মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সময় ও সাহিত্য

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা বিভাগে
পি এইচ . ডি . উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক

প্রশান্ত কুমার দাস

Registration No.: 0239/ Ph.D. (Arts)

বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৬

লায়েক আলি খান
এম.এ., পিএইচ.ডি., ডি.লিট্
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন কাজী নজরুল প্রফেসর
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
কবি নিত্যানন্দ পুরস্কার,
ঋষি বঙ্কিম স্মারক সম্মান ও
লিপিকা সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

Layek Ali Khan
M.A., Ph.D., D.Lit
Professor, Dept. of Bengali
Vidyasagar University
Former Kaji Najrul Professor
Dept. Bengali
Bardwan University
Former Guest Professor
Dept. of Bengali
Viswabharati, Santiniketan
Kabi Nityananda Puraskar,
Rishi Bankim Smarak Samman &
Lipika Sahitya Puraskar owner

তারিখ : ....

গবেষক প্রশান্ত কুমার দাস আমার তত্ত্বাবধানে **"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সময় ও সাহিত্য"** বিষয়ে দীর্ঘ ৫ বছরেরও অধিককাল ধরে গবেষণা করেছেন।

এই গবেষণাকর্ম তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল। এই কাজ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো ডিগ্রীর জন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

আমি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য এই গবেষণা পত্রটি জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

লায়েক আলি খান
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Department of Bengali
Vidyasagar University
Midnapore - 721102

ঈদগাহ্ মহল্লা, মীর্জা বাজার, মেদিনীপুর - ৭২১১০১ // মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৮৯২০২৫ / ৯৪৩৩২৩৬৪৮৬
Idgah Mahalla, Mirza Bazar, Midnapore - 721101 // Mobile : 9474892025 / 9433236486

ঘোষণা পত্র

আমি শ্রী প্রশান্ত কুমার দাস, আমার গবেষণার বিষয় — "**মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সময় ও সাহিত্য**"। অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আমি এই গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করেছি। আমার এই গবেষণা কর্মটি একান্তভাবে মৌলিক। আমার এই গবেষণার কোনো অংশ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত হয়নি।

প্রশান্ত কুমার দাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সময় ও সাহিত্য

সূচিপত্র

কথামুখ ০১

প্রথম অধ্যায় : মানিক প্রতিভার প্রস্তুতি পর্ব (১৯০৮-১৯৩৪) ০৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : মানিক প্রতিভার প্রস্তুতি পর্ব (১৯০৮-১৯৩৪) ৩৯

তৃতীয় অধ্যায় : মানিক জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি : প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব (১৯৪৪-১৯৪৭) ১৭৭

চতুর্থ অধ্যায় : মানিক জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি: স্বাধীনতা উত্তর পর্ব (১৯৪৮-১৯৫২) ২৫৮

পঞ্চম অধ্যায় : মানিক জীবনের অন্তিম অধ্যায় (১৯৫৩-১৯৫৬) ৩১৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানিকের মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত রচনা ৩৬২

সপ্তম অধ্যায় : কথাসাহিত্যের নূতন শৈলী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯১

উপসংহার ৪০০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৪০২

কথামুখ

আমাদের গবেষণার বিষয় **"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: সময় ও সাহিত্য"**। দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের পর এই গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, সময়কাল ও সাহিত্যের বিশ্লেষণকে একই আধারে ধরার এই দূরহ প্রয়াস যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক চিরস্মরণীয় নাম। জীবনকে দেখার ও দেখানোর কাজে নিজস্ব যে দৃষ্টিপ্রদীপ তিনি ব্যবহার করেছেন তা অনন্য। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে (১৯০৮-১৯৫৬) বিস্তৃত মানিকের জীবন। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বাধিক আলোড়িত-আন্দোলিত অধ্যায় এই সময়টি। এই অগ্নিময় ঝোড়ো যুগের অন্যতম দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যুগ সংঘর্ষের যুগ, মুক্তির যুগ, জয়ের উল্লাস ও শোচনীয় বিনষ্টির যুগ। বাংলা কথাসাহিত্যে এই যুগের ভাষ্য সর্বাধিক প্রত্যক্ষভাবে স্পন্দিত মানিক রচনাবলিতে। স্বল্পায়ু জীবনে (৪৮ বছর) তিনি দেখেছেন, একদিকে দু'দুটি মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশবিভাগ-ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য দেশবাসীর আন্দোলন-প্রাপ্ত খণ্ডিত 'ফর্মাল' স্বাধীনতা- শ্রমিক আন্দোলন - ভবিষ্যতের সাম্যবাদী স্বপ্নে মানুষের আন্দোলিত হওয়া ইত্যাদি। এসবই এসেছে তাঁর রচনায়। সমকালের অন্যান্য লেখকেরা যেখানে অল্পবিস্তর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে লাগিয়ে সমাজজীবনের কথা প্রকাশ করেছেন; মানিক সেখানে সাদা চোখে এ সমাজের প্রকৃত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নির্মম নিরপেক্ষ নিষ্ঠায় পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় প্রচলিত যে বিষয়গুলি উঠে আসে — তিনি কল্লোল পরিবারের লোক কিনা, প্রথমদিকে ফ্রয়েড ও পরবর্তীকালে মার্কসের ভূত তাঁকে পেয়ে বসেছিল, শেষ জীবনে তিনি অলৌকিক শক্তির কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিনা, তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলি উচ্চাঙ্গের হলেও উত্তরকালের লেখালেখি যথেষ্ট তরল — এই ধরনের জলবিভাজন স্পষ্ট। অনেকটা খবরের কাগজের রাশিফলে যেমন — রাশি ধরে ধরে এই বিরাট মানব সমাজের ভাগ্যের গড় কষার মতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার ভর ও ব্যাপ্তি কতখানি ছিল, সমকালে তিনি কতখানি ঘনাঙ্ক মেনে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন — এই দিকগুলির আলোচনা না করেই তাঁর সাহিত্যের বিভাজন রেখা টানা আসলে আমাদের চৈতন্যের বামনত্বকে প্রমাণ করে।

মানিকের সাহিত্য জীবনকে তাঁর সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রেখে আলোচনা করার এই প্রয়াস মানিক সাহিত্যচর্চায় অভিনব বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমাদের গবেষণায় এই উদ্দেশ্য নিয়ে মানিকের হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত রচনা করার চেষ্টা করেছি। যেখানে একই বছরে বাংলাদেশে তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বে ঘটে চলা উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ সূত্রে মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এককথায় সমকালীন 'সময়ে'র পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থাপন করে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ করার একটি চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের গবেষণায়। আসলে আমরা যা করতে চেয়েছি তা হল, সময়ের প্রেক্ষাপটে শিল্পী মানিক ও তাঁর শিল্পকে তুলে ধরার কাজ। যা উত্তরকালের কালানুক্রমিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রস্তাবিত গবেষণার প্রকল্প পত্রে আমরা দাবি করেছিলাম; মানিকের জীবন, সমকালীন সময় ও সাহিত্যকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করে সাহিত্যিকের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন রীতি গড়ে তোলার প্রয়াস থাকবে আমাদের গবেষণায়। যেখানে একই পাতায় ফুটে উঠবে সময়ের এক একটি অধ্যায়, তার সমকালীন ইতিবৃত্তকে অঙ্গীকার করে। পাঠকের চোখের সামনে ফুটে উঠবে পুরাতন সময়, নতুন ও জীবন্ত হয়ে। সময়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সংগ্রাম ও সাহিত্য রচনার একটি সম্পূর্ণ ইতিকথা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে আমাদের এই গবেষণায়।

আমাদের গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়: *মানিক প্রতিভার প্রস্তুতি পর্ব (১৯০৮-১৯৩৪)*। এই অধ্যায়ের বিষয় ছিল লেখকের জন্ম, বংশপরিচয়, শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল, পড়াশোনা ইত্যাদি। ১৯০৮ থেকে ১৯৩৪-এর কালানুক্রমিক সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রচনা করা হয়েছে মানিকের হয়ে ওঠার ইতিহাস। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন তারিখ অভিধান ও কালপঞ্জিধর্মী গ্রন্থের সঙ্গে মানিকের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সাহায্য নিতে হয়েছে সমকালীন উল্লেখযোগ্য লেখক — মনীষীর জীবনী গ্রন্থেরও। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ পর্যন্ত এই অধ্যায়ের কালসীমা নির্বাচন করার পেছনে আমাদের যুক্তি হল মানিকের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ববর্তী সময় অবধি মানিকের জীবন প্রসঙ্গ তুলে ধরা। সেই সঙ্গে তুলে ধরা প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সময়সীমা আমরা ঠিক করেছি শিল্পী মানিকের জীবনের প্রথম দশক। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩। ১৯৪৩ এই কারণে যে পরের বছরে মানিক কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করছেন। মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষা নেবার পূর্ববর্তী এই সময়ে মানিক মূলত ফ্রয়েডীয় ভাবনায় চালিত। তাঁর লেখার এই পর্বে তাই ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ ব্যবহার লক্ষ্মণীয়। এই সময়ের লেখালেখিতে মানিক মানুষের জীবনের জটিলতার জট খুলতে বাঁধতে মূলত মনোবিকলন তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই পর্বের শিরোনাম আমাদের গবেষণায়: ***মানিক প্রতিভার উজ্জ্বল অধ্যায় (১৯৩৫-১৯৪৩)***। এই অধ্যায়কে সময় অনুযায়ী ভাগ করতে গিয়ে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ মোট ৯টি বছরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বছরের ক্ষেত্রে সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা, মানিকের ব্যক্তিজীবনের খবর ও রচনার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। সমসাময়িক সময়কে অঙ্গীকার করেই কিভাবে মানিকের সাহিত্যচর্চা ক্রমশ অগ্রগতি লাভ করেছে আমরা তা দেখিয়েছি।

আমাদের গবেষণায় তৃতীয় অধ্যায়ের নাম — *মানিক-জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি : প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব (১৯৪৪-১৯৪৭)*। মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত মানিকের জীবন ও প্রাক স্বাধীন ভারতবর্ষের তথা বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মানিকের সৃষ্টি সম্ভার ও সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কালানুক্রমিক সমান্তরাল এক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে। গত শতকের চল্লিশের দশকে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে যে উত্তাল ও অগ্নিময় রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার আঁচ মানিকের জীবনে ও সাহিত্যেও এসে লেগেছে। এই ঝোড়োযুগের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মানিক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন মানুষের যাপিত জীবন, সময় ও সমাজকে। এক্ষেত্রেও প্রতিটি বছরের পটচিত্রে শিল্পী মানিকের জীবন ও সৃষ্টিসম্ভারকে স্থাপন করে বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে।

আমাদের গবেষণায় চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম *মানিক জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি: স্বাধীনতা উত্তর পর্ব (১৯৪৮-১৯৫২)*। দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে হয়ে ওঠা শিল্পী মানিকের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব এই অধ্যায়ে বিধৃত। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মতোই উত্তর স্বাধীনতা পর্বের রাজনীতি মনস্ক মানিকের জীবন ও শিল্পকে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে কালানুক্রমে দেখার চেষ্টা আছে আমাদের এই অধ্যায়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী এই বছরগুলিতে স্বাধীনতা লাভের আনন্দ তখন অনেকটাই স্তিমিত। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিত মানুষের স্বপ্নের ঘোর কাটতে বেশি সময় লাগেনি — *ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়*। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, শাসকের স্বৈরাচারী মনোভাব, কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের ওপর প্রবল অত্যাচার, দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালোবাজারি, দ্রব্যমূল্যের অতিবৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনা — মানুষের মনে স্বাধীনতার আনন্দকে তিক্ত করে তুলেছিল। সংবেদনশীল শিল্পী মানিকও স্বাধীনতার জন্য মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের এমন পরিণতি দেখে ব্যথিত। তাঁর এই সময়ের রচনায় ফুটে উঠছে দেশবাসীর স্বপ্নভঙ্গের সেইসব ছায়াছবি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এই পাঁচ বছরের সংবাদ ও তথ্য এই চতুর্থ অধ্যায়ের উপজীব্য।

আমাদের আলোচনায় পঞ্চম অধ্যায়ের নাম *মানিক জীবনের অন্তিম অধ্যায় (১৯৫৩ - ১৯৫৬)*। এই অধ্যায়ে মোট চার বছরের সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ও মানিকের ব্যক্তিজীবন ও রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। এই সময় মানিক শারীরিকভাবে বার বার অসুস্থ হচ্ছেন। প্রবল আর্থিক অনটন, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি তাঁর সাহিত্য চর্চায় বাধা হয়ে উঠছে। জীবনযুদ্ধে বরাবরের সংগ্রামী সৈনিক মানিকের মধ্যে দেখা দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত লেখালেখি করলেও সেইসব লেখার মধ্যে অস্তগামী সূর্যের মতোই মানিক প্রতিভা ম্লান-দ্যুতি।

আমাদের গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় হলো *মানিকের মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত রচনা*। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধগ্রন্থ, অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও চিঠিপত্র ও কিশোর রচনা সম্ভারের

উল্লেখ ও তালিকা প্রস্তুতির কাজ। লক্ষ্য করা গেছে যে শারীরিকভাবে অসুস্থ মানিক, উপার্জনহীন, প্রতিভার দীপ্তি ও শক্তি যখন প্রায় নিস্প্রভ, তখন এই সব লেখালেখি মূলত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দাবি মিটিয়ে কিছু অর্থ উপার্জনমুখী। শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে কিছু অসাধারণ না হলেও পূর্ববর্তী গল্প উপন্যাসের প্লট ভেঙে অজস্র সৃষ্টি সম্ভারে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মানিক। বিদায়ী সূর্যের শেষ স্বর্ণগোধূলী কোনো কোনো গল্পে বিকীর্ণ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা শ্লথ সৃষ্টি বলে মনে হয়। যথাস্থানে সে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণা পত্রের শেষ অধ্যায় *কথাসাহিত্যের নূতন শৈলী: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী মানিকের রচনার শৈলীর অভিনবত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতি ও তারাশঙ্করের সঙ্গে কাহিনি বিন্যাস ও কথনরীতি, অনেক ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে যে অভিনব পন্থা মানিকে লক্ষ্য করা যায়, আমরা তার সাধারণ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এজন্য প্রয়োজনে মানিক ছাড়া অন্যান্য লেখকদের রচনা ও আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহারে আমরা একথা বলতে চেয়েছি যে, একজন লেখক তাঁর সামাজিক শ্রেণি অবস্থানের মধ্য দিয়েই 'হয়ে' ওঠেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে নির্মিতি দেয় তাঁর সময়; তাঁর হয়ে ওঠার পরিধি ও প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী সত্তাকে। মানিকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সময়ের এই বিবর্তনের ধারায় মানিকের ব্যক্তিজীবনের ও তাঁর শিল্প সৃষ্টির রেখাচিত্র নির্মাণ। এই কাজ উত্তরকালের সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষণে নতুন ধারা রচনায় সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য যে আগামী দিনে এইভাবে প্রতিটি লেখক ও শিল্পীর জীবনভাষ্য রচনার সামগ্রিক চেষ্টা হয়তো খুলে দেবে নতুন এই রীতির সম্ভাবনার দ্বার।

আমাদের বাংলা ভাষার বানান বিধি নিয়ে সবাইকে কম বেশি মুশকিলে পড়তে হয়। এতদিনকার প্রচলিত অনেক শব্দের বানান বর্তমানে অচল। মান্য চলিত বাংলা, কথ্য বাংলা ভাষা ও লেখার ভাষার মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। তারপর বানান বিধি নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকাও আমাদের সামনে ছিল না। ফলে শিক্ষিত বাঙালি এক শব্দের একই বানান লিখতে পারেনি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বাংলা শব্দের যে বানান অভিধান প্রকাশ করেছেন, আমরা তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও আমরা বর্তমান বাংলা আকাদেমির বানান বিধিই প্রয়োগ করেছি। তারপরেও যদি কোথাও বানানে ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে মুদ্রণ প্রমাদ বা মুদ্রণকার্যে দ্রুততা কারণ হতে পারে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিনীত মার্জনা চেয়ে রাখছি।

আমার এই গবেষণা কর্মটিকে সুসম্পন্ন করতে গিয়ে যেসকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য আমি পেয়েছি, তাঁদের কথা না বললে আমার এই গবেষণার বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না। তাঁদের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার। যেসব গ্রন্থে আমার মন ও চিন্তা সমৃদ্ধ হয়েছে, আমার গবেষণার পাঠ পূর্ণতা

পেয়েছে, সেসব গ্রন্থের কথা আমি গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি উচ্চমানের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল গুণীজনকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। তাঁরা জানেনও না যে, তাঁরা অলক্ষ্যে থেকে আমার লক্ষ্যকে কতখানি চালিত করেছেন। এই বিস্তৃত গবেষণার কাজ করতে গিয়ে আমি যেসকল গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি — কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা রামমোহন লাইব্রেরি, আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। এই গ্রন্থাগারগুলির বিচিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারের সংস্পর্শ আমার গবেষণাকর্মকে যেমন ঋদ্ধ ও পূর্ণ করেছে, তেমনি আমার জীবন অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করেছে, যা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

এই গবেষণাকর্মে কয়েকজন ব্যক্তি আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন ও বিভিন্ন অমূল্য পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রথমেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারকে। বিশেষত মানিকের কনিষ্ঠ পুত্র সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুত্রবধূ মানসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মানিক সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য, বই এবং তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে তাঁরা ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। মানিকের সমগ্র পরিবারের প্রতি আমার প্রণাম ও শুভকামনা রইল। প্রণাম জানাই আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. লায়েক আলি খান মহাশয়কে। যিনি স্নেহে ও শাসনে আমার লেখাপড়ার আশ্রয় হিসেবে বটবৃক্ষের মতো সবসময় পাশে থেকেছেন। তাঁর সাহচর্য, সুপরামর্শ ও ভালোবাসা না পেলে আমি কখনোই এই গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারতমান না। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে, ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, ড. ছন্দা ঘোষাল, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সরোজ পান, ড. সুজিত কুমার পাল মহাশয়কে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই। তাঁরা প্রত্যেকে আমার ছাত্রজীবনে ও গবেষণাকর্মে ধ্রুবতারার মতো পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এই গবেষণা পত্রটির মুদ্রণ বিন্যাসে ও বাঁধাই কার্যে যাঁরা সহায়তা করেছেন, এছাড়াও অনেকেই আছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার গবেষণার কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাই। আর যাঁদের কথা না বললে আমার জীবন বা জীবনের সব কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়; আমার সেই পিতা-মাতা ও পরিবারের সকল গুরুজনদের প্রণাম জানাই। তাঁদের স্নেহাদর ও আশ্রয়ই আমার সকল কাজে প্রেরণার উৎস।

প্রশান্ত কুমার দাস

প্রথম অধ্যায়

মানিক প্রতিভার প্রস্তুতি পর্ব
(১৯০৮-১৯৩৪)

১৯০৮-১৯৩৪

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

সাহিত্য সৃষ্টিতে সময়ের প্রভাব অনিবার্য। কোন মানুষই তাঁর সময়কে অস্বীকার করে চলতে পারেন না। সময়কে অঙ্গীকার করে, সময়ের মধ্যে দিয়েই তাঁকে 'হয়ে উঠতে' হয়। একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর সময়কে অনুকরণ করে চলেন। (অ্যারিস্টটলের অনুকরণতত্ত্ব এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে)। সাহিত্যে সময়ের অভিঘাত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি যুগের চিন্তাধারা, সংস্কার, সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে, আবার তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসও থাকে। সবমিলিয়ে এক একটি সময়পর্ব তার নির্দিষ্ট যুগগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। আর এই সময়পর্বে দাঁড়িয়ে একজন লেখক এই সময়ের সমাজ ও জীবনকে সাহিত্যের আধারে তুলে ধরেন মাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখককে তাঁর যুগের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ না করলে মূল্যায়ণে কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম এবং 'হয়ে ওঠা'র যুগটা ছিল আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও বিক্ষোভে পরিপূর্ণ অগ্নিময় ঝোড়োযুগ। মানিকের চরিত্রে ও চেতনায়, চিন্তায় ও কর্মে এই যুগের প্রভাব সর্বাধিক। এ কথা বললেও বোধহয় ভুল বলা হয়না যে, মানিকের সমকালে যে সকল সাহিত্যিকের আর্বিভাব ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে সময়কে অঙ্গীকার করে, সময়োচিত সাহিত্য সৃষ্টি করে, সাহিত্যে সমকালীন সময়কে বড়ো আকারে তুলে ধরেছেন একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক লক্ষ্য করেছিলেন, বাঙালি মধ্যবিত্তের নানা অবক্ষয়, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি। সমকালের সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত শ্রেণিশোষণ ও অসঙ্গতি। সমাজ পরিবর্তনের নানা আন্দোলন, আলোড়ন ও বিক্ষোভ। মানিক তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না করে সামজকেন্দ্রিক করে তোলার জন্যই তাঁর সাহিত্যে সমকালীন সময়ের প্রভাব এতো বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানিকের জন্ম ১৯০৮ সালের ১৯ মে। বিশশতকের সূচনালগ্ন থেকেই জাতীয় আন্দোলন ও ইংরেজ বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে দেশীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে, বিশেষত বাংলাদেশের সমাজে নতুন করে চেতনার জাগরণ সার্বিকভাবে ঘটতে দেখা যায়। মানিকের আবির্ভাবের সময়কার পরিস্থিতিকে বুঝতে হলে একটু অতীতকে স্মরণ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই ভারতে সামন্তপ্রথার প্রবর্তন ঘটে। যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রজা শোষণ, শাসন এবং খাজনা আদায়। তুর্কি, আফগান, মোঘল, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, বেলজিয়াম, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির দ্বারা ভারতবাসী আক্রান্ত, লুন্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত এবং

শাসিত হয়েছে। যার ফলে দিনে দিনে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই বিপর্যস্ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সবশেষে প্রবেশ করে ইংরেজ। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করে। তারপর ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় তারা। বিভিন্ন উপায়ে কর আদায় ও প্রজা শোষণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে, যার ফলশ্রুতিতে ১৭৭০ এর মন্বন্তর। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পরেও ইংরেজরা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। যার ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এবং কর ও খাজনার চাপে; অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং ধর্মীয় নির্যাতনে বিপর্যস্ত মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে বিদ্রোহী ও সংগ্রামী হয়ে ওঠে। বাংলার কৃষকের সংগ্রাম আরম্ভ হয় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র (১৭৬৩-১৮০০) মধ্য দিয়ে। এছাড়াও অষ্টাদশ শতকে আরো কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল — 'মেদিনীপুরের ঘড়ুই', 'খয়রা', 'মাঝি' ও 'প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ' (১৭৬৬-১৭৮৩), 'কৃষক ও তন্তুবায় সংগ্রাম' (১৭৭০-১৭৮০), পার্বত্য চট্টগ্রামের 'চাকমা বিদ্রোহ' (১৭৭৬-১৭৮৭), যশোর খুলনার 'প্রজা বিদ্রোহ' (১৭৮৪-১৭৯৬), বাঁকুড়া বীরভূমে 'পাহাড়িয়া বিদ্রোহ' (১৭৮৯-৯১), বাখর গঞ্জের 'সুবান্দিয়া বিদ্রোহ' (১৭৯২) ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ-সংগ্রামের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 'ওয়াহাবি বিদ্রোহ' (১৮৩১), 'ফরাজি বিদ্রোহে'র (১৮৩৮-৪৭) কথা। এই আন্দোলনগুলি প্রথমে ধর্মীয় সংস্কারমূলক হলেও পরে তা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ভারতের অন্যান্য আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা মহাবিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম। উনিশ শতকে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হল 'নীল বিদ্রোহ'। এছাড়া পাবনা ও বগুড়া জেলার 'সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ' (১৮৭২-৭৩), দক্ষিণ ভারতের 'মোপালা বিদ্রোহ' (১৮৩৬-১৯২১), 'কোল বিদ্রোহ' (১৮৩২), 'ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ' (১৮৪৪-৯০), 'সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্রোহ' (১৮৬১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ করে। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার প্রভাব আমাদের সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আন্দোলন, মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেশকে পুনর্গঠনের চেষ্টা; পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন, নারী প্রগতি ও শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা; এছাড়াও ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সহ বিশিষ্ট মণীষীগণ বাংলাদেশের সমাজ ও জীবনকে পরিবর্তনের জন্য অন্তহীন প্রয়াস চালিয়েছেন। সেই সঙ্গে ইংরেজদের আগমনের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্য, শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবও আমাদের সমাজ জীবনে এসে পড়তে থাকে। আধুনিক জীবন চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হতে দেশবাসী ক্রমশ অনুভব করে পরাধীনতার গ্লানি ও যন্ত্রণা।

সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনের মান উন্নয়ণের সঙ্গেই চলতে থাকে দেশকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন ও গণচেতনা বৃদ্ধির সাধনা।

বিশ শতকের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি জাতির মনে একদিকে দেশপ্রেম ও অন্যদিকে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব ছিল প্রকট। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জমা ক্ষোভকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাঙালির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য বাংলাকে বিভক্ত করার সুচতুর পরিকল্পনা করে ইংরেজরা। এই বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজটি তাঁরা বপন করেছিলেন, তার কুফল আজও দেশবাসীর নিত্যসঙ্গী। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা বাংলা তথা সারা দেশে প্রতিবাদ আন্দোলন তীব্রতর হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, এমনকি ছাত্র ও মহিলারাও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে রাখিবন্ধন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্যোগে অরন্ধন, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত, স্বতস্ফূর্ত হরতাল, ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান, মিছিল কর্মসূচী পালন ইত্যাদি সারা বাংলাব্যাপী এক প্রবল আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে এই সময় থেকে দেশের মধ্যে নানা গুপ্ত সমিতি, চরমপন্থী সসস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনসহ ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এরপর আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কৌশলে ইংরেজরা এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবাসীকেও জড়িয়ে নেয়। এছাড়া রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রতিবাদ, চৌরিচৌরার ঘটনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, রাশিয়ার বিপ্লব ইত্যাদি নানা ঘটনার অভিঘাতে দ্রুত বদলে যেতে থাকে দেশের সামাজিক পরিকাঠামো। সাইমন কমিশনের বিরোধীতা, বিলেতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে গুপ্ত আক্রমণ ও হত্যা, ভগৎ সিং-এর ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি, পূর্ণস্বাধীনতার জন্য সার্বিক গণ-আন্দোলন, গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, একাধিক আইন অমান্য আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি নানান ঘটনার পর ঘটনার অভিঘাতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমাজ ও গোটা দেশ। দেশের এরকম আন্দোলন মুখর, বিক্ষোভপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে মানিকের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। সমকালীন সময়ের এইসব পরিস্থিতি মানিকের চিন্তায় ও মননে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়া নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি জেনে নিতে, বুঝে নিতে চেয়েছিলেন মানুষ, পরিবার, সম্পর্ক, সমাজ, দেশ, জীবনের নানান প্রশ্নকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার ও সাহিত্যকর্মের সার্থক বিশ্লেষণের জন্য তাঁর সময়টিকে জেনে নেওয়া জরুরি। অথবা সময়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে তাঁর সাহিত্যের পাঠ নিলে, তবেই আমরা তাঁর মানসভূমির কাছাকাছি পৌঁছতে পারব। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের লক্ষ্যও ছিল তাই — সময়ের প্রেক্ষিতে মানিকের সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ। সেকারণে মানিকের জন্মপরবর্তীকালে শৈশব,

কৈশোর ও যৌবনকালে, যে সময়ে মানিক 'হয়ে উঠে'ছেন; সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরছি।

১৯০৮

মহারাষ্ট্রে কোলাপুর বোমা মামলা শুরু, যে মামলায় বহু বিপ্লবীর দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হয়। কাশীর বাঙ্গালীটোলা উচ্চ ইংরেজি-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর বিদ্যালয়ের অপর কয়েকজন ছাত্রের সাথে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটা সমিতি স্থাপন করেন। এর নাম রাখা হয় 'অনুশীলন সমিতি'। কাশীতে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের ফলে নাম বদল করে রাখা হয় 'যুব সঙ্ঘ' ('ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন')। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টায় কাশীর ছাত্রদের একটি প্রকাশ্য সংগঠন গড়ে ওঠে, যার নাম হয় 'স্টুডেন্টস ইউনিয়ন লীগ'। রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে হিন্দি *কেশরী* ও *দেশ-সেবক* পত্রিকার সম্পাদক দু'জনকে বন্দি করে জেলে পাঠালে এর প্রতিবাদস্বরূপ নাগপুরের যুবকরা মহারানি ভিক্টোরিয়ার পাথরের মূর্তি ভেঙে ফেলে তাতে আলকাতারা মাখিয়ে দেয়। অনুশীলন সমিতি সহ বিভিন্ন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হয়। এই সময় পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা বিদ্যমান ছিল। কলকাতার কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে স্বদেশী পণ্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত ও অশ্বিনীকুমার দত্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করলে ব্রিটিশ সরকার এই সমিতি ও সমিতির ১৭৫ টি শাখাকে বেআইনি ঘোষণা করে। ইংরেজ সরকার 'এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্স অ্যাক্ট' প্রনয়ণ করে।

জানুয়ারি ১০ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম গান্ধিজির দুই মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়।

জানুয়ারি ২৪ মহারাষ্ট্রের নাসিকের জনসভায় অরবিন্দ ঘোষ বলেন — 'স্বরাজই (স্বাধীনতা) জীবন, স্বরাজই অমৃত, স্বরাজই মুক্তি।

জানুয়ারি ২৮ মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন হয়। অরবিন্দ ঘোষ ঐ সঙ্গীতকেই তাঁর বক্তৃতার বিষয় করেন।

মার্চ ৮ *বন্দেমাতরম* পত্রিকার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান দিতে অস্বীকার করার জন্য ছ'মাস জেল খাটার পর বক্সার জেল থেকে বিপিনচন্দ্র পালের মুক্তি।

এপ্রিল ১০ *যুগান্তর* পত্রিকায় 'ইংলিশম্যানের অত্যাচার' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ফণীন্দ্রনাথ মিত্রের এক বছর এগারো মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হয়।

এপ্রিল ৩০ মজঃফরপুরে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডের ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা নিহত।

পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মোকামা ঘাট স্টেশনে প্রফুল্ল চাকী নিজেকে গুলি করে মৃত্যুবরণ করেন। পুলিশ তাঁকে সনাক্ত করার জন্য দেহ থেকে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে স্পিরিটের জারে ডুবিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

খালি পায়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর থেকে ২৪ মাইল দূরে ওয়ানী স্টেশনে এসে একটু দূরে বাজারে গিয়ে যখন দোকানে চিঁড়ে খাচ্ছিলেন তখন গ্রেপ্তার হন। সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেণে ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে নিয়ে এলে তাঁকে দেখার জন্য খুব ভিড় জমে যায়।

মে ৩০ *যুগান্তর* পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু হয়।

প্যারিসে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেত্রী মাদাম কামার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে হেমচন্দ্র কানুনগো ফরাসি সোশ্যালিস্ট দলের গুপ্ত সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের সাহায্যে মারাত্মক বোমা প্রস্তুতের প্রণালী শেখেন। ১৯০৭ সালে দেশে ফিরে ব্রিটিশ নিধনের জন্য বোমা প্রস্তুত করেন। তাঁর প্রস্তুত প্রথম বোমাটি ফরাসি চন্দননগরের মেয়রের উপরে নিক্ষেপ করা হলেও তিনি বেঁচে যান। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত বোমা (পুস্তকাকৃতি এবং স্প্রিংযুক্ত) অত্যাচারী কিংসফোরডকে পাঠানো হয়, কিন্তু পুস্তকখানা না খোলায় তিনি রক্ষা পান। তৃতীয় বোমাটি ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়।

আগস্ট ১১ বিহারের মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

'নিউজপেপার অ্যাক্ট' প্রনয়ণ করা হয়। যার মাধ্যমে *বন্দেমাতরম*, *সন্ধ্যা* ও *যুগান্তর* পত্রিকার প্রকাশ পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ২০ মেদিনীপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত মেদিনীপুরের নাড়াজোলের জমিদার রাজা নরেন্দ্রলাল খান শর্তাধীন জামিনে মুক্ত হন।

নভেম্বর ২১ সত্যেন বসুর ফাঁসি ও জেলের মধ্যেই তাঁর মৃতদেহ দাহ।

ডিসেম্বর ২৮-৩০ মাদ্রাজে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে চব্বিশতম কংগ্রেস অধিবেশন শুরু।

১৯০৯

বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে আইন অমান্য করা হয়। এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে নেতৃস্থানীয়রা আহত হন। অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বিভিন্ন কারণে 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা' ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রথমত, এটাই বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা; দ্বিতীয়ত, ভারতে এই প্রথম বোমা দ্বারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয় এবং এই বিপ্লবীরাই ভারতে প্রথম বোমা ব্যবহার করেন; তৃতীয়ত, কানাইলাল ও সত্যেনের দ্বারা জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামী হত্যা কেবল ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসেই নয়, এটাকে সমগ্র বিশ্বের বিপ্লব - প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

জানুয়ারি ৬ ভারত সরকারের এক দমনমূলক আইনের জোরে ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতিকে ইংরেজ সরকার বেআইনী বলে ঘোষণা করে।

ফেব্রুয়ারি ১০ 'আলিপুর ষড়যন্ত্র বোমা মামলা' এবং 'কানাইলাল ও সত্যেন বসু' মামলায় নিযুক্ত সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে জোড়াবাগন আদালত প্রাঙ্গণে বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু হত্যা করেন।

মার্চ ১ কলকাতার যুবক সমিতি ও খুলনার ব্রতী সমিতিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়।

অক্টোবর ১২ ইংরেজ সরকার কলকাতায় বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে।

ডিসেম্বর ২৭-২৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মদনমোহন মালব্য। এই অধিবেশনকেও চব্বিশতম অধিবেশন বলে অভিহিত করা হয়।

১৯১০

জানুয়ারি ২২ আলিপুর ষড়যন্ত্র বোমা মামলায় অভিযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীর সরকারকে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

ফেব্রুয়ারি ৯ নতুন করে একটি ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট আরোপ করা হয়, যে আইনের ফলে সরকার বিরোধী প্রবন্ধ বা পুস্তিকার লেখককে যে কোন ধরনের শাস্তি দেওয়া যাবে, যে কোনো পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করা বা তার ওপর অর্থকরী শাস্তি দেবার অধিকার সরকার লাভ করে।

মে ১২ লণ্ডনের ম্যাজিস্ট্রেট বিনায়ক সাভারকারকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ দেন।

জুলাই ১৮ 'যুগান্তর' সমিতির উদ্যোগে খুলনা জেলায় যশোহর ও খুলনা জেলার যোলগাঁতি (২০০০ টাকা), ধূলগ্রাম (৬১৭৫ টাকা), নন্দনপুর (৬৫০৭ টাকা), ও মহিশা (২২০৪) নামে জায়গায় ডাকাতি হলে পুলিশ ডাকাতির কোনো কিনারা করতে না পারলেও বিপ্লবী দলের সন্ধান পায়। সতেরো জনকে নিয়ে যে মামলা হয় ঐ মামলা 'খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে খ্যাত।

ফেব্রুয়ারি ৯ সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করবার জন্য নতুন প্রেস-আইন প্রয়োগ।

অক্টোবর ১৩ মহীয়সী সেবাব্রতী নারী ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভগিনী নিবেদিতার মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে জীবনাবসান ঘটে।

ডিসেম্বর ১২ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে যে দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হয় তাতে বঙ্গভঙ্গ রদ করবার কথা ঘোষণা করা হয়। এর সাথে ঘোষণা করা হয় ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হবে।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিষ্ণু নারায়ণ ধর। এই অধিবেশনে প্রথম 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হয়।

১৯১১

ফেব্রুয়ারি ৯ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্য নতুন প্রেস-আইন প্রয়োগ করা হয়।

অক্টোবর ১৩ মহিয়সী সেবাব্রতী নারী ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভগিনী নিবেদিতার মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে জীবনাবসান ঘটে।

ডিসেম্বর ১২ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে যে দিল্লির দরবার অনুষ্ঠিত হয় তাতে বঙ্গভঙ্গ রদ করবার ঘোষণা করা হয়। এর সাথে ঘোষণা করা হয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানন্তরিত করা হবে।

১৯১২

এপ্রিল ১ কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

জুন ২৫ দুই বঙ্গ একত্রীকরণের জন্য পার্লামেণ্ট বিল অনুমোদিত হয়।

সেপ্টেম্বর ২৪ ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ মতিলাল নামে এক হেড কনস্টেবলকে ঢাকা শহরে জনবহুল রাস্তায় সন্ধ্যা ৭ টার সময় গুলি করে হত্যা করে।

ডিসেম্বর ২৩ কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত ভারতের নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার দরবার উপলক্ষে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন হাতিতে চড়ে রাজকীয় সমারোহে দিল্লি প্রবেশ করছিলেন তখন চাঁদনী চকে তাঁকে লক্ষ্য করে মণীন্দ্রনাথ নায়েক দ্বারা প্রস্তুত বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এতে একজন লোক নিহত হয় এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজে গুরুতরভাবে আহত হন। বোমাটি নিক্ষেপ করেন বসন্তকুমার বিশ্বাস।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ পাটনার কাছে বাঁকিপুরে আর. এন. মুধেলকারের সভাপতিত্বে সাতাশতম কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জহরলাল নেহেরু প্রথমবার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন।

১৯১৩

জানুয়ারি ২৪ রাসবিহারী বসুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা।

এপ্রিল আমেরিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা।

জুলাই ২৮ বঙ্গীয় কৃষক লীগ প্রতিষ্ঠা।

সেপ্টেম্বর ২৯ কলেজ স্কোয়ারে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কনস্টেবল হরিপদ দেবকে যুগান্তর সমিতির সদস্যরা হত্যা করে।

সেপ্টেম্বর ৩০ পূর্ববঙ্গের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন কুখ্যাত ইন্‌সপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে বাড়ির মধ্যে বিপ্লবীরা হত্যা করে।

অক্টোবর ২৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি. লিট. উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল।

নভেম্বর ১ সান্‌ফ্রান্সিসকো শহর থেকে ‘গদর’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ করাচিতে নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুরের সভাপতিত্বে আঠাশতম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৪

ছাত্রাবস্থায় বিপিনচন্দ্র পাল ও সখারাম গণেশ দেউস্করের দ্বারা প্রভাবিত অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাঘাযতীন ও রাসবিহারী বসুর পরিচয় হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় 'ব্রাদারহুড' নামে এক ছাত্র সমিতি স্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল ঘোষ এই সমিতির সদস্য ছিলেন। চম্পক রমন পিল্লাই বার্লিনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

সেপ্টেম্বর ২৯ 'কোমগাতা মারু' নামে জাহাজ বজবজে পৌঁছলে 'গদর পার্টির' লোক অভিহিত করে বন্দরে যাত্রীদের নামতে না দেবার জন্য পুলিশের সাথে সংঘর্ষ। পুলিশের গুলি চালানোর ফলে ১৮ জন শিখ নিহত।

অক্টোবর অমৃতসরের একটি সমাবেশে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

ডিসেম্বর ২৮-৩০ মাদ্রাজে উনত্রিশতম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

১৯১৫

লাহোরের ইন্ডিয়ান হোটেলে বসে রাসবিহারী বসু আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি সারা ভারতব্যাপী সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন।

জানুয়ারি গান্ধিজির ভারতে প্রত্যাবর্তন।

ফেব্রুয়ারি বাঘাযতীনের প্রেরিত দূত হিসেবে অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় অস্ত্রসংগ্রহের জন্য জাপানে প্রেরিত হন।

মার্চ ১৮ সর্বসম্মতিক্রমে ইমপিরিয়ল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারত রক্ষা আইন পাশ হয়।

মার্চ ২৩ মিরাটে বিষ্ণু গণেশ পিংলে দশটি বোমা সহ ধরা পড়লে শুরু হয় প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

মার্চ ২৫ ফিরোজপুর ষড়যন্ত্র মামলায় জীবন সিং, কাকশিস্ সিং, ধীয়ান সিং, লাল সিং, কাসিরাম ও রহমত আলিকে মন্টোগমারি ও লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মে আমেদাবাদের নিকটে একটি গ্রামে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী ও অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য আশ্রমবাসীদের যে সমস্ত মূল নীতির ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেগুলি হল সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, সংযম, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যবরণ ইত্যাদি।

জুন ৩ ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে ব্রিটিশ সরকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আগস্ট যুগান্তর বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্য অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত বাগনানে তাঁর বিদ্যালয়ে পুলিশের হয়রানিতে অতিষ্ঠ পলাতক বাঘাযতীনকে আশ্রয় দেন। এখান থেকেই বাঘাযতীন ওরফে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরের জঙ্গলে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

ডিসেম্বর ১ আফগানিস্তানের রাজভ্রাতা ও প্রধানমন্ত্রী সর্দার নসরুল্লা খানের আনুকূল্যে, রাজা আমানুল্লার সানুগ্রহ স্বীকৃতিতে এবং বার্লিন কমিটির উদ্যোগে ভারতের প্রথম জাতীয় সরকার।

ডিসেম্বর ২৭-২৯ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ত্রিশতম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

১৯১৬

জানুয়ারি ১১ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ই এফ ওটেনের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কলেজের ছাত্ররা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ছাত্র ধর্মঘট শুরু করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ও সম্ভবত বঙ্গ প্রদেশের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটিই ছিল প্রথম ছাত্র ধর্মঘট।

ফেব্রুয়ারি ১৫ অধ্যাপক ওটেন কলেজ ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হন। ওটেন সাহেবকে প্রথম আঘাত করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র অনঙ্গমোহন দাস।

ফেব্রুয়ারি ১৬ কলেজের বেয়ারা বংশীলালের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে অনঙ্গমোহন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুকে অধ্যক্ষ কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন।

ফেব্রুয়ারি ১৯ গভর্নিংবডি বহিষ্কারের প্রস্তাব অনুমোদন করলে ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

বোম্বাই সরকার বাল গঙ্গাধর তিলকের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ভীত হয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ ও এক বৎসর সদ্ভাবে থাকবার জন্য জামিন স্বরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা দেবার নির্দেশ দেয়।

পশ্চিম ভারতে বাল গঙ্গাধর তিলক হোমরুল আন্দোলনের স্বপক্ষে সারা ভারতে প্রবল জনমত গড়ে তুললে দেশবাসী তাঁকে ‘লোকমান্য’ আখ্যায় ভূষিত করে। এই সময়ে তিলক ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বাণী — “স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা অর্জন করবই।”

ডিসেম্বর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী মৌলানা মামুদ আনসারী, আবদুল্লা ফতে মহম্মদ, মহম্মদ আলি বৈপ্লবিক আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার সময় গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় সেই মামলা ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে ‘রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র’ নামে বিখ্যাত।

ডিসেম্বর ২৬-৩০ লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত একত্রিশতম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। এখানে প্রথম জওহরলাল নেহেরুর সাথে গান্ধিজির সাক্ষাৎ হয়।

১৯১৭

এপ্রিল বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধিজি সেখানকার কৃষকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহারুল হক, আচার্য কৃপালনি ও মহাদেব দেশাইকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলে গান্ধিজিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হয়।

জুন ২৬ কলকাতায় বেঙ্গল হোমরুল লীগ গঠিত হয়। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এর সভাপতি এবং আই. বি. সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যুগ্ম সম্পাদক হন।

আগস্ট ৮ অ্যানি বেশান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হলেও টাউন হল কর্তৃপক্ষ হল দিতে অস্বীকার করলে রামমোহন হলে এই দিন সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

ডিসেম্বর ২৫ বিজ্ঞানী সহ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল সোস্যাল কনফারেন্সের ৩১ তম অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি, বিধবাদের স্বনির্ভরতা, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিলোপ সাধন, নারীদের ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

ডিসেম্বর ২৬-২৯ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বত্রিশতম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অ্যানি বেশান্ত। এই অধিবেশনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের দাবী করা হয়।

১৯১৮

মার্চ আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্পের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত করা হলে গান্ধিজি তাঁদের সমর্থনে আমরণ অনশন শুরু করেন।

এপ্রিল ইংল্যাণ্ডকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে দিল্লীতে একটি 'World Conference'-এর আয়োজন করেন।

জুলাই ১৯ রাওলাট কমিটির রিপোর্ট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

সেপ্টেম্বর ১০ কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয় এবং শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

নভেম্বর ১৩ ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জর্জ লয়েডকে হোমরুল লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ভারত শাসন সংস্কারের প্রতিবাদে শান্তি, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের আবেদন জানান।

ডিসেম্বর ২৬-৩১ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি মদনমোহন মালব্য মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের সমালোচনা করেন।

১৯১৯

জানুয়ারি ১ সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত। সরকার রাওলাট বিল প্রকাশ করেন।

ফেব্রুয়ারি ২১ রাওলাট কমিটির সুপারিশগুলি আইনরূপে গৃহীত হয়। এই আইন রাওলাট আইন নামে কুখ্যাত।

মার্চ ১৮ ভারতীয় প্রতিনিধিদের বাধা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় রাওলাট বিল গৃহীত হয়। এর প্রতিবাদে মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল কেন্দ্রিয় আইনসভার সদস্য পদে ইস্তফা দেন।

মার্চ ২৪ রাওলাট বিলের প্রতিবাদে গান্ধিজির ২৪ ঘণ্টা অনশন। ৩০ মার্চ সারা দেশে এর প্রতিবাদে হরতাল পালন করা হবে বলে ঘোষণা। পরে তারিখ বদল করে করা হয় ৬ এপ্রিল।

মার্চ ৩০	শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর দিল্লিতে সেনাবাহিনীর আক্রমণ।
এপ্রিল ৬	গান্ধিজির আহ্বানে সারা দেশে 'হরতাল' পালিত হয় ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়।
এপ্রিল ১৩	অমৃতসর শহরের পূর্ব দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে এক বাগানে শাসকবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে প্রায় দশ হাজার লোক জমায়েত হলে জেনারেল ডায়ারের সৈন্যবাহিনী দশ মিনিট ধরে নিরীহ জনতার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। সরকারি মতে ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ লোক আহত, কিন্তু বেসরকারী মতে সহস্রাধিক লোক নিহত।
এপ্রিল ১৪	গুজরানওয়ালা রেলওয়ে স্টেশন ও সরকারি অফিসে জনসাধারণ আগুন লাগিয়ে দেন।
এপ্রিল ২১	বোম্বাইতে কংগ্রেসের জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২৭	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ।
জুন ৩	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা বিভাগের সূচনা।
জুন ২৬	রম্যা রঁল্যার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতাকামী সঙ্ঘের ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর দান করেন।
নভেম্বর ২৩	দিল্লিতে সর্বভারতীয় 'খিলাফৎ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। মোহনদাস গান্ধি সভাপতি নির্বাচিত হন।
ডিসেম্বর ২৭-৩০	অমৃতসরে অনুষ্ঠিত চৌত্রিশতম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন মতিলাল নেহেরু।

১৯২০

জানুয়ারি ১৮	'খিলাফৎ আন্দোলন' সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে গান্ধিজির সাক্ষাৎকার।
ফেব্রুয়ারি ২১	মীরাটে 'খিলাফৎ সম্মেলন' শুরু। গান্ধিজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রথম ঘোষণা করেন।
এপ্রিল ১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাইতে থাকাকালীন কংগ্রেসের মহম্মদ আলি জিন্নার অনুরোধে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ভাষণ লিখে পাঠান।
মে ২৮	হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে জালিয়ানওয়ালাবাগসহ পাঞ্জাবের ঘটনাবলীকে লঘু করে দেখে সরকারের ভূমিকাকে সমর্থন করা হয়।
জুন ২	এলাহাবাদে কেন্দ্রিয় খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমানদের একটি যুক্ত সভায় গান্ধিজি, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়, তেজবাহাদুর সপ্রু, বিপিনচন্দ্র পাল, মদনমোহন মালব্য, সত্যমূর্তি রাজাগোপালাচারী, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ অসহযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
জুলাই ১২	মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা 'নবযুগ' প্রকাশ।
আগস্ট ৩০	ভাইসরয়কে গান্ধিজি তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ পদক ফিরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।

সেপ্টেম্বর ৪-৮ কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপৎ রায়।

অক্টোবর ১৭ রাশিয়ার তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি স্থাপন।

ডিসেম্বর ২৬-৩১ নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঁয়ত্রিশতম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সি. বিজয় রাঘবচারিয়া। এখানে জনসাধারণ গান্ধিজিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'মহাত্মা' উপাধি দেন।

১৯২১

জানুয়ারি ১০ মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অফ কনট মাদ্রাজে অবতরণ করার পর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে হরতাল পালিত হয়।

জানুয়ারি ১২ কলকাতায় ছাত্রদিবস পালিত হল।

জানুয়ারি ২০ পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে কলকাতার সমস্ত স্কুল কলেজে ছাত্র ধর্মঘট।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকাতে অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করার জন্য চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' নামে অভিনন্দিত করা হয়। ঐ সময় থেকে চিত্ররঞ্জন দাশ 'দেশবন্ধু' নামে সকলের কাছে পরিচিত হন।

ফেব্রুয়ারি যুক্তপ্রদেশে সত্তর হাজার কৃষক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে।

ফেব্রুয়ারি ১৬ কেম্‌ব্রিজ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সুভাষচন্দ্রের চিঠি। সরকারি কাজের পরিবর্তে দেশকে সেবা করতে চান।

মার্চ ২৪ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যেহেতু শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেওয়া সেহেতু সরকার এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাবে।

এপ্রিল ২২ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুগামী পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত এম. এস. সি পরীক্ষা বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শরৎকুমার ঘোষ অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে এবং বৃন্দাবন, সুরাট, বরোদা ও আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় হয়ে কারাবরণ করেন।

শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র কুসুমরঞ্জন পাল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলে তাঁর কারাবাস হয়।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সেবাকার্যে নেতৃত্ব দেন।

জুন ১ অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি' প্রতিষ্ঠা করে পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার ভার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করে।

জুলাই ১৬ বোম্বাইতে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

জুলাই ৩১ বোম্বাইতে গান্ধিজির উপস্থিতিতে দশ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ।

আগস্ট ২০ কেরালার উপদ্রুত মালাবার উপকূলে মোপালা বিদ্রোহের সূচনা।

সেপ্টেম্বর ১ কলকাতার বড়বাজারে বিদেশি বস্ত্রের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন।

সেপ্টেম্বর ১৮ চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত।

নভেম্বর ৪ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দিল্লিতে এক সভায় আইন অমান্য আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নভেম্বর ১৭ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত সফরের উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে অবতরণ করলে তাঁর আগমণে বোম্বাই ব্যতিত ভারতবর্ষের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ ও সর্বাত্মক সফল ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট উপলক্ষে বোম্বাইতে দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে যায়।

নভেম্বর ১৮ বোম্বাইতে দাঙ্গার প্রতিবাদে গান্ধিজির পাঁচদিন অনশন।

ডিসেম্বর ১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এক আবেদনে নিজেকে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বলে ঘোষণা করেন। এ বাংলার লক্ষাধিক লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানান।

ডিসেম্বর ১০ চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসু এবং বাংলার অন্যান্য প্রভাবশালী নেতা আবুল কালাম আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯২২

জানুয়ারি ১৩ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মাদ্রাজ পরিদর্শনে এলে ধর্মঘট পালন করা হয়। জনতার উদ্দেশ্যে পুলিশ গুলি চালায়।

ফেব্রুয়ারি ৫ প্রায় ৩০০ জন আইন অমান্যকারী চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে একুশজন পুলিশকে হত্যা করে।

ফেব্রুয়ারি ৬ ইংরেজ সরকার সমস্ত সংগঠন নিষিদ্ধ করে দেয়।

ফেব্রুয়ারি ১২ হিংসাত্মক ঘটনার জন্য গান্ধিজি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখেন।

মার্চ ১৪ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য গান্ধিজি গ্রেপ্তার হন।

আগস্ট ১২ নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।

অক্টোবর ১৫ কলকাতার টাউন হলে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির যৌথ সভা। আলোচ্য বিষয় স্বরাজ, খিলাফৎ আন্দোলনের অবস্থা ও হিন্দু মুসলমান ঐক্য।

নভেম্বর ২৩ ইংরেজ শাসক 'ধূমকেতু' পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে।

ডিসেম্বর ২৬-৩১ গয়াতে অনুষ্ঠিত সাঁইত্রিশতম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯২৩

জানুয়ারি ১ চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে, দেশবন্ধু চিত্রঞ্জন ও মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্যদল গঠন করেন।

এপ্রিল ১৩ বিভিন্ন দাবিতে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জেলের মধ্যে অনশন।

অক্টোবর ২৩ চিত্তরঞ্জন দাশ দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯২৪

ফেব্রুয়ারি ৮ ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের নেতা মতিলাল নেহেরু এক প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গোল টেবিল সম্মেলন আহ্বান করা হোক।

এপ্রিল ৪ গান্ধিজি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এপ্রিল ২৪ কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়োগ করা হয়।

মে ২৫ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্না সভাপতিত্ব করেন।

নভেম্বর ১ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদের কলকাতাতে ধর্মঘট পালন করা হয়।

ডিসেম্বর ২৬-২৭ মহারাষ্ট্রের বেলগাঁওতে উনচল্লিশতম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধি।

১৯২৫

জানুয়ারি ২২ দিল্লিতে সর্বদলীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধি।

মে ২৯ মহাত্মা গান্ধির শান্তিনিকেতন আগমন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।

ডিসেম্বর ২৬ কানপুরে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ কানপুরে অনুষ্ঠিত চল্লিশতম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সরোজিনী নাইডু।

১৯২৬

জানুয়ারি ২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'লেবার স্বরাজ পার্টি' অর্থাৎ শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশিত হয়, প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। মুজফ্ফর আহমেদ এইদিন শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলে যোগদান করেন।

মার্চ ১ স্বরাজ্য দলের কেন্দ্রিয় নেতা মতিলাল নেহেরু প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে অসহযোগের আহ্বান জানান।

মার্চ ৮ সারা দেশব্যাপী স্বরাজ্য দলের সমর্থক অ্যাসেম্বলি সভ্যদের সভ্যপদে পদত্যাগ।

আগস্ট মুজফ্ফর আহমেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় শ্রমিক-কৃষক দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গণবাণী'।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ গৌহাটিতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের একচল্লিশতম অধিবেশন।

১৯২৭

ফেব্রুয়ারি ১১ বি এন রেলওয়ে কোম্পানির শ্রমিক ধর্মঘটে আদ্রা ও খড়্গপুর স্টেশনে পুলিশ গুলি চালালে একাধিক শ্রমিক নিহত ও আহত হয়।

মে ১৬ ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে সুভাষচন্দ্রকে বার্মার মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

নভেম্বর ৮ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ভারতে নতুন সংবিধান তৈরি করার জন্য ও ভারতবাসীকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়ার জন্য সাইমন কমিশন বসবে।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিয়াল্লিশতম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এম. এ আনসারি। জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় এই অধিবেশন থেকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য' বলে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডিসেম্বর ৩০ সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলকাতায় হিন্দুস্থান সেবা দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

১৯২৮

জানুয়ারি ২০ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলেজের ছাত্ররা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গান গায় ও জাতীয় পতাকার মতো দেখতে তে-রঙা ব্যাজ ধারণ করে। কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক প্রমোদ ঘোষাল ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে জোরালো বক্তব্য রাখার জন্য তাঁকে ও তাঁর সহযোগী কতিপয় ছাত্রকে পুলিশ নির্দয়ভাবে প্রহার করে। অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

ফেব্রুয়ারি ৩ সাইমন কমিশনের আগমনের প্রতিবাদে সারা দেশে ধর্মঘট পালন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ৪ ভারতে সাইমন কমিশনের আগমন।

ফেব্রুয়ারি ২০ সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় সারা বাংলায় মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় সর্বত্র জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়।

মার্চ ১ কলকাতায় বিদেশী দ্রব্য নতুন করে বর্জন করা শুরু হয়।

নভেম্বর ৩০ সাইমন কমিশনকে কালো পতাকা দেখানোর সময় লক্ষ্ণৌতে জওহরলাল নেহেরু ও সহযোগী ছাত্ররা পুলিশের হাতে প্রহৃত হন।

ডিসেম্বর ১৭ লাহোর পুলিশের সদর দপ্তরের কাছে দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে ইন্সপেক্টার স্যান্ডার্স ও তাঁর দেহরক্ষী চন্দন সিং-কে ভগৎ সিং ও রাজগুরু হত্যা করেন।

ডিসেম্বর ২২ কলকাতায় ৮৭টি দলের সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর ২৯ কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে তেতাল্লিশতম কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন করলেও মহাত্মা গান্ধির বিরোধিতার কারণে তা গৃহীত হয়নি।

১৯২৯

বিলেতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র ‘ব্রিটিশ পণ্য বর্জন’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

জানুয়ারি ১৯ কলকাতায় সাইমন কমিশন এলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে শ্রমিকেরা কালো পতাকার মিছিল সংগঠিত করে।

ফেব্রুয়ারি ৯ পাটনায় এক যুব সমাবেশে সুভাষচন্দ্র নতুন সমাজ ও দেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মার্চ ৪ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে জনসভায় গান্ধিজি বিলাতী-কাপড় স্তূপে আগুন ধরিয়ে আন্দোলনের সূচনা করেন।

এপ্রিল ৮ দিল্লিতে কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপক সভায় বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করে গ্রেপ্তার হন।

আগস্ট ৯ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে গান্ধিজির সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার সাক্ষাৎকার।

সেপ্টেম্বর ১৩ লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশন করার পর দুপুর ১-৩০ মিনিটে বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু হয়।

সেপ্টেম্বর ১৭ শহীদ যতীন দাসের শবদেহ নিয়ে কলকাতায় এক অভূতপূর্ব মিছিল। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন সুভাষচন্দ্র।

ডিসেম্বর মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে লাহোরে সর্ব ভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর ১৯ চট্টগ্রাম, বরিশাল ও কলকাতা একযোগে এই তিন জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করার সময় মেছুয়াবাজারে অনুশীলন সমিতির সদস্য সতীশচন্দ্র পাকড়াশী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

ডিসেম্বর ২১ মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ দেন সুভাষচন্দ্র।

ডিসেম্বর ২৯-৩১ লাহোরে চুয়াল্লিশতম কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ডিসেম্বর ৩১ মধ্য রাত্রিতে ইরাবতী নদীর তীরে জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন।

১৯৩০

জানুয়ারি ২ সারা দেশের সমস্ত কংগ্রেস সভ্যকে সর্বস্তরে সমস্ত কমিটি থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু।

জানুয়ারি ২৬ সারা দেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। কলকাতা পৌরসভা ভবনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

মার্চ ১২ ঊনআশি জন আশ্রমিক সঙ্গে নিয়ে আমেদাবাদের সবরমতি আশ্রম থেকে ২১৪ মাইল দূরে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করে গান্ধিজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন।

এপ্রিল ১০ গান্ধিজি ভারতের নারী সমাজকে আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান।

মে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনার পর পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত কারারুদ্ধ হন।

মে ৫ বোম্বাই প্রদেশের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র শোলাপুরে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু। ৫০ হাজার শ্রমিক গান্ধিজির গ্রেপ্তারে ক্রুদ্ধ হয়ে শহর দখল করে নিজেদের সরকার গঠন করে।

বিশেষ আদালতে লাহোর পুঞ্চ হাউসে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয়।

মে ৬ গান্ধিজিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদের সারা দেশে ধর্মঘট।

মে ২২ সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ধারসানা অভিযানে আড়াই হাজার সত্যাগ্রহীদের মিছিলে পুলিশের লাঠির আঘাতে কমপক্ষে ৩২০ জন লোক আহত হন ও বেশ কয়েকজন মারা যান।

একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন ও অপরদিকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্যে পড়ে ব্রিটিশ সরকার চরম দমননীতি প্রয়োগ করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়, জনসভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়, বেপরোয়া ধরপাকড় চলতে থাকে, মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় সত্যাগ্রহীদের জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

অক্টোবর ৭ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড, শিব বর্মা, কিশোরীলাল, ডাঃ গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর, বিজয় কুমার সিন্‌হা, মহাবীর সিং এবং কমলনাথ তেওয়ারীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অবশিষ্টদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

নভেম্বর ১২ লণ্ডনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ব্যতীত প্রথম গোল টেবিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১

জানুয়ারি ১৯ প্রথম গোল টেবিল সম্মেলন স্থগিত।

জানুয়ারি ২৬ কলিকাতা পৌরসভার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু পৌরসভার অন্যান্য পদাধিকারীগণ ও বিশাল সংখ্যক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকসহ স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে আইন অমান্য করলে পুলিশ তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। রক্তাক্ত দেহে সুভাষচন্দ্র অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু সেই অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উড়তে থাকে ভারতের জাতীয় পতাকা।

ফেব্রুয়ারি ১৮ এক লাখ মানুষের গণস্বাক্ষর সম্বলিত ভগৎ সিং-দের দণ্ডাজ্ঞা রদের আবেদনপত্র বড়লাট নাকচ করে দেন।

মার্চ ৫ বড়লাট আরউইন বা গান্ধিজির মধ্যে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর। এই চুক্তি গান্ধি-আরউইন চুক্তি নামে পরিচিত।

মার্চ ৮ গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে বহু বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হন সুভাষচন্দ্র বসু।

মার্চ ২৩ লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়।

মার্চ ২৮ করাচিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বল্লভভাই প্যাটেল।

এপ্রিল ৭ মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডিকে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করে।

জুলাই ৪ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, "ভারতের মুক্তি, তথা বিশ্বের মুক্তি, নির্ভর করছে সমাজতন্ত্রের উপর।"

আগস্ট ৩০ কুখ্যাত গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর আসানুল্লা বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের গুলিতে মারা যান।

সেপ্টেম্বর ১ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর সৈনিক জীবন ঘোষাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।

সেপ্টেম্বর ৭	দ্বিতীয় গোল টেবিল সম্মেলন শুরু হয়।
সেপ্টেম্বর ১৬	মেদিনীপুর হিজলী জেলে বন্দিদের উপর পুলিশের গুলি। তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সন্তোষ মিত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন।
সেপ্টেম্বর ১৯	হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে ঐতিহাসিক সমাবেশ।
সেপ্টেম্বর ২৬	ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার ময়দানে এক বিশাল সভায় ভাষণ দেন।
নভেম্বর ৩	সুভাষচন্দ্র বাংলার বিপ্লববাদী দলগুলিকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হবার আহ্বান জানান।
ডিসেম্বর ১১	দ্বিতীয় গোল টেবিল সম্মেলনের পরিসমাপ্তি। গান্ধিজির রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন।
ডিসেম্বর ২৮	গান্ধিজি প্রত্যাবর্তনের পর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

১৯৩২

জানুয়ারি ২	কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক শেষে বোম্বাই থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হন।
জানুয়ারি ৩	গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেন গান্ধিজি।
জানুয়ারি ৪	গান্ধিজি ও বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার। কংগ্রেস ও তার সমর্থক সব দলকে বে-আইনী ঘোষণা।
জানুয়ারি ৫	কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গ্রেপ্তার। নতুন সভাপতি ড. আনসারি।
জানুয়ারি ৯	রাজাগোপালাচারি ও এস. সত্যমূর্তি মাদ্রাজে গ্রেপ্তার।
ফেব্রুয়ারি ৬	সিনেট হাউসে (কলিকাতা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পিস্তলের গুলিতে বীণা দাশ বাংলার গভর্নর স্ট্যানিল জ্যাকসনকে গুলি করে প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলেই তিনি ধরা পড়েন।
মার্চ ১৫	কবি ও দেশব্রতী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি ইংরেজ শাসক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
মার্চ ২৪	বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যাক্ট (XXI) বিধিবদ্ধ করা হয়।
এপ্রিল ২৪	শেঠ অমৃতলালের সভাপতিত্বে দিল্লিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৬ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দশ মিনিট অধিবেশন চলার পর পুলিশ এসে সকলকে গ্রেপ্তার করলে অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।
এপ্রিল ৩০	মেদিনীপুর জেলা বোর্ড অফিসে মেদিনীপুরের জেলা শাসক রবার্ট ডগলাসকে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য গুলি করে হত্যা করেন।
আগস্ট ১২	অনুন্নত শ্রেণিদের জন্য আলাদা নির্বাচনী আসনের দাবিতে গান্ধিজির অনশন শুরু।
আগস্ট ১৮	রাজনৈতিক বন্দিদের ইংরেজ সরকার আন্দামান সেলুলার জেলে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এস. এস. মহারাজা' জাহাজে বন্দীদের আন্দামানে পাঠানো হয়।
সেপ্টেম্বর ২০	সরকারের নির্বাচন নীতির বিরুদ্ধে গান্ধিজির আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত।

ডিসেম্বর ২৪	তৃতীয় গোলটেবিল সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৩৩

জানুয়ারি ৪	সারা দেশে আইন অমান্য দিবস পালন করা হয়।
জানুয়ারি ৬	কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ গ্রেপ্তার।
জানুয়ারি ১২	মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডগলাসকে হত্যার অভিযোগে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি।
জানুয়ারি ২৬	সারাদেশে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন। পুলিশের লাঠি চালনা ও বহু লোক গ্রেপ্তার।
ফেব্রুয়ারি ১১	গান্ধিজি জেলে বসে 'হরিজন' নামে এক পত্রিকা পরিচালনা শুরু করেন।
ফেব্রুয়ারি ২৩	ইউরোপ অভিমুখে সুভাষচন্দ্রের যাত্রা।
মার্চ ১	কলকাতায় আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশন নিষিদ্ধ করে সরকারের নির্দেশ।
মার্চ ৩১	কলকাতায় আসার পথে কংগ্রেস সভাপতি মদনমোহন মালব্য, নেহেরু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।
মে ৮	গান্ধিজির জেল থেকে মুক্তি ও একতরফাভাবে প্রথমে ছয় সপ্তাহ এবং পরে আরও ছয় সপ্তাহ তিনি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখেন।
মে ১২	আন্দামানের সেলুলার জেলে ৩৯ জন রাজনৈতিক বন্দি অমানবিক ও অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।
জুন ২৬	ছেচল্লিশ দিনের দিন সেলুলার জেলে বন্দিরা অনশন ভঙ্গ করেন।
জুলাই ১২	ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য গান্ধিজি পুণায় কংগ্রেস সম্মেলন আহ্বান করেন।
জুলাই ৩১	গান্ধিজি ও তাঁর ৩৩ জন অনুগামীকে গ্রেপ্তার করে সবরমতী জেলে পাঠান হয়।
আগস্ট ১৬	জেলে গান্ধিজি অনশন শুরু করেন।
আগস্ট ২৩	গান্ধিজিকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।
সেপ্টেম্বর ২	মেদিনীপুর শহরে ফুটবল খেলার মাঠে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. বার্জকে দু'জন যুবক গুলি করে হত্যা করে। দেহরক্ষীদের গুলিতে অনাথবন্ধু পাঁজা ঘটনাস্থলেই মারা যান ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত আহত হন।
ডিসেম্বর	আবদুল হালিমের উদ্যোগে এবং রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ির সহযোগিতায় কলকাতায় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৪

এপ্রিল	লিয়াকতের সাহায্যে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের চিরস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন।
এপ্রিল ৭	গান্ধিজি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখেন।
এপ্রিল ১৮	সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেবার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবেদন।

মে ১৮	বাংলার গভর্নর জন অ্যাণ্ডারসনকে হত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে উজ্জ্বলা মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জুন ১২	যুক্তপ্রদেশে কানপুরের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা তাঁর বাসস্থানে একটা বোমা নিক্ষেপ করে।
জুলাই ২৩	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ও বেআইনী সংগঠন বলে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেন।
জুলাই ২৮	ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করে।
আগস্ট ১৮-১৯	কলকাতায় এক সম্মেলনে মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি' নামে একটি তরুণ দল প্রতিষ্ঠিত হয়।
সেপ্টেম্বর ২৫	ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির একটি অধিবেশনে পুনরায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়।
অক্টোবর ২৬-২৮	জাতীয় কংগ্রেসের আটচল্লিশতম সম্মেলন রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কংগ্রেস সভ্যদের পক্ষে সূতাকাটা আবশ্যিক করা হয় এবং খদ্দরের পোশাক ধারণ করা পদাধিকারীদের কাছে বাধ্যতামূলক করা হয়।
নভেম্বর	সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হয়।

মানিকের ব্যক্তিজীবনের খবর

মানিকের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের সিমুলিয়া গ্রাম। মানিকের প্রপিতামহ করুণাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাতুলালয় মালপদিয়া গ্রামে লালিত পালিত হন এবং সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। মানিকের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এই মালপদিয়া গ্রামেই বড় হয়ে ওঠেন। তাঁদের পারিবারিক বৃত্তি ছিল পূজার্চনা ও যাজনিক ক্রিয়া। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রথম জীবনে পুরোহিতের কাজ করতে হয়েছিল। প্রবল অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে প্রথমে ঢাকা স্কুল ও ঢাকা কলেজ, তারপর কলকাতার সিটি কলেজে পড়াশোনা করার পর ১৮৯৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে বি. এস সি. পাস করেন। গ্রাম নির্ভর পল্লিজীবনে এরকম পড়াশোনা করা মানুষ ছিল দুর্লভ। তাই গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অসংখ্য লোক তাঁকে দেখতে এসেছিল কেননা এমন শিক্ষিত মানুষ তারা পূর্বে কখনো দেখেনি। ১৯০৬ সালে তিনি সেটেলমেণ্ট বিভাগে চাকরি পান এবং অবসর গ্রহণের সময় তিনি সাব-ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

মানিকের জন্ম বিহারের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকা শহরে ১৯০৮ সালের ১৯ মে মঙ্গলবার (বাংলা ১৩১৫, ৬ই জ্যৈষ্ঠ)। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানকার সেটেলমেণ্ট বিভাগের কানুনগো। মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। জন্ম-ঠিকুজিতে মানিকের নাম রাখা হল অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও আমরা তাঁকে সেসব নামে চিনলাম না। মানিকের বড়

বৌদি অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন: "বোধহয় তার গায়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখেই সেই যে আঁতুড় থেকেই তার নামকরণ হলো কালোমানিক — সেই মানিক নামটিই রয়ে গেল আজীবন।"[১] মানিক ছিলেন পিতামাতার ১৪ সন্তানের (৮ ছেলে ও ৬ মেয়ে) মধ্যে পঞ্চম। ১ ভাই ও ১ বোন অতি শৈশবেই মারা যায়। শিশুকাল থেকেই মানিক স্বভাবে ছিলেন অতিমাত্রায় দুরন্ত, চঞ্চল, নির্ভিক ও হাসিখুশি। পিতার বদলিপ্রবণ চাকরির সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় মানিকের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। মানিকের দুরন্তপনার কথা তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> কুটনোকোটা ফেলে প্রকাণ্ড বঁটিখানা বারান্দায় কাত করে রেখে মা ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। মস্তবড় ভাতের হাঁড়ির জল টগবগিয়ে ফুটে পড়ে জ্বলন্ত উনুন নিভে যাওয়ার দাখিল, — দশটির মধ্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ের স্কুলের ভাত চাই, — মা অনন্যমনা হয়ে সেই চিন্তায় মগ্ন। কোথা থেকে তিন বছরের (মানিক কিন্তু লিখেছেন, হাঁটতে শিখেই) অতি চঞ্চল দামাল ছেলেটি এসে মা-র অবর্তমানে মনের আনন্দে কাত-করা বঁটির বাঁটের ওপর দাঁড়িয়ে খলখলিয়ে হাসে আর নাচে। মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন! বঁটি যেমন সোজা হয়ে উঠল, শিশুটিও সোজা আছাড় খেয়ে পড়ল তার বুকে।
>
> তারপর ? তারপর শিশুর পেটখানা নাভির এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কেটে দুখানা, — নাড়িভুঁড়ি প্রায় দেখা যায়। মা হঠাৎ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে রান্না ফেলে এসেই চীৎকার: কি সর্বনাশ হল রে, — মানিকের পেট কেটে দু'খানা!
>
> পাশের ঘরে কলেজের ছাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র পাঠে মগ্ন — মায়ের চীৎকারে বাইরে এসে ঐ দৃশ্য দেখে হতভম্ব। কিন্তু মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে দু'হাতের তালুর উপরে তাকে নিয়ে একছুট দুমকার ছোট হাসপাতালটিতে। ভাগ্যক্রমে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল। তিনি তড়িৎবেগে পেটটি দিলেন সেলাই করে। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেবার পর বললেন এক চুলের জন্য রক্ষা পেল ছেলেটি। কাটল এক নিদারুণ ফাঁড়া।
>
> কান্নাকাটি অথবা ভয় ডর ছিল না তার ধাতে... হাসপাতালের ডাক্তার পঁচিশটি স্টিচ দিয়ে পেট জুড়ে দিলেন, তখনও সে কাঁদেনি একফোটা! ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বলেন — এ অদ্ভুত ছেলে![২]

আট বছর বয়সে মানিকের শিক্ষারম্ভ হয় কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন-এ বড়দা শুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। প্রায় ছ'বছর এই স্থানে শিক্ষালাভ করার পর তাঁর দাদা চাকরি নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় মানিক পিতার কাছে টাঙ্গাইলে যান ১৯২২ সালে। বাল্যকাল থেকেই মানিকের চরিত্রে যে চাঞ্চল্য এবং দুরন্তপনা ছিল তা টাঙ্গাইল-এর জীবনে বিপুলভাবে প্রকাশিত হয়। জেলে-মাঝি-গাড়োয়ান সহ নিম্নবর্গের মানুষের সংসর্গেই অতিবাহিত হয় তার অনেকটা সময়। এসময়ে মানিক অত্যন্ত অশান্ত প্রকৃতির, বেপরোয়া এবং কল্পনাপ্রবণ ও ডানপিটে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা মানিক নিজেই লিখেছেন —

> এমনি আরও অনেক দুরন্তপনার চিহ্ন সর্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। শোনা যায়, আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল, দারুণ ব্যথা পেলেও কিছুতে কাঁদতাম না। আবার যখন-তখন আপন মনে নিজের খাপছাড়া স্বরে যে-কোনো গান কথা বা শব্দ নিয়ে গানও আমি গাইতাম — সব সময় তাই বোঝা কঠিন ছিল আমি কাঁদছি না গাইছি। একদিন দুপুরে মা ও বড়দি বারান্দায় খেতে বসে শুনছেন রান্নাঘরে আমি গান ধরেছি। খানিক পরে সুরটা কেমন কেমন ঠেকায় আর পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়ায় তাঁরা উঠে এসে দেখেন উনানের সামনে বসে আমি গান করছি মুখখানা বিকৃত করে, চোখের জলে মুখ বুক বুক ভেসে যাচ্ছে। কী হয়েছে বুঝতে তাঁদের মিনিটখানেক সময় লেগেছিল। তারপর চোখ পড়ল, আমার বাঁ পায়ের গোড়ালির খানিক উপরে মস্ত এক খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা পুড়ছে, বেশ খানিকটা গর্ত হয়েছে। কাঠের উনোন, চিমটে দিয়ে গনগনে কয়লাগুলি নিয়ে খেলতে গিয়ে এই বিপদ। আরেকদিন মা রসগোল্লার কড়াই নামিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন, আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করছি। আমার ভাগ্য ভালো যে রান্নাঘরেই অন্য কাজে মা-র বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। রসগোল্লার কড়াই নামিয়েই কোন কাজে মা বাইরে গেলে হয়তো সারা জীবন আমাকে হাত-পোড়া আর মুখ-পোড়া হয়ে থাকতে হত। সুযোগ যখন পেলাম, কড়াইয়ের রসটা তখন আর ফোস্কা পড়বার অবস্থায় নেই তবে মজা টের পাইয়ে দেবার মত গরম আছে। খাবলা দিয়ে কতকগুলি রসগোল্লা তুলেই মুখে পুরে দিয়ে সেটা টের পেলাম। সেই মুহূর্তে মা আর মেজদা ঘরে ঢুকলেন। মা উঠলেন চেঁচিয়ে। মেজদা তিন লাফে এগিয়ে এসে কড়ায় আঙুল ডুবিয়ে দেখে নিলেন রসটা গরম। তারপর বললেন —ঠিক সাজা হয়েছে রাক্ষসের। আর খাবি ? যন্ত্রণায় কান্না আসছিল। আমার কচি চামড়ায়, মেজদা বোধহয় সেটা হিসাব করেন নি, যে তাঁর গরম বোধের চেয়ে আমার গরম বোধ কত বেশি, তাহলে হয়ত মায়া হত।... মুখের রসগোল্লা ফেলাও যায়না, কাঁদাও যায় না। এতক্ষণে দিদিরাও এসে পড়েছে, মেজদার কথা শুনে ওদের মুখে কৌতুকের হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে রসগোল্লা গিলে ফেললাম। আর খাবি ? সকলের মুখে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কড়াই থেকে আরো কয়েকটা — আগের বারের চেয়ে কম মুখে পুরলাম। হাত মুখ আগেই জ্বলছিল, এবার যেন পুড়ে গেল। কাঁদলাম না, রসগোল্লাও চিবোতে লাগলাম কিন্তু দমটা আটকে রইল আর চোখে জল এসে গেল।...[৩]

মানিকের বয়স তখন ৫/৬ বৎসর। কিন্তু দুষ্টুমিতে পাকা। দুষ্টুমি করতে গিয়ে একের পর এক বিপদকেও তিনি ডেকে আনেন। এই বয়সে মানিক একবার আলমারি চাপা পড়েন। আলমারির ওপরে ছিল ইঁদুরে বাসা। রোজই দেখেন ইঁদুরগুলো সেখান থেকে লাফিয়ে আসে আর যায়। একদিন মানিকের মাথায় চাপল এক অদ্ভুত খেয়াল। ভাই সুবোধকে ডেকে বলেন, ওখানে যখন ইঁদুরের বাসা আছে তখন নিশ্চয়ই সেখানে বাচ্চাও আছে —

> চল আমরা ইঁদুরের বাচ্চা ধরে এনে পুষি! ছোট ভাই তখুনি রাজি হয়ে গেল। কিন্তু আলমারীর মাথায় উঠবে কি করে ? মানিক বললেন, 'তুই আমার কাঁধে চড়, তারপর আলমারীর উপর তুই উঠে যা। বাচ্চাগুলো তুই আমার হাতে দে, আমি নামিয়ে রাখি'। তারপর সুবোধ ত

আলমারীর উপরে উঠে গেল। একটু পরেই সুবোধসহ আলমারী পড়ল উপুড় হয়ে। মানিক পড়লেন চাপা। জখম হলেন খুব। প্রায় মাসখানে তাঁকে সেবার অসুস্থ থাকতে হয়েছিল।[৪]

বড়ো হওয়ার দায় প্রবন্ধে মানিক ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন —

> বাবা তখন টাঙ্গাইলে, ময়মনসিংহ জেলার একটা মহকুমা শহর। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেবারে বর্ষার পর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় ক'দিন স্কুল যাওয়া বন্ধ, ঘুরে বেড়ানো বন্ধ, কানে একটানা চলছে কুইনিনের ভোঁ ভোঁ। কি করা যায় ? কালীপুজা আসছে, বাজিই বানানো যাক। একটা মোটা বেঁটে শিশিতে (?) বারুদ রেখে ঘরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে পটকা বানাবার অন্য ব্যবস্থাগুলি সারছি, কাছে ঘেঁসে বসে আছে ছোট দুটি ভাই। আমি এদিকে একমনে ন্যাকড়ার ফালি পাথরের কুঁচি ঠিক করছি; ওদিকে লালু করেছে কি, শিশি থেকে একটু বারুদ নিয়ে শিশিটার কাছে মাটিতে ফেলে ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখতে গেছে জ্বলে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে শিশিটার বিস্ফোরণ এবং ছররা গুলির মতোই টুকরো টুকরো কাঁচ আমাদের তিন ভায়ের অঙ্গে প্রবেশ। রক্তে বারান্দা ভেসে যায়। ঠিক সেই সময় বাবা কোথা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তা থেকেই শিশি ফাটার শব্দ আর বাড়ির লোকের চীৎকার শুনে 'আমার সর্বনাশ হল রে' বলতে বলতে ছুটে ভিতরে এলেন এবং একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমাদের রক্তপাত ঠেকাবার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন। প্রত্যেকের শরীরে আট দশটা করে ফুটো হয়েছে গভীর, সহজে কি রক্ত বন্ধ হয়! অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য আমরা খুব কাবু হয়ে পড়েছিলাম — সবচেয়ে বেশি কাবু হয়েছিল ছোট ভাইটি। উবু হয়ে বসার জন্য হাত আর পায়েই কাঁচ ফুটেছিল — পায়েই বেশী। তারপর ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিনজনে বিছানা নিলাম। পরদিন কাঁচ বার করার পালা। সরু ফুটো করে কাঁচ শরীরে ঢুকেছে, শলা ঢুকিয়ে আগে ঠিক করতে হবে কাঁচের টুকরোর অবস্থান, তারপর মাংস কেটে মুখ বড় করে বার করতে হবে। ডাক্তারবাবু আমায় বললেন — তুমি বড়, প্রথমে তোমায় ধরব। একটা কথা মনে রাখতে হবে। তুমি বারুদ বানিয়েছ, বোকার মত কাঁচের শিশিতে বারুদ রেখেছ। তোমার জন্য ছোট ভাই দু'টির এত কষ্ট। কাঁচ বার করার সময় তুমি যদি বেশি চেঁচামেচি কাঁদাকাটা কর, ওরা দু'জন ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে। তুমি বড় — ব্যথা লাগলেও চেঁচানো চলবে না। বুঝতে পেরেছ ? সোজা কথাটা না বুঝে উপায় কি। অগত্যা দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুঝলাম। ক্ষতের মধ্যে শলা ঢুকিয়ে ডাক্তার যখন আস্তে আস্তে ভিতরে নেড়ে কোথায় আছে খোঁজেন, কাঁচ বার করার জন্য ছুরি কাঁচি চালান; তখন একটু চেঁচাবার অধিকার না থাকা যে কি ব্যাপার সেদিন খুব ভালো করেই টের পেয়েছিলাম। একটা টুকরো অবশ্য বার করা গিয়েছিল সহজেই। তবু সময় লেগেছিল অনেকক্ষণ। শেষ ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন — এ তো আশ্চর্য ছেলে, একটুও শব্দ করল না![৫]

দুষ্টুমি ছাড়াও মানিকের মধ্যে এই সময় দেখা গেল আর এক ধরনের খেয়াল — মাঠে ঘাটে খেতের আলে আলে কিশোর মানিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো এবং হাতে বাঁশি, গলায় দরাজ গান। এই সময় তাঁর বয়স ১৩ কি ১৪। মাঝেমাঝেই স্কুল পড়ুয়া মানিককে দু-তিন দিন খুঁজে পাওয়া যায় না। মা কেঁদে কেটে অস্থির, খোঁজ নিয়ে জানা যায় নদীর ধারে যে নৌকাগুলি নোঙর করা থাকে, তাদের মাঝি মাল্লার সাথে ভাব জমিয়ে তাদের সঙ্গে যে দু'চারদিন থেকে আসে। মাঝে মাঝে তাকে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের সাথে দেখা যায়। গাড়োয়ানদের সঙ্গে গল্প গুজবে রাত বেশি হয়ে গেলে, একটি গাড়ির ভেতর ঢুকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে থাকতে। বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকত না, ছিল না কোন ভয় ডর, পিতার শাসন মানার ভীতি। এই সময়ে মানিক অত্যন্ত বেপরোয়া এবং দুঃসাহসিক।[৬]

মানিক তখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ১৯২৪ সালের ২৮ মে ডবল নিউমোনিয়ায় মানিকের মায়ের মৃত্যু হয়। মানিকের সংবেদনশীল মনে মাতৃবিয়োগের প্রতিক্রিয়া ছিল গভীর ও ব্যাপক। মাতৃবিয়োগের ঘটনায় তাদের পরিবারের টাঙ্গাইল বাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। পুরো পরিবার চলে আসে মানিকের মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল কাঁথিতে। সদ্য ডাক্তারী পাশ করে তখন তিনি সেখানে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। মানিক ভর্তি হন কাঁথি মডেল হাইস্কুলে, কিন্তু কিছু দিন পর কালাজ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুরে, বড় দিদি শিশিরকুমারী চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরালয়ে। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে মানিক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ভর্তি হন মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। এই স্কুল থেকেই মানিক ১৯২৬ সালে মেট্রিক পাশ করেন। আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক গণিতে লেটার পেয়ে মানিক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসেবে মানিক সকল শিক্ষকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কিন্তু ভাল ছাত্র হলেও ভাল ছেলের মতো ছিল না তার স্বভাব। সে সময়ে স্কুল জীবনের কাহিনি মানিক পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন —

> অখণ্ড বাংলায় বাবার বদলির চাকরি — ছ'মাস বা দু-এক বছর পরে পরেই এক মুলুক থেকে আর-এক মলুকে ছুটতেন। হয়ত কুমিল্লা থেকে ময়মনসিংহ এবং সেখান থেকে একেবারে ঘাটাল অথবা মেদিনীপুরে। সেবার একটানা বেশ কিছুদিন মেদিনীপুর সদরে ছিলেন। শহরের পাশেই কাঁসাই নদী — বর্ষাকালে ঘোলা জলে ফুলে ওঠে, শীতকালে বেরিয়ে পড়ে বালির চর, এখানে ওখানে পুকুর বা বিলের মতো অগভীর জল। সারা জেলাতে শালের বন। শহর ছেড়ে একটু পাড়ি দিলেই বনের নাগাল পাওয়া যেত। রেল লাইনের পাশে প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ — ঝোপ ঝাড় কাঁটাবন আর জামের গাছে ভরা। আমার স্বভাব ছিল ভারি মন্দ। একদিকে যেমন ভালোবাসতাম লাল ধুলোভরা শহরের নোংরা পুরানো ঘিঞ্জি লোকালয়, মোটেই হিসাব থাকত না যাদের সঙ্গে মিলছি-মিশছি, খেলাধুলো হৈ-চৈ করছি, তারা বয়সে বড় অথবা ছোট, সংসারের মাপকাঠিতে ভদ্র অথবা ছোটলোক — তেমনি ভালবাসতাম শহরের আশেপাশে শুধু কয়েকটা কুঁড়েঘর নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট ছোট গ্রাম, বর্ষায় ভরা আর শীতের শুকনো নদী, ফাঁকা মাঠ আর বুনো গাছের জাম এবং ছড়ানো সবুজ শালের ঐ বন।[৭]

পিতার বদলির চাকরি বলেই মানিক দীর্ঘকাল কোন এক স্থানে থাকেন নি। পিতা ও পরিবারের সঙ্গে মানিক ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা জায়গায় — তমলুক, মহিষাদল, কাঁথি, মেদিনীপুর, টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে। মানিকের স্কুল শিক্ষা কোথাও বাঁধাধরা নিয়মে হয় নি। বিভিন্ন জায়গায় খাপছাড়াভাবে তাঁর শিক্ষালাভ সম্পন্ন হয়েছে। খেলাধূলায় ঝোঁক ছিল বেশি, সেই সঙ্গে ছিল ডানপিটে ও বেপরোয়া স্বভাব। মানিক ভালো গান গাওয়ার জন্য তাকে অনেক অনুষ্ঠানের আসরেও যেতে হত। ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মেলামেশা হইচই, আড্ডা, খেলাধূলা, গ্রামে আগুন নেভাতে যাওয়া প্রভৃতির পাশাপাশি তিনি হয়ে ওঠেন নির্জনতা প্রিয় ও আবেগপ্রবণ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের পর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে ভর্তি হন মানিক। এই কলেজে পড়ার সময় মানিক ছিলেন খুব স্মার্ট ছেলে, লম্বায় ৬ ফুট এর বেশি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। বাঁকুড়ার হোস্টেল জীবনে বৃদ্ধি পায় তাঁর নৈঃসঙ্গ প্রেম। এ সময় মানিক নিয়মিত ধূমপায়ী, অনিয়মিত মদ্যপায়ী, কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক তরুণ। গোপন অনুশীলন দলের সঙ্গে সংযোগ গড়ে উঠে, বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি লাভ। মানিক তখন কলেজের ছাত্র ফলে সমসাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বৈপ্লবিক উন্মাদনা তাদের ছাত্রজীবনেও ব্যাপক বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ১৯২৮ সালে মানিক বাঁকুড়া কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করেন। পিতা খুশি হয়ে তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স সহ বি. এস সি. তে ভর্তি করিয়ে দেন।

কলকাতায় এসে মানিক পাঠ্য অপাঠ্য নানা পুস্তক পড়তে থাকেন এবং নিজের কল্পনার জাল বুনে চলেন। সে সব কথা মানিক নিজেই জানিয়েছেন —

> বাংলা তেরোশো পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি বি. এস সি.। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মতো এমন আর কি আছে ? এমন জটিলতায় এমন চুলচেরা নিয়ম! রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ত অভিনব কাব্য — ছ্যাবলামি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই। ক্লাসে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, ল্যাবরেটরিতে মশগুল হয়ে এক্সপিরিমেণ্ট করি; নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়! হাজার নতুন প্রশ্নের ভারে মন টলমল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন ?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়েই মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসাবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলেমানুষেরও সেটা জানা থাকে — যতক্ষণ সেটিকে তুলোধুনো করে না ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্তে মাংসে পরিণত করার মতো পরিণত না করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই। ক্লাস এগিয়ে যায় বহুদূর, আমি মেতে থাকি দু'মাস আগে পড়ানো বিদ্যুতের এক অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে। স্বভাব আজও আমার যায় নি। একটু পড়ি আর একটু যা শুনি তাই নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার সময় যায় — রাশি রাশি পড়া আর শোনার রীতিমাফিক পড়াশোনা আর হয়ে ওঠে না। বিজ্ঞান প্রায় শুয়োরানি হয়ে

বসেছিল আমার উপর, শুধু আমার এই স্বভাবের জন্য আমাকে আয়ত্ত করে উঠতে পারল না। বৈজ্ঞানিকও হতে পারলাম না, পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়াও ঘটে উঠল না — জীবনটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হল উপন্যাস লিখে.....।

লিখতে শিখে লেখক হবার সাধ কবে জেগেছিল মনে নেই— বোধ হয় ছেলেবেলাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে যখন নিষিদ্ধ বই পড়তাম তখন। বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন পড়া হয়ে গিয়েছে। আর সে কি পড়া! এ রকম একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিন-চারদিন মাঠে-ঘাটে, গাছে-গাছে, নৌকায়-নৌকায়, হাটে-বাজারে, মেলায় ঘুরে আর হৈ-চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম। বড় ঈর্ষা হত বই যাঁরা লেখের তাঁদের উপর। হয়ত সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার সাধ। লেখক হবার ইচ্ছে সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হই নি। স্কুল-জীবনের শেষের দিকে ইচ্ছেটা অল্পে অল্পে নিজের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছে হাত মেলেছিল বহুদূরের ভবিষ্যতে — সঙ্গে সঙ্গে লেখবার তাগিদ যোগায় নি। অধিকাংশ স্কুল কলেজে হাতে-লেখা মাসিক পত্র থাকে। সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা-দশেক স্কুলে আর মফঃস্বল ও কলকাতায় গোটা-তিনেক কলেজে আমি পড়েছি। লিখব ?— এই বয়স আমার! বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা কিছু আমার নেই। কোন্ ভরসায় আমি লিখব ? লেখা ত ছিনিমিনি খেলা নয়! বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখনও করি নি। আমার অধিকার নেই বলে। ১৩৩৫ সালেও, যে বারে আমি প্রথম লেখা লিখি — আমার এ মনোভাব বদলায় নি। বরং আরও স্পষ্ট একটা পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়সের সীমা ঠিক করেছি। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয় — আমি সেই বয়সে লিখব। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্যচর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলব।[৮]

মনের ভাবকে ভাষা দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে মানিক নিজেও তখনো সচেতন হয়ে ওঠেননি, বিভিন্ন সাহিত্যবাসরে বা বিতর্কে যোগ দিতেন। একদিন এমনি এক বিতর্ক সভায় বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে মানিক গল্প লিখে ফেললেন অতসীমামী — "আমি জানতাম পারবো। কোনদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প ত পড়েছি অজস্র। সাহিত্য হবে না, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক ভুলানো গল্প নিশ্চই হবে। আমি কেন, যে কেউ চেষ্টা করলেই এরকম গল্প লিখতে পারে।"[৯] মানিক বাজি জিতে গেলেন। *বিচিত্রা* পত্রিকায় ১৩৩৫ এর পৌষ সংখ্যাতে *অতসীমামী* গল্পটি প্রকাশ পায়। এই গল্পে লেখক হিসাবে মানিক নিজের নাম দেননি। ডাকনাম মানিক ব্যবহারের ফলে এটিই তাঁর লেখক নামরূপে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর গল্প শুধু ছাপাই হলোনা, *বিচিত্রার* সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে গল্পের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে গেলেন ১৫ টাকা এবং একখণ্ড বিচিত্রা আর দাবি জানিয়ে গেলেন আরো গল্প লেখার।[১০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্র এর ১১ খণ্ডে মুদ্রিত অগ্রন্থিত গ্রন্থের তালিকায় *ম্যাজিক* নামের একটি গল্প রয়েছে যেটি *অতসীমামী* র তিনমাস আগে (সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) প্রকাশিত হয়

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *গল্পগুচ্ছ* পত্রিকায়। মনে করা হয় *অতসীমামী* লিখিত ও পত্রিকায় প্রেরিত হওয়ার পরেই *ম্যাজিক* লিখিত ও পত্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয়েছিল আগেই। আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লিখে সাফল্যের পর সম্পাদকের তাগিদে কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মানিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯২৯

*বিচিত্রা*র সম্পাদকের তাগিদে তাঁর গল্প লেখা অব্যাহত থাকে। এ বছর *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প: জুন মাসে *নেকী* এবং আগস্ট মাসে *ব্যথারপূজা* এর আগে জানুয়ারিতে গল্পগুচ্ছ পত্রিকায় *শেষ মুহূর্তে* ও এপ্রিল মাসে *মানসী* ও *মর্ম্মবাণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *রকমারী* নামে গল্প। প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্যে,* আদি রচনা শুরু হয় এ বছরেরই শেষের দিকে। সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশের ফলে স্বাভাবিকভাবে কলেজ শিক্ষায় মনোযোগ হ্রাস পায়।

১৯৩০

'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পের প্রথম কিস্তি ছাপা হয় জানুয়ারি মাসে *বিচিত্রা* পত্রিকায়। এর বাকি অংশ ছাপা হয় *বিচিত্রা* র পরবর্তী সংখ্যায়। মার্চে *প্রবাসী* পত্রিকায় ছাপা হয় *চাপাআগুন* গল্প। সাহিত্যচর্চায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ায় কলেজের পড়াশোনায় দেখা দেয় বিপুল অমনোযোগ। মানিকের পড়াশোনার খরচ যোগাতেন দাদা শুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি বোম্বের কোলাবা অবজারভেটরীর ডিরেক্টর। তিনি মানিকের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালেন। অকুতোভয় মানিক জানিয়ে দিলেন তাঁর পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় নেই। এইসময়ে দেশি-বিদেশি লেখকদের লেখা গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি বই তাঁর সবসময়ের সঙ্গী। সেইসব লেখক ও তাঁদের পুস্তকের এক বিরাট তালিকা তিনি পাঠিয়ে দেন দাদার কাছে। এই সময়ে মানিকের সঙ্গে তাঁর দাদার অনেকগুলি পত্র বিনিময় হয়েছিল। একটি পত্রে মানিক লেখেন — "গল্প উপন্যাস লেখা ও পড়া আমি ছাড়তে পারবো না। কাজেই কলেজের পড়াই আমায় ছাড়তে হবে। তবে আপনি দেখে নেবেন, কালে এই লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমারও নাম ঘোষিত হবে।"[১১] দাদা ক্ষুব্ধ হয়ে মানিকের পড়াশোনার খরচ যোগানো বন্ধ করে দিলে মানিক কলেজ হোস্টেল ত্যাগ করে আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে গিয়ে ওঠেন। প্রবল আর্থিক কষ্টের মুখোমুখি হয়ে মানিক পরীক্ষায় পাশের ব্যর্থ চেষ্টা পরিত্যাগ করে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে উপার্জনের কথা ভেবে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্য চর্চায়।

১৯৩১

জুন মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প — *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকায় ‘মাটির সাকী’ এবং *অগত্যা* পত্রিকায় ‘বিড়ম্বনা’। বিজ্ঞান ও বাস্তব মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক অনুশীলন সহ দেশী বিদেশী সাহিত্য পাঠে মেতে থাকায় পড়াশোনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথমবার বি. এস সি. পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। এই সময়ের মন ও মেজাজের খবর মানিক নিজেই জানিয়েছেন —

> আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু'বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব শোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে ‘আধুনিক’ সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের ‘হাঙ্গার’ থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।....
>
> ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে ‘কেন’ রোগের আক্রমণ খুব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্টতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নীচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।
>
> গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত — জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি ?...
>
> সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।[১২]

১৯৩২

একের পর এক গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। জানুয়ারিতে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘সর্পিল’। মার্চে ‘ধাক্কা’ প্রকাশিত হয় *বিচিত্রা* এবং ‘যাত্রা’ প্রকাশিত হয় *প্রবাসী*তে। জুনে *বিচিত্রা*য় প্রকাশিত হয় ‘জন্মের ইতিহাস’ আর *প্রবাসী* তে ‘ভূমিকম্প’। আগস্টে ‘শৈলজশীলা’ প্রকাশিত হয় *গল্পলহরী* পত্রিকায়। সেপ্টেম্বরে *দীপক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘মহাকালের জটার জট’ আর *প্রবাসী*তে প্রকাশিত হয় ‘পোড়াকপালী’। দ্বিতীয়বার কৃতকার্য হওয়ার চেষ্টায় সিটি কলেজ থেকে বি. এস সি. পরীক্ষা দেন।

কিন্তু প্রস্তুতিহীনভাবে পরীক্ষায় বসে আগের মতোই অকৃতকার্য হন। শেষে পরিবারের মতামত অগ্রাহ্য করে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দেন এবং সাহিত্যসাধনার পথ বেছে নেন।

১৯৩৩

মানিকের তখন দারুণ সংগ্রামের জীবন। অর্থকরী জীবিকার্জনের ধারে না গিয়ে লেখাকেই তিনি পেশা রূপে গ্রহণ করলেন। এই সময়ের মানিক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

> দীর্ঘায়ত দেহ, চোখে চশমা, পায়ে চটি জুতো আর প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি আজও মনে আছে। গায়ের রং ময়লা হলেও যেন সাঁওতালী ছেলের লাবণ্য। আলাপ ঘনিষ্ঠ হল কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় আর্য পাবলিশিং-এর আড্ডায়। তখনকার কালে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছোট বড়ো অনেক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক সেই মজলিসে যোগ দিতেন। মানিকও আসত। মনে আছে শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত একদিন প্রেমেন্দ্রকে প্রশ্ন করেছেন, কার লেখা এখন বেশি সম্ভাবনাময় ? প্রেমেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মানিকের নাম করল। মানিক তখন মাত্র কয়েকখানি গল্প লিখেছে। কিছু পরেই সে এসে পড়ল, প্রেমেন্দ্র শচীনদার সঙ্গে মানিকের পরিচয় করিয়ে দিল। মানিকের কী সলজ্জ মুখভঙ্গি, প্রশংসা গ্রহণে তার কী অপরিসীম কুণ্ঠা!... একদিন তখনকার গ্লোব সিনেমার উপরতলায় সস্তার টিকিটে তিনটের শোতে ছবি দেখছি, পিছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখল, পিছন ফিরে দেখি মানিক। হাতে তার একখানি কালো এক্সারসাইজ বই। সিনেমা ভাঙতে মানিক আমাকে টেনে নিয়ে কার্জন পার্কের একপাশে বসে তার নতুন লেখা পড়ে শোনাল। তখন সেটি একটি গল্প ছিল, অনুচ্ছেদ রচনা করে এবং পরে এই কাহিনিগুলো *দিবারাত্রির কাব্য* নামে প্রকাশিত হয়।[১৩]

এই বছর প্রকাশিত হয় 'কেরানির বউ' (*উত্তরা* পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪০)। 'চোর' (*সাপ্তাহিক ছোটগল্প*, কার্তিক, ১৩৪০), 'রাজার বউ' (*উত্তরা*, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০)। 'আত্মহত্যার অধিকার' (*ভারতবর্ষ*, পৌষ, ১৩৪০)।

১৯৩৪

১৫ই জানুয়ারি তারিখে প্রবল ভূমিকম্পে মুঙ্গের শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার খবর শুনে মানিক সেখানে ছুটে যান। মানিকের পিতা তখন সমগ্র পরিবার নিয়ে থাকেন মুঙ্গেরে। মানিকের পরের ভাই সুবোধ বাবুর সেখানে ব্যবসা ছিল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মেজদা সন্তোষ কুমারের এক কন্যা নিহত ও কয়েকজন আহত হন। মানিক সেখান থেকে সবাইকে নিয়ে আসেন রাঁচিতে। সেখানে মানিকের মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকুমার ডাক্তার হিসাবে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। রাঁচির মনোরম আবহাওয়া এবং ডাক্তার ভ্রাতার চিকিৎসা ও যত্নে ক্রমে সকলেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত মানিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চাকরি নিতে বাধ্য হন। কয়েকমাস তিনি সম্পাদক হিসেবে *নবারুণ* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এসময়ে তাঁর বসবাসের স্থান কলকাতার দত্তবাগান এলাকার জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড। এই সময় মানিক কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন পরিমল গোস্বামী —

> মানিকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত *বঙ্গশ্রী* অফিসে ১৯৩৩-৩৪ সালে। ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত সেই অফিসটি আকারে সাহিত্য, শিল্পী ও গুণীজনের মিলন ক্ষেত্র, সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্যাত বিলিতি কফি-হাউস।
>
> মানিক তখন নিতান্ত তরুণ, আমার তুলনায় ত বটেই। বয়সে প্রায় বারো বছরের ছোট। ব্যবহার নম্র, কিন্তু ব্যক্তিত্বে কঠোর। চেহারায়, ব্যবহারে, কথায় একেবারে স্বতন্ত্র। আপন ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন নয়, কিন্তু আত্মশক্তি তার সমস্ত সত্তায় প্রতিফলিত।
>
> প্রথমেই তার সম্পর্কে যেটি অনুভব করেছিলাম সেটি হচ্ছে তার ঐ স্বাতন্ত্র্য। সব বিষয়ে সজাগ, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, অথচ সব বিষয়ে কেমন যেন একটা রহস্যপূর্ণ সুদৃঢ়তা। একটা অবর্ণনীয় ঔদাসীন্য, অথচ তা মধুর এবং মহা আকর্ষক। যা প্রীতিকর, প্রসন্নকর এবং যার প্রতি উদাসীন থাকা অসম্ভব।[১৪]

বাংলা কথাসাহিত্যের অসাধারণ স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যেমন জিজ্ঞাসা ও বিতর্কের শেষ নেই, তেমনি তাঁর আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়তা ও অশুদ্ধ প্রচলনকে ভাঙার দৃষ্টান্ত তাঁকে কম রক্তাক্ত করেনি। ‘গল্প লেখার গল্প’ লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর গল্প পড়ার অভিজ্ঞতার কথা। ১২-১৩ বছর বয়সের মধ্যে যখন তিনি ‘বিষবৃক্ষ’, ‘গোরা’ বা ‘চরিত্রহীনে’র মতো উপন্যাস পড়েছেন তখন তার ধাক্কা সামলাতে নৌকায় বা গাছে চড়ে, হাট-বাজারে বা মেলায় ঘুরে বেড়াতেন অথবা মারামারি করতেন। ‘বড় ঈর্ষা হত বই যাঁরা লেখেন তাঁদের উপর। হয়তো সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার স্বাদ।’[১৫]

আরেকটি কারণেও তিনি লেখক হতে চেয়েছিলেন। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহে পড়তেন গল্প-উপন্যাস। ‘গল্প-উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীর ভাবে, গল্প-উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাস করতাম বাস্তবজীবন।’[১৬] জীবনকে বুঝতে কথাসাহিত্য এবং কথাসাহিত্যকে বুঝতে জীবনের কাছে হাত পাতার এই যুগ্ম প্রয়াস অথবা যুগলবন্দীর নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক দেখেছেন তখনকার অন্য কোনো লেখক যা পারেননি শরৎচন্দ্র তাই করেছেন, পতিতা বা তথাকথিত অসতীদের চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানিকের মনে প্রশ্ন জাগে ও প্রবল হয়ে ওঠে এ ভাবনা যে, ‘সাহিত্যে বাস্তবতা আসেনা কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন, মানুষ হয় ভালো নয় মন্দ, ভালোমন্দ মেশানো হয় না কেন ?’[১৭] এখানে তিনি সাহিত্যের জীবন ও বাস্তব জীবনের বিরোধ ও তাদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। এর বাস্তব উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, “ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কার প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র

জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ ?”[১৮] এই বাস্তবতায় সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যেমন দিন দিন বাড়তে থাকে, তেমনি আফশোসও তীব্র হতে থাকে। “একদিকে যে সাহিত্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে, আমার চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে সেই সাহিত্যই প্রবল নালিশ জাগায়, তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি, এর কি কোন প্রতিকার নেই।”[১৯]

বাংলা সাহিত্যের ধারায় বাস্তবতার দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে ত্রিশের দশক থেকে। তখন থেকে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের যে সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে, তার বৈশিষ্ট্য এবং স্তর ক্রম নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। সে বিশ্লেষণ আমাদের আলেচ্য নয়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতাবোধ এবং তাঁর সৃষ্ট ভাষা ও ভাব — উভয়ই বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতার মূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে তাঁর চেতনার গভীরতা। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাস্তবতা এসেছে। কল্লোল ও কালিকলমের লেখক সম্প্রদায় : শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখরা জীবনের বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কন করেছেন। এঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন বা পূর্বকালীন। এঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য মানিক আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মানিকের জীবন জিজ্ঞাসাকে এঁদের রচনা তৃপ্ত করতে পারেনি। নিজের জীবন বোধের বিকাশের উল্লেখ করতে গিয়ে মানিক লিখেছেন —

> ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্পবয়সে কেন রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্রজীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্টতা জন্মেছিল নিচের স্তরের দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে। উভয়স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরিব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে এই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম। কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত।...
> গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত — জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি ?[২০]

মানিক তাঁর নিজের রচনায় এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যে জবাব তিনি দিয়েছেন এবং তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে বাস্তব জীবনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা নিজের জীবনেও বিনা সংগ্রামে সম্ভব হয় নি। নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সংগ্রাম। একজন মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকের নিজের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম —

> ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।
> আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

> ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন অথচ ভদ্রজীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে।...
>
> এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা ভূষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার এই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।...
>
> সাহিত্য নিয়েও এই রকম সংঘাতের জাঁতাকলে পড়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসি, বাস্তবতার উর্ধ্বে তোলা মধ্যবিত্তের হৃদয় মন ও ভাবপ্রবণতার প্রতিফলন বলেই এ সাহিত্যকে ভালোবাসি। ... আবার বাস্তবকে না পেয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা, বিকৃতি ইত্যাদির মুখোশ খুলে না দেওয়ার উদাসীনতা পরোক্ষ প্রশ্রয় হয়ে দাঁড়ানো এবং বাস্তব-ঘেঁষা সতেজ ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায় বড়ই আফশোস আর রাগ হত।
>
> সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন দিন দিন বাড়তে থাকে, এই আফশোসও তেমনি তীব্র হতে থাকে। একদিকে যে সাহিত্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে, আমার চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে সেই সাহিত্যই প্রবল নালিশ জানায়, তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি এর কি প্রতিকার নেই ?
>
> এই সংঘাত থেকে স্বাদ জাগত যে, আমি একদিন লেখক হবো। নিজে এর প্রতিকার করব। সাধ ক্রমে পণ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আমি হবোই।[২১]

কিন্তু এই প্রত্যয়ও তাঁর ছিল যে সাহিত্যচর্চা ছেলেমানুষের কাজ নয়। ফলে তিনি ভেবেছেন, “বয়স বাড়ুক, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়ুক, পাশ-টাশ করে চাকরি-বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নিই, তারপর সিরিয়াসলি শুরু করা যাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিযান।”[২২] এভাবনা থেকেই তিনি একটা স্পষ্ট পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। “বয়সের সীমা ঠিক করেছি। ত্রিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়। আমি সেই বয়সে লিখবো... এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্য চর্চা করতে পারি তার ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলবো।”[২৩]

কিন্তু দ্বান্দ্বিক এ সমাজে তা তো হবার নয়। চাকরি-বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নেওয়া অথবা নিশ্চিন্ত মনে যেন সাহিত্যটা করতে পারেন, তার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা আর মানিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেটাই বাস্তব ও স্বাভাবিক ছিল। যে সমাজে তাঁর আত্মীয় স্বজন আফশোস করে বলেন, — তোর দাদা লেখাপড়া শিখে ২০০০ টাকার চাকরি করছে, তুই কি করলি, বলতো মানিক ? না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি ? সেই সমাজে সুস্থির হয়ে বসার উপায় নেই। সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে

মানিকও তা পারেননি। যেখানে বিদ্যা পণ্য এবং তাতেই তার সার্থকতা নির্ণিত হয়, সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনেও যে ওলোট-পালট ঘটবে তাতে আর সন্দেহ কি!

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ২।

২. পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ৭ ও ৮।

৩. 'আমার কান্না', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১২ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৭৬০।

৪. অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মরণ করি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, সরোজমোহন মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

৫. 'বড়ো হওয়ার দায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১২ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৫।

৬. অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মরণ করি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, সরোজমোহন মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

৭. 'গল্প লেখার গল্প', লেখকের কথা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃপৃ. ১-২।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৯. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

১০. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ডায়েরি ও চিঠিপত্র), দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ২৮৪।

১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নতুন সাহিত্য, (পত্রিকা), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*— সরোজমোহন মিত্র', ঐ, পৃ. ৩১।

১২. পরিমল গোস্বামী, ১৯৫৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যুগান্তর পত্রিকা, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, সরোজমোহন মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

১৩. 'গল্প লেখার গল্প', *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ. ২।

১৪. 'সাহিত্য করার আগে', *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ১২৯।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ১৩০ - ১৩৯।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিক প্রতিভার উজ্জ্বল অধ্যায়
(১৯৩৫-১৯৪৩)

১৯৩৫

সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা

মানিকের জীবনের ২৭তম বছর। ভারতীয় রাজনীতিতে জ্বলন্ত সময়। পরাধীন দেশের মুক্তির দাবিতে বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের ওপর সরকারের দমন পীড়ন চলছে প্রবলভাবে। লাইব্রেরি আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র ও যুব সমাজে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচারকারী অমূল্য চৌধুরী একটি রাজনৈতিক খুনের মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেন। কোটালিপাড়ায় একটি রাজনৈতিক হত্যার মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে আশুতোষ ভরদ্বাজকে বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার জন্য পি. সি. যোশী, অজয় ঘোষ, রণদিভে সরদেশাইয়া গ্রেপ্তার হন। এর আগে নানা কারণে মুজফ্ফর আহমেদ, আব্দুল হালিম, সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আন্দামান, দেউলি, বক্সা প্রভৃতি বন্দিনিবাসে আটক বহু বিপ্লবীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

জানুয়ারি ১০, সুভাষচন্দ্র ইউরোপে ফিরে যান।

জানুয়ারি ২৩, মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের বৈঠক শুরু।

ফেব্রুয়ারি ৩, বাংলার গভর্নর স্যার জন আন্ডারসনকে হত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে রাজশাহী জেলে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি। উজ্জ্বলা মজুমদারের ১৪ বৎসর দীপান্তর এবং সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর ১০ বৎসর করে দীপান্তর।

ফেব্রুয়ারি ৬, বঙ্গের লাট স্যার জন আন্ডারসন শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। কঠোর পুলিশি ব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে কবি আশ্রমের সকলকে শ্রীনিকেতন উৎসবে পাঠিয়ে দেন। গভর্নর শূন্য বিদ্যায়তন দেখে ফিরে যান।

ফেব্রুয়ারি ৮, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে।

মার্চ ১, কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মহম্মদ আলি জিন্নার দীর্ঘস্থায়ী বৈঠকের পরিসমাপ্তি, কিন্তু কোন ফলাফল হয়নি।

মার্চ ৭, বাংলার সরকার একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলার ১৩টি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে।

মার্চ ৯, হিটলার জার্মান সামরিক বিমানবাহিনী পুনর্গঠিত করার কথা ঘোষণা করেন।

এপ্রিল ২৬, আন্দামানের সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিষ্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠন করা হয়।

মে ১, বাংলা-বিহার-যুক্তপ্রদেশ-পাঞ্জাব মিলে মোট ঊনচল্লিশ জন বন্দি প্রাথমিকভাবে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটির সদস্য হন।

জুন ৯, বিহার কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

জুন ১৫, রোহিনী বড়ুয়া ফরিদপুরে ইন্সপেক্টর এরসাদ আলিকে তাঁর অফিসে হত্যা করেন।

জুন ২১, প্যারিসে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্যাসী-বিরোধী সম্মেলন (International writers' conference for the Defence of Culture)।

জুলাই ৩, ঢাকার টিকিয়াটোলিতে গুপ্তচর হীরালাল চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়।

জুলাই ৬, শান্তিতে (১৯৮৯) নোবেল জয়ী বৌদ্ধধর্মগুরু ১৪তম দলাইলামা গিয়াৎসো তেনজিং তিব্বতে জন্মগ্রহণ করেন।

জুলাই ১৭, পুরুলিয়া তথা মানভূম জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতা, দেশবন্ধু প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত নিজের প্রতিষ্ঠিত পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘের আশ্রমে প্রয়াত হন।

আগস্ট ২, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নতুন **ভারত শাসন আইন** পাশ হয়। এই আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করা হয় এবং উড়িষ্যা ও সিন্ধু এই দুটি প্রদেশের সৃষ্টি করা হয়।

আগস্ট ৪, রাজার সম্মতি লাভ করে 'ভারত শাসন আইন' আইনে পরিণত হয়।

অক্টোবর, কালিঘাট মন্দিরে জীববলি বন্ধ সম্বন্ধে আন্দোলনকে সমর্থন করে গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হন।

অক্টোবর ২, মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালী কর্তৃক আবেসিনিয়া আক্রমণ।

অক্টোবর ২৯, বাংলায় তৈরি হয় যুদ্ধ ও ফ্যাসী বিরোধী সংগঠন।

নভেম্বর ৩০, শ্রীনিকেতনে 'নবান্ন' উৎসব প্রবর্তন। জাপানী কবি নোগুচির শান্তিনিকেতনে আগমন ও কবি কর্তৃক সংবর্ধনা।

ডিসেম্বর ৮, ময়মনসিংহের গান্ধিজি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়ের জীবনাবসান ঘটে।

ডিসেম্বর ১৫, ফরিদপুর জেলে রোহিনী বড়ুয়ার ফাঁসি হয়।

ডিসেম্বর ২৮, বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী পালন।

এছাড়াও এই বছরে আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটেছে — ভারতবর্ষকে যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গঠন, *সারা ভারত কৃষাণ সভা* গঠন, লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের পঞ্চাশতম সুবর্ণজয়ন্তী অধিবেশন, সভাপতি জওহরলাল নেহেরু।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ: কাব্য — রবীন্দ্রনাথ : *শেষ সপ্তক, বীথিকা* / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *অর্কেষ্ট্রা*। **নাটক** —মন্মথ রায় : *খনা* / প্রমথনাথ বিশী : *ঋনং কৃত্বা* / জলধর চট্টোপাধ্যায় : *রীতিমত নাটক*। **উপন্যাস** — শরৎচন্দ্র : *বিপ্রদাস* / বিভূতিভূষণ : *দৃষ্টিপ্রদীপ* / তারাশঙ্কর : *প্রেম ও প্রয়োজন* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *জননী, দিবারাত্রির কাব্য* / শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : *হোমানল, কাঁকনতলার মেয়ে* / প্রমথনাথ বিশী : *পদ্মা* / বনফুল : *তৃণখণ্ড* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *বেদে* / বুদ্ধদেব বসু : *বাসর ঘর* / দিলীপকুমার রায় : *বহুবল্লভ* / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : *অন্তঃশীলা*। **গল্পগ্রন্থ** — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *অতসীমামী* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *মৃত্তিকা* / বুদ্ধদেব বসু : *অসামান্য মেয়ে, ঘরেতে ভ্রমর এল*।

পত্রিকা প্রকাশ – *ত্রিপুরালক্ষ্মী*: ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ / *নবদ্বীপ*: গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ / *ভাস্কর*: কিরণ চন্দ্র দে / *উন্মোচন*: বিধায়ক ভট্টাচার্য / গণশক্তি : সুশীলকুমার চৌধুরী / *অবন্তিকা*: প্রফুল্লকুমার রায় / সোনার তরী : সতীশচন্দ্র গুহ / *কবিতা*: বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র / *সাহিত্যিকা*: বাদল গঙ্গোপাধ্যায় / *উষার আলো*: ফজলুল হক।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু:

জন্ম: অমিতাভ দাশগুপ্ত / বুদ্ধদেব গুহ / শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় / জহির রায়হান / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যু: প্রিয়ম্বদা দেবী।

মানিকের ব্যক্তিজীবনের খবর

এই বছরই গ্রন্থকার হিসেবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। ৭ই মার্চ *জননী* উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ৭ই আগস্ট *অতসীমামী* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বরে *দিবারাত্রির কাব্য* পরিমার্জিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। শেষ হয় ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত *পুতুলনাচের ইতিকথা*। এবছরই মানিক কোন এক সময় মৃগী বা Epilepsy রোগে আক্রান্ত হন, এই রোগের কারণ দুটি চিঠিতে উল্লিখিত। একটি ১৯৩৭-এর ২৪ সেপ্টেম্বর, অন্যটি ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫। মানিক আন্দাজ করেছেন সাহিত্য রচনার অতিরিক্ত পরিশ্রম এর জন্য দায়ী —

১. কিন্তু যে কথা তিনি উহ্য রাখেন তা এই যে, লেখকের জীবনের কখনো কখনো এমন কিছু কথাও থাকে যা অন্য কোন উপায়ে দূরে থাক, এমনকি লেখার সাহায্যেও জানাবার উপায় থাকে না, এবং তা থাকে না বলেই লেখক মনে রাখতে বাধ্য হন, কিছু কিছু কথা তার কোনভাবেই জানাবার উপায় নেই। ... বলা সম্ভব নয় বলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন নি, কিন্তু আমরা পাঠকেরা টের পাই, ব্যক্তিজীবনের তেমন কোন অতিবাস্তব অভিজ্ঞতার চাপেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রথম চার-পাঁচ বছরের সাহিত্যসাধনা, তাঁর নিজের কাছেই মনে হয় 'প্রাণান্তকরণ'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ও অভিজ্ঞতায় সেই সময় ঠিক কি ঘটেছিল আজ তা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। কিন্তু জীবনীগত তথ্য হিসাবে অন্তত একটি ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, যা নিশ্চিতভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোন অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, এবং তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের সঙ্গে যা এক দ্বন্দ্বময় সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই ঘটনাই তার ব্যক্তিগত ব্যাধি — তাঁর মৃগীরোগ।[১]

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের সাহিত্য, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'-এ হেরম্বের জীবনের দ্বন্দ্বময় রূপক, গাঢ় অন্ধকারে হেরম্বের দীর্ঘ ও আত্মক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ, কড়ি কাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজের স্ত্রীকে ঝুলিয়ে দেবার অতর্কিত স্মৃতি,

হেরম্বের 'অনির্বচনীয় একাকীত্ব' ও পরবাসী চেতনা, এইসব ও আরো অনেক কিছু এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের দুঃস্বপ্নপ্রায় গল্পগুলি, — লেখকের অবচেতন জীবনের গভীর কোন সংকট বা বিপন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু জীবনীগত উপাদান হিসেবে কোন প্রামানিক তথ্যের অভাবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যাধির কারণ ও পরিণাম, তাঁর ব্যক্তিগত চিঠির প্রকাশ্য বিবরণ থেকে আমাদের জেনে নিতে হয়।[২]

৩. কারণ যাই হোক, 'দীর্ঘকাল চিকিৎসা চালিয়ে অকর্মণ্য, মরণাপন্ন হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে নিজেকে আর রোগী ভাবব না।' প্রতিরোধের চেষ্টা তাঁকে ঠেলে দিলো আর এক অসুস্থতায় — 'অ্যালকোহলের মতো এক সম্পূর্ণ বিপরীত ও আত্মঘাতী প্রক্রিয়ায়।'[৩]

সেপ্টেম্বরে সাপ্তাহিক *নাগরিক* পত্রিকায় *প্রকৃতি* গল্পটি প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস-১ : জননী

জননী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+২৮৪, দাম দু'টাকা। উপন্যাসটি কোনো পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় নি, গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অব বুক্স-এ নথিভুক্ত তথ্যানুযায়ী *জননী*-র প্রকাশকাল ১২ মার্চ ১৯৩৫, ফাল্গুন ১৩৪১। এই বছরে প্রকাশিত *অতসীমামী*গ্রন্থে *জননী* উপন্যাসের একটি বিজ্ঞাপন ছিল:

বাংলার জননী জীবনের অপূর্ব মৌলিক কাহিনি

> সকল জন্মভূমি মৃত্তিকা, সকল জননী মানবী। মাটির মানুষের কাছে তাই জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়ো। জননী বড়ো দেবীর চেয়ে। শ্যামাকে মানিকবাবু দেবী করেন নাই, জননী করিয়াছেন। কেবল শ্যামা নয়, পুস্তকটির প্রত্যেকটি চরিত্র আপনার চারিপাশে বিচরণ করে, কথোপকথনগুলি আপনি নিত্য শুনতে পান, ঘটনাগুলি আপনার চোখের সামনে সংঘটিত হয়। মৃদু রহস্যের সুরে লেখকের নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গিতে বর্ণিত এই কাহিনিতে মানুষগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। জননীকে কেন্দ্র করিয়া এ ধরনের ক্রন্দন-বিহীন বাস্তব উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর নাই।[৪]

জননী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির অনেকখানি অংশ গ্রন্থপ্রকাশের সময় পুনর্লিখিত হয় এবং প্রকাশিত অংশের অনেকখানি নতুন করে লিখে পাণ্ডুলিপিতে লিখিত অংশের সঙ্গে তা যুক্ত হয় এবং পরবর্তী সংস্করণের ক্ষেত্রেও বেশকিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের চেষ্টা হয়েছে।

জীবনের বাইরের উচ্ছল তরঙ্গায়িত স্রোতের চেয়ে অন্তর্জগতের নিস্তরঙ্গ স্রোতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সমাজের মূল স্রোতের অন্তরালে যে প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারা বয়ে

চলে — তাকে চিত্রিত করেছেন তিনি। বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিতে তিনি জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর লেখায়। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ-অভিমান ছিল। তিনি বলেছেন —

ক. বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন ?[৫]

খ. মানুষ হয় ভাল, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন ?[৬]

গ. ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষি-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগ্‌দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা — যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে তা মানুষের জগতে-সাহিত্যে স্থান পায়না কেন ?[৭]

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় — সমাজজীবন ও সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে যে ফাঁকি তিনি দেখেছিলেন, তাই তাঁকে সাহিত্য রচনার দিকে চালিত করেছিল। মূলত তিনি শোষিত পীড়িত মানুষের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন উপন্যাসে। বাস্তব জীবনকে ধরতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যে তিনি শোষিত মানুষের ভেতরেও যে শোষক এবং শোষিত রয়েছে, তা উন্মোচন করেছেন এবং সবচেয়ে নিরুপায় শোষিতকে তিনি সাহিত্যে প্রধান স্থান দিয়েছেন। *জননী* উপন্যাসে এসেছে নিম্নবিত্ত সমাজের চিত্র। এই সমাজের একজন শীতল — সে আবার শোষণ করেছে শ্যামাকে। মানিকের লক্ষ্য তাই শীতল নয়, শ্যামা। এই শ্যামাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে 'জননী' উপন্যাসের কাহিনি। এ উপন্যাসে শুধু জননীই চিত্রিত হন নি, জননীর চারপাশের বিভিন্ন চরিত্র, সংসার এবং পরিবেশ পরিস্থিতিও অঙ্কিত হয়েছে নিপুণভাবে। উপন্যাসে শ্যামা, মন্দাকিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, সত্যভামা, রানি, বকুলমালা, সুপ্রভা, রাজবালা, সরযূ, বিভা, শামু, সুবর্ণলতা — ১৩টি নারী চরিত্র; শীতল, রাখাল, হারাণ, বিধান, বিমানবিহারী, কমলবাবু, শঙ্কর, তারাশঙ্কর, কনকের স্বামী, মোহিনী, বনবিহারী — ১১টি পুরুষচরিত্র এবং বিধান, বকুল, কানু, কালু, রানি, শঙ্কর, শামু — ৭ জনের শিশু জীবন অঙ্কিত হয়েছে। এখানে অনেকগুলো সংসারের চিত্র আছে — শ্যামা এবং শীতলের সংসার, মন্দা-সুপ্রভা-রাখালের সংসার, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার, কনকের সংসার, বকুল এবং মোহিনীর সংসার, সরযূর সংসার। এতগুলো সংসারকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে লেখক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বোধ, মানস বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণ, সংস্কার, উৎসব-পার্বণ, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, পেশা, অর্থনৈতিক হালচাল, বিনোদন, ফ্রয়েডীয় প্রভাবকে সাঙ্গীকৃত করেছেন।

প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে নারী 'মা' হন। কিন্তু এই 'মাতৃত্ব' অধ্যায়টি খুব সহজ নয়। সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং ভূমিষ্ঠের পর তাকে লালন-পালন এবং প্রতিষ্ঠিত করা, পুরোটিই এক দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ। এই পথে 'মা' অবতীর্ণ হন মুখ্য ভূমিকায়। সাহিত্যে 'মা' ধারণাটি অনেক আবেগে অঙ্কিত হয়। মা-কে অতিমানব করে তুলবার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু *জননী*র মা বাস্তবজীবনের প্রতিকৃতি। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রচ্ছদে মানিক লিখেছেন —

জননী দেবী নন — মানবী। [ভাল ও মন্দ, মহত্ব ও হীনতা লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে] সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এক জননীর চিত্র আঁকিতে গিয়া তাকে দেবী করিতে চাহিয়া মিথ্যা করিয়া দিব কেন ?[৮]

তাই মানিকের জননী ধরণীর মানুষ — অপার্থিব জগতের কেউ নন। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক শ্যামার নির্ঝঞ্ঝাট জননী-জীবনে পদার্পণের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। পিতৃকূলে এবং শ্বশুরকূলে তার প্রায় কেউ নেই। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পিতাকে হারিয়েছে, এগার বছর বয়সে মা'কে হারিয়েছে, ছিল এক মামা। বিয়ের এক বছরের মধ্যে সেও সম্পত্তি বিক্রি করে, গ্রামের এক বিধবাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়িতে শুধু একমাত্র বিবাহিত ননদ মন্দাকিনী এবং স্বামী নেশাগ্রস্ত-বদরাগী-বহির্মুখী মানুষ। তাই শ্যামার জীবনে বাইরের প্রভাব ক্ষীণ — ঘরই তার পৃথিবী। শ্যামা সাত বছর বধূজীবন যাপনের পর প্রথমবার মা হয়। লেখক জননীর জীবন অঙ্কনে শ্যামার প্রসব যন্ত্রণা থেকে শুরু করেছেন। শ্যামা দুই দিনের বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে এবং দুই তিন বার মুর্ছা যায়। শেষবার মুর্ছা ভাঙার পর সে মহামুক্তির স্বাদ পায়। পরদিন প্রথম দেখেই ছেলেকে সে ভালোবেসে ফেলে। নতুন মায়ের অনুভূতি লেখক শ্যামার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—

কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কি পেলবতা মুখের! মাথা ও ভ্রূতে চুলের শুধু আভাস আছে। বেদানার জমানো রসের মতো টুলটুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণ স্পন্দন কোথা হইতে আসিল ? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়িসংযোগ বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য এ কি কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে ? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দু'দিন দু'রাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।[৯]

জননীর এ প্রথম অভিজ্ঞতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আরো ঋদ্ধ হয়। চোখ-মুখ-গাল-ঠোঁট-বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সে সন্তানের হাত-পা ছোঁড়া, তাকানো, হাসি-কান্নার অর্থও বুঝতে পারে। ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে শুরু করতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। শুয়ে শুয়ে খুঁত খুঁত করতো — এটা হলো না, ওটা হলো না। ছেলের বুকে একটু সর্দি বসলে সে তাগিদ দিয়ে গরম তেল ছেলের বুকে মালিশ করায়, পাশ ফিরেই ছেলেকে পিষে ফেলেছে আশঙ্কা করে চমকে ওঠে, কখনো তার মনে হয় ছেলের যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না — সে নাকের নিচে গাল পেতে নিঃশ্বাস অনুভব করে, ছেলের বুকে হাত রেখে স্পন্দন গোনে, আবার স্নানের জল বেশি গরম কি-না তা নিয়ে ননদ মন্দার সঙ্গে খুনসুটি করে। শ্যামার এই প্রথম সন্তান বেঁচে ছিল মাত্র বার দিন। তার মায়ের মন, তাকে

ক্ষমা করতে পারে নি — তার ধারণা সন্তান পালনে সে আনাড়ি বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। — এও মায়ের এক রূপ। সন্তানের জন্য তার চিরন্তন মমতা। সন্তান না বাঁচলেও সন্তান পালনের সমস্ত কৌশল শ্যামা এ সময়ই শিখেছিল। এর দু'বছরের মাথায় তার আর একটি সন্তান হয়, নাম বিধান, এরপর ছেলেমেয়ে দিয়ে তার ঘর ভরে যায়। মেয়ে বকুল, ছেলে মণি, ফণি এবং শেষ বয়সে অন্ধ মেয়ে। কিন্তু প্রথম সন্তানকে সে ভোলে না। সেই অভিজ্ঞতাই তাকে অন্য সন্তানদের লালন পালনে সাহায্য করে। কিন্তু বিধানের জন্মের পর সে কোনো উচ্ছ্বাস দেখায় না, যদি এবারও দেবতার পরিহাসে পড়ে সেই ভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে, আশাতে-আশঙ্কাতে, সংস্কার-বিশ্বাস-মানত করে সে সন্তানের জন্য সর্বদা নিবেদিত থাকে। মায়ের মন সব সময়ই কোমল। সন্তান বিষয়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সমস্ত অনুভূতিই তাকে দ্যোতিত করে। ধর্মীয়-সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার শ্যামাকে বার বার আশঙ্কিত করে।

মানিক একটু একটু করে শ্যামার মাধ্যমে জননীর চিত্র তুলে ধরেছেন। বিধানের জন্ম থেকে বিধানের পিতা হওয়া পর্যন্ত এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শ্যামার মাতৃত্বের বিভিন্ন বাঁক দেখা যায়। বিধান একটু বড়ো হলে মায়ে-ছেলেতে রাজ্যের গল্প হয়। বাইরের মন্দ পরিবেশ এবং অনাচার থেকে বাঁচাতে সে ছেলেকে নানারকম উপদেশ দেয় —

> ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনও কারো না বাবা, কখনও নয়।[১০]

মাতৃহৃদয়ের এ অতি সাধারণ চিত্র। 'মা' সকল সময় সন্তানকে আগলে রাখতে চান। ঘটনার সাহায্যে মানিক তা ফুটিয়ে তুলেছেন। জননী শ্যামার সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা শুরু হয় স্বামী শীতল টাকা চুরি করে জেলে গেলে। শ্যামা কিন্তু হাল ছাড়ে না; লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। প্রথমে নিজে ছাদের ঘরে উঠে গিয়ে নিচের তলা ভাড়া দেয়, তারপর সংকুলান না হলে পুরো বাড়ি ভাড়া দিয়ে মন্দার কাছে আশ্রয় নেয়। সেখানে দাসীর মতো খেটে সন্তানদের মানুষ করে। আবার বিধান রাত জেগে পড়ে বলে ঘি-দুধ-সন্দেশ চুরি করে বিধানকে খাওয়াতেও দ্বিধা করে না। এখানে মাতৃত্বের কাছে নৈতিকতা হার মানে। মন্দার কথায় সে শহরতলির বাড়ি শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। তবু তার সংগ্রাম শেষ হয় না। বকুল বড়ো হয়ে উঠলে শঙ্করকে নিয়ে বকুলের আবেগকে সে ভয় পায়, কেননা ধনীর ছেলে শঙ্করের সঙ্গে কখনো বকুলের বিয়ে হবে না, বকুলকে শুধু কষ্টই পেতে হবে। আবার মোহিনীর সঙ্গে বকুলকে বিয়ে দিয়ে সে চিন্তিত হয় — বকুল সুখে আছে তো! সে লুকিয়ে বকুলকে লেখা মোহিনীর চিঠি পড়ে, কিন্তু সে চিঠির মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারে না। তারপর একদিন ভোরে মোহিনী আর বকুলকে বাইরে থেকে আসতে দেখে এবং বকুলের লজ্জায় লাল হওয়া দেখে নিশ্চিন্ত হয় মেয়ে তার সুখী হয়েছে। বিধান চাকরি পেলে শ্যামার সুখী জীবন শুরু হয়। তারা কলকাতায় ঘর ভাড়া নেয়। আবার শ্যামার নিজের সংসার শুরু হয়। এরপর বিধান বিয়ে করলে ছেলের বউ সুবর্ণকে শ্যামা সহ্য করতে পারে না। বেশিরভাগ বাঙালি

পরিবারের এ এক চেনা চিত্র। শাশুড়ি ছেলের বউকে সহজভাবে মেনে নেয় না। শ্যামাও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। যৌবনবতী বউকে সে হিংসাও করে — নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অকারণে সুবর্ণকে গালমন্দ করে। এখানেই মানিকের অনন্যতা। তিনি শ্যামাকে সমাজজীবনের রক্তমাংসের মানুষে আবদ্ধ রেখেছেন। ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী পুত্র সন্তানের প্রতি যে অবচেতন আকর্ষণে জননী চালিত, একথা মনে রেখেই যেন শ্যামাকে আঁকছেন মানিক। এবং ঠিক এই কারণে মহাভারতের কুন্তী থেকে একালের গ্রাম-শহরের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল জননীরা এক সারিতে রয়েছেন, মানিক তা অবলীলায় দেখিয়ে দেন আমাদের। 'গোরা'র আনন্দময়ী নয়, মানিকের শ্যামা। 'মা'য়ের প্রতি কোনো আবেগ দ্বারা পরিচালিত হন নি। তবে শেষ পর্যন্ত শ্যামা সুবর্ণকে মেনে নেয়, যখন সুবর্ণ মা হয়। মায়ের জন্য মায়ের হৃদয়াবেগ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানিক শ্যামার পরিপূর্ণ মাতৃত্বের ছবিকে তুলে ধরেছেন।

মানিক *জননী* উপন্যাসে অনেকগুলো 'মা'-কে দেখিয়েছেন। শ্যামা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মন্দা, সত্যভামা, সুপ্রভা, বকুল, সুবর্ণ। বিষ্ণুপ্রিয়া উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। শ্যামার যখন প্রথম সন্তান হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া তখন গর্ভবতী। সে এসেছিল শ্যামার সন্তানকে দেখতে। তার প্রায় আগত মাতৃমন শ্যামাকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মেয়ে হয়েছিল, তবে সে পিতার পাপের ছাপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েকে একমাত্র বাড়ির পুরানো ঝি ছাড়া আর কারও হাতে দেয় না, নিজেও নিয়ে কোথাও বের হয় না। ঘরের কোনে লুকিয়ে রাখে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃত্ব তাই অপূর্ণ থাকে। সে সাজগোজ করা বাদ দেয়, সন্তানের জন্য কষ্ট পেয়ে পেয়ে নিজেকেও সে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে —

> এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অতুল উপাদানে নিজেকে সবসময় ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ত্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে থাকিত হীরার চমক। এখন সে সব কিছুই তাহার নাই। অলংকার সে সবই খুলিয়া ফেলিয়াছে, বিন্যস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, কেউ কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোনো সুগন্ধির ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।[১১]

লেখক স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন মাতৃত্ব কত প্রবল হতে পারে। সন্তানের জন্য শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে 'মা' ত্যাগ স্বীকার করে। বিষ্ণুপ্রিয়া বিত্তের অহঙ্কারে সন্তানের খুঁত অস্বীকার করতে পারে নি। তাই তা আপন পরাজয় বলে মেনে নিয়েছে। শ্যামার পুত্র বিধান জন্মালে সে জামা-তোয়ালে-নরম কাঁথা পাঠায়। শ্যামার মাতৃত্বের মধ্যে সে নিজের অপূর্ণ মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চায়। তবে শীতলের টাকা চুরি করে জেলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া শ্যামার সঙ্গে আর কোনোও সম্পর্ক রাখে না। তাই শেষপর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি হয়েই থাকে। মানিকের শ্রেণি বৈষম্য চিত্রায়ণের সার্থকতা এইখানেই। আবার লেখক খুব নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন নিম্নবিত্ত এক 'মা' সত্যভামার চিত্র। সে শ্যামার বাড়ির ঠিকা-

ঝি। তার স্বামী নেই, তিনবাড়ি কাজ করে চারটি ছেলে মেয়ের আহার জোগায়। লেখকের আর এক সৃষ্টি মন্দা চরিত্রটি। সে তিন সন্তানের জননী। কিন্তু তার ছেলেদের শাশুড়ি অধিকার করে রেখেছে, তার কাছে ঘেঁসতে দেয় না। তাই সে লুকিয়ে ছেলেদের দেখতে যায়। বোঝা যায় সন্তানের জন্য মায়ের বুভুক্ষু হৃদয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মাতৃত্বের অন্যরূপটি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন 'মা' কোনো ঐশ্বরিক ব্যক্তি নন, ভাল-মন্দ মিলিয়ে জাগতিক মানুষ। জগতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, হীনতা-নীচুতা সকল কিছুই তার মধ্যে প্রতীয়মান। তাই শ্যামা চুরি করতে দ্বিধা করে না। লেখক দেখিয়েছেন 'মা' মানেই স্নেহময়ী-মমতাময়ী নয় — সংসারের যেকোনো মানুষের মতো সেও রূঢ় আচরণ করতে পারে। ভালো-মন্দ মিলিয়েই 'মা' সমাজে প্রতীয়মান হয়। শ্যামার মেয়ে বকুলও মা হয়, তবে সে শ্যামারই দ্বিতীয় সংস্করণ। উপন্যাস শেষ হয়েছে বিধানের স্ত্রী সুবর্ণের মা হওয়ার মধ্য দিয়ে। লেখক এতগুলো 'মা' কে উপস্থাপন করে উপন্যাসের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন —

> ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।[১২]

বাড়ি এবং তার পরিবেশের বর্ণনায় মানুষের জীবনধারার পেক্ষাপট স্পষ্ট হয়। *জননী* উপন্যাসে শহর, শহরতলী এবং, গ্রাম তিনটি পরিবেশের বর্ণনা আছে। বিয়ে হয়ে শ্যামা এসেছিল শীতলের শহরতলীর বাড়িতে। শহরের মতো অতটা ঘিঞ্জি নয়, ইঁটের অরণ্যের মধ্যে দু'একটি গাছ, যেন ছেলেভোলানো পার্ক। প্রতিবেশী থেকেও নেই। সবাই ঘরের কোনে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। শীতল জেলে যাওয়ার পর শ্যামার সংসার সংকীর্ণ হয়ে আসে। একতালাটা সে ভাড়া দেয় —

> দোতালার ঘরখানা আর ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ, জিনিসপত্রসহ সে বাস করিত ঘরে, রাঁধিত ছাদে, একখানা কারোগেটেড টিনের নীচে।[১৩]

মন্দার বাড়িটি গ্রামে। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড় মেশামেশি। প্রকাণ্ড অঙ্গন, বাগান, পুকুর, ধূলাবালি, খেলার সাথী, প্রতিবেশী সব মিলে জীবনের জয়জয়কার। মন্দার বাড়ির বর্ণনায় ধরা পড়ে তারা গ্রাম্য ধনী পরিবার। বিধানের ভাড়া করা বাড়িটি ছিল কলকাতায়। ঘিঞ্জি এলাকা। মানুষের গাদাগাদি, একজনের সঙ্গে আন্যের হিংসা-দ্বেষ, ভদ্রতার খোলস। সরযূর পরিবার দেখিয়ে লেখক এখানে একটি সাংস্কৃতিক পরিবারের ছবিও এঁকেছেন। এ পরিবারে বাবা-মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু। আনন্দ-উল্লাসে ওদের দিন কাটে, সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, চারজন মিলে তাস খেলে, একসঙ্গে যায়। এই হলো শহরের ছবি।

সমাজের সমগ্রতাকে আঁকতে গিয়ে মানিক বিভিন্ন পেশার মানুষকে দেখিয়েছেন। যেমন, শীতল প্রথমে প্রেসের মালিক, পরে প্রেস বিক্রি করে দিয়ে অন্যের প্রেসের ম্যানেজার হয়। রাখাল চাকরি করে, হারান ডাক্তারি করে, বিধান ব্যাংকে চাকরি নেয়, সরযূ নার্স, বিভা স্কুলের শিক্ষক, কনকের স্বামী কেরানি, শামু ছাত্রী, শ্যামা-মন্দা-বিষ্ণুপ্রিয়া-কনক গৃহিনী। মানিকের অভিজ্ঞতা ছিল বিচিত্র, পিতার বদলির চাকরির কারণে শিশুবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আবার নিজে ছিলেন চঞ্চল স্বভাবের, সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতেন, ফলে সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় যার প্রকাশ ঘটেছে। তাই তাঁর উপন্যাস বাস্তবের দর্পণ, এখানে অহেতুক আবেগের স্থান নেই। তিনি নির্লিপ্তভাবে জীবনকে উপস্থাপন করেছেন। সমালোচকের মতে —

> আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সবকিছুকে, সকল মূল্যবোধকে যাচাই করে দেখার সূচনা হল মানিকের উপন্যাসে।[১৪]

বিজ্ঞাননির্ভর, নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণিকে সূক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *জননী* তে দেখা যায় প্রতিটি শ্রেণিকে স্ববৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্যামা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। লেখক দেখিয়েছেন, সে একা তার সংসার টিকিয়ে রেখেছে। চলার পথে যত বাধা-বিপত্তি আসুক মানুষ সংগ্রাম করেছে, টিকে থাকছে। জীবনের একটি পথ বন্ধ হলে, মানুষ আর একটি পথের সন্ধান করেছে। জীবনে টিকে থাকাই তার কাছে বড় কথা। সমাজজীবনে মানুষ বড়োই অসহায়, তবুও হার না মেনে এগিয়ে চলে। শ্যামাও তেমনই এগিয়েছে সংগ্রাম করেই, তার মাতৃত্বের মর্যাদাকে রক্ষা করেই। মানিক তাই বলেছেন, জননীর জীবন মিথ্যে করে দেবেন না। শ্যামার জীবন মিথ্যে হয়ে যায় নি। মানিক উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রকে স্বস্থানে স্ব-স্বভাবে অঙ্কন করেছেন। চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাদের পরিবেশ পরিস্থিতি ও সময়কালের ধারা বিবরণী দিয়েছেন। সঙ্গত কারণে *জননী* তে সমকালীন বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার ছবি ও সময়কাল অঙ্কিত হয়েছে। সে যুগের শ্রেণি ভিত্তিক সমাজের নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শ্যামার অবিরাম সংগ্রামের কাহিনি বর্ণনা করেছেন লেখক। সমকালীন সমাজজীবনের এক হার্দিক পরিচয় দিয়ে তিনি উপন্যাসে বাস্তবমুখী চেতনাকে চিহ্নিত করেছেন।

উপন্যাস-২ : দিবারাত্রির কাব্য

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণে প্রকাশকালের উল্লেখ ছিল না। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অব বুকস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২২শে জুলাই ১৯৩৫ (শ্রাবণ ১৩৪২) তারিখে। অর্থাৎ প্রকাশক্রম অনুসারে এটি লেখকের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ, যদিও

দিবারাত্রির কাব্য মানিকের হাতে রচিত প্রথম উপন্যাস। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪+২০৪। দাম এক টাকা বারো আনা।[১৫]

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উপন্যাসটি সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ বৈশাখ ১৩৪১ থেকে পৌষ ১৩৪১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে *বঙ্গশ্রী*তে 'একটি দিন' শিরোনামে উপন্যাসটির প্রথম অংশটি গল্পাকারে ছাপা হয়। এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাশ তাঁর *আত্মস্মৃতি* দ্বিতীয় খণ্ডে *বঙ্গশ্রী* সম্পাদনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —

> দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনিও বিচিত্র।... লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনো অব্যবস্থিত মানিক 'একটি দিন' নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি ? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে ? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিন' এর উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেই শেষ হইল না। দুই সংখ্যার পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি'তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি'— 'দিবারাত্রির কাব্য' হইল। এই উপন্যাসের নাম পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে।[১৬]

দিবারাত্রির কাব্য শিরোনামটি প্রথম পাওয়া গেল *বঙ্গশ্রী* আশ্বিন সংখ্যায়। যখন গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি বেরোল ১৯৩৫ এর ডিসেম্বরে তখন তার শিরোনাম ছিল এই রকম —

দিবারাত্রির কাব্য

একটি বস্তু সংকেতের কল্পনামূলক রূপক কাহিনি।[১৭]

মানিক নিজে উপন্যাসটির সূচনায় জানিয়েছিলেন —

> দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েকবছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।
>
> দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক — তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনি। রূপকের এ একটি নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেই গুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection — মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।[১৮]

দিবারাত্রির কাব্য রচনার সূচনা মানিকের একুশ বছর বয়সে। ‘একটি দিন’ হিসাবে গল্পাকারে রচিত হয়ে ছিল। কয়েক বছর ধরে তাকের উপর পড়ে থাকার পর *বঙ্গশ্রী* তে প্রকাশিত হল, তারপর উপসংহার হিসাবে মানিক লিখলেন ‘একটি সন্ধ্যা’। ‘একটি সন্ধ্যা’র উপসংহার হিসাবে রচিত হল ‘রাত্রি’। এবং সবগুলি একত্রে সুগ্রন্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় *দিবারাত্রির কাব্য*। উপন্যাসটির বিষয় এবং রচনাশৈলী সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন লেখক। সেই কারণেই হয়তো গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় ‘কল্পনামূলক রূপক কাহিনি’ বলে শিরোনামের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের তিনটি অংশ — ‘দিনের কবিতা’, ‘রাতের কবিতা’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’। প্রত্যেক অংশের সূচনাতেই একটি করে মোট তিনটি কবিতা আছে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় অবশ্য সেগুলি ছিল না, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় যুক্ত হয়েছে। উপন্যাসটির আদি পাণ্ডুলিপি, *বঙ্গশ্রী* র মুদ্রিত পাঠ এবং পরবর্তী গ্রন্থাকারে মুদ্রিত পাঠের মধ্যে প্রচুর পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়।

‘দিনের কবিতা’ শুরু হয়েছে সকালে সূর্যোদয়ে রূপইকুড়া গ্রামে হেরম্বের আগমনে। রাত বারোটা থেকে গরুর গাড়িতে করে রূপাইকুড়া গ্রামে পৌঁছতে সকাল সাতটা বেজে গেছে। গাছের উপর লাল সূর্য তখন জ্বলজ্বল করছে। ক্লান্ত অবসন্ন হেরম্বের রাতজাগা লালচোখে তখন একরাশ ঘুম। জাগরণ ও ক্লান্তির দ্বন্দ্ব নিয়ে শুরু হয়েছে উপন্যাস। স্বামী অশোকের অনুপস্থিতিতে প্রেমিক হেরম্বের উপস্থিতি, সুপ্রিয়ার পাঁচ বছরের অন্ধকার জীবনে প্রত্যাশার প্রভাত বয়ে এনেছে। সুপ্রিয়ার কাছে হেরম্বের আগমন রক্তিম রাগে উজ্জ্বল; অপরদিকে হেরম্বের নিজের কাছে এ আগমন অর্থহীন পরিক্রমার ক্ষণিক বিরতি।

হেরম্বের আগমনের পর থেকে সুপ্রিয়া বার বার চেষ্টা করেছে তার কাছে অনুযোগ জানাতে, বেদনা প্রকাশ করতে, সহানুভূতি লাভ করতে, আত্মসমর্পণ করতে, কিন্তু হেরম্বের বক্র বক্তব্যের নিষ্ঠুরতার কাছে তার আত্মনিবেদন বার বার প্রতিহত হয়েছে। সুপ্রিয়ার স্বামী অশোক পেশায় দারোগা। অসতী বৌ কে হত্যাকারী খুনী রিরসাকে ধরে এনেছে অশোক, অথচ তার নিজের ঘরেই তখন তার স্ত্রীর প্রেমিক হেরম্ব উপস্থিত। মানিক এ ধরনের তির্যক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাঠক-হৃদয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছেন। হেরম্বের অকারণ নিষ্ঠুরতায় সুপ্রিয়া অসুস্থ হয়েছে। সংজ্ঞা হারানো পুরানো ব্যধি তার আবার দেখা দেয়। তবু রাতের গভীরতায় অসুস্থ ম্রিয়মান সুপ্রিয়া হেরম্বের কাছে এসেছে আশ্বাসের জন্য, আত্মনিবেদনের তাগিদে, মুক্তির কামনায়। সুপ্রিয়ার প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ হেরম্ব গভীর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গভীর রাত্রি। বিদ্যুৎ চমকায়। “শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।”[১৯] এ অপূর্ব আশ্বাসের কথা বলে দিনের কবিতার যবনিকাপাত হয়। এক রাত বারোটা থেকে আর এক রাত দুপুর পর্যন্ত কাহিনি প্রসারিত।

রাতের কবিতা শুরু হয়েছে অনাথের সঙ্গে হেরম্বের সমুদ্র সৈকতে সাক্ষাতের মাধ্যমে। হেরম্বের লক্ষ্যহীন পরিক্রমার গতিপথে, এক গোধূলি লগ্নে, সমুদ্র সৈকতে অনাথের সঙ্গে দেখা হয় তার।

সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত, নির্জন আত্মজিজ্ঞাসার সাধক অনাথ। মালতী একসময় অল্প বয়সে হেরম্বকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, সেই মালতীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল অনাথ। মালতীকে দেখার একান্ত বাসনা হেরম্বের। তাই অনাথকে অনুসরণ করে জনপদের উপান্তে গিয়ে হাজির হয় হেরম্ব। ভাঙা প্রাচীরে ঘেরা বাগান। বাগানের শেষের দিকে গাছপালায় প্রায় আড়াল করা ছোটো একটি মন্দির। সমস্ত বাগান জুড়ে গাছের নিবিড় ছায়া আর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। মালতীর সঙ্গে তির্যক প্রাথমিক আলাপের শেষে তৃষ্ণার্ত হেরম্বকে জল পরিবেশনের জন্য ডাক পড়ে মালতীর একমাত্র মেয়ে আনন্দের। "আনন্দকে দেখে হেরম্ব হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। আনন্দ অপ্সরী নয়, বিদ্যাধরী নয়, তিলোত্তমা নয়, মোহিনী নয়। তাকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু হেরম্বের কথা আলাদা।"[২০] আলাদা এই জন্য যে কৈশোরের দেখা মালতীকে খুঁজে পাচ্ছে হেরম্ব তার আত্মজা আনন্দের মধ্যে —

> এই মালতীকে নয়, সত্যবাবুর মেয়ে মালতীকে সে আজও ভুলতে পারে নি। এই স্মৃতির সঙ্গে তার মনে বারো বছর বয়সের খানিকটা ছেলেমানুষী, খানিকটা কাঁচা ভাবপ্রবণতা আজও আটকে রয়ে গিয়েছে। আনন্দকে দেখে তার মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্বশিল্পীর কারখানা থেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, নানা পশুপাখীর মধ্যে, ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শীতকালের ঝরা শুকনো পাতাকে হঠাৎ একসময় বসন্তের বাতাস এসে যেভাবে নাড়া দিয়ে যায় আনন্দের আবির্ভাবেও হেরম্বের জীর্ণ পুরাতন মনকে তেমনিভাবে নাড়া দিয়েছিল।[২১]

সন্ধ্যার দেখা ক্রমেই ভালোলাগায়, ভালোবাসায় রূপান্তরিত হতে হতে মধ্যরাত্রে গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হল। পারস্পরিক এ প্রেমের অগ্রগতির পথে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মান, অভিমান ও গভীর উপলব্ধি পরস্পরকে বার বার স্পর্শ করেছে। মধ্যরাত্রে আনন্দ চন্দ্রকলা নৃত্য পরিবেশন করলো হেরম্বকে; আবেগময়, প্রাণময় এ নৃত্য উভয়কে প্রেমে আকৃষ্ট করেছে চূড়ান্তভাবে। নৃত্য শেষে "ওইখানে আকাশের চাঁদের কাছে পৌঁছে, আনন্দ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। হেরম্বের দেহের আশ্রয়ে নিজের দেহকে আরও নিবিড়ভাবে সমর্পণ করে সে আকাশের নিষ্প্রভ তারা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল।"[২২] আর হেরম্বের হৃদয়ে যে উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে তা এরকম —

> চোখ যখন আছে, চোখ দেখুক। দেহ যখন আছে দেহে রোমাঞ্চ হোক। হেরম্ব গ্রাহ্য করে না। অনাবৃত আনন্দের দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আবরণ আজ কি সে ঘোচাতে পারবে? লক্ষ আলিঙ্গনও নয়, কোটি চুম্বনও নয়।... প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না — সে প্রেম করছে। এ তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম।

আনন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, দুহাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুশি হয়ে উঠল। প্রশান্ত চিত্তে সে ভাবল, পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালই করেছে।[২৩]

আনন্দের পূর্ণিমা নৃত্যের পরবর্তী অমাবস্যার দিনের শুরু থেকে তৃতীয় অংশ অর্থাৎ *দিবারাত্রির কাব্য* কাহিনির সূচনা। হেরম্ব ইতিমধ্যেই বৈচিত্র্যহীন দিনযাপনের একঘেয়েমিতে ঝিমিয়ে পড়েছে। আনন্দও গম্ভীর ও বিষন্ন হয়ে পড়েছে। মালতীর উগ্রতা ও অনাথের সীমাহীন ঔদাসীন্য হেরম্ব দেখেছে। প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রকলা নৃত্য শেষে আনন্দের যে যন্ত্রণা হয়েছিল, তেমনি একটি কষ্টকে সে চেপে রেখে সহ্য করে চলেছে। ক্রমান্বয়ে আনন্দ বিষন্ন ও ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে। একদিন সকালে মন্দিরে ভক্তদের মাঝে হেরম্ব সুপ্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে আনন্দের সাক্ষাত হয়। উভয়ের মধ্যে তীব্র ঈর্ষা জাগ্রত হয় হেরম্বকে কেন্দ্র করে। উত্তেজনাময় তির্যক বাক্য বিনিময় ঘটে উভয়ের মধ্যে। সুপ্রিয়াকে পৌঁছে দিতে গিয়ে হেরম্ব আর অশোকের মধ্যেও উত্তেজনাময় ঈর্ষার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। হেরম্ব সুপ্রিয়ার কাছ থেকে ফিরে এসে দুঃসংবাদ পায়, অনাথ ঘর-সংসার ছেড়ে চলে গেছে। সুপ্রিয়ার আহ্বানে হেরম্বকে আবার যেতে হয় সুপ্রিয়ার কাছে, কিন্তু সুপ্রিয়ার পালিয়ে যাবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে রাত্রে হেরম্ব ফিরে আসে আনন্দের কাছে। সে রাত্রে মালতীও গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়। আনন্দ ক্রমে বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অজস্র বেদনা, সুতীব্র ঈর্ষা এবং পরপর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে আনন্দ অমাবস্যা নৃত্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে। আনন্দের নির্দেশে আঙিনায় বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হল। "খানিকক্ষণ আগুনের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে কাপড় জামা আনন্দ অর্ঘের মতো আগুনে সমর্পণ করে। তার গলায় সোনার হারে তাবিজ ছিল, বাহুতে তুলসীর মালা ছিল, হাতে ছিল সোনার চুড়ি। একে একে তাও খুলে আগুনে ফেলে দিল।"[২৪] নিরাবরণ ও নিরাভরণ হয়ে আনন্দ আজ নৃত্য করেছে। নাচতে নাচতে আনন্দ অগ্নিশিখার মতো হয়ে উঠল এবং অকস্মাৎ নৃত্য শেষ করে সে আগুনের নিকট থমকে দাঁড়ালো। একসময় সে-বিরাট যজ্ঞানলে আনন্দ ঢলে পড়ল। হেরম্ব তাকিয়ে রইল। কিছুই তার করার নেই। সকাল থেকে রাত্রি অর্থাৎ দিবারাত্রির মধ্যে কাহিনির সমাপ্তি।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সুস্থ সামাজিক মানুষ নয়, তারা যেন মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষাক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা অস্ফুট মানুষ। উপন্যাসের নায়ক হেরম্ব প্রথম থেকেই দ্বিধা সংশয় দোলাচলতায় আক্রান্ত। এক চরম শূন্যতা তার মধ্যে রয়েছে বলে মনে হয়। নিজের স্ত্রীর আত্মহনন প্রসঙ্গে সে বলে, "আমার মতো লোকের বউয়েরাই গলায় দড়ি দেয়, সুপ্রিয়া। আমি হলাম জগতের সেরা পাষণ্ড।"[২৫] হেরম্বের নিজের বলতে আছে একটি দু-বছরের মেয়ে, কিন্তু তার প্রতি কোনো টান নেই হেরম্বের। লেখক তার চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "সে জটিল জীবন যাপনে অভ্যস্থ। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অপরাধী।"[২৬] হেরম্বের বিশ্বাস — মানুষের কোনো কাজ নেই — "কী কাজ আছে মানুষের ? অঙ্ক কষা, ইঞ্জিন বানানো, কবিতা লেখা ? ও সব তো ভান, কাজের ছল। পৃথিবীতে কেউ ওসব চায় না। একদিন

মানুষের জ্ঞান ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিল না, মানুষের কিছু এসে যায়নি। আজ মানুষের ওসব আছে কিন্তু তাতেও কারও কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ নিরুপায়। তার মধ্যে যে বিপুল শূন্যতা আছে সেটা তাকে ভরতেই হবে।...

... জীবনের একটা অর্থ এবং পরিণতি অবশ্যই আছে, বিশ্বজগতে কিছুই অকারণ হতে পারে না। ... কিন্তু জীবনের শেষ পরিণতি জীবনে নেই। মানুষ চিরকাল তার সার্থকতা খুঁজবে কিন্তু কখনো তার দেখা পাবে না।"[২৭] এই শেষ বাক্যটি শুনলে মনে হবে আমরা যেন অস্তিবাদী দর্শনেরই সারসত্য শুনতে পাচ্ছি এখানে, শুনতে পাচ্ছি আলবেয়ার কাম্যুর *দ্য মিথ অফ সিসিফাস* - এরই অমোঘ উচ্চারণ।

এই উপন্যাসে সমকালীন দেশ-কালের যে ছায়া পড়েছে তা আলোচনার পূর্বে সে যুগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি মনে করা প্রয়োজন। অসহযোগ, খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধিজির পদত্যাগের ঘটনায় দেশবাসী দিশেহারা হয়ে পড়ল, এরপর আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় গণ-বিক্ষোভ গড়ে উঠতে লাগল। যেমন — চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পেশোয়ারে সংগ্রামী জনতার সমর্থনে গাড়োয়ালী সৈন্যদের বিদ্রোহ, শোলাপুরে জনগণের শায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা, যুক্ত প্রদেশে কৃষকদের জন্য খাজনা বন্ধ প্রভৃতি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ দেশবাসী উত্তাল গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তখন কংগ্রেস দলকে বেআইনি ঘোষণা করে প্রায় নব্বই হাজার মানুষকে বন্দি করা হয়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। এরপর গান্ধি-আরউইন চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস তার পূর্ণ মর্যাদা ফিরে পেলেও স্বরাজ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য ছিল না। এই চুক্তির ফলে রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকারীদের শাস্তি বহাল ছিল। এরপর ১৯৩৪-এ গান্ধিজি বিনাশর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। একের পর এক আন্দোলন ও তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ফলে আন্দোলনের কর্মী, সমর্থক সহ সাধারণ দেশবাসী প্রবল হতাশা, বিষাদ, একাকীত্ম, নৈরাশ্য বোধে নিমজ্জিত হয়। এই পরিস্থিতি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। শ্রমিক আন্দোলন তখন অব্যাহত থাকলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি কখনই নিজেদের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। ব্যাতিক্রম সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষ ছাড়া।

এই রকম সংকটময় সামাজিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এর থেকে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ, যৌন বিকৃতি, বিকারগ্রস্ততা। সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ে। মৃত্যুচেতনা, চেতনাপ্রবাহরীতি, পরাবাস্তবতা, অ্যালিনিয়েশন প্রভৃতি চেতনা স্থান পেলো বিশেষত সমকালীন কল্লোলীয় সাহিত্যে। *দিবারাত্রির কাব্যে* তারই প্রতিফলন দেখা যায়। উপন্যাসের নায়ক হেরম্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হেরম্ব কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের শেলী-কীট্স পড়ান। সেই হেরম্ব বারো বছর বয়সে ষোল বছরের সুপ্রিয়াকে ভালোবেসে পাগল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিয়ে করার সাহস হয় নি। আবার নিজের স্ত্রীকেও ভালোবাসতে পারেনি। এমনকি স্ত্রীর

মৃত্যুও হেরম্বকে পীড়া দেয় না। সদ্য মাতৃহারা শিশুকন্যাকে রেখে সে বেড়াতে চলে যায়। তার জীবনের অস্তিত্ব ক্রমাগত শূন্যতায় ভরে উঠতে থাকে। একাগ্রতা প্রেমিকা আনন্দ তার এহেন নির্বিকার স্বভাবের মধ্যে কোনো ভবিষ্যৎ না দেখে আত্মাহুতি দেয়। আনন্দের মৃত্যুদৃশ্য বসে থেকে দেখেছে হেরম্ব নির্বিকারভাবে। দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিকৃতকাম, ভাবলেশহীন, নিজের প্রতি আস্থাহীন, প্রেমের প্রতি অবিশ্বাসী হেরম্বের মধ্যে যুগযন্ত্রাণার ছাপ স্পষ্ট।

তিরিশের দশকের বিশ্বমন্দা মানুষের জীবনের সহজ, সরল ছবিটাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। সেই সময়কেই মানিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন। সেখানে অচরিতার্থ প্রেমের যন্ত্রণা, বিকৃত কামনার সঙ্গে যুগ-যন্ত্রণাও প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের কবিতার মধ্যেও দেখা যায় —

বক্ষ রিক্ততার মমতায়
এ জীবনে জীবনের এল না আভাস
বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।"[২৮]

অথবা

"সব্যসাচী! আমি ক্ষুধাতুর,
শ্মশানের প্রান্ত-ঘেঁষা উত্তর বাহিনী
নদী স্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
মোর সর্ব ভবিষ্যৎ-ভরা
ব্যর্থতার পরপারে! — কে কহে কাহিনি
মোর লাগি রহিবে বসিয়া ?"[২৯]

দিবারাত্রির কাব্য রোমান্টিক এবং কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। প্রত্যক্ষভাবে তৎকালীন বিক্ষুব্ধ সময়ের চলচ্চিত্র এর মধ্যে না থাকলেও, তৎকালীন যুগের বিশেষত যুব মনে যে বিভ্রান্তি, হতাশা, বিষাদময়তা বর্তমান ছিল তা এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। সারা বিশ্বজুড়েই তখন এক ভীষণ অর্থনৈতিক মন্দা। এর ফলে আমাদের দেশেও সে সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। সামাজিক অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার, মন্দা, বেকারত্ব মানুষের জীবনকে চরম হত্যাশার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কোথাও আলো নেই, ভরসা নেই। সর্বগ্রাসী এই হতাশায় যুবকসমাজ ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড বিদ্রোহী। কিন্তু তাদের সামনে সঠিক কোনো দিশা ছিলনা। ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল প্রচণ্ড ভাববিলাস। *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে এই ভাববিলাস প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সেজন্য মানিক বলেছেন, এই উপন্যাসে মানুষ নেই "আছে মানুষের Projection — মানুষের এক টুকরো মানসিক অংশ।"[৩০]

গল্পগ্রন্থ-১ : অতসীমামী

অতসীমামী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ এবং প্রথম গল্প গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে প্রকাশকালের উল্লেখ ছিল না। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অব বুকস-এ নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৮ই আগস্ট ১৯৩৫ (ভাদ্র ১৩৪২)। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, পৃষ্ঠা - ৬+২৬৭, মূল্য দু টাকা।[৩১]

এই গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল: *অতসীমামী, নেকি, বৃহত্তর মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশসূত্র নিম্নরূপ:[৩২]

অতসীমামী	বিচিত্রা	পৌষ, ১৩৩৫
নেকি	বিচিত্রা	আষাঢ়, ১৩৩৬
বৃহত্তর মহত্তর	বিচিত্রা	মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩৩৭
মাটির সাকী	বঙ্গলক্ষ্মী	আষাঢ়, ১৩৩৮
সর্পিল	ভারতবর্ষ	মাঘ, ১৩৩৮
পোড়াকপালী	প্রবাসী	আশ্বিন, ১৩৩৯
আগন্তুক	অমৃত	কার্তিক, ১৩৩৯
মহাসঙ্গম	পূর্বাশা	পৌষ, ১৩৪০
আত্মহত্যার অধিকার	ভারতবর্ষ	পৌষ, ১৩৪০
শিপ্রার অপমৃত্যু	?	?

অতসীমামী

অতসীমামী মানিকের প্রথম গল্প। যদিও এই গল্পে গল্পকার মানিকের স্বাতন্ত্র্যসূচক লক্ষ্মণ স্পষ্ট হয়নি। পত্রিকায় নবাগত লেখকদের লেখা প্রকাশের বিতর্ককে কেন্দ্র করে বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে লেখা এই গল্পটি। বরং এই গল্পে গল্পকার মানিকের হয়ে ওঠার সাক্ষর লুকিয়ে আছে। সমকালীন রোমান্টিক ভাবালুতা ও স্বপ্ন বিলাসী প্রেমকে অবলম্বন করে মানিক গল্পটি লিখেছেন। গল্পটি অত্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ এক শিল্পী দম্পতির। এই গল্পের নায়ক যতীন্দ্রনাথ রায় অর্থাৎ যতীনমামা, তিনি অসাধারণ সুন্দর বাঁশি বাজান এবং স্ত্রীকে প্রচুর ভালোবাসেন। আর এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অতসীমামী, তিনি গল্পের নায়িকা অর্থাৎ যতীনমামার স্ত্রী। নায়িকা অতসীমামীই গল্পের প্রধান চরিত্র, তিনিও স্বামীকে অসম্ভব ভালোবাসেন এবং তাঁর ভালোবাসাই গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয়। যতীনমামা একজন শিল্পী কিন্তু শিল্পীর শিল্পবোধ বা জীবনসঙ্কট নয়; এই গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয় প্রেম।

অতসী নামের একটি মেয়ে ভালোবেসেছিল যতীন্দ্রনাথ নামের একজন সুরসাধককে, যতীন্দ্রনাথ খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন। বিয়ের পর তারা কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকে কিন্তু দারুণ দারিদ্র্য তাদের জীবনকে কষ্টকর করে তোলে। তবুও সুরের সাধনা বন্ধ হয় না। বাঁশি শোনবার জন্যই লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে ভাগ্নে সম্পর্ক পাতিয়ে বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। যতীন মামা নিজেকে নিঃশেষ করে মুখে রক্ত না ওঠা পর্যন্ত বাঁশি বাজানো থামাতেন না। মামীর কাছে তাই এই বাঁশিই ছিল সবচেয়ে বড়ো শত্রু। শেষ পর্যন্ত মামাকে বাঁশি বাজানো ছাড়তে হয়েছিল মামীর মরণ অসুখের কারণে। বাড়ি বিক্রি করে, বাঁশি বিক্রি করে যতীনমামা মামীকে নিয়ে চলে গেলেন পূর্ববঙ্গে নিজের গ্রামে। আবার দীর্ঘ সাত বছর পরে রেলের কামরায় বিধবা অতসীমামীর সঙ্গে লেখকের দেখা। চারবছর আগে যে দিনটিতে যতীনমামার মৃত্যু হয়েছিল ঢাকা মেলের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায়, সেই দিনটিতে মামার মৃত্যুর স্মৃতিতে, প্রেমে, ভালোবাসায় সেই স্থানটিতে মামী চলেছেন। মরণোত্তর তীব্র নাটকীয় ভালোবাসার গল্প *অতসীমামী*। খুব অল্প সংলাপে লেখক অতসীমামীর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন —

> বাঁশিকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না।[৩৩]

সুরেশ বাঁশি বার করল, যতীনমামার সেই বাঁশিটি। মামী সেই বাঁশি বাজাতে লাগলেন অপূর্ব দক্ষতায়, তারপর পরের স্টেশনে বাঁশিটা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মামী নেমে পড়লেন —

> সামনের স্টেশনের উল্টোদিকে লাইনের ধারেই কঠিন মাটির উপর তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট করছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ওই তীর্থদর্শন করতে যাই। আমার কাছে আর কোনো তীর্থের এতোটুকু মূল্য নেই।
> হঠাৎ জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামী বলে উঠলেন, ওই ওই ওইখানে! দেখতে পাচ্ছোনা ? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয়তো... সেই নির্জন মাঠে সমগ্র রাত আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়! ...আবার বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল।[৩৪]

নেকি

হাকিম পুত্র আশোক ও নীলা অর্থাৎ নেকি নামের একটি মেয়েকে নিয়ে বাস্তববোধের এই গল্পটি মিলনান্তক প্রেমের। এই গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের *পরিণীতা* গল্পের প্রভাব দেখা যায়। মামার আশ্রয়ে লালিত সুন্দরী তরুণী নেকির সঙ্গে অশোকের ভালোবাসা গড়ে ওঠে, তারপর ভুল বোঝাবুঝি ও মিলনাত্মক পরিণতি, ব্যবসার দায়ে ঋণগ্রস্ত, আত্মঘাতী পিতার শহুরে সৌখিন মেয়ে নেকি তার একমাত্র পিসির সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে মামার বাড়িতে। নেকির মামা ও অশোকের গ্রাম সম্পর্কে প্রতিবেশী। গ্রামে ছুটি কাটাতে এসে অশোকের সাথে নেকির পরিচয় হয়, আবার নেকির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যখন তার মামা জমি

সংক্রান্ত মামলা জেতার জন্য অশোককে অনুরোধ করায়, তখন অশোক নেকিকে ভুল বোঝে। নেকিকে ভুল বোঝার মাধ্যমে অশোকের বক্র চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে। এ আসলে সমকালীন মানুষের ভাবনাচিন্তারই প্রতিফলন। মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি মানুষের চিন্তাভাবনার জগৎকেও ভীষণ বক্র করে তুলেছিল। বিশেষ করে শহরের জীবনে কৃত্রিমতা যত বেড়েছে তত মনের জটিলতাও বেড়েছে। গল্পে মিথ্যা মামলা, ঘুষের প্রসঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। আবার অশোকের মুখে অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করার কথাও বলেছেন লেখক। সমকালীন বিক্ষত সামাজিক মানসিকতার প্রতিফলন গল্পটিতে দেখা যায়।

বৃহত্তর-মহত্তর

মানিকের নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এই গল্পে খানিকটা দেখা যায়। এই গল্পে যে মমতাদি চরিত্রে সংসারজীবন ত্যাগের পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেই মমতাদি চরিত্রটি *সরীসৃপ* গ্রন্থের *মমতাদি* গল্পে পাওয়া যায়। এই গল্পে মমতাদি যে কারণে স্বামীগৃহ, সন্তানকে ত্যাগ করেছিলেন; সেই কারণ খোঁজার মধ্যেই মানিকের নিজস্বতা নিহিত রয়েছে। পুরুষ শাসিত মধ্যবিত্ত সমাজে মধ্যম মেধা ও মানসিকতা ধারণ করেন যাঁরা, তাদের কাছে নারীত্বের সংজ্ঞা কিছুটা বিকৃত। মমতাদিকে তাই গৃহ, স্বামী, সংসার ছাড়তে হয় আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে। *স্ত্রীরপত্র* গল্পে রবীন্দ্রনাথ মৃণালের মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদ সোচ্চারিত করেছিলেন, একই প্রতিধ্বনি মমতাদির কন্ঠেও — "নিজের আত্মার সন্ধানের কারণে নিজের ভিতর যে অনির্বাণ মনুষ্যত্ব তার অপমানের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়ে ছিল মমতাদি।"[৩৫] স্বামীকে ত্যাগ করার কারণ সম্পর্কে মমতাদি বলেছেন —

> স্বামী আমার কাছে ছোটো নয় — তুচ্ছ নয় — কিন্তু পর। সব স্বামীই পর — নিজের চেয়ে মানুষের আপন আর কেউ নয় — প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই ? সবাই পরের জন্যই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্য আহরণ করে ওই বেঁচে থাকার স্বার্থকতাটুকু। পরিণাম নিজের আত্মার কল্যাণ।[৩৬]

মেয়েদের জীবনে বেঁচে থাকার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার সমাজের সামনে একটি প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন মমতাদি। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি না হয়েও দীর্ঘদিনের নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ মমতাদি নিজেই বেছে নিয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার সচেতন প্রতিবাদের মধ্যে তিরিশ / চল্লিশের দশকের বিদ্রোহের ভাব স্পষ্ট। পুরুষ শাসিত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে চালিত সমাজে নারীর জীবনের চরিতার্থতা তথাকথিত প্রেমে নয়, গার্হস্থ্যসীমায় নয়, তার চরিতার্থতা বৃহৎ কর্মজগতের মুক্তিতে। এই প্রয়োজনীয় সত্যটুকু মানিক এই গল্পে বলতে চেয়েছেন। নারী বিদ্রোহের যে ভাবটি এই গল্পে প্রকাশিত, তা হেনরিক যোহান ইবসেনের নাটক *A Dolls House* (১৯৭৯), রবীন্দ্রনাথের *স্ত্রীরপত্র*

গল্পে এবং *পলাতকা* কাব্যের *মুক্তি* কবিতায় পূর্বেই দেখা গেছে। *A Dolls House* এর — নোরা, *স্ত্রীর পত্রে*র মৃণাল *মুক্তি* কবিতার নারীচরিত্র এবং মমতাদি চরিত্রের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল — তারা দীর্ঘদিন চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, অন্যের প্রয়োজন মিটিয়েছে নিজের সত্ত্বা ভুলে। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা সব বাঁধন ছিঁড়ে মুক্তির স্বাদ পেতে বৃহত্তর জগতের দিকে পা বাড়িয়েছে। সেখানে তারা কারো মেয়ে-স্ত্রী-মা নয়। সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে তারা শুধুই নারী।

ফরাসি বিপ্লব পরবর্তীকালে সারা বিশ্বব্যাপী যে নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী স্বাধীনতার জয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে নারীর অধিকার বিষয়ে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল তার প্রভাবে আমাদের দেশের নারী আন্দোলন ও প্রগতিশীল চিন্তা প্রভাবিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রমুখদের হাত ধরে বাংলাদেশে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে এসে সেই পরিবর্তন অনেকখানি মাত্রা লাভ করেছিল। বিশ শতকে এসে শিক্ষায় দীক্ষায় অধিকার সচেতনতায় নারীসমাজ যে একটি বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক Identity লাভ করতে পেরেছিল তার উদাহরণ *বৃহত্তর মহত্তর* গল্পটি।

শিপ্রার অপমৃত্যু

মানিকের পরিণত লেখনীর স্পর্শ *শিপ্রার অপমৃত্যু* গল্পটিতে প্রত্যক্ষ করি। মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে ত্রিকোণ প্রেমের গল্পও এটিকে বলা যায়। উত্তীর্ণ যৌবনা পুরুষ সঙ্গহীন শিক্ষিকা শিপ্রা, অনিন্দিতা ও পরাশর এ গল্পের মুখ্য চরিত্র। অনিন্দিতাদের পূর্ববঙ্গের গ্রামে ছুটি কাটাতে এসে শিপ্রার সঙ্গে পরাশরের সাক্ষাৎ ঘটে। পরাশরের সঙ্গে অনিন্দিতার ছিল প্রায় বাল্যপ্রেমের সম্বন্ধ। অনিন্দিতার গ্রামীণ সহজ সরল মন আর পরাশরের শহুরে চতুর মনের ফাঁকটুকুতে ঢুকে পড়ে শিপ্রা। স্বভাববশত মধুর লোভে আকৃষ্ট হয় পরাশর এবং সম্পর্ক বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছে যায়। অনিন্দিতা কষ্ট পেয়ে, প্রতিবাদ করে কোনো ফল হয় না দেখে পুকুরের জলে ডোবার কম্পিটিশনের অছিলায় শিপ্রাকে ডুবিয়ে মারতে চায়। ভীত অসহায় শিপ্রা ডুবে যাচ্ছে জেনেও পরাশর ঘাটে বসে থাকে, কিন্তু শিপ্রাকে বাঁচাতে উঠে আসেনি। অনিন্দিতার উদ্দেশ্য সফল হয় এবং পরদিনই অপমানিতা শিপ্রা কলকাতায় ফিরে যায়।

মানিকের প্রথম পর্যায়ের রচনায় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও মনোবিকলনের প্রভাব বেশি করে চোখে পড়ে। শিপ্রার মানসিক বিকারের যে বর্ণনা মানিক দিয়েছেন —

> ভোরে ঘুম ভেঙে রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত অজস্র খাপছাড়া কাণ্ডে সে সকলকে উত্তেজিত রাখে কিন্তু নিজে সে উত্তেজিত হয়না। তার কথা মৃদু ও সুরের রেশ লাগানো, তার হাসি হয় অপার্থিব একটা অধরা ভঙ্গি, তার চলন হয় ঢিমে তালের একটা নৃত্য ছন্দ। এক কাব্যাত্মক আভিজাত্য, খুব উঁচুস্তরের আধুনিকতা ব্রহ্মাস্ত্রের মতো আত্মরক্ষার জন্য সে পরিস্ফুট করে রাখে। গ্রামের অল্প শিক্ষিত, অল্প আলোক-প্রাপ্ত নর-নারীর মধ্যে সে আলোর মতো উদয়

> হয়েছে, এরা যদি তাকে পছন্দ না করে সেটা হবে এদেরই সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের দোষ, এদেরই পিছনে পড়ে থাকার পরিচয়। এছাড়াও শিপ্রার আরো একটা চালাকি আছে। অনেক ভেবে অনেক কৌশলে সে এই ভাবটাও বজায় রেখেছে যে সে সকলকে মাতায়নি, তাকে নিয়ে সকলে মেতেছে। অনিয়ম ও অসংযম যদি কিছু ঘটে থাকে তার দায়িত্ব অন্যের, তার নয়।[৩৭]

মানবচরিত্রের যে ধরনের জটিলতা মানিকের রচনায় পাওয়া যায় তার প্রথম দিককার দৃষ্টান্ত *শিপ্রার অপমৃত্যু* গল্পটি। সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকা গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার ব্যবধান, মানসিক ভারসাম্যের সীমারেখা; যা বিশ শতকের বাঙালী সমাজে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই গল্পটিতে নিজ নিজ সংকীর্ণ পরিধির আবর্তে সীমাবদ্ধ মানুষগুলির মনোজগতের দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট। মানব মনোগহনের গভীরে অন্তর্দৃষ্টির রঞ্জন রশ্মি ফেলে যে জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন *শিপ্রার অপমৃত্যু* তার অন্যতম। উত্তীর্ণ যৌবনের ব্যাকুলতা, প্রেমহীনতা, পুরুষ সঙ্গহীন জীবনের শূন্যতাবোধ ও নিরাশ শিপ্রাকে যে অসংযমী চরিত্রের অধিকারী করেছে তা আসলে সময় নির্দেশিত একটি ব্যধি। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় পর্বে দ্রুত বদলে যেতে থাকা সমাজ ও তার যাবতীয় চিন্তা চেতনা এবং সেই সঙ্গে বদলে যেতে থাকা মানুষের নিজস্ব ধ্যান ধারণার জটিল আবর্তে জীবন সম্পর্কে ব্যক্তির নেতিবাচক নৈরাশ্যবোধ ও অসংযম প্রধানভাবে লক্ষ্য করা যায়। সময়ের সেই তীব্র প্রভাবকে মানিক কখনোই উপেক্ষা করে চলেননি।

সর্পিল

এই গল্পটিও জটিল মনস্তত্ত্বমূলক। সামন্ততন্ত্র শুধুমাত্র একটি সিস্টেম নয়, সমাজের শিকড়ে জমাট হয়ে বসে থাকা এক অন্ধ মানসিকতাও। সভ্যতার ইতিহাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। পুরানো যত কিছু আবরণ ছেড়ে ফেলে নতুন সংকল্পে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু আধুনিক যুগেও অনেক সময় সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসন চোখে পড়ে। *সর্পিল* গল্পে এমনই একটি কাহিনিবৃত্ত রয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বংশধর শঙ্কর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্থ হলেও তার সামন্তমূল্যবোধ ও সংকীর্ণ মানসিক বিকৃতিগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই সে গ্রামে ফিরে যায়, সে ফিরে যায় তাদের পূর্বপুরুষের প্রাসাদোপম গৃহের ভগ্নাবশেষে। সে ফিরে যায় নিজের অবচেতনে সঞ্চিত সামন্ততান্ত্রিক পুরুষের অহংকারে। স্ত্রী কেতকীর জীবন এই বিকৃত মানসিকতার চাপে বিষন্ন হয়ে ওঠে। ঘটনার দুর্বিপাকে ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাত্রিতে ভগ্নপ্রায় বাড়ির কিছুটা অংশ ভগ্ন হয়ে কেতকী ও অনন্ত মারা যায়। কিন্তু কালীমন্দিরে পুজোর আছিলায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য শঙ্কর বেঁচে যায়। আসলে সমগ্র প্রসাদের মধ্যে মন্দিরটিই একটু শক্তপোক্ত তাই কোনো দুর্যোগের রাতে শঙ্কর মন্দিরে গিয়েই আশ্রয় নেয়। সকালে দুই মৃতদেহের উপর রাশি রাশি ইঁট বালি জড়ো করে তাদের ঢাকা দেয় শঙ্কর এবং তার আচার আচরণের মধ্যে বিকারগ্রস্ত, ঈর্ষাপরায়ণ, সন্দেহবাতিক, প্রভুত্বকামী পুরুষকে লক্ষ্য করা যায়।

সে কালীভক্ত, কথায় কথায় মা কালীকে ডাকে কিন্তু তার পূর্বপুরুষেরা স্ত্রীদের ভালো না বেসে শুধু জয় করতেন ও ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতেন। নাগরিক শিক্ষিত জীবনে অভ্যস্ত শঙ্কর যে কেন গ্রামে মৃত্যুপুরীর মতো ধ্বংসস্তূপে ফিরে এলো তার যথাযথ ব্যাখ্যা নেই। স্ত্রী কেতকীর মুখে একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় —

> আমার মনে হয় ওর রক্তে এই বিকার ছিল, হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আসবার আগে আমি একটা পার্টি দিয়েছিলাম। একটা কথা শোন বলে আমায় তেতলার সেই ছোট্ট ঘরে ডেকে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই আমার প্রথম শাস্তি।[৩৮]

কাহিনির শেষেও আমরা দেখি ঝড়ের রাতে সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে কেতকীর ঘরের শিকল বাইরে থেকে তোলা। শঙ্করের এই বিকৃত মানসিকতার উৎস তার সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবোধ। যে অধিকারবোধের শক্তিতে বিকৃত রুচির সব স্বাভাবিক সীমাকে সে অতিক্রম করে যেতে পারে। ইংরেজ প্রবর্তিত জমিদারী সামন্তপ্রথা এবং মধ্যযুগীয় প্রভুত্ববোধের চেতনা বিশশতকেও সমাজ মানসিকতায় বর্তমান ছিল। সামন্ততন্ত্র সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের চেতনায় যে বিভেদ তৈরি করেছিল তার থেকে মুক্ত হওয়াটা খুব সহজ ছিল না আমাদের। বিশ শতকের আধুনিকতার জয়যাত্রা প্রবলভাবে ঘোষিত হলেও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা সমাজে একটা বড়ো বাধার প্রাচীর হয়ে বসেছিল। মানিক সেই সময়ের তরঙ্গ তাঁর লেখনীতে ধরতে চেয়েছেন। সময়ের আঘাতে ও অভিঘাতে এভাবেই মানিকের সাহিত্যিক হয়ে ওঠা।

পোড়াকপালী

University of California Press, Berketey, U.S.A. (1990) তে প্রকাশিত ২১টি ছোটগল্পের সংকলন *A selection of Bengali short stories* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত মানিকের চারটি গল্পের মধ্যে অন্যতম হল *পোড়াকপালী* (The Unlucky Woman)। স্বামী অন্তপ্রাণ এক দরিদ্র্য বধূ কুসুমের কাহিনি *পোড়াকপালী* কোলে একটি ও গর্ভে একটি সন্তান তখন, তার জীবনে নেমে এল অকাল বৈধব্য। স্বামী তারক মারা যায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায়। লুচি ভাজার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতে গিয়ে তারক ভয়ঙ্করভাবে পুড়ে যায় এবং তার গায়ে ফোসকা পড়ে। কুসুমের ধারণা ফোসকা না পড়লে তারকের মৃত্যু হত না। কারণ ম্যালেরিয়া রোগে কুসুমও তো কত ভুগেছে, কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সাধারণ ম্যালেরিয়ার পার্থক্য কুসুম বোঝে না। তার নিজের ভেতরে কাজ করে এক অমার্জিত অপরাধবোধ। কুসুমের ধারণা তার কারণেই তার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনার মাস খানেক পরে মামার বাড়িতে কাঠের আঁচে রান্না করতে গিয়ে উনোনের পাশে রাখা এক আঁটি পাকাটিতে আগুন লাগলে সে চুপচাপ বসে থাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে। সহমরণের প্রত্যাশায় মানিক তার এই জীবনবিরোধী আত্মহত্যার প্রবণতাকে তিরস্কার করেছেন এবং কুসুমের এই মানসিক বিকারের দৃষ্টান্তে পাঠককে সচেতন

করেছেন। আসলে মানিক তার অসংখ্য গল্প উপন্যাসের কাহিনিতে ধরতে চেয়েছেন জীবনের বিচিত্র সব জটিলতাকে। জীবন যে সহজ-সুন্দর নয়, জীবন যে জটিল, বক্র এবং আরো কত কি! তা-ই মানিকের উদ্দিষ্ট। সময়ের আঁচ এভাবেই ঘুরে ফিরে আসে মানিকের কাহিনিতে।

আগন্তুক

আগন্তুক গল্পটিও একটি মনোবিকলনের প্রভাবযুক্ত আশাভঙ্গের কাহিনি। গল্পের নায়ক মুকুল কর্মোপলক্ষে পাঁচ বছরের জন্য সিলোন গিয়েছিল। পাঁচ বছর পর যখন সে নিজের বাড়িতে ফিরছে, তার প্রত্যাশা — তাকে দেখা মাত্র সকল আত্মীয়-স্বজন তাকে দেখে আনন্দে হইচই করে উঠবে। কিন্তু তেমনটা কিছুই হয়না, সহজভাবেই তাকে সবাই অভ্যর্থনা করে। তার বহুদিনের আশা ভঙ্গ হয়। এমনকি বহুদিন পরে দেখা স্ত্রীকেও সে একই মানসিকতা থেকে বিচার করে, ফলে দীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের মধ্য দিয়ে যে ব্যবধান মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা আরো দূরত্ব তৈরি করে। আসলে উগ্র আত্মপ্রেম এবং নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ার অস্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই তার এরকম আচরণ। মধ্যবিত্ত জীবনের নানারকম অসঙ্গতি, অনাচার, ভণ্ডামি মানিক তার গল্পে তুলে ধরেছেন। এই গল্পটিতেও মুকুলের আগন্তুক হয়ে ওঠার মধ্যে সেই ব্যঙ্গটি স্পষ্ট।

মাটির সাকী

দুটি দম্পতিকে ঘিরে এই গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে — সুকান্ত-হিমানী ধনী দম্পতি কিন্তু তারা নিঃসন্তান এবং শঙ্কর-বিধূ তারা দরিদ্র্য দম্পতি এবং তাদের তিন চারটি ছেলে মেয়ে। দুইটি বিপরীত দাম্পত্য জীবনের সহাবস্থান এই গল্পটিতে। গল্পটির ভাববস্তু নির্মাণ করেছে সুকান্ত-হিমানীর প্রাচুর্যে ভরা অসুখী ও বিকারগ্রস্থ দাম্পত্যজীবন; আর শঙ্কর-বিধূর দরিদ্র্য ও অসহায় দাম্পত্যজীবনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকা সুখ। পাশাপাশি দুটি পরিবারের মধ্যে বাক্যালাপের সম্পর্কও ছিল না বললেই চলে। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার অভিঘাতে দুইটি পরিবার কাছাকাছি আসে। ধনী গৃহের সুন্দরী বধূ হিমানীকে বিধূর সেবা করতে দেখে শঙ্কর বিস্মৃত না হয়ে পারে না। সুকান্তের ডাক্তার ডেকে আনা, অসুস্থ বিধূকে সুস্থ করে তোলার সর্বোত্তম চেষ্টা দেখে শঙ্কর অভিভূত না হয়ে পারে না। দূর থেকে দেখা সুকান্ত হিমানীর ঐশ্বর্য্যময় জীবন তাকে পীড়িত করত — আর আজ এতো কাছে আপন হতে দেখে তার ভালোই লাগে। কিন্তু যখন সে জানল সুকান্ত হিমানীর জীবনে এতটুকু সুখ নেই সন্তান না হওয়ার কারণে হিমানী মানসিক ভারসাম্যহীন আচরণ করে, তখন শঙ্কর অভাবের প্রাচুর্যে নিজের আধমরা স্ত্রীর দিকে তাকায়। মানিকের জীবন অন্বেষণের নানা কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এটিও একটি। জীবনের সুখ-শান্তি যে আর্থিক সচ্ছ্বলতায় আসে না; অভাবের ঘরেও ভাবের ফুল সুন্দরভাবে ফোটে — জীবন অন্বেষণের পথে এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন মানিক *মাটির সাকী* গল্পটির মধ্যে।

মহাসঙ্গম

জীবন থেকে মৃত্যুর মহাসঙ্গমে দাঁড়িয়ে এক ৮৭ বছরের বৃদ্ধের গল্প *মহাসঙ্গম*। বেঁচে থাকার জন্য যার ব্যাপক আগ্রহ কিন্তু মৃত্যু যার নিকটেই তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক —

> চোখে এখনো সে অল্প অল্প দেখিতে পায়। কিন্তু চোখের পাতাদুটি সীসার মতোই ভারি হইয়া সর্বদাই তাহার চোখদুটিকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, টানিয়া খুলিয়া রাখিতে তাহার কষ্ট হয়, পরিশ্রমও যেন হয়। ভ্রু পাকিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মুখে আর একটাও দাঁত নাই। চোয়ালের দুপাশ দিয়া গালের গোড়া হইতে দুটি নিস্তেজ নীল শিরা তাহার শীর্ণ গলাটি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ডটি তাহার ধনুকের মতো বাঁকা। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাটি সে কোনোমতে নিজের কোমরের লেবেল ছাড়াইয়া উপরে তুলিতে পারে না। দুই হাতে মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। লাঠি না থাকিলে সে মুখ থোবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। দেহের ভারকেন্দ্র তাহার পায়ের আয়ত্তাধীন সীমানা ছাড়াইয়া অনেকখানি সামনে আগাইয়া গিয়াছে।[৩৯]

এহেন পশুপতি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। ছাত্রের বাড়িতে আশ্রিতের জীবনযাপন করে। স্ত্রী মারা গেছে ৫৭ বছর বয়সে, প্রায় ৩০ বছর ধরে নিঃসঙ্গ পশুপতি মৃত্যুর প্রতিক্ষা করছে তবুও জীবনের প্রতি তার লুব্ধতা তীব্র। বিশেষ কোনো ঘটনাক্রম এই গল্পে নেই, যা আছে তা হল বৃদ্ধ পশুপতির একাকিত্ব, অসহায়তা, জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং মানুষের হৃদয়ে কিছুটা স্থান পাওয়ার চেষ্টা। সে জীবিত হলেও প্রায় বাইরে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট শিশুর মতই অসহায়। লেখকের দৃষ্টি জীবনের কোনো অংশকেই ফাঁকি দেয়নি। জীবনের যে প্রান্তটি অসুন্দর, আঁধারিত সেখানেও লেখক সমান কৌতূহল ও মনোযোগ নিয়ে জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। প্রতিটি মানুষের অবস্থা হয়তো জীবনের অন্তিম পর্বে গিয়ে অসহায় আক্ষেপে এবং দূরাতিক্রমী নিরাশায় ভরে যায় — পশুপতির অসহায় অনুভবের বর্ণনায় লেখক তা দেখাতে চেয়েছেন।

আত্মহত্যার অধিকার

অতসীমামী গল্পসংকলনের শেষ গল্প *আত্মহত্যার অধিকার*। মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত *Manik Bandyopadhayay; selected stories* গ্রন্থে এই গল্পটি *The Right to Suicide* নামে সংকলিত হয়েছে। অনুবাদক সজনী কৃপালনী মুখার্জি। এছাড়া এই গল্পটি চিনা ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৪০]

বর্ষার এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে একটি অতি দরিদ্র পরিবারের দুর্দশার কথা বলা হয়েছে এই গল্পে। সীমাহীন দারিদ্র্য নীলমণির জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। নীলমণি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে একটু সুস্থ ও স্থির জীবনের জন্য। প্রবল বর্ষার রাত্রে তারা একটি মাত্র ঘরের মধ্যে বসে

থাকে ছাতা মাথায় দিয়ে। নীলমণির মনে হয় "বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিস্প্রয়োজন।"[৪১]

বর্ষার রাতে ঘরের চাল ফুটো হয়ে অজস্র ধারায় জল পড়ে এবং আমাদের অসম বিন্যস্ত সমাজের বাসিন্দা নীলমণি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ রাতভোর ভিজতে থাকে। গল্পটি একটি পরাজিত মানুষের গল্প। এরকম অসংখ্য মানুষকে চারপাশে দেখেছেন মানিক। নিজের অক্ষম পিতৃত্ব নীলমণিকে দগ্ধ করে এবং সেই জ্বালায় সে বকাবকি করে, উত্তেজিত হয়, মারামারি করে। মানব মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান কতখানি ছিল মানিকের তা এ গল্পটি পড়লে বোঝা যায় —

> তার শক্তি নাই কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে, পেটের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান, সে কোন দিক সামলাইবে ? সকলে যেখানে বাঁচাইতে চায়না সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে।[৪২]

তবুও নীলমণিরা হাল ছাড়ে না। অপমানিত হয়েও আশ্রয়ের প্রত্যাশায় কড়া নাড়ে সরকার বাড়ির দরজায়। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালীন মানুষের মূল্যবোধের যে দ্রুত অবক্ষয় হয়েছিল তারই প্রমাণ আছে এই গল্পে। পৃথিবীতে সম্পদের আয়োজনের অভাব নেই, তবুও মানুষের পেটে ভাত নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, দুঃখের শেষ নেই। প্রকৃতির আক্রোশের বিপরীতে মানুষের অসহায়তার কথা এই গল্পে বর্ণিত হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাঙ্গাত্মক চাবুকের মতো। ধনী ও গরীবের ব্যবধান ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই দ্রুতহারে বাড়ছিল। দরিদ্রের অসহায়তা, যন্ত্রণা, দুঃখভোগ প্রভৃতির বর্ণনায় জীবনের বাস্তব রূপটিকে মানিক এই গল্পে শিল্পরূপ দান করেছেন।

অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প সংকলনে সর্বমোট দশটি গল্প রয়েছে। মনে রাখতে হবে এই গল্পগুলি লেখকের একেবারে প্রথম দিককার রচনা। যখন তিনি প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠবার সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করছেন এবং ইতিপূর্বে তিনি কিছু লেখেননি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাহিত্য সাধনায় প্রথম হাতেখড়িজনিত দুর্বলতা বা ত্রুটি এক্ষেত্রে প্রায় অলক্ষণীয়। প্রথম দুটি গল্পে রোমান্টিক ভাবালুতার আধিক্য ব্যতিত বাকি আটটি গল্পে মানিক একজন পরিণত গল্পকারের পরিচয় অর্জন করেছেন। শব্দচয়ন এবং ভাষার তির্যক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নয়, বিষয় নির্বাচনে ও কাহিনি চয়নের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব গতিপথ খুঁজে পেয়ে গেছেন প্রথম গল্পগ্রন্থেই। এই অসংগঠিত সমাজে মানুষ অসুখী, অসহায়, বিপর্যস্থ, বিকারগ্রস্থ, অস্বাভাবিক — আর মানিকের অন্তর্দৃষ্টির আলো এই সব মানুষদের উপরেই পড়েছে। এই গল্পগ্রন্থের সব চরিত্রগুলিই সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির (শুধুমাত্র 'মাটির সাকী' গল্পের সুকান্ত ও হিমানী ছাড়া) এবং এই শ্রেণির চরিত্রগুলির মধ্যে যে অসংগতি তাকে সমাজ-মনস্ক মানিক চমৎকারভাবে খুঁজে পেয়েছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে চারিত্রিক বিকার, অসুস্থতা, অক্ষমতা চোখে পড়ে। শ্রেণি অবস্থান অনুযায়ী সংলাপও।

ভাষা ব্যবহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করেছে। সাহিত্যে ভাব প্রবণতার বিরোধী ছিলেন মানিক। তিনি নিজেই বলেছেন —

> শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধের সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি — সাহিত্যে কি তা আসবে না ? এই বাস্তব জীবন যাদের সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ ?
>
> অথচ প্রথম গল্পই আমি লিখি *অতসীমামী* রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনি। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখিনি — জিতবার জন্য। এ গল্পে তাই নিজের আসল নাম দিই নি, ডাক নাম 'মানিক' দিয়েছিলাম। ... যে সংঘাতের (ভাবপ্রবণতার ও বাস্তবতার সংঘাত) কথা বলেছি এও তারই প্রমাণ। যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম তবে আর সংঘাত থাকতো কিসের ?[৪৩]

বিপ্লব আন্দোলনের দিক থেকে এই সময়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে আরও একটি ভয়ানক যুদ্ধের ছায়া গোটা পৃথিবীর আকাশে। পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিলতর হয়ে চলেছে এবং তার প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবনেও। বিশ্বমন্দা, প্রাত্যাহিক দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধি, কালোবাজারি, ডান্ডি অভিযান, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ইংরেজদের অত্যাচার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে দেশে ও সমাজে তখন উত্তপ্ত পরিবেশ। এই সব অবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব গল্পগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ৩৪।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থপরিচয়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, ২০০৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৪৯৭।

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য করার আগে, লেখকের কথা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ. ১৩।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৪৯৭।

৯. *জননী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য করার আগে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১৩. *জননী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ, ২০০৫, পৃ. ৮৪।

১৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১।
১৮. 'দিবারাত্রির কাব্য', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
৩১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪।
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৬।
৩৩. 'অতসীমামী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।
৩৫. 'বৃহত্তর মহত্তর', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।
৩৭. 'শিপ্রার অপমৃত্যু', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।
৩৮. 'সর্পিল', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১।
৩৯. 'মহাসঙ্গম', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭।
৪০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯।
৪১. 'আত্মহত্যার অধিকার', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭।
৪৩. 'সাহিত্যকরার আগে', *সমগ্র প্রবন্ধ এবং,* সম্পা - শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ১৩৪।

১৯৩৬

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ২৮তম বছর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণি এসে দাঁড়ালেন স্পেনের গণতান্ত্রিক মানুষের পাশে। ভারতের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে ভারত সচিবের কাছে আবেদনপত্র পেশ। প্রথম স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথের। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন। প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় চল্লিশজন বিপ্লবীর দণ্ড। এবছরেই প্রথম ভাষা ভিত্তিক রাজ্য ওড়িষার জন্ম। এপ্রিলে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা। জুলাইয়ে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘে'র প্রতিষ্ঠা এবং 'নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ' প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হল — এই দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভের অনুকূল পটভূমিতে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন চরম বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য তৎপর।

	এবছরেই সারা ভারত কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।
মার্চ	ইউরোপ থেকে জওহরলাল নেহেরু দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
এপ্রিল ৮	ভিয়েনা থেকে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরেই বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হন।
এপ্রিল ১০	সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে এক সাহিত্য সম্মেলন থেকে *নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ* গঠিত হয়। এই সংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে মুন্সি প্রেমচন্দ এবং সজ্জাদ জহীর।
এপ্রিল ১২-১৪	জাতীয় কংগ্রেসের উনপঞ্চাশতম অধিবেশন জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়।
এপ্রিল ৩০	গান্ধিজির তাঁর বাসস্থান সবরমতী থেকে ওয়ার্ধা সেবাশ্রমে (আশ্রম) নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। রবীন্দ্রনাথ *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় সারা ভারত চটকল শ্রমিক আন্দোলন এর সমর্থনে লেখেন — "সমাজের বোঝা যাঁরা বহন করছেন, সেই শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা ও দেখাশুনার দায়িত্ব সমাজকেই নিতে হবে। এটাই তো মানবতার দাবী।"
মে ১০	কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তির দাবিতে 'সুভাষ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
মে ১২	এইদিন 'সুভাষ দিবস' উপলক্ষে *আনন্দবাজার পত্রিকা*য় রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি প্রকাশ।
জুন ১৮	ম্যাকসিম গোর্কির মৃত্যু।
জুন ১৯	বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি (আলেকসি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ) প্রয়াত হন। জন্ম ১৪-৩-১৮৬৮।
জুলাই	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে *নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ* স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল নানাভাবে ব্রিটিশ সরকারের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা এবং জনস্বার্থ বিরোধী কাজের বিরোধিতা ও সমালোচনা করা। সঙ্ঘের সম্মানিত সভাপতি ও

কার্যকরী সভানেত্রী ছিলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরোজিনী নাইডু। জওহরলাল নেহেরুর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ভারতীয় ন্যাশানাল কাউন্সিল অব সিভিল লিবার্টিজ* ইউনিয়নের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

জুলাই ১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতায় আগমন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে টাউন হলের সভায় ভাষণ দেন।

জুলাই ১৬ জুলাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন জেলার কৃষক নেতারা মিলিত হয়ে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার* সংগঠনী কমিটি তৈরি করে। আহ্বায়ক হন বঙ্কিম মুখার্জী।

জুলাই ১৮ স্পেনে গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়।

জুলাই ১৮ স্পেনের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দোলোরেস ইবারু 'No Passaran' শ্লোগান দিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলো। সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণি এসে দাঁড়ালেন স্পেনের গণতান্ত্রিক মানুষের পাশে।

আগস্ট ১২-১৩ সুভাষ চন্দ্র বসুর উদ্যোগে ভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মিলিত জাতীয় সম্মেলন হয় লক্ষ্ণৌতে গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে। সম্মেলনের উদ্বোধক ও সভাপতি ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু ও মহম্মদ আলি জিন্না।

আগস্ট ১৫ ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। (AISF)

অক্টোবর বি. আর. আম্বেদকর *ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি* গঠন করেন।

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। সূর্য সেন ও তাঁর তিন সঙ্গীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল।

অক্টোবর ১২ অ্যালবার্ট হলে নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

অক্টোবর ১৯ স্প্যানিশ কবি ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা ফ্যাসিস্ট বাহিনী কর্তৃক খুন হলেন।

সেপ্টেম্বর ৩ রোমাঁ রোঁল্যার নেতৃত্বে ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর ১১ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুদিবস পালনের মধ্য দিয়ে *বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের* জন্ম হয়।

নভেম্বর ২২ *ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের* সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *অমৃতবাজার পত্রিকা*য় এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে নবজীবন ঘোষ ও সন্তোষচন্দ্র গাঙ্গুলীর তথাকথিত আত্মহত্যার উল্লেখ করে তিনি আবেদন জানান এই দুটি আত্মহত্যার সমগ্র প্রশ্নটি এবং নির্বিচারে আটকের নীতি সম্পর্কে একটি প্রকাশ্য, বেসরকারী ও নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।

ডিসেম্বর ২৭-২৮ ফৈজপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চাশতম অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেন।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ: কাব্য — অপরাজিতা দে : *পুরবাসিনী* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *প্রিয়া ও পৃথিবী* / জীবনানন্দ দাশ : *ধূসর পাণ্ডুলিপি* / ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : *ছায়াপথ* / মোহিতলাল মজুমদার : *স্মরগরল* / যতীন্দ্রমোহন বাগচী : *মহাভারতী* / রবীন্দ্রনাথ : *শ্যামলী, পত্রপুট, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, জাপানে-পারস্যে, সাহিত্যের পথে, প্রাক্তনী* / সজনীকান্ত দাস : *আলো আঁধারি* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *সাগর ও অন্যান্য কবিতা*। **নাটক** — শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *আবুল হাসান* / প্রমথনাথ বিশী : *মৃতং পিবেৎ*। **উপন্যাস** — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জীবনের জটিলতা* / বনফুল : *বৈতরণী তীরে* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *আগামীকাল*। **গল্পগ্রন্থ** —তারাশঙ্কর : *ছলনাময়ী*।

পত্রিকা প্রকাশ — *নূতন পত্রিকা* : নীরদ চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস / *নূতন বৈতালিক* : কেশব সেন / *বলাকা* : কালীপ্রসন্ন দাস / *কিশলয়* : হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ / *গৈরিকা* : প্রভাতকুমার দেওয়ান / *প্রভাতী* : সুনীলকুমার গুপ্ত / *বাংলার শক্তি* : মনোজ বসু / *শুকতারা* : সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় / *তপোবন* : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় / *যুবশক্তি* : মহঃ হায়দার আলী / *রং মশাল* : প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, তারাপদ রায়, শিশির কুমার দাশ, সামসুল হক, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়।

মৃত্যু : লুৎফর রহমান, পঞ্চানন সরকার।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে কলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে থাকছেন মানিক। তবে দাদা বৌদির সঙ্গে সমঝোতা ও বনিবনা তেমন একটা ছিল না। শারীরিক ও মানসিক বাড়তি শ্রম, নিজের প্রতি অযত্ন ও অবহেলায় এক সময় শরীর বিদ্রোহ করে বসে। বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে একদিন দুপুরবেলা মানিক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে জানা যায় তা মৃগী রোগ। অল্প বয়সে মানিক মাতৃহীন হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে মাতৃহীন মানিক উপযুক্ত স্নেহ মমতা কোনদিনই পাননি, যা তার দুরন্ত চঞ্চল স্বভাবকে আরো বেশি খাপছাড়া ও বেপরোয়া করে তুলেছিল। এরকম পরিবারে সাধারণত সবাই চায় পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট এবং ভালো চাকরি। কিন্তু মানিক সেই পথে না হাঁটায় দাদা বৌদিরা তাঁকে উপেক্ষা করে চলতেন। এই সময় মানিক প্রবল আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছেন, সেই সঙ্গে দাদা-বৌদির নিষ্ঠুর ব্যবহার মানিককে পীড়া দিত। মানিকের কোনো কোনো আত্মীয় স্বজন মনে করেন মানিকের মৃগী রোগের কারণ তাঁর দাদা-বৌদির সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্য এবং বাদানুবাদ।[১] ২৮শে মে

পদ্মানদীর মাঝি প্রকাশিত হয়। এই বছরই প্রকাশিত হয় আরো দুটি উপন্যাস *পুতুল নাচের ইতিকথা* এবং *জীবনের জটিলতা*। এই সময়ে কোন রমনীর সঙ্গে হয়তো সাময়িকভাবে মানিকের সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। ২৭শে মাঘের চিঠিতে মানিক লিখছেন: "হঠাৎ ভাগলপুরে চলে যাবেন শুনে বড় দুঃখিত হয়েছিলাম। পরদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম বেলা ১০টায় আপনারা চলে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল গাড়ি রাত্রে। আগে যাইনি বলে আপসোস হচ্ছে। না যাওয়ার একটা প্রায় অবিশ্বাস্য কৈফিয়ত দিই, যাওয়ার আগ্রহ একটু বেশি প্রবল ছিল, তাই চুপচাপ ছিলাম।"[২]

এবছরে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প — 'ওমিলনাইন' (*উত্তরা*, শ্রাবণ ১৩৪৩)। 'সাহিত্যিকের বৌ' (*ভারতবর্ষ*, শ্রাবণ ১৩৪৩)। 'মাথার রহস্য' (*বঙ্গশ্রী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩), 'দিক পরিবর্তন' (*অগ্রগতি*, পৌষ, ১৩৪৩)।

উপন্যাস-১ : পুতুলনাচের ইতিকথা

পুতুলনাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস, এবং চতুর্থ মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশক বি. এম. লাইব্রেরি, প্রকাশকাল ১৯৩৬, সাইজ ডবল ক্রাউন, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২ + ৩৪৩। মূল্য - ২.৫০ টাকা।[৩]

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৪২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১২ টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম পাঠের সঙ্গে পরবর্তী গ্রন্থ পাঠের মধ্যে বহু সংস্কার ও সংশোধন লক্ষ্য করা যায়। UNESCO -এর উদ্যোগে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ *The Puppets Tale* নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ তে। প্রকাশক সাহিত্য একাডেমি। অনুবাদক - শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ও সম্পাদক আতুর আইসেনবার্গ। এছাড়াও উপন্যাসটি চেক, হাঙ্গেরীয় এবং সুইডিশ ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। চেক সংস্করণটির নাম - *Tanec Loutek*, ১৯৬৪। হাঙ্গেরীয় অনুবাদ — *Babuk Tanca*, ১৯৭৯। মানিকের অন্যান্য রচনার তুলনায় *পুতুলনাচের ইতিকথা* সর্বাধিক ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। গুজরাট (মাটির মহেল, অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী, ১৯৫৩)। হিন্দি - (কটপুতলিয়োঁকা ইতিহাস, অনুবাদক — প্রবোধ কুমার মজুমদার, ১৯৫৮)। তেলেগু (জীবন ললিতা, অনুবাদক — এম. সুরি, ১৯৬০)। মালায়ালম (পাবাকলিয়ুতে কথা, অনুবাদক — নীলিনা আব্রাহাম, ১৯৭২)। তামিল - (পোম্মালট্টিম, অনুবাদক টি, এন. কুমারস্বামী, ১৯৭৬)। মারাঠি- (সিখদ্যঞ্চ্যা খেলাচি গোষ্টা, অনুবাদক — অশোক সাহানি, ১৯৭৯)। ওড়িয়া — (কান্ধেই নাচের ইতিকথা, অনুবাদক বিজয়লক্ষ্মী মোহান্তি, ১৯৯০)। পাঞ্জাবি (পুতলিআঁআ দি কথানি, অনুবাদক — চন্দন নেগি, ১৯৯০)। অসমিয়া (পুতুল নাচের ইতিকথা, অনুবাদক — রাজেন সইকিয়া, ১৯৯৮)[৪] লেখকের জীবন কালেই উপন্যাসটি অবলম্বনে একটি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। কে. কে. প্রোডাক্‌শনস্ প্রযোজিত ও ছায়াবাণী লি. পরিবেশিত এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯, ২৮ শে জুলাই

কলকাতায় শ্রী, প্রাচী এবং আলেয়া প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রটি মুক্তিলাভ করে। উপন্যাসটির নাট্যরূপ একাধিক যাত্রা ও বেতারকেন্দ্রে পরিবেশিত হয়েছে।[৫]

*পুতুলনাচের ইতিকথা*র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদে প্রকাশকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন স্বরূপ নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল —

> পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোনো অদৃশ্য হাতের সুতোর টানাপোড়েনে মানুষ নাচে, কাঁদে, কথা বলে। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে তার জীবনের স্রোত বয়ে চলে না, মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি।
>
> যে সীমাহীন নীড়-প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিল শশী, সে স্বপ্ন তার চুরমার হয়ে গেল কেন ? তার প্রিয়জনের পদচিহ্ন লাঞ্ছিত কায়েত পাড়ার সেই নির্জন রাস্তা শশীর জীবনে শুধু রাজপথ হয়েই রইল, কিন্তু সে পথে প্রিয়জনের আনাগোনার প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে...
>
> *পুতুল নাচের ইতিকথা* এই বিপর্যস্ত জীবন্ত পুতুলদের হাসিকান্নার মর্মান্তিক অভিনয় আর তাদের প্রেরণাহীন যান্ত্রিক জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস।[৬]

পুতুলনাচের ইতিকথা বাংলা সাহিত্যের একটি বহু আলোচিত উপন্যাস। উপন্যাসটি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী আলোচনা হয়েছে অনেক। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ পরিবর্তনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,— "ঔপনিবেশিক জীবনে কলকাতা এবং গাওদিয়ার মাঝে যে দূরাতিক্রম্য ব্যবধান, শশী-কুসুমের সম্পর্ক তারই প্রতীক ... শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহিত উচ্চাকাঙ্খার প্রতীক।"[৭] নবনীতা দেবসেন শশী ডাক্তারের সঙ্গে আলব্যেয়ার কামুর *দি প্লেগ* উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার রিউর তুলনা দেখিয়ে বলেছেন, — "রিউ ও শশী এই দুজনেরই মূল সমস্যা হল মৃত্যু শাসিত জীবনের অসম্পূর্ণতা মোচনে ব্যক্তি মানুষের প্রয়াসের অর্থহীনতা। ... অবশ্যম্ভাবী দৈবের প্রবল অযৌক্তিকতার কাছে মানুষের যুক্তি নির্ভরতা ও ইচ্ছেশক্তির অসহায়ত্ব।"[৮] গোপীকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন —

> *পুতুলনাচের ইতিকথা*য় আধুনিক জটিল জীবনবোধের যে প্রতিফলন ঘটেছে বলা বাহুল্য তার অনেকটাই উপন্যাসের নায়ক শশী চরিত্রের দর্পণে... শশীর দৃষ্টির দর্পণে যে জীবনের রহস্য তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে, সেই জীবনকে সে দেখেছে নিজের পরিবারের বাইরে পথে ঘাটে, প্রতিবেশীদের সংসারে তাদের ব্যাধিতে মৃত্যুতে, আত্মবঞ্চনায়, স্বভাবের বিকারে, অস্ফুট অথচ উদ্যাম প্রণয় বাসনায়।... শশীর মনে জীবনের এই রহস্য রূপের ধারণায় এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র সংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। জীবন মৃত্যুর এই গূঢ় জটিল রহস্য-প্রশ্নের সঙ্গে অনিবার্যরূপে জড়িত হয়ে যায় মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার অর্থশূণ্য পরিণাম।[৯]

উপন্যাসের মূল পাত্র শশী। লেখক শশীর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে গাওদিয়ার নানা পরিবার ও নানা মানুষের জীবনকাহিনি নির্মাণ করেছেন। শশীর জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখেই উপন্যাসটিকে আমরা দেখি। উপন্যাসে প্রধান যে ঘটনাবর্তগুলি রয়েছে — ১. যামিনী কবিরাজ-সেন দিদি-গোপালদাসকে নিয়ে। ২. যাদব-পাগলাদিদিকে নিয়ে। ৩. শশী-কুসুমকে নিয়ে। ৪. বিন্দু-নন্দলালকে নিয়ে। ৫. মতি-কুমুদকে নিয়ে। ৬. হারু ঘোষের বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা। ৭. হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্বের সঙ্গে শশীর জড়িয়ে পড়া। এই ঘটনাবর্তগুলির মধ্য দিয়ে শশী আন্দোলিত আলোড়িত হতে হতে চলেছে। কোন ঘটনা তাকে বিপর্যস্ত করেছে, কোনটি তার হৃদয়কে বিস্মিত করেছে। উপন্যাসে ছোটো বড়ো চরিত্র এসেছে অনেক। কেউ মঞ্চের সামনে পাদপ্রদীপের আলোয়, কেউ আবার পিছনে। তারা কেন নাচে, কে তাদের নাচায় — এই রহস্যই পাঠককে ভাবায়।

নান্দনিক বোধ অথবা রাজনৈতিক চেতনাকে মানিক কখনো মানবিক মূল্যবোধ ও স্বকল্পিত শ্রেয়বোধ দ্বারা প্রভাবিত হতে দেননি। বস্তুনিষ্ঠ মানিক বাস্তবকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপন্যাসের কাহিনিতে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তি, শ্রেণি, রাষ্ট্র, বস্তু, পুঁজি, সময়, ইতিহাস, প্রতিবেশ, সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব, প্রেম, কাম, হিংসা, লোভ, ক্ষমতা এবং অনুভূতি, অনুভব, দর্শনে শুরু থেকেই মানুষের মনে কোনো সংশয় ছিল না। সচেতন, বিজ্ঞান মনস্ক মানিক নিম্নবর্গের মানুষ, মধ্যবিত্তের জীবন মনজগৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছা মোহ কামবোধ সহ ইতি-নেতির প্রকাশ করতে পারেন নিরাসক্তভাবে। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে বাস্তববাদী চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে কিছু কিছু অধ্যাত্মবাদী সংশয় চেতনা এসেছে। কুসুমের বাবা অনন্তর সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। শশী ডাক্তারকে অনন্ত বলে —

> সবচেয়ে ভালো ঘর বর দেখে ওর বিয়ে দিলাম, ওর অদেষ্টেই হল কষ্ট। সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বৈ তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন। শশী একটু হাসিয়া বলিল, তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম। অনন্ত বলিল, তেমন করে চাইলে পাবেন বৈকি, ভক্তের তো দাস তিনি।[১০]

নিরুদ্দম, নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ, ভীরু, সংশয়ী, ব্যর্থ এবং নানা স্ববিরোধীতায় ভরা প্রকৃত মধ্যবিত্ত শশীর মনোজগৎকে লেখক ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। বাংলা উপন্যাসে এরকম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সার্বিক উপস্থিতি ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি একদিকে তার কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের দিক ও অন্যদিকে আবার সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তার যথেষ্ট।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের ব্যপ্তিকাল প্রায় ১০ বছর। এই বিস্তৃত সময়ে শশীর বিশেষ কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কুসুমের সঙ্গে মতির প্রেম হয়ে গেলে অথবা ৯ বছর শেষে কুসুমের শব্দবানে সে যেন কিছু বুঝতে পারে, কিন্তু এর বেশি কিছু তার করার থাকে না। কোনো কিছুরই উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। যে কুসুমকে একদিন ডাক দিলে ছুটে আসত সে শশীর খাপছাড়া আকুলতায় বাঁকা হাসে। কুসুম বলে, "স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। ... আজ হাত ধরে

টানলেও আমি যাব না।"[১১] নিস্পৃহতা অথবা সামাজিকতার বাহানা, সাহসের অভাব, সংশয় সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শশীকে কূপবাসীই করে রাখে। কুসুম তার শরীর ও মনের ইচ্ছা লুকায় না, নিজের শরীরের উত্তাপে শশীর হাত টেনে বসায়, কিন্তু কুসুমের সেই শরীরী উত্তাপ শশীর শরীরে ও মনে ছড়ায় না, উল্টে কুসুমকেই সে নিন্দা করে — তোমার শুধু শরীরই আছে, মন বলে কিছু নেই! মন কুসুমের আছে, কিন্তু শশী তার নাগাল পায় না। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাবার কথা অনেক বারই সে বলে, বিদ্যুতের আলোর মতো উজ্জ্বল জীবন সে কল্পনা করে কিন্তু সব শেষে নেতিবাচক দর্শনেই তার স্থিতি হয়, "গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই।"[১২] এ শুধু শশীর মনের কারাগার নয়, শশীর মতো গোটা মধ্যবিত্ত সমাজ ও মানুষজন একই রকম অসুখে আক্রান্ত। মধ্যবিত্তের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান মানিক শশী-পুতুলের রশি কখনো আলগা করেন না, অবকাশ তৈরি হলেও নির্ধারিত মঞ্চের সীমানা অতিক্রম করতে দেন না।

মধ্যবিত্তের ব্যক্তি প্রতিনিধি শশীকে ভর করে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপজাত এই শ্রেণিটি আত্মবিরোধে জর্জরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে যে অনিবার্য অবক্ষয়ের পথেই যাবে — এই নিয়তির ইতিকথা নির্মাণের সচেতন শিল্পী মানিক ক্রমাগত ব্যক্তিকে খুঁড়তে খুঁড়তে তার ঐতিহাসিক পরিণতি নিঃসন্দেহ করে তোলেন। বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, সংকল্প, প্রেরণা উত্তেজনা, কামচেতনার আব্রু খুলে খুলে উপন্যাসের ভিতর ব্যক্তিকে পরিচিত করে তোলেন। উপন্যাসের চরিত্ররা তাই লেখকের কল্পিত জগতের আদর্শের ব্যক্তি নয়। ইতিহাস ও বাস্তবের প্রকৃত মানুষ। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শহর ও গ্রামের মানুষের শুধু বহির্জীবনের চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরতে মানিক আগ্রহী নন। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অন্তর্গত জীবন, ব্যাখ্যাতীত অনুভব অনুভূতি সহ সামগ্রিক বাস্তবতাকে ছেঁকে তোলেন। এই উপন্যাসে তিনি গাওদিয়া গ্রাম নিয়ে বা শশী কুসুমের সম্পর্ক নিয়ে কোনো ভাবালুতা বা রোমান্টিক বিহ্বলতার বানানো আবীলতা করেন নি। বাস্তবতার সমগ্রতা নিয়ে অনুভব অনুভূতিসহ মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত শুধু গাওদিয়া গ্রামের নয়, গ্রামোত্তর।

রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার-সঙ্ঘের ভিতর ক্ষয়, আত্মবিরোধ, প্রবঞ্চনার শিকার ও ক্রীড়নক মধ্যবিত্তের ভিতর জন্ম নেয় কঠিন নির্মম চেহারা। অভাবিত এই সময়ের কথা সংবেদনশীল, বস্তুনিষ্ঠ মানিক তুলে ধরেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপন্যাসে। যে সময় মানিক এই উপন্যাসটি লিখছেন সে সময়টি অস্থির ও উত্তেজনায় ভরা। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতির পট পরিবর্তিত হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতি সমাজকে কিছুটা অগ্রসর করলেও ব্যক্তির অভ্যন্তরে নিঃসঙ্গতার ছবিটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। দেশীয় অর্থনীতিতে মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক জীবনে হতাশা — এই পরিস্থিতির মধ্যে মানিক তাঁর পরিচিত একটি গ্রামীণ জীবন অবলম্বনে এই অপূর্ব উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসের গাওদিয়া গ্রামটি সমকালীন যে কোনো গ্রামের প্রতিনিধি। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আছে শশীর সঙ্গে অবক্ষয়ীত গ্রামজীবনের দ্বন্দ্ব। শশীর মধ্যে একটি স্বপ্ন ছিল, সে তার গ্রামের পরিবর্তন ও মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবে। কিন্তু তা সে পারেনি, তখন তার মধ্যে দেখা গেছে তীব্র সংকটবোধ। উপন্যাসে

পুতুলের প্রসঙ্গ এবং পুতুল নাচের প্রসঙ্গ থাকলেও মানিক কখনোই বলেননি মানুষ ঈশ্বরের হাতের পুতুল। বরং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিস্তরঙ্গ, গণ্ডিবদ্ধ জীবনে পুতুলের মতো বসবাস না করে সেই প্রথাকে ভেঙে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। তাই মতি, কুমুদ ও কুসুম গন্ডিবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বিশ শতকের তিনের দশকে রচিত এই উপন্যাস আসলে এই শতাব্দীরই মানসিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রে কেমন দুর্গতি হয় তার স্বাক্ষর রয়েছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাস-২ : পদ্মানদীর মাঝি

পদ্মানদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ গ্রন্থ এবং তৃতীয় উপন্যাস। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্, কলকাতা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪+২০৮, দাম দেড় টাকা। গ্রন্থে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত *পূর্বাশা* মাসিক পত্রে ১৯৩৪ এ ধারাবাহিকভাবে কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু *পূর্বাশা* পত্রিকার প্রকাশ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটি আর প্রকাশ পায়নি। ২ বছর পরে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *পূর্বাশা* পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পাঠের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসটি দেশি বিদেশি একাধিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে। প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *বোটম্যান অব দ্য পদ্মা* নামে (১৯৪৮)। ইউনিভার্সিটি কুইন্সল্যাণ্ড প্রেস থেকে ইউনেস্কোর একটি প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে ১৯৩৭ এ *পদ্মা রিভার বোটম্যান* নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও চেক, সুইডিশ, শ্লোভাক, ডাচ, জার্মান, লিথুয়ানিয়, নরওয়েজিও, বুলগেরীয় ও রুশ ভাষাতেও গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে।[১৩]

মানিকের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি*। লেখকের গ্রন্থগুলির মধ্যে এটির সর্বাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, নাটক, গীতিনাট্য, চলচ্চিত্রে ব্যাপকভাবে রূপায়িত ও সম্প্রচারিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি, মালয়ালম, তামিল, কন্নড়ি, ওড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি ভাষাতে উপন্যাসটি অনুদিত এবং জনপ্রিয় হয়েছে। লেখকের জীবৎকালেই (১৯৫২) উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ণের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। নিজস্ব ডায়েরিতে মানিক একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ সংক্রান্ত চুক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তবে লেখকের জীবিতাবস্থায় চলচ্চিত্রায়ণ সম্ভব হয়নি। এই উপন্যাসটির চিত্রায়ণ নিয়ে লেখকের মনে অনেক প্রত্যাশা ছিল। একটি পত্রে তিনি লিখছেন —

> কয়েক বছর আগে থেকেই আমি অনুভব করছিলাম যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ছায়াচিত্র জগতে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসন্ন। ক্রমে ক্রমে এটা অরো স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হয়েছে। এই পরিবর্তন ঘটবার সূচনা পরিস্কার দেখতে পাই। কারো সাধ্য নেই এই পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখে। কারণ সাধারণ মানুযের চেতনার পরিবর্তনই এটা ঘটাচ্ছে।

> সিনেমার সাধারণ দর্শক সচেতনভাবে বিচার না করুক, না বুঝুক, সময়ের সঙ্গে তাদের রুচি বদলে যাচ্ছে। তারা ছায়াচিত্রে বাস্তব জীবনের, জীবন্ত মানুষের কাহিনি চায়। রোমান্টিক রোমাঞ্চকর বা ধর্মঘটিত কাহিনি — আড়ম্বরপূর্ণ রঙিন ছবি, এসবের দিকে টান এখনো আছে, কারণ পছন্দ ঝট্ করে একদিনে বদলে যায় না। কিন্তু পরিবর্তন যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।
>
> অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এসসি. পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি — বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করেছিলাম যে সাহিত্য জগতে একটা বড়ো রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্যে যে মোড় ঘুরছে কল্লোলীয় সাহিত্য তার লক্ষণ মাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে — সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে...
>
> পদ্মানদীর মাঝির চিত্র রূপের সাফল্য সম্পর্কে আমার বিশ্বাসের এটাই ভিত্তি। কাহিনিটা বাস্তব মানুষের বাস্তব জীবন নিয়ে। একেবারে নিখুঁত করে যদি নাও তোলা যায় ছবি — চরিত্রগুলি যদি মোটামুটি রূপ পায় আর কাহিনিটা দর্শকেরা বুঝে অনুসরণ করে যেতে পারে, ছবিটি লোকে খুশি হয়ে নেবে.... আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা চিত্রজগতে আলোড়ন তুলবে, নূতন মূল্যবোধের চেতনা আনবে, নূতন পথ দেখাবে।[১৪]

পদ্মানদীর মাঝি প্রমত্ত, খেয়ালী পদ্মার একটি বিশেষ জনাঞ্চল কেতুপুরকে কেন্দ্র করে রচিত এবং এখানকার অধিবাসীরা জীবিকা সূত্রে ধীবর শ্রেণির। নদী মানে অখণ্ড প্রবহমানতা, বিরতিহীন সময়ের হাত ধরে চলা, নদী মানে সভ্যতা, নদী মানে জলজীবন, নদী মানে জনজাতি যার জীবনধারা নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নদী মানে নদীর রূপোলি ফসল — মাছ এবং মাছ ধরাকে ঘিরে সচল জীবন বৃত্ত। নদী মানে জেগে ওঠা নতুন চর - চরের অবলুপ্তি। নদী মানে বানভাসী মানুষের হাহাকার — নতুন করে ঘর বাঁধার আকুতি, নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে যায় জীবন প্রবাহ। নদীর কলধারায় ভেসে চলে মানুষের দুঃখ-সুখের আলাপচারিতা, নদী মানে নদী নির্ভর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রবহমানতা। নির্দিষ্ট সময় বৃত্তে নদীকেন্দ্রিক গোষ্ঠীজীবনের অতীত থেকে বর্তমানের যাপিত জীবন ও লালিত সংস্কৃতির বয়ে চলা।

নদীকেন্দ্রিক গোষ্ঠী জীবনের অতীত থেকে বর্তমানের যাপিত জীবন ও লালিত সংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে যায় নদী। সেজন্য বিশ্বসাহিত্যে নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবনকে নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক গল্প, উপন্যাস, নাটক, লোককাহিনি, কবিতা। বাংলা সাহিত্যেও নদী প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্নভাবে। সেখানে নদীর ভূমিকা থেকেছে আলংকারিক বা সাময়িকভাবে। নদীকেন্দ্রিক সামগ্রিক জীবনবৃত্তান্ত বা মূলচরিত্রের সঙ্গে নদীর একাত্ম হয়ে ওঠার কাহিনি ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। নদী জীবনের সার্থক প্রতিফলন প্রথম সূচিত হয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে। এই প্রথম দেখা গেল উপন্যাসের নরনারীর জীবন কথা, আচার-আচরণ, সংস্কার, অর্থনীতি প্রভৃতির সঙ্গে নদীপ্রবাহের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকা।

ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষি, মজুর, মাঝি-মাল্লাদের ঋজু প্রান্তিক জীবনের রূপায়ণ হল *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে। পদ্মা বিধৌত পূর্ববাংলার একটি অখ্যাত এলাকা কেতুপুর অঞ্চলের ধীবর জীবনের যাপনচিত্র, সংস্কৃতি-সংস্কার, আবেগ-অনুভূতি, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ধারা বিবরণী শিল্পীত দক্ষতায় পরিস্ফুট হয়েছে *পদ্মানদীর মাঝি* তে। ইতিপূর্বে এ ধরনের প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়নি। এই উপন্যাসের পটভূমিতে লেখক যে জীবনধারা বর্ণনা করেছেন তা একাধারে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিমগ্নিম। উপন্যাসটির সূচনাতেই লেখক অতি বাস্তব অথচ কাব্যিক বিবরণে গোষ্ঠী জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন—

> পদ্মায় ইলিশমাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলো গুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময়, অন্ধকারে দুর্বোদ্ধ সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়।[১৫]

নদীবক্ষের অন্ধকারে এই দুর্বোধ্য সংকেত জেলে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের প্রতীক। নৌকার ম্লান আলো সে অন্ধকার দূর করতে অপরাগ। কুবের মাঝি মাছ ধরছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকাতে আছে আরো দুজন — ধনঞ্জয় ও গণেশ। আরো দু মাইল উজানে কেতুপুর গ্রাম। কেতুপুর গ্রামের পূর্বদিকে গ্রামের বাইরে জেলে পাড়া, এই ধীবর পল্লীকে ঘিরেই উপন্যাসের বিস্তার।

শুরুতেই জেলেদের অসহায়ত্ব ও বিপর্যস্ত জীবনধারার এক বিশ্বস্ত ছবি ফুটে উঠেছে। নৌকোটি ধনঞ্জয়ের, জালও তার। কাজেই জ্বরে আক্রান্ত কুবেরকে তার নির্দেশ মতোই কাজ করতে হয়। কে এই কুবের? গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটোলোক। সেজন্য সে ধনঞ্জয়ের কাছে প্রতারিত হয়, বাবুদের কর্মচারী মাছ নিয়ে দাম দিতে চায় না, চালানবাবু কেদারনাথ প্রতি একশ মাছে ৫টি মাছ চাঁদা হিসেবে নেয় জেলেদের কাছে। জালহীন, নৌকাহীন শ্রমজীবী কুবের একাই যে বঞ্চনার স্বীকার তা নয়। জেলেপাড়ার রাশু, আমিনুদ্দি, গণেশ ও অন্যান্যরা প্রত্যেকেই বঞ্চনার স্বীকার। সে কথা লেখক পাঠককে জানিয়ে দেন —

> চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলে পাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। ... স্থানের অভাব এ জগতে নেই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের এটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলে পাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।[১৬]

এই অবস্থার মধ্যেই অসহায় বঞ্চিত মানুষগুলির জীবনচক্র প্রবাহিত হতে থাকে —

> দিন কাটিয়া যায় জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙনধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর নিরুৎসব বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[১৭]

এই সর্বব্যাপী হতাশা আর নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্যে এরা একে অপরকে আঁকড়ে ধরে। পরিবার পরিজন হারিয়ে সর্বশান্ত হয়। রাসুর ময়নাদ্বীপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে সভা হয়েছিল, তাতে সমগ্র জেলে পাড়ার যোগদান এবং রাসুর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন সামগ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। রথের মেলা, দোল, বাবুদের বাড়ির পূজা প্রভৃতি উৎসবে যোগদান সমাজবদ্ধ জীবনের প্রবহমানতাকে তুলে ধরেছে। নদীবক্ষে বিপদে পড়লে মাঝিরা সাংকেতিক ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করে। লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের মধ্য দিয়েও জেলেপাড়ার অধিবাসীদের সমাজচেতনার রূপটি ধরা পড়ে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন সেটিই উপন্যাসের চালিকাসূত্র হয়ে উঠেছে। প্রান্তজীবনের বুক ছাড়া দীর্ঘশ্বাসের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় বারে বারে বিভিন্ন পটভূমিতে।

এখানে গোষ্ঠীজীবনের সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে ব্যক্তিগত যাপনচিত্র। মুখ্য চরিত্রাভিনেতা কুবের, হোসেন মিঞা, কপিলা এবং কুবেরের স্ত্রী মালা। উপন্যাসের ঘটনাংশকে তিনটি সুস্পষ্ট অংশে পর্যবেক্ষণ করা যায়।— ১. এক থেকে তিন সংখ্যক পরিচ্ছেদব্যাপী কেতুপুরের পদ্মানির্ভর মানুষের জীবনযাত্রা — জীবনধারণ, জীবন ধারনা, ধর্মবিশ্বাস-সংস্কার, নৈতিকতা-নীতিহীনতা, ঈর্ষা-অসূয়া-বিদ্বেষ, গ্লানি ও যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায়। ২. চতুর্থ পরিচ্ছেদে কপিলার আগমন সূত্রে কাহিনি হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি নিমগ্ন হয়েছে কুবের-কপিলার আখ্যানে। কখনো কখনো কুবের কপিলার যৌনতাত্ত্বিক সংকট ঔপন্যাসিকের প্রধান প্রতিপাদ্য বলে মনে হতে পারে। ৩. হোসেন মিঞা ও তার ময়নাদ্বীপ উপনিবেশ উপন্যাসের তৃতীয় প্রতিপাদ্য। এই বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের চেয়ে অসামঞ্জস্যই বেশি এবং তাই উপন্যাসের গঠন কলায় অসংগতি অনেকে লক্ষ্য করেছেন। এই সীমাবদ্ধতাটুকু সত্ত্বেও *পদ্মানদীর মাঝি* হয়ে উঠেছে পদ্মা তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের প্রাত্যাহিক জীবনচর্যার প্রামাণ্য দলিল—

এই গ্রন্থের কোথাও আতিশয্য নেই। অতিরঞ্জন নেই — দুঃখকে তিনি যেমন অকারণে বাড়িয়ে দেখেননি, সুখকে তেমনি দেননি অপ্রাপ্য মহিমা — শিল্পের চেয়ে জীবনই তাঁর কাছে গভীরতর সত্য। *পদ্মানদীর মাঝি* সম্পর্কে এই মন্তব্য সর্বদাই প্রযোজ্য বলে মনে করি। সেজন্যেই এই গ্রন্থে শিল্পের কারুকাজের আড়ালে জীবনের এতে বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে উঠেছে।[১৮]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে, বিশেষত *দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুল নাচের ইতিকথা* য় নরনারীর সমস্যা ও সংকট উপস্থাপনায় মানিক স্পষ্টত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে আস্থাবান। কারণ এই তত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতিত চরিত্রগুলির জীবনযাপনের বিকার, অসংগতি, সংকট ও সংঘাতের কার্য-কারণ অস্পষ্ট থেকে যাবে। এই উপন্যাসে কুবের-কপিলার অবচেতন মনের স্বরূপ উন্মোচনেও ফ্রয়েডীয় ভাবনার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে মানিক কুবের-কপিলার লিবিডো প্রভাবিত জীবনচিত্রাঙ্কনে উৎসাহিত বোধ করলেও প্রায় পুরো উপন্যাসে তিনি পদ্মা তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের রহস্যময় ভূগোল পরিভ্রমণ করেছেন নৈষ্ঠিক পরিব্রাজকের মতো। তিনি একবারও পাঠককে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি পদ্মা তীরবর্তী জনজীবন থেকে। *পদ্মানদীর মাঝি* র জীবন সমস্যা পদ্মা এবং পদ্মাবিধৌত জনপদবাসীর যাপিত জীবনের যে চলচ্ছবি এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, তা সুদুর্লভ মহিমায় ভাস্বর। এক সংখ্যক পরিচ্ছেদে বর্ষার রাত্রিতে মাঝিদের মৎস্য শিকারের প্রতিটি আনুপুঙ্খিক বর্ণনা, পদ্মাবক্ষে রাত্রিতে বিরাজিত ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য, ইলিশমাছ শিকার ও সংগ্রহ, ইলিশ মাছের দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য, জালের আকার-প্রকার, জালবিছানোর জ্যামিতিক কৌশল প্রভৃতির বর্ণনায় লেখকের শিল্প, সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটেছে অত্যাশ্চর্য সমন্বয়।

কেতুপুরের ধীবর শ্রেণির মানুষেরা জীবিকার জন্য পদ্মার উপরে নির্ভরশীল হলেও তাদের প্রত্যেকের জীবিকার্জনের উপায় এক নয়। অর্থনৈতিক শ্রেণিবিচারেও তাদের মধ্যে রয়েছে রকমফের। ধনঞ্জয়ের নৌকা আছে, জাল আছে, তার তুলনায় কুবের ও গণেশ নিঃস্ব। তাই প্রতিরাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলে ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম। সে শুধু নৌকার হাল ধরে বসে থাকে এবং কুবের ও গণেশ হাতল ধরে জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। অনশন, অর্ধাহার তাদের নিত্যসঙ্গী। অনিশ্চয়তাজনিত দুশ্চিন্তাই তাদের জীবনের সার্বক্ষণিক দোসর। ইলিশের মরসুমে দুবেলা খাবার জুটলেও মরসুম শেষে পরিবার প্রতিপালন তাদের পক্ষে হয়ে উঠে দুঃসাধ্য। কারণ —

ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের

স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড়ো পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরীব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় যা মাছ পড়ে তার দু-তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না।[১৭]

সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক সূত্রানুসারে কেতুপুরেও দুই পৃথক শ্রেণি অস্তিত্বমান। শোষক ও শোষিত। যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তারা শোষণের হাত বাড়িয়ে দেয় দরিদ্র সরল মানুষদের প্রতি। জমিদারের কর্মচারী শীতল সুযোগ পেয়ে যেমন শোষণ করে কুবেরকে, তেমনি ধনঞ্জয়ের মতো মহাজনও সুযোগ হাত ছাড়া করে না। বঞ্চনাই হয়ে উঠে কুবেরদের বিধিলিপি।

পদ্মানদীর মাঝি যে সময়ে রচিত হয়, সে সময় মানিকের মনের মধ্যে এসেছিল প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত দেশের জনসাধারণের বিধ্বস্ত অবস্থা এবং অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লব চেতনা। দেশের রাজনীতিতে মার্কসবাদী মতাদর্শ ক্রমশ প্রসার লাভ করছে — কৃষকসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র যুব সংগঠন। মানুষ উপলব্ধি করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে গেলে প্রয়োজন মেহনতি মানুষের যৌথ গণ-আন্দোলন। এ ধারণা অবশ্য রাশিয়ার বিপ্লবের ফসল। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ করে আসার পর তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*তে সে দেশের জনগণের নবজাগরণ, নব উত্থানের আলোচনা করেছেন। দেশে বিদেশে কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার চলছে। এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যে মানিক *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি রচনা করেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে মানিকের মনে রেখাপাত করেছিল।

জেলে পাড়ার প্রতিটি ঘরেই অসহায়তার চিত্র। ঘরে চালা থাকলেও তাতে বৃষ্টির জল আটকায় না, ঘরে ঘরে অন্নাভাব, শিশুদের গায়ে পোশাক নেই, বাড়ির মেয়ে-বউরা শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে থাকে। কোনো কোনদিন রান্নার নুন, তেল অন্যের থেকে চেয়ে আনতে হয়। অথচ এদের শরীরে ক্ষমতা আছে, বুকে সাহস আছে, কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এই উপন্যাসে শ্রমনির্ভর, জাতিধর্মবিহীন এক সমাজ গঠনের ভাবনার পরিচয় পাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগ্রামী মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের অধিকার অর্জনের দাবি তখন সর্বত্র জোরালো হচ্ছে। এতকাল যারা বঞ্চিত, উৎপীড়িত, পদদলিত ছিল তারা সাহিত্যের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠছে। সেই কারণেই জেলে তথা ধীবর শ্রেণির মানুষদের অবলম্বনে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন মানিক। প্রকৃতি বিধ্বস্থ, সমাজ বঞ্চিত, দারিদ্র্য, পীড়িত জেলে মাঝিদের কাহিনির মধ্যে শ্রমজীবী কোন ঔপনিবেশিকতা বা জমিদারি শোষণের পরিচয় নেই। বরং এক শ্রমনির্ভর সমাজ গঠনকেই মানিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপন্যাস-৩ : জীবনের জটিলতা

এটি মানিকের পঞ্চম উপন্যাস এবং ষষ্ঠ মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৩৬, প্রকাশক ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২+১৩০, দাম - দু টাকা। উপন্যাসটির পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।[২০]

জীবন ব্যাপারটি প্রকৃত পক্ষে কী ? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা কঠিন। বরং তার চেয়ে জীবন কী নয় সেটি বলা হয়তো অনেক সহজ। এই বিশ্বের সঙ্গে এবং সমগ্র প্রকৃতি জগতের সঙ্গে কী ওতপ্রোতভাবেই না জড়িয়ে আছে মানুষের জীবন। প্রত্যেক মানুষের জীবন আবার অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে গাঁথা। মানুষের নিজের সঙ্গে ও নিজের জীবন নানা সূত্রে জড়িয়ে থাকে। এই কারণে আমরা যখন বিশ্বজগতের কথা বলি তখন যেমন ঘুরে ফিরে মানুষের জীবনের কথা আসে, তেমনি জীবনের কথা যখন বলি তখন বিশ্ব প্রকৃতির প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে এসে উপস্থিত হয়।

জীবনের জটিলতা উপন্যাসে মানিক সচেতনভাবেই জীবনের যৌক্তিক বিন্যাসটাকে দেখাতে চেয়েছেন। বর্তমান সময়ে যে জীবন আমরা যাপন করে চলেছি, সেই জীবনে যৌক্তিক বিন্যাসের আদৌ কোনও জায়গা আছে কি না — এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু মানিক দেখাতে চেয়েছেন — যাকে আমরা অযৌক্তিক হিসাবে ভাবি তার মধ্যেও কোন একটা যৌক্তিক পরম্পরা রয়েই যায়। জীবনের অর্থ কী কিম্বা এই জীবন নিয়ে আমি-মানুষ কী করব — এ জাতীয় প্রশ্ন অনেক সময় অর্থহীন হয়ে দেখা দেয়। মানিক মনে করেন মানুষের কর্মতৎপরতার মধ্যেই জীবন তার অর্থ প্রকাশ করে।

এই উপন্যাসে মানিক তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে চরিত্রগুলির অপার রহস্যের সন্ধান করতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে যে কাহিনি বৃত্তগুলি এসেছে — ১. বিমল-সান্তা-অধরকে নিয়ে একটি প্রণয় ত্রিভূজ। ২. প্রমীলা-নগেন-লাবণ্যকে নিয়ে আর একটি প্রণয় ত্রিভূজ। ৩. সজনী-কামিমার দাম্পত্য জীবন।

উপন্যাসে প্রথম দুটি কাহিনি বৃত্তই মূল প্রসঙ্গ। এই উপন্যাসে লেখক ব্যক্তিগত প্রেম আশ্রয়ী নানা ধরনের সমস্যার গগনে চিত্তকন্দরে আবর্তিত হয়েছেন। তাই বলে সামাজিক বাস্তবতার বাতাবরনটি অস্বীকার করেন নি। বিমলদের সংসারের অন্তঃপুরে ঢুকে একবার ওদের বাল্যে তারপর ওদের যৌবনে, মাঝেমধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত অভাবী পরিবারের সত্য চেহারা খুঁটিনাটি বিবরণে ধরে রেখেছেন। ধনবান নগেনকে তার শ্রেণি বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বেকারের জ্বালা কী ভয়ানক হয়, এক যুবকের আত্মহত্যায় তার নাটকীয় বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাদের জীবন সংগ্রাম, অর্থনৈতিক দুর্গতি, হতাশা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে জীবন যাপন করেও শেষ পর্যন্ত নিজের নিজের কর্মের মধ্যে দিয়ে যার যার জীবনের তাৎপর্য খুঁজে নিতে চায়।

প্রমীলা বিমলকে একটা গল্প লিখতে বললে তার উত্তরে বিমল বলে — “আমি ফরমাসী, ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক নই মিলি। তিনদিন সিগারেট না খেয়ে থেকেছি, নির্লজ্জের মতো টাকা ধার করেছি, কিন্তু বাজে লেখা একটা লিখিনি।” এই Seriousness বিমলের মানসিকতার প্রধানতম উপাদান এবং এর ফলেই সম্ভব হয়েছে তার প্রণয়িনীর স্মৃতিচিহ্নটুকু পুড়িয়ে ফেলা। লেখক দেখাতে চেয়েছেন মানুষের সত্ত্বার গভীরে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত জটিলতা। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন বিমল মূলত কবি এবং পরস্ত্রীর প্রতিপ্রবলভাবে প্রণয়াসক্ত। সেই পরস্ত্রীর মনও দ্বিধা বিজড়িত। স্বামীর প্রচণ্ড প্রেমে সে হাঁপিয়ে উঠে। সে ছাদে বা জানালায় খোঁজে প্রেমিকার উপস্থিতি — কিন্তু বিদ্রোহ করে জীবনকে একটা সরলরেখায় দাঁড় করাতে তার কোন আগ্রহ নেই। বিমলও জানে শান্তাকে কিছুক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখলেও সারাজীবনের মতো করে এই ঘটনাকে চিরস্থায়ী করতে গেলে সেটা নিছক নাটুকেপনা হবে। অধর তো শান্তাকে স্পষ্টই জানিয়েছে —

> দুধকলা দিয়ে সাপ পোষার কথা শুনে হাসি পেত। ভাবতাম, মানুষ অত বোকা হয় ? পণ্ডিতের এটা বানানো কথা, বুকের ভালোবাসা দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা পয়সার সুখ সুবিধা দিয়ে মানুষ যে সাপের চেয়ে ভয়ানক প্রাণীকে পোষে এ কথা কল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু সেটা আমারই কল্পনার লজ্জা। পৃথিবীতে বোকা আছে, আমার মতো বোকা পৃথিবীতে আছে শান্তা। আমিই তার প্রমাণ।[২১]

স্বামীর এই অনুযোগ অস্বীকার করার শক্তি শান্তার ছিল না। সে আত্মহত্যা করলেও স্বামীর সঙ্গে আমৃত্যু প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করার চেষ্টা করেছে। একই ধরনের জটিল চরিত্র প্রমিলা যে প্রেমের প্রদাহে প্রজ্জ্বলিত হয়েও ভোগবাদি নগেনের প্রতি তীব্র দুর্বলতা বোধ করে, তার যুক্তি সংস্কার বা আত্মসম্মান তাকে বাঁচাতে পারে না — সে জেনে শুনেও বিষ পান করতে চায়। মানবিক মূল্যবোধ যে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত — লেখকের এই সুদৃঢ় ধারণার অস্পষ্ট ছায়া সঞ্চার এই উপন্যাসের পাতায় লক্ষ্য করা যায়। মাত্র গতদিনের চাকরি পাওয়ার পুরস্কার হিসাবে যুবকের যবানিতে তিনি জানিয়েছেন —

> কাল বাড়িতে পাঁচসিকের হরিলুট হয়ে গেছে। কতকাল পরে বউ হাসিমুখে কথা বলেছিল। কাল দুবেলা ভাতের সঙ্গে কী পেয়েছি জানেন ? দুধ। আর বিকালে লুচি জলখাবার।[২২]

মানিকের সাহিত্য জীবন শহর বা শহরতলিতে কাটলেও নগরকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি তাঁর অনিহা *জননী* উপন্যাস থেকেই লক্ষ্য করা যায়। জীবনের জটিলতার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে শহরের পরিবেশে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির আবাসস্থান যে গলিতে, লেখক শ্লেষাত্মক দৃষ্টিতে সেই গলির বর্ণনা দিয়েছেন—

> গলির নাম জীবনময় লেন, দুপাশের বাড়ির চাপে বহুকাল জীবন ত্যাগ করিয়াছে— শবের মতো শীতল। বারচারেক দিক পরিবর্তন করিয়া এই গলি যে পুরাতন বাড়িটির বাহিরের জীর্ণ দরজায় শেষ হইয়াছে, সেই বাড়িতেই প্রমথ আজ সাত বৎসর সপরিবারে বাস করিতেছে।[২৩]

এই উপন্যাসে একদিকে আছে জটিল মনোবিশ্লেষণ আর আছে তিরিশ-চল্লিশের দশকের সামাজিক চিত্র। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে যেমন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল, তেমনি তীব্র সংকট তৈরী হয়েছিল মানব মনে। আর্থিক মন্দা, শিক্ষিত মানুষের বেকারত্বের জ্বালা, মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে ভাববাদীর জন্ম হলেও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি কঠোর বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। এর ফলে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে মানব মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই সংঘাতেরই কাহিনি নিয়ে *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসটি রচিত।

ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে সমকালীন যুবক যুবতীরা সর্বাধিক বিধ্বস্ত হয়েছিল। এই উপন্যাসেও দেখা যায় উপন্যাসের চরিত্রগুলি যুগপৎ বিপর্যস্ত ও বিকারগ্রস্থ। এদের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠ, আবার সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ঘটনায় এদের জীবনে তীব্র বিশ্বাসহীনতা ও মনোবিকার দেখা দিয়েছে। মানিক তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী কলমে যুগযন্ত্রণার চিত্রকে প্রকাশ করেছেন। তীব্র হতাশা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি থেকে যুক্তির পথ না খুঁজে পেয়ে রোমান্টিক ভাববিলাসকে অবলম্বন করে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় নি। বিজ্ঞান চেতনা ও গণচেতনায় সমৃদ্ধ মানিক কিন্তু রোমান্টিক ভাববিলাসকে *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে মুখ্য করেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাববিলাসে মুখ ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিন শেষ হয়ে আসছে। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে, এই আশাবাদি মানিক আস্থা রেখেছেন *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৪৬।

২. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ২৮৩।

৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৫১৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৯।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৯।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৯।

৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, পৃ. ২৭৪।

৮. নবনীতা দেবসেন, *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী: শশী ও রিউ*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৮।

৯. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ, ২০০৮, পৃ. ৬৫।

১০. 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,২০০৭, পৃ. ৪৭২।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৬।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৪।

১৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫।

১৪. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* দে'জ, ১৯৯০, পৃপৃ. ৩০৭-৩০৮।

১৫. 'পদ্মানদীর মাঝি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ১৮, ১৯।

১৮. আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৯৩।

১৯. 'পদ্মানদীর মাঝি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

২০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪৪।

২১. 'জীবনের জটিলতা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

১৯৩৭

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ২৯তম বছর। সারা বিশ্বের আকাশে আরো একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ছায়া ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে। জাপান চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলায় চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশ ও কানপুরে সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটে চল্লিশ হাজার শ্রমিক অংশ নেন। ভারতে নতুন শাসনবিধি চালু। সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীপরিষদ গঠন। বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন। বড়লাট আন্দামানে আটক বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি অগ্রাহ্য করে বিবৃতি দেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইন সভায় কংগ্রেস বিরোধী পক্ষে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবেদন নিবেদনমূলক রাজনীতিকে সমর্থন করতেন না। ইংরেজকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে তিনি বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে সমগ্র জাতির অপমান ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সেদিন তিনি করেছিলেন, তেমনটা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও দেখা যায়নি।

জানুয়ারি ১৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় ভাষণ দেন
জানুয়ারি ২৬	বঙ্কিম মুখার্জীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলির ২ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৭৪ দিন এই ধর্মঘট চলে।
ফেব্রুয়ারি ৬	দেউলি বন্দি শিবিরে থাকার সময় দীর্ঘ রোগভোগের পর বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।
মার্চ ১১	*League Against Facism and War* এর উদ্যোগে এলবার্ট হলে স্পেনের সাহায্যকল্পে স্পেন সপ্তাহ পালন শুরু হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সরোজিনী নাইডু, বক্তা ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন মুখোপাধ্যায়, সুরেন গোস্বামী, গুণদা মজুমদার ও আরো অনেকে।
মার্চ ১৭-১৮	দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে স্থির হয়, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভা চালাতে পারবে বলে মনে করছে, সেই সকল প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করবে।
মার্চ ১৮	প্রায় এক বৎসর বন্দি জীবন অতিবাহিত করার পর সুভাষচন্দ্রের মুক্তি।
	মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলিম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম দলগুলিকে লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান।
মার্চ ৩০	গান্ধিজি দাবি তোলেন মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে ইংরেজের সাথে ভদ্রলোকের চুক্তি হোক।
মার্চ ৩১	জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে অতঃপর মুসলমানদের কংগ্রেসে আনার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচারকার্য চালান হবে।
এপ্রিল ১	বার্মাদেশ (বর্তমান নাম মায়ানমার) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয়।

এপ্রিল ৪	কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় বোম্বাই থেকে *ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া* পত্রিকা প্রকাশ করেন।
মে ২	মহম্মদ আলি জিন্না গান্ধিজির কাছে আবেদন করেন হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটির সমাধানের জন্য।
মে	'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' সম্বন্ধে কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং কলকাতায় কংগ্রেস কমিটির সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' জাতীয়তা-বিরোধী, অগণতান্ত্রিক এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও ঐক্যের পরিপন্থী।
জুলাই ১০	কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু মন্ত্রীসভায় যোগদানের ব্যাপারে সম্মতি জানান।
জুলাই ১২-১৭	যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে।
জুলাই ২৪	এইদিন থেকে ১৮৭ জন (পরে ঐ সংখ্যা ২১১-এ দাঁড়ায়) আন্দামান-বন্দি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি এবং অবিলম্বে আন্দামান থেকে বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনা।
আগস্ট	ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।
আগস্ট ২	কলকাতা টাউন হলে আন্দামানে আটক বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মুক্তিদানের দাবিতে যে বিশাল জনসভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন।
আগস্ট ১২	আন্দামানে আটক বন্দিদের সমর্থনে দেউলি বন্দিনিবাসে আটক প্রায় ২০০ এবং প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ৪৮ জন রাজবন্দি একযোগে অনশন শুরু করেন।
আগস্ট ১৪	'আন্দামান বন্দি মুক্তি দিবস' পালিত হয়। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট হয় সারা কলকাতায়। কংগ্রেস থেকে 'আন্দামান দিবস' পালনের ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তিনিকেতনে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা যে সভা করেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন।
আগস্ট ১৬	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার লাট অ্যান্ডারসনের কাছে পত্র প্রেরণ করেন, আন্দামানে আটক বন্দিদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য।
আগস্ট ২১	চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
আগস্ট ২৮	আন্দামানে বন্দিরা অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।
সেপ্টেম্বর	কংগ্রেস সদস্য মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় দোকান নিয়ন্ত্রণ বিল' বঙ্গীয় আইন সভায় উত্থাপনের চেষ্টা করেন।
সেপ্টেম্বর ১৬	আন্দামানে আটক বন্দিদের প্রথম দলটিকে দেশে ফেরত পাঠান হয়।
অক্টোবর ৭	বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।
অক্টোবর ১৭	মুসলিম লীগ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে।
অক্টোবর ২৫	জাতীয় কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে বঙ্কিম চন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়।
অক্টোবর ২৮	শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বন্দেমাতরম্ সংগীতটির প্রথম কলি দুইটি জাতীয় সংগীতরূপে গীত হয়।
নভেম্বর	আন্দামানে আটক বন্দিদের দ্বিতীয় দলটিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

ডিসেম্বর ২৪ বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় দন্ডিত আসামী হিসেবে থাকার সময় ধরণীধর চৌধুরীর বীরভূম কারাগারের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচারে মৃত্যু ঘটে।

ফেব্রুয়ারি ১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলায় ভাষণ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার ব্যবহার এই প্রথম ও বেসরকারি লোকের সভাপতিত্ব এই প্রথম।

মার্চ ২ কলকাতায় রোঁমা র‍্যোলা বিশ্বে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভাষণ দেন।

মার্চ ৮ গৃহযুদ্ধ চলাকালীন স্পেনের মেয়েরা ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। ফরাসী কবি রেনে শা'র দেশ রক্ষার কাজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ: কাব্য — করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : *রবীন্দ্র-আরতি* / কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *শর্বরী* / বিষ্ণু দে : *চোরাবালি* / বুদ্ধদেব বসু : *কঙ্কাবতী* / রবীন্দ্রনাথ : *খাপছাড়া, ছড়ার ছবি* / সমর সেন : *কয়েকটি কবিতা* / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *ক্রন্দসী* / সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : *মনোমুকুর, আহিতাগ্নি* / হরপ্রসাদ মিত্র : *চন্দ্রমল্লিকা*। **উপন্যাস** — তারাশঙ্কর : *আগুন* / বনফুল : *কিছুক্ষণ, দ্বৈরথ* / প্রবোধকুমার সান্যাল : *আলো আর আগুন* / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : *আবর্ত*। **গল্পগ্রন্থ** — জগদীশ গুপ্ত : *শ্রীমতী* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *জন্ম ও মৃত্যু* / তারাশঙ্কর : *জলসাঘর* / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : *রাণুর প্রথম ভাগ* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রাগৈতিহাসিক* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *মহানগর*।

পত্রিকা প্রকাশ — *ছায়াপথ* : নীতিশচন্দ্র মজুমদার / *কিশোর* : হীরেন্দ্রনাথ গুহ, কামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ *ছেলেখেলা* : সুহৃদকুমার চট্টোপাধ্যায় / *জলছবি* : প্রভাতকিরণ বসু / *সত্যবাদী* : বিধুকৃষ্ণ চক্রবর্তী / *সাময়িক* : বিনয় মজুমদার / *গৌড়েশ্বর* : গোবিন্দদাস গোস্বামী / *সেবক* : মতিলাল লাহা / *পাঠশালা* : নরেন্দ্র দেব।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপল কুমার বসু।

মৃত্যু : জগদীশচন্দ্র বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

শারীরিক ক্ষেত্রে মৃগী রোগের প্রকোপ বাড়ে এবছরে। রোগ উপসমের জন্য চিকিৎসকের ব্যাবস্থাপত্রে প্রদত্ত স্নায়ু অবশকারী ওষুধের মোকাবিলার চেষ্টায় মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। চিকিৎসাবিদ্যার বইপত্র ঘেঁটে নিজেই রোগ আয়ত্তে রাখার এই ওষুধটি আবিস্কার করেন। বছরের শেষদিকে পিতার

অবসর ভাতা ও ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকায় কেনা টালিগঞ্জের দিগম্বরী তলার বাড়িতে পিতা ও অন্য ভাইদের সঙ্গে একান্নবর্তী সংসারে যৌথভাবে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী ১১ বছর তিনি এই বাড়িতেই ছিলেন। এই সময়ে মানিক মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। বুখানিনের লেখা *ঐতিহাসিক বস্তুবাদ* এবং লিয়েনতিয়েভের লেখা *মার্কসীয় অর্থনীতি* বিষয়ক বই পড়ে তিনি নিজেকে মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণায় উজ্জীবিত হন।

কিরণকুমার রায় সম্পাদিত *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন মানিক। এখানে বেতন হিসেবে পেয়েছেন মাসিক ৬৫ টাকা। মৃগী রোগের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার জন্য এবং শক্ত হয়ে যাতে একস্থানে অনেকক্ষণ বসে লিখতে পারেন, তার জন্য তিনি অধিক পরিমাণে সুরা পান করতে লাগলেন। এই সময়ে মানিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকরূপে গড়ে তোলার কথা সারাক্ষণ চিন্তা করছেন। তবে লেখা ছাড়াও তাঁর সুরা পানের আর একটি কারণ ছিল মানসিক অশান্তি।[১] অত্যন্ত দারিদ্র্যতার মধ্যে মানিক দাদা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন : "চিকিৎসার জন্য আমার অর্থের প্রয়োজন আছে, এখন চাকুরীতে আমি যাহা মাহিনা পাই তাহাতে চিকিৎসা চলিবে না। এ পর্যন্ত যে রূপ চলিয়াছে সেই রূপ জোড়াতালি দেওয়া চিকিৎসা চলিতে পারে মাত্র।"[২] জানুয়ারি থেকে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *অমৃতস্যপুত্রাঃ* উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে থাকে। এপ্রিলে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *প্রাগৈতিহাসিক*। পাশাপাশি চলে গল্প প্রকাশ : 'দিনের পর দিন' (*বঙ্গশ্রী*, মাঘ, ১৩৪৩)। 'সিঁড়ি' (*অগ্রগতি*, চৈত্র ১৩৪৩)। 'হাত' (*অগ্রগতি*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)। 'অবগুণ্ঠিত' (*অগ্রগতি*, ভাদ্র, ১৩৪৪), 'টিকটিকি' (*পরিচয়*, শ্রাবণ, ১৩৪৪)।

গল্পগ্রন্থ-১ : প্রাগৈতিহাসিক

প্রাগৈতিহাসিক মানিকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। সজনীকান্ত দাস প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থটি ১৭ এপ্রিল ১৯৩৭এ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, পৃষ্ঠা - ৪ + ২২৪, দাম দেড় টাকা। এই গ্রন্থে মোট গল্প সংখ্যা দশ: *প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকি, যাত্রা, প্রকৃতি, ফাঁসি, ভূমিকম্প, অন্ধ, চাকরি* এবং *মাথার রহস্য*। *মাটির সাকি* গল্পটি পূর্ববর্তী *অতসী মামী* গল্প সংকলনেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:[৩]

মাটির সাকি	বঙ্গলক্ষ্মী	আষাঢ় ১৩৩৮
যাত্রা	প্রবাসী	চৈত্র ১৩৩৮
ভূমিকম্প	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৩৯
প্রাগৈতিহাসিক	পূর্বাশা	১৯৩৩
অন্ধ	আনন্দবাজার পত্রিকা	শারদীয়া ১৩৪৩

চাকরি	বঙ্গশ্রী	কার্ত্তিক ১৩৪৩
মাথার রহস্য	বঙ্গশ্রী	অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
চোর	?	?
প্রকৃতি	?	?
ফাঁসি	?	?

এই গল্পসংকলনে গল্পকার মানিকের নিজস্বতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। মানিকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অন্তর্ভেদী জ্ঞান, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের আচার-আচরণের অসঙ্গতি, স্বার্থপরতা, মানসিক বিকার — ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই গ্রন্থের গল্পে ফুটে উঠেছে। কাহিনির আকর্ষণ, ঘটনাগত চমক বা কাঙ্খিত পরিণামমূলক গল্প মানিক লিখতেন না। তাঁর কমবেশি সব গল্পের লক্ষ্য মানব চরিত্রের নানা অসংগতির প্রকাশ এবং সেইসব অসঙ্গতির কারণ অনুসন্ধান। তাই তাঁর গল্পের আবেদন হৃদয়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধির কাছে।

প্রাগৈতিহাসিক

এই গল্পটি ইংরেজি ভাষায় মানিকের সর্বাধিক অনুদিত গল্প। প্রথম ইংরেজীতে অনুদিত হয় ১৯৫৮ সালে *Primeval and Other Storys* গ্রন্থে। অনুবাদক অশোক মিত্র। এছাড়াও আরো একাধিক ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থে গল্পটি অনুদিত হয়েছে। মানিকের ডায়েরী থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় *রংমহল* নাট্যমঞ্চে গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় গল্পটি নাটকাকারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। গল্পের প্রধান চরিত্র ভিখু এক নৃশংস ডাকাত। আদিম জৈব প্রবৃত্তির প্রকাশ ভিখুর মধ্যে প্রবল। বর্বর প্রবৃত্তিই তার বাঁচার রসদ। দুর্ভাগ্যবশত ভিখুর ডান হাত খানা অকেজো, তবুও মাঝে মাঝে তার মনে হয় — পৃথিবীতে যত খাদ্য আর যত নারী আছে, একা সব দখল করতে পারলে তার তৃপ্তি হয়। মানিকের বর্ণনায় ভিখুর চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে —

> তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত। টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত।[৪]

ভিখুর এই অনৈতিক জীবনাচার আদিম বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত। খুনি ডাকাত ভিখুর পলাতক জীবনের নানা পর্যায় স্তর পরম্পরায় সজ্জিত হয়েছে গল্পে। আর তা যেন এক প্রাগৈতিহাসিক সময়ের বৃত্তান্ত।

উপন্যাসধর্মী কথন ভঙ্গিতে চূড়ান্ত অসামাজিক ভিখুর গল্প বলেছেন মানিক। হিংস্র উন্মত্ত ভিখু এক বর্ষার রাতে বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার আঘাতে জখম হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

বর্ষাকালে যে বন ভয়ানক হয়ে ওঠে — হিংস্র বাঘও সেখানে বাস করতে চায় না, সেখানে বিষাক্ত ঘায়ের যন্ত্রণায় ভিখু সাপ, শেয়ালের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে রইল —

> দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও গায়ের ব্যথায় ধুকিতে ধুকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সংকীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল।... পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার একমুহূর্তে স্বস্তি রহিল না।... অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। এক হাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল, বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। ... মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।[৫]

পেহ্লাদ বাগদী এই মুমূর্ষু দশা থেকে উদ্ধার করে ভিখুকে আশ্রয় দিল তার ঘরে। আর শক্তপ্রাণ ভিখু এই অশ্রয়টুকু আশ্রয় করেই বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে বেঁচে উঠল। কিন্তু ডান হাতটা আর ভালো হল না — গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে গেল। কিন্তু ভিখুর জীবন আদিম রিপুর তাড়নায় নিয়ন্ত্রিত। তার জীবনে নারীর প্রয়োজন শরীর নির্ভর। আর এই কামনা মানবিক সম্পর্ক বিবর্জিত। কোনো নৈতিকতার ধার দিয়ে সে যায় নি। একটু সুস্থ হতেই ভিখুর কুনজর পড়ল পেহ্লাদের বউ-এর উপর। পেহ্লাদের কাছে মার খেয়ে আধমরা হয়ে সে সেখান থেকে বিতাড়িত হল। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি ভিখুর মধ্যে আদিম জৈব বৃত্তির একটি বৈশিষ্ট্য। সে রাতের অন্ধকারে পেহ্লাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। এখান থেকে শুরু হল ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

ডাকাত থেকে ভিখু হল ভিক্ষাজীবী। সারাদিন ভিখুর সামনে দিয়ে হাজার দেড়েক লোক যাতায়াত করে এবং উপার্জন আট আনার কম হয় না। হাটবারে উপার্জন একটু বেশি। দিন কয়েকের মধ্যেই পৃথিবীর এই অতিপুরাতন জীবিকাটির আদব কায়দাও সে সহজে আয়ত্ব করে নিল। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করে। নারী সঙ্গহীন নিরস জীবন ভিখুর অসহ্য লাগে। অতীতের কথা ভেবে সে আফসোস করে — তার জীবন কি ছিল আর কি হয়েছে। নারীসঙ্গহীন একা একা থাকার জন্য সে ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে, "তাহার চালার পাশে বিনু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটি তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক একদিন বিনুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে।"[৬] এই অনিবার্য জৈব প্রবৃত্তির তাড়নাতেই ভিখু আকৃষ্ট হয় ভিখারিনি পাঁচীর প্রতি। পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু অন্তরায় পাঁচীর সঙ্গি বসির মিঞা, সেও ভিখারী। কাজেই পাঁচীর দখল নিতে হলে বসিরকে সরানো আবশ্যক। ভিখু আর দেরি করে না। কৃষ্ণপক্ষের রাতে বাঁ হাতের এক আঘাতে ঘুমন্ত বসিরের তালুর মধ্যে শলাকার অগ্রভাগ প্রায় তিন আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে তার গলা টিপে ধরল। নিঃশব্দে ঘটে গেলো বসিরের হত্যাকান্ড। তারপর বসিরের সঞ্চিত টাকা পয়সা এবং পাঁচীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল ভিখুর নতুন জীবন —

> ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুধারে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।
>
> হয়তো ঐ চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।[৭]

পাঁচী ও ভিখুর তিমির যাত্রা তাদের আর এক জীবন সংগ্রামের অনুবর্তন মাত্র। মানুষের পাশবিক আচরণের এই কদর্য রূপ জঘন্যতম — কিন্তু অবাস্তব নয়। *প্রাগৈতিহাসিক* নামকরণের মধ্যেই একটি মূলগত ধারণা আছে। সে ধারণা হল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে টিকে থাকা। ভিখুর চরিত্রের বলিষ্ঠতা সমস্ত প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মেকী আবরণের বিরুদ্ধে মানিকের এক বিদ্রোহী সৃষ্টি ভিখু চরিত্রটি। আধুনিক সভ্যতার আলোক সাধনা সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অন্ধকার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। তিরিশ-চল্লিশের দশকে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় এবং মানব চেতনার অবনমন ভীষণ নেতিবাচক রূপ নিয়েছিল। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রতিকায়ত হয়েছে এই গল্পে।

চোর

সমাজের নিচু তলার মানুষের প্রতি মানিকের পর্যবেক্ষণ কত তীক্ষ্ণ ছিল তা প্রমাণিত হয় এই গল্পে। পেশায় চোর মধু ঘোষের জীবনের একটি দুঃখজনক দিনের গল্প বলতে বসে লেখক একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মধুর জীবিকা চৌর্যবৃত্তি। বাঁচার তাগিদে সে চুরী করে কিন্তু আরো বহুরকমের চুরি সমাজে প্রচলিত — "জগতে চোর কে নয় ? সবাই করে।" মধু চোর হলেও নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে এবং তাকে খুশি করার জন্য ভরা বাদলের রাতে অসুস্থ শরীর নিয়েও চুরির সন্ধানে যায় —

> বৈধ উপায়ে আজ পর্যন্ত সে একটি পয়সাও উপার্জন করেছে কিনা সন্দেহ। গোপন ও প্রকাশ্য যত প্রকার উপায়ে তাহার অনিয়মিত আয় হয় তার সবগুলিই নীতিবিগর্হিত। কিন্তু কোনো রকম নীতির ধার মধু ধারেনা। পয়সার জন্য সে করিতে পারেনা জগতে এমন কাজ নাই। সে শিশুর গলার হার ছিনাইয়া লইয়াছে, মেলায় জুয়াড়ি সাজিয়া দরিদ্র চাষার উপার্জনে ভাগ বসাইয়াছে, পকেট মারিয়াছে, দূর গ্রামে গিয়া পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা

> করিয়াছে। কোমরে ল্যাঙট আঁটিয়া সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া মাঝে মাঝে গৃহস্থের ভিটায় সিঁদও সে দিয়াছে। দেহে শক্তি ও মনে সাহস থাকিলে বোধ হয় ডাকাতি করিতেও সে ছাড়িতনা।[৮]

এই মধু স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসে। স্ত্রীর জন্যই সে দিনরাত এত পরিশ্রম করে চুরি করে। স্ত্রীকে সে রাখাল মিত্রের বাড়িতে কাজের ঝি করে পাঠায়, বাক্স পেঁটরা কোথায় থাকে খবর জোগাড়ের জন্য। মিত্র বাড়ির বড়ো ছেলে পান্নাবাবুর সঙ্গে গোপনে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে মধুর স্ত্রী। কাহিনির শেষে দেখি মিত্র বাড়ির মেয়ের বিয়ের জন্য সঞ্চিত অর্থ সিঁদ কেটে চুরি করে এনেছে মধু। বাড়ি ফিরে সে দেখে তার স্ত্রী মধ্যরাত্রে গৃহত্যাগ করে পালিয়েছে। সে গিয়েছে খালের জলে ওপারে নৌকায় অপেক্ষারত পান্নাবাবুর সঙ্গে। এই সত্যটি জানার সঙ্গে সঙ্গে মধু বড়ো দঃখে বীভৎস হাসি হাসে এবং ভাবে জগতে চোর কে নয় ? সবাই চুরি করে — এই জীবনদর্শন মধু অর্জন করে তার সর্ব অর্থে প্রবঞ্চিত জীবন দিয়ে। কিন্তু এ পরাজিত মানুষটির মধ্যেও সুস্থ সুখী জীবনের স্বপ্ন ছিল। মিত্র বাড়ির নিদ্রিত কন্যার সুকুমার মূর্তিটি দেখে মধু নিজের বিকৃত জীবনের গ্লানিতে চুরি না করে ফিরে যাবার কথা বারবার ভেবেছে —

> ফিরিয়া গিয়া নতুন করে জীবন আরম্ভ করে। সংযত সুন্দর পবিত্র জীবন। ঈশ্বরকে আর কি ভক্তি করা যায় না ? কাদুকে শেখানো যায় না লোভ করিতে নাই, নোংরা থাকিতে নাই, অবাধ্য হইতে নাই, কলহ করিতে নাই ? — সে মজুর খাটিবে। গরু কিনিয়া দুধ বেচিবে, জমি কিনিয়া চাষ করিবে না হয় গ্রামের মধ্যে মনোহারি দোকান দিবে।[৯]

কিন্তু এই মহৎ জীবনের স্বপ্ন কয়েক মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় এবং সে গৃহস্থের কষ্টার্জিত অর্থ চুরি করে ফিরে আসে। কিন্তু সহজ সুস্থ জীবন তার অনায়ত্ব। একটি চোরের জীবনদর্শন প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজের নিচতা কপটতা ও অবক্ষয় সমকালীন সমাজবৃত্তে মানিক চমৎকার ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

যাত্রা

গ্রামবাংলায় কন্যা দায়গ্রস্থ পিতার দূরাবস্থা ও অসহায় কন্যাটির মর্মন্তুদ জীবনবেদনা একাধিক লেখকের কলমে আমরা পাই। এই গল্পটিও একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত। গ্রামীণ পরিবারটিতে ১৩ বিঘা ধানের জমি বিক্রয় করে দিয়ে, ভিটেবাড়িটুকু পর্যন্ত বাঁধা রেখে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়। সেই বিবাহকে কেন্দ্র করে আত্মীয় প্রতিবেশিনীদের ব্যঙ্গ, প্রচণ্ড গরমে যাত্রাকালে বধূর অজ্ঞান হয়ে পড়া এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরের পিতার কন্যার পিতার কাছ থেকে আরো কিছু টাকা অতিরিক্ত আদায় করা, বিদায়কালে আসন্ন বিরহে মাতা ও কন্যার নিবিড় মমতার বন্ধন, অসুস্থ ছোটো ভাইটির প্রতি সদ্য বিবাহিতা দিদির গভীর মমতা গল্পটিকে আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও আপন করে তুলেছে। সামন্তমূল্যবোধে চালিত পুরুষ শাসিত সমাজে কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে যে পণদান ও অর্থনৈতিক পীড়ন, অনিশ্চিত অপরিচিত পরিবেশে কন্যার নিরাপত্তার অভাববোধ — প্রভৃতির প্রতি লেখক চমৎকার আলো ফেলেছেন।

কন্যার পিতার একমাত্র অপরাধ তিনি কন্যার পিতা। এই অপমানকর দুঃখজনক পটভূমিতে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, সেই বিবাহের শেষে পথে জ্বলন্ত চিতা দেখে বর কনেকে জিজ্ঞাসা করে, "পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমায় আমায় খুব মনের মিল হবে, হবে না?"[১০] — এই প্রশ্নের পরে লেখকের একটি শ্লেষাক্ত মন্তব্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি — "যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকি থাকিত"[১১]

আমাদের সমাজে নরনারীর মিলন সুন্দর ও স্বাভাবিক। এবং তা বিবাহের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। অথচ এই সহজ সুন্দর ব্যবস্থাটিকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে কত বিকার ও অসঙ্গতি। একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানিক আমাদের বিবেকের কাছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন রেখেছেন। সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজ পরিবেশে এই ঘটনা সর্বত্র সুলভ ছিল। এবং আজও লেখকের প্রশ্নের সদর্থক উত্তর খুঁজতে আমরা ব্যর্থ। কেননা এমন কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা এই বর্তমান সমাজেও খুব দুর্লভ নয়।

প্রকৃতি

প্রকৃতি গল্পটিতে শ্রেণি অবস্থানে বন্দি মানব মনস্তত্ত্বের চমৎকার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। দশ বছর আগে অমৃত সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারির মতো দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় সে পেয়েছিল ধনীদের অবহেলা। দরিদ্র উকিল প্রমথ বাবুর কাছে অমৃত আশ্রয় পেয়েছিল, অসুস্থ অমৃত পেয়েছিল যত্ন ও সেবা। আজ অমৃত বিদেশ থেকে আবার ধনী হয়ে ফিরেছে এবং অভাবের কারণে বিক্রয় করে দেওয়া নিজের বাড়ি সে অনেক বেশি দাম দিয়েই কেনে। একদা আশ্রয়দাতা দরিদ্র প্রমথ বাবুর বাড়িতে গিয়ে সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এই পরিবারটির মানুষগুলির কুণ্ঠা ও হতশ্রী দারিদ্র্যের রূপ তাকে বিরক্ত করে, এদের দেওয়া খাবারটুকু খেতে সে ঘৃণা বোধ করে। সে ভেবেছিল প্রমথবাবুর ছেলে অবিনাশের সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে, কিন্তু অবিনাশের গলার ভাঁজে মাটির রেখাটি, যা কিনা অযত্ন দারিদ্র্য অপরিচ্ছন্নতার কারণে তৈরি হয়েছে, সেটি চোখে পড়া মাত্র তার বন্ধুত্বের সব আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে যায়। কেননা সে নিজে এখন যে শ্রেণির লোক, তার সঙ্গে হতশ্রী এই পরিবারের লোকগুলির অনেক দূরত্ব। আসলে মানুষ সমশ্রেণির মানুষের মধ্যেই বিচরণ করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। নিজের জীবনেও মানিক দেখেছেন বড়োলোক দাদাদের দরিদ্র ভাই মানিকের প্রতি ব্যবহার ও সম্পর্কের দড়ি টানাটানি।

অমৃত এই দরিদ্র পরিবারটিতে কিছুক্ষণ থেকেই হাঁপিয়ে ওঠে। ফেরার পথে মোটরে চাপা দেওয়া একটি ভিখারিকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে সে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, কিন্তু রক্তাক্ত ভিখারীর অপরিচ্ছন্ন পোশাক তার মনে এমন ঘৃণার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে যে, সে ভাবে, যেন কিছুক্ষণের জন্য ডাস্টবিনে গড়িয়ে পড়েছিল। বাড়ি ফিরে "নিজের স্নাত ও পবিত্র শরীরটার সেই আধঘণ্টার

অপব্যবহারকে সে যেন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতে ছিল না।"[১২] এরপর যখন ধনী রাখাল হালদার সন্ধ্যায় তার বাড়িতে আসে, সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। সে ভুলে যায় তার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা। বরং তার সমশ্রেণির লোকের সঙ্গে মিশেই সে অনেক বেশি আনন্দ পায়। আসলে মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এমনই। অমৃতের মতো ধনী লোকের ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং দরিদ্র নিম্নবিত্তদের প্রতি সহানুভূতি যে ভাববিলাস মাত্র, তা মানিক বুঝিয়ে দেন তাঁর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে এই লেখাগুলির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত শ্রেণি অবস্থান ভেদে মানুষের চরিত্রের পরিবর্তনশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যা তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

ফাঁসি

ধনী পরিবারের সন্তান গণপতি খুনের আসামি হিসেবে অভিযুক্ত ছিল। যদিও সে প্রকৃত খুনি ছিল না। গণপতি জেলে ছিল কয়েদি হয়ে এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। গণপতির বাবা ছিলেন একসময়ের নামকরা উকিল এবং তার দাদাও বর্তমানে আইন ব্যবসায়ী। ফলে বড়ো বড়ো ব্যারিস্টার ও আইনজ্ঞদের পরামর্শ পেতে তার অসুবিধে হয় না এবং সে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। গল্পটি আসলে গণপতির স্ত্রীকে কেন্দ্র করে রচিত। এই সব ঘটনায় তার স্ত্রী রমা মানসিকভাবে বারবার আঘাত পেয়েছিল। সে অন্তর্মুখী স্বভাবের মেয়ে ফলে নিজের দুঃখের কথা রমা প্রকাশ করত না। তাই গণপতি যখন জেলে ছিল, সে বেশি দুঃখ না করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে একটু একটু করে, ক্রমশ বিষণ্ণ এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে তার জীবন। রাত্রে একা গোঙানির সুরে চাপা কান্না কাঁদে। আবার গণপতি ফিরে এলে সে উচ্ছ্বসিতভাবে আনন্দও প্রকাশ করেনা। বরং সে চায় এই চেনা পরিবেশ থেকে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে আবার নতুন জীবন শুরু করতে — যেখানে এই পরিচিত পরিবেশের কৌতূহল অনুকম্পা নেই, এই অস্বস্তিকর মানসিক ভার যেখানে বহন করতে হবে না। কিন্তু নিজের পরিচিত বৃত্তের নিরাপত্তা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে যেতে গণপতি রাজি হয় না। ভালোবাসা ও অনুরাগের সঙ্গে সে স্ত্রীকে বোঝাতে চেয়েছে এই পরিচিত পরিবেশ ও পরিবারকে ছেড়ে যাওয়া বোকামি। স্বার্থবুদ্ধি গণপতি তার অপমানাহত স্ত্রীর দগ্ধ হৃদয় যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারেনি, তাই বুঝতেও পারেনি স্ত্রীর ভাবনাকে। গল্প শেষ হয়েছে একটি চমকপদ করুণ পরিণতি দিয়ে: "পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়িতে একটা বিরাট হৈ চৈ শোনা গেল। বাড়ির মেজো বৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।"[১৩] অপমানিত রমা জীবনে কোনো প্রতিকারের উপায় না পেয়ে আত্মহত্যার পথটি বেছে নিয়েছে। স্বামীর জেলে যাওয়াতেও যে স্ত্রী মনকে শক্ত করে রেখেছিল, সে স্বামীর ফিরে আসার পর নিজেই গলায় ফাঁসি নিল। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মানিক দেখাতে চেয়েছেন আপাত স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে কি গভীর জটিলতা। গল্পের ফাঁসি নামকরণটি তাই অধিক তাৎপর্য নিয়ে আভাসিত হয় পাঠকের সামনে।

ভূমিকম্প

একটি ভূমিকম্পের আকস্মিক ঘটনায় মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে প্রসন্ন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারপর কোনো ক্রমে বাইরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার মধ্যে দেখা দেয় একপ্রকার মানসিক বিকার। এই ভূমিকম্পের রাতে যে মানসিক আঘাত সে পেয়েছিল, তা তার চেতনাকে এতটাই বিপর্যস্ত করেছিল যে সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। নিরাপত্তার অভাববোধ ক্রমাগত তার স্বাভাবিক আচার-আচরণকেও অস্বাভাবিক করে তোলে। অফিসের তিন তলার খোলা জনালা তাকে প্রলুব্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে, খোলা জানালা দিয়ে সে দেখতে পায় রাস্তার ফুটপাতে একটি কলার খোসা পড়ে আছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে সে প্রতিক্ষা করে কখন একটি মানুষ সেই কলার খোসায় পা দিয়ে আছাড় খাবে। অবশেষে একটি গরু এসে সেই খোসাটি খেয়ে ফেললে, সে রীতিমত হতাশ হয়। মানিক তার প্রথম দিককার লেখালেখিতে মানুষের জীবনের নানা অসঙ্গতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোবিকলন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিককার বহু চরিত্রই মানসিকভাবে খুব স্বাভাবিক নয়। *ভূমিকম্প* গল্পের নায়ক মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং এই বিকার গ্রস্ততার কারণ নিরাপত্তাবোধের অভাব বা সমকালীন সমাজের অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতা। দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন এই সময়পর্বে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ভারসাম্য এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে মানুষের প্রাত্যহিক নিরাপত্তাটুকু হারিয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিনের বেঁচে থাকাটুকুও ছিল এক একটি বৃহৎ সংগ্রামের সমতুল্য। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাববোধ ছাড়াও, যে সামাজিক অবক্ষয় এই দিনগুলিতে দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাব মানুষের সংবেদনশীল চৈতন্যে তৈরি করেছিল নানা ধরনের বিকার। সাধারণের তুচ্ছ জীবনের এইসব ক্ষুদ্র বিষয়কেও মানিক তাঁর শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী কলমে তুলে ধরেছেন।

অন্ধ

গল্পের নায়ক সনাতন চক্রবর্তী অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ছাপান্ন বছর বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে স্ত্রীকে সে খুব ভালবাসতো সেই স্ত্রীর গা থেকে সোনার গহনা খুলে নিয়ে এসে সে বাড়ি তৈরি করেছিল। আর সেই কারণেই তার স্ত্রী অভিমানে সম্ভবত মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিল। মোহিনী নামের একটি মেয়ে ছিল সনাতনের। নিজের ভবিষ্যৎ ও মদ্যপানের খরচ রেখে দিয়ে সে সামান্য খরচে সামান্য পাত্রে মেয়ের বিয়ে দেয়। অন্ধ হওয়ার পর সে তার মেয়ে জামাইকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সবকিছুর মধ্যে ধরা পড়ে তার একটি স্বার্থপর পরিকল্পনা এবং মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে সে অদম্য নেশায় মেতে থাকে। তার স্ত্রী সাত বছরের কন্যা সন্তান রেখে, স্বামী-সংসার সবকিছু ফেলে গয়নার শোকে আত্মহত্যা করেছিল। সেই বেদনার তীব্রতা সনাতনকে সারাজীবন অধিকার করে রেখেছিল। অন্ধ হওয়ার পরেই সনাতন বুঝেছিল এই পৃথিবীর বাস্তব সত্যকে। স্বার্থপর সনাতনের মানসচক্ষু খুলে যায় অন্ধ হয়ে। মেয়ে ও জামাই যে স্বার্থপর এবং বৃদ্ধ পিতার প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার দেখে সে আরো বেশি মদ খায় এবং মদের

নেশায় সে আরো বেশি অন্ধ হয়ে যেতে থাকে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, মানিকের জীবনের শেষ দিনগুলির কথা। চরম দারিদ্র্য ও অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তি নেই ভেবে মদের নেশায় মানিক নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনের পরাজয় ও হতাশাকে ভুলতে মদই ছিল তাঁর একমাত্র উপায় এবং শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত মদ্যপানই তার অকাল মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। অনেক আগেই মানিক *অন্ধ* গল্পের সনাতন চরিত্রটিতে প্রায় সমতুল্য শোচনীয় পরিণামটিকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

চাকরি

মহেন্দ্রজিৎ ছেলেবেলার বন্ধু জয়গোপালকে বঞ্চিত করে কৌশলে চাকরিটা বাগিয়ে নেয়। বিয়ের পর ধনী শ্বশুরের কৃপায় একটি মোটর গাড়িও তার হয়। নতুন বৌকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে হাওয়া খেতে গিয়ে বন্ধু জয়গোপালের বাড়ির সামনেই অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে। মহেন্দ্রজিৎ ও তার স্ত্রী শোভারানী মোটর গাড়ি উল্টে অল্প জখম হয়ে বাধ্য হয় দরিদ্র বন্ধু জয়গোপালের বাড়িতে আশ্রয় নিতে। বন্ধুর পরিবারের দারিদ্র্যের রূপটি দেখে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। চলে আসতে চাইলেও বন্ধুর ভাবাবেগ ও ভালোবাসার আবেদনে নরম হয়ে সে থেকে যায়। মানব চরিত্রের স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, কপটতা মানিক একাধিক চরিত্রে তুলে ধরেছেন। এ গল্পেও মহেন্দ্রজিৎ ও তার স্ত্রীর আচার-আচরণে স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি প্রকট। হঠাৎ অবস্থান্তরে বড়োলোক হওয়া মানুষেরা তাদের পূর্বের অবস্থানকে কিভাবে ভুলে যায়, সমকালীন জীবন অভিজ্ঞতায় মানিক সেই ছবি তুলে ধরেছেন *চাকরি* গল্পে।

মাথার রহস্য

একটি দরিদ্র পরিবারের করুণ পরিণতির গল্প 'মাথার রহস্য'। শেষ বয়সে একসঙ্গে দুহাজার টাকা হাতে পেয়ে দরিদ্র গৃহকর্তা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে টাকা হারিয়ে ফেলে —

> ব্যাপারটা যে কি হইয়াছিল বাড়ির লোকে ঠিক জানে না। নন্দীগ্রামে পতিত পাবনের বাড়ি। পাওনা টাকাটা আদায় করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিবার জন্য সে কলিকাতায় গিয়াছিল। তিনদিন পরে সে গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিল। জীবনযুদ্ধে হাসিখুশি ভাবটা পতিত পাবনের অনেক দিন উবিয়া গিয়াছে, তবু সাধারণত সে এইরকম খাপছাড়া গাম্ভীর্যের ধার ধারে না। চোখের চাউনিও যেন একটু কেমন কেমন।[১৪]

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে সে জানায় মাটির তলায় টাকা পুঁতে রেখেছে, মেয়ের বিয়ের খরচের প্রসঙ্গ উঠলে বলে অবিবাহিতা মেয়ের নাকি সে দুবছর আগেই বিয়ে দিয়েছে — এভাবে সে সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্যহীন চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। পতিতপাবনের মস্তিষ্কে কি রহস্যময় ঘটনা ঘটছে তা ডাক্তারও বুঝতে পারে না। দাড়ি গোঁফে তার চেহারা হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক, "তার চোখের দিকে চাহিলে কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কেমন একটা জটিল দুর্বোধ্য রহস্য তাহার দুটি চোখে একটা অস্বাভাবিক

বিচ্ছিন্ন জ্যোতির মত ঘনাইয়া আসিয়াছে, শিশুর চোখে যেন ফুটিয়া আছে শ্মশানচারী কাপালিকের দৃষ্টি।"[১৫]

এই অভিঘাতে সমস্ত পরিবারটি বিপন্ন হয়ে পড়ে। মেজো ছেলে যাদব প্রচুর পড়াশুনো করে পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে চাকরি পায় এবং পাগল বাবাকে সারাবার জন্য নিজেকে আত্মাহুতি দেয়। কুৎসিত দর্শনা, পৃথুলা এক ধনী কন্যাকে সে টাকার জন্য বিয়ে করে। বিবাহের নগদ হিসেবে প্রাপ্য টাকা মাটির তলায় আগে থেকে পুঁতে রাখে এবং পতিতপাবনের সামনে সেই টাকা মাটি খুঁড়ে বার করা হয়। সবাই জানতে পারে, যে টাকাটা পতিতপাবনের হারিয়ে গিয়েছিল সেই টাকা এগুলি। আর পতিতপাবন নিজের আত্মত্যাগের এই পরিণাম দেখে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায় —

> একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায়তা, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের, নেতিবাচক পরিণতির, পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের ভালোবাসার গল্প এটি। যযাতির পুত্র পিতার বার্ধক্যকে গ্রহণ করে নিজের তরুণ জীবনকে আহুতি দিয়েছিল। যাদব তার জীবনকে, তার তরুণ বয়সের স্বপ্নকে আত্মাহুতি দিল পিতা পতিতপাবনের সুস্থতার জন্য। বৃদ্ধ পতিতপাবনের পাগল হওয়াতে যতখানি বেদনার অভিঘাত পাঠকের অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয়। তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বেদনা ছড়িয়ে পড়ে তরুণ যাদবের পাগল হয়ে যাওয়াতে।[১৬]

এই গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পই মানবজীবনের এক একটি দিককে তুলে ধরেছে। সদ্য সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত মানিকের বয়স তখন ঊনত্রিশ। সাহিত্যচর্চার কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। শুধু মাত্র জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখেছিলেন এবং যত ভাবে দেখেছিলেন, তাকে প্রকাশের জন্য ছিল ব্যাকুল আগ্রহ। লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই বলা যায় না এসব কথা, তাই, মানিককে লিখতে হয় *প্রাগৈতিহাসিক* থেকে *মাথার রহস্যের* মত গল্প। চারপাশের সময় ও সমাজকে, মানুষের জীবনের আলো-অন্ধকারকে, স্বপ্ন ও হতাশাকে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মানিক একের পর এক গল্পে রচনা করেছেন। ১৯৩৭ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে ও সমাজ জীবনে ব্যাপকভাবে আলোড়িত এবং বিপর্যস্ত একটি বছর। এই সময়ের সামাজিক ছবি এবং মানুষের জীবনের যন্ত্রণা শিল্পী মানিক তাঁর অসাধারণ শিল্প কলমে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৫২।

২. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ডায়েরি ও চিঠিপত্র), দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ২৮৫।

৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ৪৮৮।

৪. 'প্রাগৈতিহাসিক', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯।

৮. 'চোর', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

১০. 'যাত্রা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।

১২. 'প্রকৃতি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

১৩. 'ফাঁসি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।

১৪. 'মাথার রহস্যত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

১৬. কৃষ্ণা বসু, *ছোটগল্পকার মানিক : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ৩৫।

১৯৩৮

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩০তম বছর। আসন্ন আর একটি বিশ্বযুদ্ধের কথা ভেবে বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আতঙ্কিত। সাম্রাজ্যবাদী জাপান কর্তৃক আক্রান্ত চীনে সাহায্যের জন্য ভারতীয় মেডিক্যাল টিম প্রেরণ। পশ্চিমবঙ্গে চটকল শ্রমিক ধর্মঘট অব্যাহত। বাংলায় মন্ত্রীসভা গঠনের পর বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিরুদ্ধে উগ্র সাম্প্রদায়িক জিগির তোলে মুসলিম লীগ। আন্দামানে আটক বন্দিদের শেষ দলটি সেলুলার জেল ছেড়ে দেশে ফিরে আসে। বিপ্লবী যুগান্তর দল ভেঙে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ইংরেজ সরকারের প্রবল সমালোচনা করেন।

জানুয়ারি ১১ লন্ডনে প্যাক্রাশ টাউন হলে সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন রজনীপাম দত্ত।

জানুয়ারি ১২ ব্রিটিশ শাসনের সংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব নিয়ে সুভাষচন্দ্র সমালোচনা করেন।

জানুয়ারি ১৪ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত 'বেলুড় মঠ'-এর উদ্বোধন হয়।

জানুয়ারি ১৮ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ঘোষণা করেন সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

জানুয়ারি ৩০ আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে হরেন্দ্রনাথ মুন্সী পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রথমে ডায়মণ্ডহারবার ও পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি অনশন ধর্মঘটে যোগ দিলে নাসারন্ধ্রে নল দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ফেব্রুয়ারি ১৯-২১ গুজরাটের অন্তর্গত তাপ্তি নদীর তীরে হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের একান্নতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার দাবিতে সক্রিয় প্রতিরোধের কথা তোলেন, যদিও তা হবে অহিংস।

মার্চ পৃথক জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বিষয়ক প্রস্তাব বিচার করার জন্য মুসলিম লীগ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে।

মার্চ ১৪ সারা বাংলা বন্দি মুক্তি দিবস পালিত হয়।

অক্টোবর ৮ কথা সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার মুন্সি প্রেমচাঁদের (ধনপত্ রায়) মৃত্যু। জন্ম ৩১-৭-১৮৮০।

ডিসেম্বর ২ ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলন হুগলির বড়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে মুজাফ্‌ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি পরিষদ এবং মহঃ আবদুল্লাহ রসুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ডিসেম্বর ১২	সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। জওহরলালকে এই কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ইউরোপের আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানান।
মার্চ ২২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; বাংলার রাজবন্দিদের মুক্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়।
জুলাই ২৩	তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক।

সাহিত্য সংবাদ

কাব্যগ্রন্থ – অমিয় চক্রবর্তী : *খসড়া* / মৈত্রেয়ী দেবী : *চিত্তছায়া* / রবীন্দ্রনাথ : *প্রান্তিক, সেঁজুতি* / সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : *বিদায় আরতি* / সুধীরকুমার চৌধুরী: *জলের লিখন* / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *কবিতা* / হুমায়ুন কবীর : *অষ্টাদশী*। **নাটক** — মন্মথ রায় : *মীরকাশিম* / শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *সিরাজদৌল্লা, স্বামী-স্ত্রী* / বিধায়ক ভট্টাচার্য : *মেঘমুক্তি* / প্রমথনাথ বিশী : *মৌচাকে ঢিল* / বনফুল : *মন্ত্রমুগ্ধ*। **উপন্যাস** — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *গরীব স্বামী নবদুর্গা* / সীতাদেবী : *পরভৃতিকা* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *অমৃতস্য পুত্রা* / প্রমথনাথ বিশী : *জোড়া দিঘীর চৌধুরী পরিবার* / বুদ্ধদেব বসু : *পরিক্রমা*। **গল্পগ্রন্থ** — জগদীশ গুপ্ত : *বিনোদিনী* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *তিনশূন্য* / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : *রাণুর দ্বিতীয় ভাগ* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *মিহি ও মোটা কাহিনি*।

পত্রিকা প্রকাশ – *দেশবন্ধু* : প্রীতিধন রায় / *সারথি* : অনিলকুমার রায় / *প্রগতি* : সুশীলকুমার বসু / *নীহারিকা* : অজিতকুমার বসুমল্লিক / *অলকা* : সজনীকান্ত দাস / *চতুরঙ্গ* : হুমায়ুন কবির, বুদ্ধদেব বসু / *ছায়াপথ* : অরুণ বসু।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : শৈলেশ্বর ঘোষ, নবনীতা দেবসেন।

মৃত্যু : আবুল হুসেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইকবাল, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

বারবার মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য মানিককে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে দেখানো হয়। তিনি মনে করেন শুধুমাত্র ওষুধে মানিকের এই রোগের সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব নয়, তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থিতির উপায় হিসেবে তিনি মানিককে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। ১১ মে / ২৮ শে বৈশাখ, ময়মনসিংহ গভর্ণমেণ্ট গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার

নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে মানিকের বিবাহ হয়। ইতিমধ্যেই মানিক সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। সাহিত্যই তাঁর প্রধান জীবিকা। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি লেখেন না। এ সম্পর্কে ২০.০৮.১৯৩৮ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে মানিকের মানসিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় —

> সম্মান মূল্যের জন্য আমি গল্প লিখি না, গল্প লিখিয়া কিছু 'সম্মানমূল্য' প্রত্যাশা করি। এই জন্য পূজার মরশুমে পর্যন্ত ২-১টির বেশি গল্প লিখিতে পারি না। আজকাল একটা অপরাধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি — গল্পের জন্য কিছু বেশি পারিশ্রমিক দাবি করি। অপরাধ তবু মার্জনীয়, অভদ্রতার মার্জনা নাই। তবু একটা ঘোরতর অভদ্রতা করি — প্রায় দোকানদারের মতই প্রার্থনা জানাই পারিশ্রমিকটা হাতে হাতে নগদ দিতে হইবে।[১]

আসলে চরম দারিদ্র্যতা ও পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, অশান্তির কারণেই মানিককে বেশি করেই লেখালেখির মাধ্যমে অর্থোপার্জনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল।

এ বছরে জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে *অমৃতস্যপুত্রাঃ* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *মিহি ও মোটাকাহিনী*। এছাড়াও কয়েকটি গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : 'নদীর বিদ্রোহ' (*বঙ্গশ্রী*, আষাঢ় ১৩৪৫)। 'প্যাঁক' (*পরিচয়*, শ্রাবণ, ১৩৪৫)। 'বিষাক্ত প্রেম' (*অগ্রগতি*, শ্রাবণ, ১৩৪৫)। 'বোমা' (*চতুরঙ্গ*, আশ্বিন, ১৩৪৫), 'মহাজন' (*আনন্দবাজার*, শারদ ১৩৪৫)। 'বন্যা' (*যুগান্তর*, শারদ ১৩৪৫)।

উপন্যাস-১ : অমৃতস্য পুত্রাঃ

মানিকের অষ্টম গ্রন্থ এবং ষষ্ঠ উপন্যাস *অমৃতস্য পুত্রাঃ*। জুলাই ১৯৩৮ এ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক কাত্যায়নী বুকস্টল, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২+২২০, মূল্য দুটাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি *বঙ্গশ্রী* মাসিক পত্রে মাঘ ১৩৪৩ থেকে পৌষ ১৩৪৪-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।[২]

লেখকের ইতিপূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির নামকরণের থেকে আলাদা এই উপন্যাসটির শিরোনাম। উপনিষদিক অনুসঙ্গ বেয়ে নামকরণটি এলেও মানিক উপন্যাসের পরিণামে কঠিন শ্লেষযুক্ত তাৎপর্য আভাসিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের রচনাশৈলীতেও সেই ব্যঙ্গাত্মক পরিকল্পনাটি স্পষ্ট। পিতামহ বীরেশ্বরের দুই পৌত্র অনুপম ও শঙ্কর কলেজে যাচ্ছিল যথাক্রমে বাসে ও বাড়ির গাড়িতে চড়ে। উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটলে বীরেশ্বরের একান্ত আগ্রহে ও অনুরোধে অনুপমকে কলেজ বন্ধ করে বীরেশ্বরের বাড়িতে আসতে হয়। ধনী বীরেশ্বরের বড়ো তিনতলা বাড়ি, সামনে ছোট বাগান। শহরের এই অংশ নির্জন ও গম্ভীর। কারণ কেবল একটা বাড়ি নয়, পথের দুদিকের প্রায় সব বাড়ি গুলিই বড়লোকের বাগানওয়ালা বাড়ি। নানারকম উদ্ভিদের সমাহারে বাড়িগুলিকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অনুপমের

বাবার মৃত্যু সংবাদ বীরেশ্বর ও পরিবারের অন্য সকলে শোনার পর তাদের শোক প্রকাশে কৃত্রিমতা ধরা পড়ে এবং এসব দেখে অনুপমের মনের যন্ত্রণা শুরু হয়: "এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এত দামী আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসিয়া তার বাবার মরণের খবরে এদের কাতর হইবার অধিকার কি আছে, কেবল এই অর্গ্যান বেচিয়া সেই টাকায় চিকিৎসা হইলে তার বাবার যখন না মরিবার সম্ভাবনা ছিল।"[৩]

অন্তঃসারশূন্য ও অহমিকাপূর্ণ ধনী সমাজের প্রতি মানিকের বিতৃষ্ণ দৃষ্টির ফলে এই পরিবারের প্রত্যেকটি দেখা ও অদেখা চরিত্রের মধ্যে তিনি বিকারগ্রস্ততার সন্ধান পেয়েছেন। সীতা পিসিমা, ভাবপ্রবণ শঙ্কর, মদ্যপ রামলাল প্রত্যেকটি চরিত্র একটা অসুস্থ পরিবেশের শিকার। এ বাড়িতে কোনো অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব বিগড়ে গিয়েছে। মানিক বর্ণনা করেছেন: "জীবনের রসকস যা আছে সব শক্ত জমজমাট, যেমন তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসালো করিতে চায়না।"[৪]

বীরেশ্বরের দুই পুত্র মৃত শ্যামলাল এবং জীবিত রামলাল। এমন দুটি সংসারের ভিত্তিমূলে অবস্থিত সদস্যদের মিলন বুঝি আর কখনো সম্ভব নয়। বীরেশ্বরের এক পুত্রবধূ স্টোভ ধরাতে বসে স্পিরিটের উত্তাপ টুকুর অপচয় বাঁচাতে চেষ্টা করেন এবং আর এক পুত্রবধূ মুখের পরিচর্যার যে সব ক্রিম মাখেন, তার এক কৌটার দাম দশ বোতল স্পিরিটের দামের থেকেও বেশি। বীরেশ্বরের একটি নাতির বাজেটে এক পয়সার পান খাওয়া বিলাসিতার খরচ এবং অন্য এক নাতির একটার পর একটা পুড়িয়ে ফেলে দশটা পানের দামের সিগারেট। দুই পরিবারের মধ্যে এতখানি এস্টাব্লিশমেন্টের তফাত। উভয় পরিবারের মধ্যে শুধু একটা অস্বস্তিকর আসা যাওয়ার সম্পর্ক থাকে মাত্র।

শঙ্কর ও অনুপম, "স্বাদ দুজনেরই সমান উগ্র, স্বপ্ন দুজনেরই সমান জটিল। শঙ্কর হইবে বিদ্যান আর অনুপম হইবে বৈজ্ঞানিক। জগতে তাদের তুলনা যদিও থাকে, অমর কীর্তি থাকিবে দুজনেরই, এতবড় হইবে দুজনেই যে, শ্রদ্ধা, ভয়ে বিস্ময়ে মানুষ থ বনিয়া থাকিবে।"[৫] কিন্তু তরঙ্গকে কেন্দ্র করে শঙ্করের পতন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তরঙ্গের কাছে প্রতিহত হয়ে শঙ্করের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রেমে প্রতিহত তার ভাবনাচিন্তা ব্যক্তিক থেকে হয়ে ওঠে নৈব্যক্তিক। তখন তার উপলব্ধি হয় মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজের জন্য ভাবা উচিত। এভাবেই তার মধ্যে সামাজিক চেতনা ও রাজনৈতিক দর্শন প্রভাব বিস্তার করে। একটি রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত শঙ্কর দেখে রাজনীতির আড়ালে নেতাদের শয়তানি আর নোংরামির খেলা। দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলাদেশের সমাজ-মানুষের হতাশার অভিব্যক্তি ঘটেছে এই উপন্যাসে। তরঙ্গের শেষ পত্রে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে সমকালীন মানুষের জীবনভূমি। এই উপন্যাসে মানিকের শ্রেণিভিত্তিক সমাজের প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম দৃঢ়ভাবে স্পষ্টতর হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। স্বদেশের মুক্তির জন্য যেসব নেতৃবর্গ আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, তাদের চরিত্র ভ্রষ্টতা প্রমাণ করে, স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতবর্ষের

রাজনীতি ও অর্থনীতির কি শোচনীয় চেহারা হতে পারে। নগরজীবন ও অবহেলিত গ্রামজীবনের মূল সমস্যাও লেখকের মনোযোগ এড়ায়নি। উপন্যাসের শুরুতেই সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্ব স্পষ্টতর হয়েছে —

> জনপূর্ণ পৃথিবীতে জনতাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সমাজ গঠনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও অনেকগুলি মানুষ মিলিয়া একসঙ্গে জমাট বাঁধিবার আর নিশ্বাস, গায়ের গন্ধ, সংক্রামক রোগ, কড়া কথা এইসব আদানপ্রদান করিবার স্বাদ মানুষের কেন থাকিবে, সে কথাটা যাহারা ঘরের কোনায় বসিয়া ছাপানো কাগজের পাতা দুচোখ দিয়া জ্ঞান শুষিয়া শুষিয়া হয় মানবতত্ত্ববিদ্ তাদের বিবেচ্য। পিঁপড়াও ভিড় জমায়, কেবল গুড়ের চারিদিকে নয়, সকলে মিলিয়া সকলের চেষ্টায় যাতে সকলে বাঁচিতে পারে সেই জন্য।[৬]

এই উপন্যাসে মানিক যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা বিশেষ কোন একটি পরিবারের নয়। জীবনের নানা জটিলতায় মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিকারগ্রস্ততা তা সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দ্রুত কুপ্রসারলাভ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তা চরম আকার নেয়। ধনতন্ত্রের মূল কথাই হল অর্থ এবং মুনাফা। ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থই হল সমাজের মাপকাঠি। যার ফলে মানুষের মধ্যে দেখা দিল অপরিসীম লোভ। একদিকে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সংঘাতের ফলে মানবজীবনের বিপর্যয়। অন্যদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয়, ন্যায়-নীতি তুচ্ছ করে অর্থলোভ এবং অর্থলাভ। ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই সংকট থেকে জন্ম নেয় বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্য। এই ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। একদল মানুষ আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চায় এবং একদল মানুষ যেন তেন ভাবে স্বার্থসিদ্ধির পথেই জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পায়। এই উপন্যাসে সাধনা ও অনুপমের আদর্শবোধের মাধ্যমে মানিক সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করেছেন।

গল্পগ্রন্থ-১ : মিহি ও মোটা কাহিনি

এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং তৃতীয় গল্প সংকলন। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৬ + ১৬২, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল — *টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজশীলা, খুকি, অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি*। পত্রিকায় যে গল্পগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাদের প্রকাশ তথ্য নিম্নরূপ:[৭]

রকমারি	মানসী ও মর্মবাণী	বৈশাখ ১৩৩৬
বিড়ম্বনা	আগতা	আষাঢ় ১৩৩৮
শৈলজশীলা	গল্পলহরী	শ্রাবণ ১৩৩৯
কবি ও ভাস্করের লড়াই	বিচিত্রা	অগ্রহায়ণ ১৩৪১
সিঁড়ি	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	চৈত্র ১৩৪৩

হাত	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
টিকটিকি	পরিচয়	শ্রাবণ ১৩৪৪
অবগুণ্ঠিত	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪৪
বিপত্নীক	?	?
ছায়া	?	?
আশ্রয়	?	?
খুকি	?	?

টিকটিকি

মিহি ও মোটাকাহিনী গল্পসংকলনের প্রথম গল্প এটি। জ্যোতিষার্নব নিজে জ্যোতিষ চর্চা করে বহুলোকের ভাগ্যগণনা করেন। এটি তার প্রধান পেশা। এমনকি স্ত্রীর মৃত্যু সংকেত তিনি পান টিকটিকির ডাকে এবং মৃত্যুর পরে স্ত্রী স্বর্গে না নরকে গেছে জানবার জন্য টিকটিকির ডাকের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। মা কোথায় গেছে, তার বড় ছেলের জিজ্ঞাসায় জ্যোতিষার্ণব টিকটিকির ডাকের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকেন —

> স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক যে টিকটিকিটা তার ছেলে মেয়ের মা'র মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিল সেটা অন্তত একবার ডেকে উঠত। হোক না অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই।[৮]

তারপর নানা জটিল যুক্তি তর্ক নানাচাড়া করে জ্যোতিষার্ণবের মনে হয় যে তার স্ত্রীর স্বর্গে যাওয়ার পথ বন্ধ। কেন না জ্যোতিষার্ণবের স্ত্রী কুমারী জীবন থেকে জ্যোতিষার্ণবের সঙ্গে থাকলেও, সে ছিল অবিবাহিত বৌ। তাই জ্যতিষার্ণবের মতে তার স্বর্গে যাওয়ার পথ বন্ধ। সেই জন্যই টিকটিকিটা ডেকে ওঠেনা। ফলে অন্য সময় ছেলে একই প্রশ্ন করলে জ্যোতিষার্ণব স্ত্রীর নরকে যাওয়ার কথা বলে, টিকটিকির ডাকের জন্য সে অপেক্ষা করে। এই গল্পের কাহিনীটি শ্লেষ ও বিদ্রূপে ভরা। জ্যোতিষার্ণবের চরিত্রের কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব এই গল্পে আক্রমণের বিষয়। টিকটিকি নামক প্রাণীটিকে নিয়ে আমাদের সমাজে ও গৃহে নানান কুসংস্কার প্রচলিত আছে। সে সংস্কারের বশে অনেকেই টিকটিকিকে ত্রিকাল দ্রষ্টা বলে মনে করেন। এই বিষয়টিকে গল্পে উপস্থাপনের মাধ্যমে মানিক মধ্যবিত্ত সমাজের অশিক্ষা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তীব্র কষাঘাতে কটাক্ষ করেছেন।

জ্যোতিষার্ণব জানতেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দ্বারা স্থাপিত ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর ক্লায়েন্ট ও অন্যান্যদের কাছে জানিয়েছিলেন, টিকটিকির ঘোষণা এবং কুষ্ঠি বিচারের মাধ্যমে তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছিলেন। এ তার মানুষের বিশ্বাস অর্জনের ভণ্ড প্রচেষ্টা। সে এও জানায় — কুষ্ঠি বিচার করে এবং গণনা করে যেদিন টিকটিকিটা স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বলার পর ডেকে উঠেছিল, সেই দিন গোধূলীবেলা পর্যন্ত তার স্ত্রীর আয়ু ছিল। জ্যোতিষার্ণবের এই সব বানানো গল্প আসলে মানুষের

কাছে নিজের ভণ্ড জ্যোতিষ চর্চার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস। গল্পের শেষে দেখি জ্যোতিষার্ণব আবার একটি বিবাহ করে রেবতীকে ঘরে আনে। আর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পাঠক বুঝে নেয় জ্যোতিষার্ণবের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু আসলে নিয়তি নির্দিষ্ট নয়, তাই ব্যঙ্গের সুরে মানিক বলেন —

> তার ছেলে মেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আর একটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানেনা।[৯]

টিকটিকি এই গল্প সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। আমাদের সমাজের পুরানো সংস্কার, পুরানো ধ্যানধারণাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন মানিক এই গল্পে। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের মিথ্যাচারকে এই গল্পে তুলে ধরেছেন। আমাদের জীবনের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাসকে মানিক এখানে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। টিকটিকিরা ডাকে তাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করার জন্য। ভবিষ্যতের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করার জন্য নয়। অথচ সেই টিকটিকির ডাক শুনে আমরা জীবনের সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করি। সাহিত্যে এভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ মানিকের সাহিত্যেই প্রথম। সেই সঙ্গে ফ্রয়েড কথিত মানুষের অবচেতন মনের অবদমিত কামনা বাসনা ও যৌন প্রবৃত্তির লক্ষণও এই গল্পে আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয় স্ত্রী রেবতীকে ঘরে আনার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষার্ণবের মানসিক বিকারটি আরো স্পষ্ট হয়েছে। তাই গল্পের শেষে মানিক বিদ্রুপের সুরে বলেন —

> হয়ত রেবতী জ্যোতষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়তো টিকটিকির জন্য জ্যোতিষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাওয়ার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে এবং স্বর্গে যাবার প্রতিক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।[১০]

বিপত্নীক

পুরুষের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গল্পের শুরু। গল্পের নায়ক তার স্ত্রীকে সন্দেহ করে, তিরস্কার করে এবং শাসন করে। এমনকি নিজের পায়ের জুতো ছুঁড়ে মারতেও দ্বিধা বোধ করেনা। স্ত্রীকে এই ভাবে আঘাত ও অপমান করে নায়ক সারারাত চমৎকারভাবে ঘুমিয়ে ওঠে। ঘুমের তৃপ্তিকর আমেজ নিয়ে জেগে ওঠার পর শুয়ে শুয়ে আলসেমি করতে করতে তার মনে পড়ে, গত রাত্রে স্ত্রী সবিতাকে সে কিভাবে শাসন করেছে। স্ত্রীর প্রতি এই বিকৃত ব্যবহারে সে অনুতপ্ত হয় না, বরং আত্মতৃপ্তি লাভ করে এই ভেবে যে: "স্ত্রীকে অবশ্য মাঝে মাঝে শাসন করা ভাল। বড় পাজী জাত, কেবল আদর দিলে একেবারে মাথায় উঠে যায়।"[১১] এই মানসিকতায় বসবাসকারী নায়ক তৃপ্তিকর ঘুমের পর চিন্তা করে কাল রাতে স্ত্রীকে জুতো ছুঁড়ে মারার পর কি করে আজ তাকে খুশি করা যায়। নিজের স্বামীত্বের তথাকথিত অহংকারটুকু বজায় রেখেই কিভাবে স্ত্রীর অভিমানের মর্যাদা রাখা যায়। নায়কের এই আত্মচিন্তনের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মানিক : "রাগ করে থাকার যার উপায় নেই,

রাত্রের শাসন সকালে উঠে নতুন করে আরম্ভ করলেও যার বলার কিছু ছিলনা, নিজে থেকে তাকে যেঁচে সহজভাবে কথা বলা, সহজভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য স্বামীর প্রতি সবিতার ভক্তি জন্মে যাবে।"[১২]

এরকম স্বার্থপর ও বিকৃত মানসিকতা যে স্ত্রীর প্রতি প্রভুত্বের অধিকার ফলানোর প্রচেষ্টা থেকে আসে, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ঘরের ড্রেসিংটেবিল, সবিতার জন্য কিনে দেওয়া জামাকাপড় দেখে নায়ক এগুলির মধ্যে নিজের উপার্জনের অহংকারকে তৃপ্ত করে এবং এগুলিকেই সবিতার প্রতি ভালবাসার প্রকাশ ভেবে আত্মতৃপ্তি পায়। এসব ভাবতে ভাবতে বিছানা ছেড়ে সে ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে আসে এবং দেখে সবিতা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে তার মনে কোন আকস্মিক বেদনার আঘাত লাগে না, বরং সে ভাবতে থাকে কি করে তার স্ত্রী উঁচু কড়িকাঠে আত্মহত্যার জন্য দড়িটি আটকে ছিল ? সবিতার সবটুকুই তার চেনা ছিল। কিন্তু সেই সবিতা কি করে এ কাজ করল সে তা বুঝে উঠতে পারে না। মানিকের প্রথম দিকের ছোটগল্পে বিভিন্ন চরিত্রগুলিতে নানারকম মানসিক বিকার লক্ষ্য করা যায়। *বিপত্নীক* গল্পের নায়ক তার অন্ধ সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় স্ত্রীকে এখনও পুরুষের দাসী মনে করে। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তার দুঃখ বা বেদনার থেকেও বেশি দুশ্চিন্তা হয় সবিতা এমন কাজটি কিভাবে করল ? স্ত্রীর প্রতি প্রেম বা অনুরাগ নয়, একপ্রকার প্রভুত্বগর্ব তার মানসিকতাকে বিকৃত করেছে। চমৎকারভাবে মানিক বিশ শতকের অন্ধ পিউরিটান মানসিকতায় আচ্ছন্ন পুরুষের মানসিক বিকারকে তুলে ধরেছেন এই গল্পে।

ছায়া

আর একটি মানসিক বিকার ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার গল্প *ছায়া* । এ গল্পের নায়ক স্ত্রীর মৃত্যুর পরও মেনে নিতে পারেনি যে তার স্ত্রী কোথাও নেই। স্ত্রীর সঙ্গ কামনায় ও বিরহ বেদনায় তার মধ্যে দেখা যায় একপ্রকার মানসিক অসুখ। স্ত্রীকে পাবার তীব্র ইচ্ছায় সে বাড়িটিকে খালি করে ফেলে এবং বাড়ির লোকজনকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় শূন্য বাড়িতে একটি মাত্র কাজের ঝি নিয়ে সে দিন কাটায়। সন্ধের পর থেকে সে বই পড়ে এবং চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে স্ত্রীর অশরীরী আগমনের প্রত্যাশায়।

এই ভাবেই তার রাত্রির পর রাত্রি কেটে যায়। একদিন সে আবিষ্কার করে সন্ধ্যায় ঘরে আলো জ্বলে বলে তার স্ত্রী তার কাছে আসতে পারে না। তারপর থেকে সে সন্ধ্যাবেলা আলো নিভিয়ে বসে থাকে। আলো নেভানোর পর চৌকো ছবির ফ্রেমের মত নারী মূর্তির ছবি ঘরে এসে পড়ে এবং অশরীরী স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলন হয়। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগে এবং বিরহে সে ঠিক করে আত্মহত্যা করে মরণোত্তর জগতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে। আত্মহত্যার প্রস্তুতি করতে সে যেমনি দরজা বন্ধ করে তার স্ত্রী ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায়। দরজা খুলে সে বুঝতে পারে দরজার বাইরে বাড়ির ঝি বসে আছে। সিঁড়ির নিচের বাঁকা আলো

দেওয়ালের গা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে তার মূর্তিটি ছায়া হয়ে ঘরে এসে পড়ে। এই বাস্তব কারণটি জানার পর নায়ক বছর খানেকের মত পাগল হয়ে গিয়েছিল। পরে সে আবার বিবাহ করে এবং তার মনের কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে ভেঙে যায়। এই গল্পে মানিক দেখাতে চেয়েছেন অন্ধ কুসংস্কার কিভাবে আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে এবং আরও অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কুসংস্কার নয়, এটি কুসংস্কার ভাঙার গল্প। তাই গল্পের শেষে নায়ক পুনরায় বিবাহ করে আশাবাদী জীবনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

হাত

এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র মহামায়া নামের একটি মেয়ে। শৈশবে পিতার মোটরে চেপে যাবার সময় একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মহামায়ার পিঠে এবং হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তার শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়। যার ফলে সে রোগা হয়ে গেছে। লম্বায় বা স্বাস্থ্যে তার উন্নতি হয়নি। কেবল তার হাত দুটি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। এই সামঞ্জস্যহীন শরীর তাকে যত না লজ্জা দিয়েছে তার চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে অস্বাভাবিক দুটি হাত। এই হাত দুটিকে নিয়ে মহামায়া সংসারের সকল কাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করে ফেলে। কিন্তু সব কাজই তাকে করতে দেওয়া যায় না। কেননা হাত দুটিকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সংসারের বহুত্বর প্রয়োজনে কাজ করে করে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু হাত দুটি কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। এমনকি ঘুমের ঘোরেও তার অস্থির হাত দুটি বিছানা-বালিশ-চাদর ছিঁড়ে ফেলে। টবের ফুলগাছ শিকড় সমেত উপড়ে এনে ছিঁড়ে ফেলে, অন্যের দামী শাড়ি ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয়, পাঞ্জাবি সেলাই করতে দিলে পাঞ্জাবির বোতামগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে মহামায়ার হাত দুটি তাকে চূড়ান্ত সমস্যায় ফেলে দেয়। অপমানে, তিরস্কারে, গঞ্জনায় ও আত্মধিক্কারে মহামায়া হাত দুটিকে পেতে দেয় বাঁধানো বই কাটবার যন্ত্রের তলায়। কনুইয়ের নিচ থেকে হাত দুটি কাটা পড়ে অচৈতন্য হওয়ার আগে মহামায়া বারীনকে বলে: "মরতে দিও না ভাই ঠাকুরপো বাঁচিও।" আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা থেকে মহামায়া হাত দুটি কেটে বাদ দেয়, নিজের অনিয়ন্ত্রিত হাত দুটির কৃতকর্মের যন্ত্রণা তার মধ্যে একপ্রকার মানসিক বিকার তৈরি করেছিল। সমাজের সবকিছুই ভারসাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই ভারসাম্য নষ্ট হলেই জীবনে নানারকম সংকট ও সমস্যা নেমে আসে। মানসিক বিকার সম্বলিত এই ধরনের সংকট ও সমস্যার একটি দিক আমরা এই গল্পে দেখতে পাই।

বিড়ম্বনা

গল্পের নায়িকা শ্বেতার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বিশ্লেষণ এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। শ্বেতা বিধবা এবং একটি সাত বছরের পুত্র সন্তানের জননী। এখন তার বয়স ছাব্বিশ। দীর্ঘ ন'বছর পরে তার একদা প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক অনন্তের সঙ্গে দেখা হয়। তার বাবার গড়ে তোলা স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে আসে অনন্ত। অনন্তের আগমনে শ্বেতার জীবন আবার অনুরাগ রঙিন হয়ে ওঠে। শ্বেতা জানতে পারে অনন্ত

তার বেদনায় পরবর্তী জীবনটা উদাসীন ভাবে কাটিয়ে দিয়েছে এবং শ্বেতার একটি ছবিকে সে আজও ফুল দিয়ে পূজা করে। তখন শ্বেতার সমস্ত শূন্যতা গভীর তাৎপর্যে ভরে যায়। তার অপরিতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা আবার জেগে ওঠে, কিন্তু সে যখন জানতে পারে অনন্তের একটি বিবাহিত স্ত্রী আছে এবং সে স্ত্রী অনন্তের কাছে আবার ফিরে এসেছে। তখন শ্বেতা রাগে ক্ষোভে হিংস্র প্রতিশোধময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়। স্কুল থেকে অনন্তকে তাড়িয়ে দিতে শ্বেতা সচেষ্ট হয়। মানিক তার অধিকাংশ গল্পেই মানব মনের জটিল ক্রিয়াকলাপের উপর আলোকপাত করেছেন। অনন্তের যে প্রেম শ্বেতার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়েছিল, সেই প্রেম যখন অন্য কোন নারীর প্রতি নিবেদিত হয় তখন তা শ্বেতার কাছে মনে হয় অত্যন্ত নীচতার, অভিনয়ের। মানুষ নিজের সম্পর্কে এতদূর অন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো মানুষের আত্মপ্রেম এত তীব্র হয় যে, স্বাভাবিক ভালোমন্দের বোধও লুপ্ত হয়ে যায়। মানিক চমৎকারভাবেই শ্বেতার জীবনের বিড়ম্বনাকে *বিড়ম্বনা* গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রকমারি

একাধিক ভাবের বা বিষয়ের একত্র সহবস্থানকে রকমারি শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়। আধুনিকা উকিল গৃহিণী তার সাংসারিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঝি-চাকরদের সামান্য দোষেও সাংঘাতিক বকাবকি করেন, স্বামীকেও শাসন করেন। পঁচিশ বছর বয়সের পূর্ণযৌবনা গৃহিণী জীবনের রসে পরিপূর্ণা; আসলে বকাবকি তর্জন গর্জনের তলায় তার যে স্নেহময় উৎসুক মনটি আছে তার পরিচয়ে লেখক চমৎকারভাবে দিয়েছেন। কৌতুকময় ভঙ্গিতে লেখা এই গল্পটিতে গৃহিণীর প্রবল স্নেহময় ব্যক্তিত্ব ও অন্তরের মাধুর্য, গল্পের সমস্ত চরিত্র গুলিকে মুগ্ধ করেছে এবং একটি আনন্দময় পরিণামে গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে।

কবি ও ভাস্করের লড়াই

একটি ত্রিকোণ প্রেমের ধ্বংসাত্মক পরিণতির গল্প *কবি ও ভাস্করের লড়াই*। গল্পের নায়িকা চারণীর আকাঙ্ক্ষা ছিল কোন একটি প্রতিভাকে সে লালন করবে, প্রেম দিয়ে প্রেরণা দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলবে। একুশ বছর বয়সে তার জীবনে একই সঙ্গে দুজন প্রতিভাধর পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমে তার জীবনে আসে উদীয়মান ভাস্কর অরবিন্দ, অরবিন্দের সঙ্গে বিবাহের কথা যখন প্রায় পাকা তখন তার জীবনে এসেছে প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কবি মহাব্রত। চারণী এই দুই প্রেমিকের বিপরীত আকর্ষণে নিরন্তর দোলায়িত এবং দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে শেষে এ দ্বন্দ্বের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। চারণীর শোচনীয় মৃত্যুর পরও এই দুই পুরুষ ঈর্ষায় এবং আক্রোশে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি করেছে। চারণীর মৃত্যু তাদের মানসিকতায় কোন সুস্থতা আনেনি বরং তাদেরকে আরও অসুস্থ করে তুলেছে। চারণীর জীবনে একসঙ্গে দুই পুরুষের আবির্ভাব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, শিল্পীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে চারণীর দোলায়িত হওয়াও বিচিত্র নয়; কিন্তু তার আত্মহত্যার

কোনো বিশ্বাস্য কারণ আমরা খুঁজে পাই না। আর মহাব্রত এবং অরবিন্দ প্রেমের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, চারণীর মৃত্যুর পরে তাদের এমন অসহিষ্ণু আচরণ অবিশ্বাস্য মনে হয়। মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানিকের তীব্র অন্তর্দৃষ্টি এই ছোট গল্পটিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আশ্রয়

আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় বঙ্কুর স্ত্রী এবং ছেলে একই সঙ্গে মারা যায়। এই শোকের অভিঘাতে বঙ্কু মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। সামান্য কথা বুঝতে তার দেরী হয়, নির্বোধের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এই বঙ্কু শচীন দত্তের বাড়িতে কাজ করতে এসে বিনা মাইনেতে আধপেটা খেয়েও কাজ ছেড়ে চলে যায় না। তার কারণ শচীন দত্তের কন্যা নন্দরাণীর সঙ্গে সে তার মৃতা স্ত্রীর সাদৃশ্য খুঁজে পায়। নন্দরাণীর একান্ত বশম্বদ হয়ে সে কাজ করে। নন্দরাণীর প্রতি তার আনুগত্যপূর্ণ আচরণ অনেক সময় অসহ্য মনে হয় এবং তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে যায় না। অসীম আনুগত্যে বঙ্কু ফিরে আসে নন্দরানীর কাছে। নন্দরানীর বিয়ে হয়ে যায় এবং বঙ্কু সেখানে গিয়ে নন্দরাণীর বাড়িতে চাকরের কাজ করে বিনা মাইনেতে। কথা হয়, বঙ্কুর মাইনে জমা থাকবে নন্দরাণীর কাছে। কুড়ি বছরের মাইনে জমা হয়ে গেলে, নন্দরাণীর স্বামী রসিকতা করে বলেন, বঙ্কু মাইনে চাইলে তিনি নন্দরাণীকেই বঙ্কুর কাছে বিক্রি করে দেবেন। আসলে মানসিক বিকার থেকে নন্দরাণীর প্রতি বঙ্কুর যে দুর্বলতা, সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রথমে নন্দরাণীর পিতৃগৃহে এবং পরে স্বামীগৃহে তাকে বিনা মূল্যে কাজ করানো হয়েছে। নন্দরাণী বঙ্কুর মানসিক ভারসাম্যহীন জীবনের আশ্রয়। স্ত্রীর মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বঙ্কুর জীবনে এমন আঘাত নিয়ে এসেছিল যে, বঙ্কু সেই মানসিক আঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। তার সেই মানসিক অস্বাভাবিকতা থেকেই বঙ্কু তার গোটা জীবন এই ভাবেই কাটিয়ে দিল। শুধুমাত্র স্ত্রীর রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য জনিত কারণে অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্খা থেকেই বঙ্কুর এমন আচরণ। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের ব্যবহার মানুষের জীবন কাহিনীতে মানিক এভাবেই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তুলে এনেছেন।

শৈলজশীলা

গল্পের নায়ক হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে, লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে একটি গুহায় একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যা সন্তানকে কুড়িয়ে পায়। পাশে পাওয়া একটি চিঠি থেকে সে জানতে পারে এই কন্যা সন্তানটির মা একজন বাল্য বিধবা। ক্রমে ক্রমে ষোল বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই কন্যা সন্তানটি এখন ষোড়শী। নাম শীলা। অসাধারণ রূপ লাবণ্যে শীলা সবাইকে মোহিত করে। শীলায় জন্ম বলে মেয়েটির নাম রাখা হয় শীলা। এই গল্পের নায়ক যিনি শীলাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তিনি অবিবাহিত প্রৌঢ় এবং বিকৃত কাম মানসিকতায় জর্জরিত। তাই নিজেরই পালিত কন্যার রূপ-যৌবন তাকে প্রলুব্ধ করে এবং সে নিজেই শীলাকে বিয়ে করতে চায়। তার এই কামনা শীলার উদাসীন গাম্ভীর্যে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ভূপেন নামের একটি তরুণ সুপাত্র শীলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে এলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং

শীলাকে নিয়ে দেশত্যাগ করে অন্য জায়গায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেয়। শীলার উদাসীনতা নায়কের মনে বিষাদময় পরিবেশ তৈরী করে, কিন্তু সে শীলার উপরে জোর করতেও পারে না। তার মধ্যে কাজ করে অদ্ভুত এক ধরনের অধিকার বোধ, সে ভাবে যেহেতু এই পৃথিবীতে শীলাকে সে বাঁচিয়েছে, তাই শীলা তারই অধিকারের, ভোগের বস্তু। নায়কের এই অধিকারবোধের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন মানিক —

> শীলাকে নিয়া আমি যে আদিকাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে বড় একথা মানা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শীলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ ? কেনই বা শীলাকে আমি ছাড়িব। বিলাইয়া দিবার জন্যে এত কষ্টে এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া ?[১৩]

প্রেম এবং যৌনতা যে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে চিরদিন ক্রিয়াশীল এবং যা প্রকৃতিদত্ত ও অন্ধ। তাই নায়কের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জাগরুক। শীলার প্রতি পিতৃসম প্রৌঢ় নায়কের সদাজাগরুক প্রেমকে কামনার বিকার বলা যায়। সমাজে স্বাভাবিক কতগুলি অনুমোদিত সম্পর্ক আছে, এক্ষেত্রে নায়ক সে সব নীতি মানতে চায়নি। সে নিজের স্নেহের পুতুলী মেয়েটিকে কামনার নারীতে পরিণত করতে চেয়েছিল। ইচ্ছা করলে সে বল প্রয়োগ করতে পারত, কিন্তু তা সে পারেনি। আর তা পারেনি বলেই গল্পটি একজন শয়তানের গল্প নয়, একজন তৃষিত কামনাতাড়িত মানুষের গল্প। ফ্রয়েডীয় যৌনমনস্তত্ত্ব ও তৎপ্রসূত মানসিক বিকার এই গল্পের উপজীব্য। গল্পটি প্রেমের গল্প, কিন্তু স্বাভাবিক প্রেমের গল্প নয়। এক অতৃপ্ত যৌবন প্রৌঢ় অভিভাবকের অস্বাভাবিক অচরিতার্থ প্রেমের গল্প।

খুকী

গল্পের নায়ক সৌম এবং নায়িকা কাদম্বিনী। সৌম একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে তাদের প্রতিবেশী ডাক্তারের মেয়ে খুকী অর্থাৎ কাদম্বিনী আর বালিকা নেই, সে এখন ১৭-১৮ বছরের পূর্ণ যুবতী নারী। সৌমর প্রণয় নিবেদনে সহজেই সাড়া দেয় মেয়েটি। সৌমর মধ্যে একপ্রকার প্রণয় জনিত মানসিক বিকার লক্ষ্য করা যায় — সৌম চায় তার প্রেমিকার মধ্যে হতাশা তাড়িত অশ্রুকাতর বিরহ ব্যাকুল নায়িকাকে আবিষ্কার করতে। তাই প্রণয় সম্পর্ক সত্ত্বেও খুকীকে সে বিয়ে করবে না জানায়। প্রণয়কলা পক্ক যুবক সৌম অন্য তরুণীদের প্রণয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত এক প্রকার মানসিক অস্বাভাবিকতা অর্জন করেছিল। সে তার প্রেমিকাদের মধ্যে আগামী বিচ্ছেদের ভাবনার বীজ বপন করে তাদের মধ্যে বিরহ কাতর রোমান্টিক নায়িকাকে খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু তার এই অদ্ভুত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কেননা কাদম্বিনী সহজ সরল এবং শান্ত স্বভাবের মেয়ে এবং তার মধ্যে কোনরূপ অস্থিরতা দেখা যায় নি। আর এ কারণেই সৌম সরল ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতাকে মর্যাদা দিয়ে কাদম্বিনীকে বিবাহ করে। মানিক সৌমর

এই মানসিক বিকৃতির মধ্যে আসলে দেখাতে চেয়েছেন যেমন মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব, সেই সঙ্গে সমকালীন অস্তিত্ব সময় ও সমাজের প্রভাবে আক্রান্ত হওয়া মানব চরিত্রের অস্থির অসুখ।

অবগুণ্ঠিত

গল্পের নায়ক নবীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন আত্মমুখী বিবাহিত সুখী তরুণ। অফিস বেরুবার আগে তার লাজুক তরুণী বধূর আচার-আচরণের মধ্যে সে গভীর ভালোবাসা খুঁজে পায়। পথে কোন রমণীর চোখে তাকাতেই তার অবগুণ্ঠিত মন লজ্জায় কুণ্ঠা বোধ করে। সে ভাবে মাইনে বাড়লেই স্ত্রীকে একটি নতুন শাড়ি কিনে দেবে, শাড়ি সে এখনই কিনে দিতে পারে কিন্তু তার স্ত্রী জোর করে না বলেই স্ত্রীকে এত সে পছন্দ করে। মধ্যবিত্ত সুলভ এই ভীরু, সুখী, নমনীয় চরিত্রটির মধ্যে অবগুণ্ঠিত সামাজিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

সিঁড়ি

এই গল্পের নায়ক মানব একটি তিনতলা বাড়ির মালিক এবং তিনটি তলাই ভাড়া দিয়ে সে উপরে চিলেকোঠায় থাকে। একতলার দরিদ্র ভাড়াটে কন্যা ইতির সঙ্গে বাড়ির মালিক চল্লিশ বছরের মানবের গোপন সম্পর্ক দেখা যায়। ইতি মানবের কাছে যায় গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে এবং কয়েক মুহূর্তের প্রণয়লীলার পরে তারা দুজনে নীচে নেমে আসে। নামার সময় দোতলা ও তিনতলায় বধূদের সঙ্গে দেখা হলে ইতি নির্দ্বিধায় জানায় যে, মানবকে বাড়ি ভাড়ার টাকা দিতে উপরে গিয়েছিল। তিন তলার প্রথম বধূটি স্বামী-পুত্রের সঙ্গে আনন্দেই থাকে, সে ভাড়ার টাকাও ঠিকঠাক মানবের হাতে তুলে দেয়, ইতির অভাব তাড়িত অবিবাহিত নারীসুলভ ঈর্ষা সে উপভোগ করে। দোতলায় সুধা নামের বৌটিকে নিখোঁজ স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে মানব বিব্রত করে। বাকি থাকা বাড়ী ভাড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পের শেষে লেখক দেখিয়েছেন মানব তিন চার ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যায়। আসলে তিন চারটি নারী চরিত্রকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে, দমিত করে রেখে মানব একপ্রকার আত্মসম্মানবোধ অনুভব করে। সে একটি তিনতলা বাড়ির মালিক। তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রয়েছে, তার পক্ষেই সম্ভব এই নারীগুলির দীনতা ও অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে সুযোগ বুঝে তাদেরকে ভোগ করা। মানবকে মহামানব বলে গল্পকার একটি সূক্ষ্ম শ্লেষ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এই গল্পে।

এই সংকলনের প্রায় সবকটি গল্পই অস্বাভাবিক মানসিকতাপূর্ণ চরিত্রদের নিয়ে গড়া। প্রতিটি গল্পেই লেখক বাইরের ঘটনার চেয়ে অন্তর্জীবনের দিকে, মানবমনের রহস্যলোকের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। গত শতকের তিনের দশকেই সাহিত্যে ও শিল্পে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব খুবই প্রচলিত ছিল। ফ্রয়েডের ভাবনায় মানুষের অবদমিত বাসনার মূলে যৌন প্রবৃত্তি। আর অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার ফলে অনেক সময় মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। তবে শুধুমাত্র ফ্রয়েডীয় দর্শনের প্রভাব মানিকের গল্পে

আছে এমন নয়, পাভলভের মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষণ এবং নিজস্ব 'কেন' রোগের ক্রম পরিণতিতে পাওয়া জীবনদৃষ্টি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা তাঁকে এ ধরনের জীবন বিশ্লেষণে আগ্রহী করেছে। মানিকের মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পগুলির মধ্যে পাভলভীয় চিন্তার প্রভাব এবং অ্যালফ্রেড অ্যাডলারের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেই সঙ্গে সমকালীন গণ-আন্দোলনের ফলে প্রাপ্ত পরিবর্তনশীল চিন্তাভাবনা এবং 'সময়-নিয়তি' নিয়ন্ত্রিত মানুষের মনের নানারকম অসুখ এই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষীভূত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ২৮৬।

২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ৪৯০।

৩. 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।

৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১।

৮. 'টিকটিকি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

১১. 'বিপত্নীক', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯।

১৩. 'শৈলজশীলা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩।

১৯৩৯

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩১তম বছর। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। ব্রিটিশ সরকার ভারতকে 'যুদ্ধরত দেশ' বলে ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে ভারতবাসীকে জড়িয়ে দেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে সমস্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। ত্রিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্বাচিত হলে, গান্ধিজি সমর্থিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা এই নির্বাচন মানলেন না। গান্ধিবাদী সদস্যরা ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ। মুসলিম লীগ প্রধান জিন্নার বিরোধীতায় জাতীয়সঙ্গীত বন্দেমাতরম-এর অঙ্গচ্ছেদ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কমিউনিস্টদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ন্যাশনাল ফ্রণ্টের প্রকাশের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। 'মহাজাতি সদন' এর উদ্বোধন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন, — "নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি সাবলম্বন, গণআন্দোলন এবং গণসংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। ... যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়, আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র।" ফ্রান্সে গিলেটিনে শেষ প্রাণদণ্ড।

জানুয়ারি ২ — বোম্বাইয়ের সাধারণ ধর্মঘটে দুই লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন।

জানুয়ারি ২১ — জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে **'দেশনায়ক'** আখ্যা দেন।

জানুয়ারি ২৯ — গান্ধিজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

ফেব্রুয়ারি ১২ — কংগ্রেসের ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন সদস্য সদ্য নির্বাচিত সভাপতির সাথে সহযোগিতা করা সম্ভব নয় বলে পদত্যাগ করেন।

মার্চ ৯ — ব্রিটিশ সরকার শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।

মার্চ ১০ — ত্রিপুরার ৫২ তম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

মার্চ ১৪ — কলকাতায় 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। পরে এই মঞ্চের নাম হয় 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চ।

মার্চ ২৬ — কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগপত্র সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন।

মার্চ ২৯ — সুভাষচন্দ্র গান্ধিজিকে অনুরোধ করেন, হয় তিনি সব মতের লোক নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে দিন, না হয় সম্পূর্ণ নিজের মনোমত লোকেদের নাম ঘোষণা করুন।

মার্চ ৩০ — গান্ধিজি সুভাষচন্দ্রকে জানান তিনি যেন তার মনোমত লোক নিয়ে ক্যাবিনেট তৈরি করেন।

এপ্রিল ৭	ইতালি আলবানিয়া আক্রমণ করে।
এপ্রিল ৯	৯-১০ এপ্রিল বিহারের গয়ায় 'সারা ভারত কৃষক সভা'র ৪র্থ সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে আচার্য নরেন্দ্রদেব এবং স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী।
এপ্রিল ২৯	কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্র পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
এপ্রিল ৩০	সভার কর্মপরিচালিকা সরোজিনী নাইডু নির্দ্বিধায় সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ গ্রহণ করেন ও বিনা ভোটে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি ঘোষণা করেন। ওয়ার্কিং কমিটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বাংলার অস্থায়ী (Ad-hoc) কমিটি গঠন করে।
মে ১	সুভাষচন্দ্রের অধীনে যে বারোজন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটিতে সদস্য হতে অস্বীকার করেছিলেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের পুনর্নিয়োগ করেন। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের পরিবর্তে নতুন সদস্য হন বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।
মে ৩	সুভাষচন্দ্রের মনে হয় কংগ্রেসের মধ্যে এক সংঘবদ্ধ বামপন্থী উপদল গঠন প্রয়োজন। তার পরিপ্রেক্ষিতে 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' জন্ম।
জুন ২২	বোম্বাইতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
জুলাই ৬	দমদম ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দিরা অনশন শুরু করেন।
জুলাই ৯	জুন মাসে গৃহীত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি 'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস' পালন করে।
আগস্ট ১২	ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করে।
আগস্ট ১৯	সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহাজাতি সদন নামটি কবিগুরুরই দেওয়া।
সেপ্টেম্বর ৩	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।
সেপ্টেম্বর ১৮	কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রস্তাব দেয় যে তারা শর্তাধীনে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে রাজি আছে।
অক্টোবর	সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন ফরওয়ার্ড ব্লক নাগপুরে এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করে।
অক্টোবর ২	বোম্বাইয়ের ৯০ হাজার শ্রমিক একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বর্বর সুলভ দমননীতির প্রতিবাদ করে।
অক্টোবর ১০	কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানান হয় ভারতবাসী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে রাজি আছে যদি তাদের স্বাধীনতার অঙ্গীকার দেওয়া হয়।
অক্টোবর ১৭	লর্ড লিনলিথগো এক ঘোষণায় জানান ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মর্যাদা দেওয়াই ব্রিটিশের লক্ষ্য।
অক্টোবর ২৭	গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা করা সম্ভব নয় বলে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে।

নভেম্বর ১৭ নাজি সৈন্যরা প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অত্যাচার চালায়। এই ঘটনার স্মরণে এই দিনটি আন্তর্জাতিক ছাত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়।

নভেম্বর ২৩ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহিত হয়।

ডিসেম্বর ১৪ 'লিগ অব নেশনস' থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়।

ডিসেম্বর ২৭ কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে হিন্দু মহাসভার তিনদিনব্যাপী সর্বভারতীয় সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বীর সাভারকর।

মার্চ ১৫ জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে।

আগস্ট ২৩ জার্মানি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি।

সেপ্টেম্বর ৩ ঘোষিত হল ব্রিটেন বনাম জার্মানির যুদ্ধ।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য —অমিয় চক্রবর্তী : *একমুঠো* / প্রিয়ম্বদা দেবী : *চম্পা ও পাটল* / মণীন্দ্র রায় : *ত্রিশঙ্কু* / রবীন্দ্রনাথ: *আকাশপ্রদীপ* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *পৃথিবী* / সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : *বিজয়িনী*। **নাটক** — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *শ্যামা* / শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *কামাল আতাতুর্ক, তটিনীর বিচার, সংগ্রাম ও শান্তি* / বিধায়ক ভট্টচার্য : *মাটির ঘর* / জলধর চট্টোপাধ্যায় : *প্রাণের দাবী* / বনফুল : *শ্রীমধুসূদন*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় : *আরণ্যক* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *ধাত্রীদেবতা* / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *শেষের পরিচয়*। **গল্পগ্রন্থ** — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *সরীসৃপ*।

পত্রিকা প্রকাশ — *অগ্রণী* : প্রফুল্ল রায় / *গিরীকা* : সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার / *বিশ্ববাণী* : স্বামী স্বরূপানন্দ / *তরুণ বাণী* : কনক বন্দ্যোপাধ্যায় / *রাজপথ* : বিনয় চট্টোপাধ্যায় / *চয়নিকা* : সতীকুমার নাগ / *অচলায়তন*: সুরেশ বিশ্বাস / *বৈজয়ন্তী* : জগদীশ ভট্টাচার্য / *চলন্তিকা* : পাঁচুগোপাল দাস।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : যোগেন চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত, রাহুলদেব বর্মন।

মৃত্যু : আশরফ আলী খান, জলধর সেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রসন্নময়ী দেবী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

জানুয়ারিতে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা দেন। নিজস্ব প্রকাশনী সংস্থা গড়ে তোলার ইচ্ছে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুজ সুবোধ কুমারের সহযোগিতায়, কালিঘাটে উদয়াচল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস নামে একটি ছাপাখানা ও প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মানিক আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখলেও তা বাস্তবে সফল হয়নি। *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার চাকরি ছাড়ার পর সম্ভবত ১৯৩৯ সালেই মানিক ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভেন্সিয়াল অরগানাইজার বেঙ্গল দপ্তরে

পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে যোগদান করেন। সম্ভবত ১৯৪৩ সালের মে-জুন মাস পর্যন্ত তিনি এ চাকরিতে যুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভবানী মুখোপাধ্যায় বলেন —

> তখন তার মনে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা জেগেছে। মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হওয়ার ফলে মানিক ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজটা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজ করার সময়। এই সময়েই সে প্রথমে প্রগতি লেখক সংঘে যোগদান করে এবং ক্রমে পুরোপুরিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে।[১]

জানুয়ারি থেকে *পরিচয়* পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে *অহিংসা* উপন্যাস। আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *সরীসৃপ*। সেপ্টেম্বরে *শারদীয়া আনন্দবাজার* পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস *শহরতলী* মুদ্রিত হয়, কোনো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় বা শারদীয়া সংখ্যায় সমগ্র উপন্যাস প্রকাশের রীতি সূচীত হয় *শহরতলি* দিয়ে। অক্টোবর মাস থেকে *মাসিক* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *শহরতলি* উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের প্রকাশ শুরু হয়। পাশাপাশি এ বছরে কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়: 'সঞ্চয়াভিলাষীর অভিমান' (*আনন্দবাজার*, ফাল্গুন ১৩৪৫)। 'সমুদ্রের স্বাদ' (*মাসিক পত্রিকা*, ভাদ্র ১৩৪৬), 'পূজাকমিটি' (*নতুনপত্র*, আশ্বিন ১৩৪৬), 'স্নায়ু ' (*পূর্বাশা*, ১৩৪৬), 'চাষার বৌ' (*বর্ষবাণী*, ১৩৪৬), 'কলহের জের' (*বৈজয়ন্তী*, পৌষ, ১৩৪৬), রমাপতি বসু সম্পাদিত ১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা শীর্ষক সংকলনে মুদ্রিত হয় *উত্তর দক্ষিণ* নামে মানিকের একটি কবিতা (ভাদ্র, ১৩৪৬)।

গল্পগ্রন্থ-১ : সরীসৃপ

সরীসৃপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশম গ্রন্থ ও চতুর্থ গল্পসংকলন। প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৩৯। প্রথম সংস্করণের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ১৭৬, দাম দেড় টাকা। সংকলনে থাকা মোট বারটি গল্পের মধ্যে সর্বশেষ গল্পটির নামে এই গল্প সংকলনটির নামকরণ করা হয়েছে। এই সংকলনে উপস্থিত গল্পগুলি : *মহাজন, বন্যা, মমতাদি, মহাকালের জটার জট, গুপ্তধন, প্যাঁক, বিষাক্ত প্রেম, দিকপরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অবলার ইতিকথা*, দুটি ছোটগল্প : *বোমা* ও *পার্থক্য* এবং *সরীসৃপ*।[২]

এই সংকলনের কয়েকটি গল্পের পত্রিকায় প্রকাশ তথ্য নিম্নরূপ:[৩]

মহাকালের জটার জট	দীপক	আশ্বিন ১৩৩৯
সরীসৃপ	বঙ্গশ্রী	আশ্বিন ১৩৪০
দিক পরিবর্তন	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	৭ই পৌষ ১৩৪৩
নদীর বিদ্রোহ	বঙ্গশ্রী	আষাঢ় ১৩৪৫

প্যাঁক	পরিচয়	শ্রাবণ ১৩৪৫
বন্যা	যুগান্তর	আশ্বিন ১৩৪৫
মহাজন	আনন্দবাজার পত্রিকা	আশ্বিন ১৩৪৫
গুপ্তধন	?	?
বিষাক্ত প্রেম	?	?
মহাবির ও অবলার ইতিকথা	?	?
বোমা ও পার্থক্য	?	?

মহাজন

সরীসৃপ গল্পসংকলনের প্রথম গল্প *মহাজন*। গল্পের নায়ক-নায়িকা বিধুশেখর ও বাঙ্গা স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাদের মধ্যে তিরিশ বছরের ব্যাবধান রচিত হয়। জীবনের শেষ বেলায় উপনীত হয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান এবং সমস্ত জীবন নষ্ট করার অনুতাপে গল্পটির সমাপ্তি। কি কারণে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল গল্পে তার উল্লেখ নেই। বিধুশেখর বছরে মাত্র চারদিন বাড়ি আসতেন। বাঙ্গা তার দুঃখ, বেদনা, ব্যাকুলতা, আবেগ, অসহায়তা বিধুশেখরের কাছে প্রকাশ করেনি। তার ধারণা ছিল যে মাত্র চার দিনের জন্য বাড়ি আসে তাকে শুধু হাসি মুখে, কেবল প্রফুল্লতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করতে হয়, কোনো বিষাদের ছাপ সেখানে রাখা উচিত নয়। আসলে তাদের সম্পর্কের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল জটিল মানসিক বিকার। মানিকের প্রথম দিকের অনেক গল্পেই এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রধানভাবে লক্ষণীয়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বাঙ্গা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। তার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। ক্রুদ্ধ বিরহে, ব্যথিত হৃদয়ে আবেগটিকে চেপে রাখতে না পেরে বাঙ্গা তার অসহায়তাকে প্রকাশ করে ফেলে। আগের মতো পরিচ্ছন্ন প্রসাধিত হয়ে হাসি মুখে বাঙ্গা স্বামীর সঙ্গে আলাপ পরিহাস করতে পারে না। এতদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিধুশেখর এবারের অভিজ্ঞতাকে মেলাতে না পেরে বিচলিত হন। ফিরে যাবার নির্দিষ্ট দিন পেরিয়ে গেলেও ফেরেন না, থেকে যান এবং অবশিষ্ট জীবনের কটা দিন বাঙ্গাকে নিয়ে একসঙ্গে কাটাবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব বুঝে উঠতে বাঙ্গার একটু সময় লাগে, তারপরেই বাঙ্গা চরম আবেগে দুঃখে ফেটে পড়ে —

> বাঙ্গা দুচোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে ? আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকবো ?
> যদি তুমি রাজি হও। আমি ভাবছিলাম কি, কবে কি হয়েছিল সেজন্য এতকাল তুমিও কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পেলাম, এবার বাকি কটা দিন —
> বাঙ্গার মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। সে সংক্ষেপে বলিল তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে।
> বিধু বলিল, কি বললে ? অনেকদিন বাঁচব ? বাঁচা বাঁচির কথা পরে হবে, তুমি রাজি তো ?
> রাজি নই ? ওগো আমি যে সারা বছর তোমার জন্য কাঁদি আর পথের পানে চেয়ে দিন কাটাই।

গ্রাম্য মেয়ে এভাবে পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটানোর কথা বলিলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব না হইয়া পারে ?[৪]

বিধুশেখরের এত বছরের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, কেননা প্রতিবারই বাঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নিয়ে বিধুশেখর বাড়ি আসে। কিন্তু বাঙ্গার হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি দেখে এবং তার মধ্যে কোনো বিরহকে আবিষ্কার করতে না পেরে বিধুশেখর ফিরে যায় —

নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি প্রত্যেকবার তোমার রকম-সকম দেখে ভড়কে যেতাম। আমায় ছাড়া যে অমন ফূর্তিতে থাকতে পারে, তাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বলতেই সাধ হত না।[৫]

দীর্ঘ তিরিশ বছরের জীবনের অপচয়ের মূল্য আর কিভাবে পরিশোধ করা সম্ভব ? তাই বেদনার হাহাকারের মধ্যে গল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রথম পর্বের মানিকের অন্যান্য গল্পগুলির মতো এই গল্পের মধ্যেও মানসিক বিকার ও মনস্তত্ত্বগত জটিলতা এবং তার থেকে উদ্ভুত জীবন সমস্যার বিশ্লেষণ রয়েছে। আমাদের এই নিয়তি তাড়িত জীবনে কখনো কখনো এমন দেখা যায় যে আমরা সবকিছু জেনেও মুর্খের মতো আচরণ করি। কালপ্রবাহে প্রত্যেকটি মানুষ যে এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ভাসমান এবং তাদের মধ্যে লবণাক্ত বিরহের দুস্তর ব্যবধান — সেই সত্যটি এই গল্পের দুই চরিত্রে প্রকাশিত।

বন্যা

প্রকৃতির খেয়াল মানুষের জীবনে কখনো আশীর্বাদ কখনো অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। এরকমই একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে *বন্যা* গল্পটি রচিত। বন্যা মানুষকে অসহায়ভাবে তার মূল থেকে উপড়ে ফেলে, ঘর বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মানুষের কাছ থেকে তার প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, অকালমৃত্যু গ্রাস করে তরুণ জীবনকে। আমাদের দেশে এই বন্যার বিরুদ্ধে স্থায়ী কোনো প্রতিরোধ বা পরিকল্পনা গড়ে ওঠেনি। তার ফলে অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে নেমে আসে অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণার অন্ধকার।

প্রতিবছরই বন্যা আসে এবং অসহায় মানুষের জীবনগুলিকে প্রহসনে পরিণত করে। দরিদ্র বিপন্ন মানুষগুলি ঘর ছেড়ে ঘরের চালায় ওঠে, বড়ো গাছের শক্ত ডালে মাচা বেঁধে তাতে আশ্রয় নেয়, উঁচু বাঁধে গিয়ে বসবাস করে, তবুও রক্ষা নেই। এই বন্যা গ্রাস করে নেয় অসতর্ক মানুষকে, প্রিয়জনের দুই হাতের ব্যাকুল বন্ধন থেকে খসে পড়ে আপনজন। বন্যা কবলিত এলাকাগুলির এই চির পরিচিত নিষ্ঠুর সত্যটি *বন্যা* গল্পে মানিক নির্লিপ্ত নিরাশক্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। শেষরাত্রে বন্যার জল খুব প্রবল হয়ে উঠলে ভৈরব, মহেশ প্রায় সকলেই ঘরের চালার উপর উঠে বসে —

ভৈরবকে শেষ রাত্রির দিকে একেবারে ঘরের চালায় উঠিতে হইল। আজ কতকাল এই শনে ছাওয়া চালা তাকে সপরিবারে আকাশের কৃপণ-অকৃপণ বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে,

> আকাশ ফাটা রোদে জোগাইয়াছে ছায়া। এ চালার নীচে কতদিন রাত্রি কাটিয়াছে, কে জানিত কেবল তলায় নয়, একদিন রাত্রি শেষে দরকার হওয়া মাত্র উপরেও তার এমন আশ্রয় মিলিবে।[৬]

এই বিপর্যয়ের রাতে আলতামণির আর্তনাদ ভেসে আসে। তার স্বামী কানাই অচৈতন্য হয়ে জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল, নেশাগ্রস্ত কানাইকে অচৈতন্য জেনে তারা উদ্ধার করে, বহুকষ্টে আলতামণি তাকে একহাতে ধরে আর এক হাতে আমগাছের প্রায় ডুবন্ত একটি ডাল ধরে কানাইকে ভেসে যেতে দেয় না। তারপর বহুকষ্টে সবাই মিলে আমগাছের উঁচু ডালের মাথায় কানাইকে তোলে। আলতামণি সারারাত হাওয়া দেয় কিন্তু কানাইয়ের কোনো নড়ন-চড়ন নেই। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্মম সত্যটুকু চাপা থাকেনা যে কানাই মৃত, সে মারাগেছে অনেক আগেই, সারারাত একটি মৃতদেহকে তারা জীবন্ত ভেবে সেবা করেছে, প্রাণঘাতী বন্যার নিষ্ঠুর রূপটি প্রকট হয়ে পড়ে যখন আলতামণি তার তরুণ স্বামীটিকে বাঁচাতে না পারার জন্য প্রবল হাহাকারে ফেটে পড়ে। বার্ধক্য নয়, রোগ নয়, বন্যার কবলে পড়ে তার স্বামী মারা যায়। বন্যা এই সাধারণ মানুষগুলির অবলম্বনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, জীবন কেড়ে, মানুষকে ঘর ছাড়া করে। তবুও বিপর্যয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার না করে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামের প্রকাশে গল্পটি সমাপ্ত হয়।

মমতাদি

মমতাদি চরিত্রটিকে আমরা তৃতীয় গল্প সংকলনের ‘বৃহত্তর ও মহত্তর’ গল্পের মধ্যে পাই। স্থূলরুচির আত্মসম্মান জ্ঞানহীন একটি পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মমতাদির। অথচ মমতাদি নিজে ছিলেন সূক্ষ্ম আত্মসম্মান বোধযুক্ত রুচিশীল মহিলা। এই মমতাদি লেখকের বাড়িতে রাঁধুনী হয়ে এসেছিল। লেখকের তখন বালক বয়স, মমতাদি কাজ সারে লির্লিপ্ত ভঙ্গিতে, মনিব বাড়ির সঙ্গে অযথা আত্মীয়তা পাতাবার চেষ্টা করেনা। কিন্তু বাড়ির ছোটো ছেলেটি অর্থাৎ লেখকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় সন্তানটির আগমন সম্ভাবনার জন্য মমতাদিকে কাজ ছেড়ে দিতে হয়, পরে আবার পুরোনো বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ নিতে বললে মমতাদি রাজি হয়না। আত্মসম্মানবোধ যুক্ত মমতাদি সামন্ততান্ত্রিক মনোভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়, যার পশ্চাতে লুকিয়ে রয়েছে পুরুষ প্রাধান্যযুক্ত মূল্যবোধ।

মহাকালের জটার জট

পাশাপাশি বসবাস করে এরকম দুটি পরিবারের নানান বয়সী নারী পুরুষদের মনের বিচিত্র লীলা ও কার্যকলাপ এই গল্পটিকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব এই গল্পটির মধ্যে দেখা যায়। আধাপাগল সুন্দরী যুবতী সুচিত্রার বিবাহের জন্য তার মামা বহুকষ্টে একটি পাত্র জোগাড় করে আনে, কিন্তু দেখাশোনার দিন সুচিত্রা উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে জানায় যে সে বিবাহিত এবং দ্বিতীয়বার সে কিছুতেই বিবাহ করবে না। পাত্রপক্ষ মুচকি হেসে বিদায় নেয়। গল্পের শুরুতেই একটি

সুন্দর সুগঠনা মেয়ে উঠনের ধূলোয় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। লেখক আসলে দেখাতে চেয়েছেন তার দেহটি সুন্দর কিন্তু মনটি বিকৃত। আসলে আমাদের এই যে বাইরের সবকিছু ঠিকঠাক সুন্দর সুবিন্যস্ত জীবন, এর গভীরে কিন্তু রয়েছে মনোবিকার, কামবিকার, অবিন্যস্ত-বিশৃঙ্খল চিন্তা, অসুন্দর ভাবনার উপস্থিতি।

আধা পাগল সুচিত্রা উন্মাদের মত পঞ্চু নামের একটি ছোটো ছেলেকে ভালোবাসে। পরিবারের সবাই মনে করে তার মৃত ছোটো ভাইটির কথা মনে করেই সুচিত্রা পঞ্চুকে স্নেহ করে। কিন্তু তার আচার-আচরণ দেখে তা মনে হয় না। মাত্র পনের বছর বয়সের পঞ্চু কিশোর সুলভ লাবণ্য হারিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়, তার মধ্যেও দেখা যায় নানা অস্বাভাবিকতা। অস্বাভাবিক এই গল্পের সবকটি চরিত্রই। সুচিত্রার মা'র সম্পর্কে পাশের বাড়ির যুবক সতীশ যে মনোভাব পোষণ করে তাও খুব সহজ স্বচ্ছন্দ নয়, আবার সরমার মেয়ে সুমিত্রা, আগামী শ্রাবণে যার বিয়ে ঠিক করা আছে অন্য পাত্রের সঙ্গে, সতীশকে দেখা যায় সেই সুমিত্রার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ এবং অসঙ্গত অবস্থায়। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র সুলতা, সে সাত মাসের ভ্রূণের ভারে মন্থর, তারও এক বিচিত্র মমতাময় আকর্ষণ পাশের বাড়ির বর্ষীয়ান কাকাবাবু যাদবের প্রতি, যাদবের কন্যা মনোর একটি একমাসের পুত্রসন্তান হয়ে মারা যায়, সেই শোককেও লেখক দেখিয়েছেন বিচিত্র উপায়ে —

> খোকাতো শুধু আমার ছেলে হয়ে আসেনি ওর মধ্যে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম, সাথী পেয়েছিলাম, প্রেমিক পেয়েছিলাম। বিয়ের পর উনি যেমন নিরাশ্রয় প্রেম নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, খোকা তেমনিভাবে তাকাতে শিখেছিল। ... খোকার হাত গালে ঠেকলে ওঁর প্রথম দিনের স্পর্শ আমার মনে পড়ে যেত, রোমাঞ্চ হয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়ত ভয়ে।[৭]

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যে ঈডিপাস এবং ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স নামক মানসিক অবস্থাটির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই কমপ্লেক্স থেকেই এই গল্পটির জন্ম। কন্যাতুল্য সুলতার প্রতি যাদবের আকর্ষণ, পুত্র তল্য সতীশের প্রতি সরমার আকর্ষণ, আপন সদ্যজাত পুত্রের মধ্যে মনোরমার প্রেমিককে আবিষ্কার, বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতৃসম পঞ্চুর সঙ্গে সুচিত্রার অস্বাভাবিক সম্পর্কের ইঙ্গিত — এসব ঘটনা প্রমাণ করে এই সম্পর্কগুলির মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স কার্যকর। গল্পটির নাম 'মহাকালের জটার জট'। আমাদের মনের অবচেতনলোকে সমস্ত জট পাকিয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে। সেই রহস্যলোকের জটিলতার প্রতি নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখক ইঙ্গিত করেছেন। আমাদের মনের মধ্যে এমন অনেক কিছুই ঘটে চলে যার সন্ধান আমরা নিজেরাই পাই না। অবচেতন স্তরের সেই সব কার্যকলাপ, যৌনবিকার এই গল্পটির মধ্যে স্পষ্ট।

গুপ্তধন

গল্পটি একটি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের গল্প। হরিখালি গ্রামের ভীম একজন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। এগারটি পলাশ গাছ নিয়ে ঘেরা তার বাসগৃহ। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সে জীবন যাপন করে। এই ভীম গ্রামের জমিদার, বড়লোক মেজোকর্তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তার মেয়ের সঙ্গে মেজোকর্তার গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পেরে। আর মেজোকর্তার মাথা ফাটানোর পুরস্কার স্বরূপ তাকে ডাকাতির দায়ে কৌশলে মেজোকর্তা জেলে পাঠিয়ে দেন। সাত বছর পর জেল থেকে ফিরে এসে ভীম দেখে যে তার পলাশ গাছ সমেত ভিটেটি উধাও এবং সেখানে খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে। মেজোকর্তার অত্যাচারে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গৃহহারা হয়ে কোথায় গিয়েছে কোনো ঠিক নেই। গ্রামের লোকের সঙ্গেও ভীমের সম্পর্ক ভালো ছিল না। সব মিলিয়ে ভীমের মধ্যে জেগে ওঠে ভীষণ প্রতিশোধ স্পৃহা। হরিখালি গ্রামটি ছিল টুল্পী নদীর ধারে, জোয়ারের সময় এই নদী ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। নদী আর গ্রামের মধ্যে নিরাপদ ব্যবধান রচনা করেছে বড় উঁচু বাঁধ। বাগদী পাড়ার দরিদ্র মানুষগুলিকে ভীম মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বলে, মেজোকর্তার বাড়িতে ডাকাতির সব সোনা ও টাকা লুকিয়ে রাখা আছে বাঁধের মধ্যে, এই লোভ দেখিয়ে ভীম বাগদী পাড়ার মেয়ে মরদকে মাটি কাটাতে রাজি করায়। মাটি কাটার ফলে বাঁধের প্রতিরোধ আলগা হয়ে যায়। জোয়ারের ধাক্কায় সমস্ত হরিখালি গ্রামটি ডুবে মরবে, এই প্রতিশোধস্পৃহা মিটাতে ভীম কাজটি করে। গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে এভাবে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহা মেটানো গল্পটির প্রধান বিষয়। শ্রেণি বিভক্ত বিচিত্র সমাজের বাস্তবতা এবং মনোবিকলনের প্রভাব একসঙ্গে সম্পৃক্ত করে মানিক এই গল্পটি রচনা করেছেন। মানব জীবনের বহু বিচিত্র ওঠা পড়ার মধ্যে এরকম অস্তিত্বের সংকট সমকালীন সময়ে মানিক দেখেছিলেন। তার সঙ্গে নিজের বলিষ্ঠ জীবনদর্শন মিশ্রিত করে গুপ্তধন গল্পটি মানিক রচনা করেছেন।

প্যাঁক

সুশান্ত স্বপ্ন দেখে লেখক হবার, নিজে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হয়েও সে স্বপ্ন দেখে সৌখিন, স্বচ্ছ, মসৃণ জীবনের। সে লিখতে চেষ্টা করে এমনই সাজানো সুন্দর জীবনের গল্প। মধ্যবিত্ত শ্রেণির তথাকথিত ভদ্রজীবনের প্রতি মোহ এবং বাস্তবের আঘাত কিভাবে জীবনকে পর্যুদস্ত করে, সেই কাহিনি এই গল্পের উপজীব্য। গল্পটি ব্যঙ্গাত্মক। সুশান্তদের বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকে ট্যাক্সি ড্রাইভার শিবচরণ। শীবচরণের অবিবাহিত বোন ভালোবাসে সুশান্তকে। শিবচরণ নিজে শ্রমজীবী ট্যাক্সি ড্রাইভার হলেও, মনে মনে মালতিকে ভদ্র পরিবারে বিবাহ দেবার স্বপ্ন দেখে। সুশান্ত চাকরী পায়না, শেষে মোটর ড্রাইভিং শেখার কথা ভাবে। সে কথা শুনে তার বাবা প্রথমে ক্ষিপ্ত হয় এবং তারপর শ্লেষের সঙ্গে বলেন: “ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন করে না।”[৮]

সুশান্ত শিবচরণের কাছে গাড়ি চালানো শেখার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বিফল হয়ে আবার সে কলম ধরে, সস্তার কলমে গল্প লেখার চেষ্টা করে। তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে মানিকের নির্মোহ নির্ভিক দৃষ্টিভঙ্গি এই গল্পটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। সমকালীন সমাজ পরিবেশে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যাগুলি মানুষের স্বপ্নকে কিভাবে বিবর্ণ করে তুলেছিল, তার খবর এই গল্পে আমরা পাই।

বিষাক্ত প্রেম

সত্য ও সরলার অসামাজিক কার্যকলাপ এবং উভয়ের ভালোবাসা ও ভালোবাসা হীনতার গল্প *বিষাক্ত প্রেম*। সরলা দেহপোজীবীনী আর সত্যের জীবিকা চুরী করা। অসামাজিক এই দুটি বৃত্তিই মানুষের মনকে নষ্ট করে। সত্য সরলার কাছে আসে চুরীর উদ্দেশ্য নিয়ে, আর সরলা সত্যকে খাতির করে আরো বেশি বেশি উপহার উপকরণ টাকাপয়সা আদায়ের লোভে। কিন্তু তারা পরস্পরের সাথে এমন ব্যবহার করে, যাতে দেখাতে চায় তারা পরস্পরকে বড়ই ভালোবাসে। সত্য ভাবে সরলার জমানো টাকা ও গহনাগুলি নিয়ে পালাবে আর সরলা ভাবে আদায় একটু কম হলেই সে সত্যকে তাড়িয়ে দেবে। একদিন সত্য সরলাকে বিষাক্ত মদ খাইয়ে তার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে পালাতে চায়, কিন্তু পালাতে পারে না। প্রেমের প্রতিক্রিয়ায় বাঁধা পড়ে তারা। আসলে তাদের অজান্তেই তাদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যার নাম প্রেম বা ভালোবাসা। সত্য ও সরলার মধ্যে যে সম্পর্ক তার সবটাই বিষাক্ত পরিবেশে দূষিত হয়ে উঠলেও, মনের মধ্যে কোথাও কোন টান সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্য সত্য সরলাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। দুই অসামাজিক মানুষের অসামাজিক কার্যকলাপ, লোভ, ছলনা, ঘৃণা, ভয়, ও প্রেম ইত্যাদির সংমিশ্রণে বিচিত্র স্বাদের গল্প *বিষাক্ত প্রেম*।

দিক পরিবর্তন

ধনী চিকিৎসক মনোহরের বাড়ির কাজের ঝি সখী একজন তরুণী বিধবা। মনোহরের বাড়ির চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান, কম্পাউন্ডার সকলেই তাকে পেতে চায়। সখী মনোহরকে গভীর শ্রদ্ধা করে এবং মনোহরের আশ্রয়ে সে মনের জোর পায়। তাই সখী বাড়ির কর্মচারী বা চাকরদের সহজেই উপেক্ষা করে চলে, কিন্তু মনোহরই একদিন তার সংযমের সীমা ভেঙে সখীকে কামনা করে এবং সখী সহজেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারপর সখী ক্রমশ হয়ে উঠে দেহপোজীবীনী। একে একে বাড়ির কম্পাউন্ডার, ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান সকলের সঙ্গেই তার আদিম জৈব সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সখী একদিন সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়লে, মনোহরের স্ত্রী জানতে পেরে সখীকে তাড়িয়ে দেয়। তার প্রতিক্রিয়া, "ভদ্রলোকের বাড়িতে তো এতো অনাচার চলতে পারে না।" সখীর এই বিপন্ন অবস্থার জন্য কে দায়ী তা জানা না গেলেও, সখীকে এই জীবনে প্রথম যে টেনে এনেছে, সে ভদ্র লোক মনোহর।

মনোহর, কম্পাউন্ডার, ঠাকুর, চাকর, ড্রাইভার সকলেই সখীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সকলেই ভাবছে সখীর গর্ভে তার সন্তান আছে। চমৎকার শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে মানিক দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃতির বিধানে সন্তানের যথার্থ উত্তরাধিকারের পেছনে পুরুষের ভূমিকার নেতিবাচক দিকটি। একটি সহজ সরল মেয়ের বিভ্রান্ত হয়ে দুঃখময় পরিণতির মধ্যে মানিক আমাদের সমাজের কুৎসিত পচা গলা রূপটিকে তুলে ধরেছেন। আপাত সুন্দর ভদ্রতার আড়ালে মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে হিংস্র শাপদ ও বন্যতা। আর তার ফলে নষ্ট হয় সখীর মতো মেয়েরা। সমকালীন সমাজে অবক্ষয় শুধু বহির্জীবনে প্রকটিত হয়েছিল এমন নয়, মানুষের মানসিক জগতেও তৈরি হয়েছিল অবক্ষয়ের চোরাবালি। বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবিত সেই অবশ্চয়িত সমাজের কালো ছাপ স্পষ্ট এই গল্পে।

নদীর বিদ্রোহ

সংক্ষিপ্ত আয়তনের এই গল্পটিতে একটি পরিণত যুবক চরিত্রকে আমরা পাই, যে পেশায় স্টেশন মাস্টার। সে নদী প্রেমিক, শৈশব থেকেই নদীর ধারে বড় হয়ে উঠছে এবং নদীর সঙ্গে তার আবাল্য সখ্যতা। কিন্তু বড় হওয়ার পর তার জীবন থেকে শৈশবের নদীটি হারিয়ে গেছে। বর্ষার দিনে সে তার কর্মস্থলের নিকটে পরিচিত বিপুলা একটি নদীকে দেখতে পায়, পাড়ে বসে নদীর জলস্রোতের সঙ্গে খেলা করে, দীর্ঘক্ষণ নদীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর অভিভূত হয়ে রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরার সময়, ট্রেনে কাটা হয়ে মারা যায়। প্রকৃতির প্রতি উদ্দাম আকর্ষণ তার এই পরিণতির কারণ। এই গল্পের মধ্যেও মনোবিকারগ্রস্ত একটি চরিত্রকে আমরা পাই, যার মধ্যে সুস্ত সহজ জীবন যাপনের লক্ষণ ছিল না।

মহাবীর ও অবলার গল্প

এই ক্ষুদ্র গল্পটি অবলা নামের প্রবল প্রতাপান্বিতা নারী ও মহাবীর নামে একটি ভীরু পুরুষের প্রেমের কাহিনী। গল্পটি ব্যক্তিত্বহীন পুরুষদের প্রতি ব্যঙ্গ করে লেখা। তেমন কোন ভাব গল্পটিতে জমে ওঠেনি।

বোমা ও পার্থক্য

গল্প দুটি অতি সংক্ষিপ্ত ও স্কেচধর্মী রচনা। প্রথম গল্পে নায়ক অক্ষয় স্ত্রীর জন্য দামী শাড়ি কিনে, ফেরার পথে ময়লা শতচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা ভিখারিনীকে একটি সিকি পয়সা দেয়। ভিখারিণীটি রাস্তা পার হতে গিয়ে অক্ষয়ের সামনেই গাড়ি চাপা পড়ে। তার শতচ্ছিন্ন কাপড়ের ভেতর থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে কতগুলি চকচকে টাকা।

পার্থক্য গল্পের তেইশ বছর বয়সের বিধবা সুনীতি দুটি দেবরের প্রতিই সমান মমতাময়ী। ছোটটির বয়স বারো এবং বড়টি সুনীতির সমবয়সী। ছোট দেওরটিকে আদর যত্ন করতে দেখলে, সবাই তার সুখ্যাতি

করে এবং বড় দেওরটির প্রতি আদর যত্ন দেখে পাড়ায় তার নামে ছি ছি রটে যায়। এই পার্থক্য সুনীতির জীবনে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি আরও পল্লবিত হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি।

সরীসৃপ

নির্মোহ নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানিক এই গল্পে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অর্থকেন্দ্রিক বাস্তব রূপের একটি দিক প্রকাশ করেছেন। অর্থ যেখানে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে প্রত্যেকটি মানবিক সম্পর্কের ভাঙা-গড়াও নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থের দ্বারা। প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষ ভাবে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটে অর্থের নিয়ন্ত্রণে। জীবনসত্যের এরকম বলিষ্ঠ প্রকাশ খুব কম গল্পেই দেখা যায়। নারী ও পুরুষের মনোলোকের সরীসৃপ লীলাকে নিয়ে এই গল্পের পটভূমি রচিত। মধ্যবয়স্কা চারু, তার সদ্য বিধবা তরুণী বোন পরি এবং বনমালি এই তিনজন নারী পুরুষের মনোজগতের সরীসৃপ লীলার নিখুঁত চিত্রায়ণ করেছেন লেখক।

ধনী শ্বশুরের পাগল পুত্রের সঙ্গে চারুর বিয়ে হয় ১৭ বছর বয়সে। বনমালীর বয়স তখন ১৫। প্রতিবেশি মোসাহেব পুত্র বনমালীর উপর চারুর দেখাশোনার ভার দিয়ে শ্বশুর যেতেন বাগান বাড়িতে। কিশোর বনমালীকে তখন চারু হাতের পুতুলের মতোই জব্দ করে রাখত,যদিও চারুকে বনমালী দেহ-মন দিতে চেয়েছিল সেই বয়সেই। তখন চারু বনমালীকে নিয়ে ইচ্ছেমত খেলা করেছে আর বনমালীর প্রেম চারুকে ঘিরে ঘুরে মরেছে দিনের পর দিন। ভাগ্যের পরিহাসে সেই বনমালীর হাতেই চারুর গৃহ বাঁধা পড়েছে, বনমালী যে কোন মুহূর্তে চারুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় চারু সবরকমভাবে বনমালীকে সন্তুষ্ট করে রাখতে চায়। নানারকম লজ্জা ও অপমান সহ্য করেও চারু বনমালীর সেবাযত্ন করে: "পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমন উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাইতে বসাইলে যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।"[৯]

এই অবস্থায় চারুর বিধবা বোন পরি একটি শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠল দিদির আশ্রয়ে। এরপর ক্রমশ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বনমালী সপরিবারে উঠে এল চারুর গৃহে এবং চারু নিজের বাড়িতেই আশ্রিতার মত থাকতে বাধ্য হল। দেখা দিল অন্য এক প্রতিযোগিতা। বনমালীর হৃদয় জয় করবার বাসনায় চারু এবং পরি হয়ে উঠল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীনি। একদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির রাতে চারু আবিষ্কার করে, পরি ও বনমালীর গোপন সম্পর্কের কথা —

> বনমালীর মুখের কাছে যদিও সে জড়সড় হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে... খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দুহাতে বুকের কাছে আকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।[১০]

পরির ভবিষ্যৎ যে বনমালীর পদাশ্রিত, এই নির্মম সত্যটি স্পষ্ট করে দেন মানিক খোকার মাটিতে বিছানা এবং বনমালীর চটি বুকে আঁকড়ে শুয়ে থাকার মধ্যে। আর উল্টোদিকে পরির প্রতি চারুর মর্মান্তিক মানসিক অবস্থাকে মানিক ফুটিয়ে তুলেছেন —

> কত আদরে যত্নে তাহাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সে পরি, সে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করিল, ইহার আকস্মিকতা, ইহার অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল। ... মতলব থাকে, যেদিকে যেভাবেই মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।[১১]

দুই নারীর এই গোপন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে চারু ঈর্ষায় প্রতিশোধগামী হয়ে উঠল। প্রতিহিংসা পূরণ করতে গিয়ে চারু পরিকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার বাসনায় কলেরার বিজানুযুক্ত পাত্রে তারকেশ্বরের প্রসাদ খাওয়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ঘটনাক্রমে চারু নিজেই কলেরায় মারা গেল। অপ্রতিদ্বন্দ্বীনী অবস্থায় পরি বনমালীকে তার দেহের আকর্ষণ দিয়েও বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারল না। সরীসৃপের মত পাক খাওয়া মনের অধিকারী বনমালী পরির প্রতি বিমুখ হল। বরং বনমালীর স্নেহ বর্ষিত হল চারুর পুত্র ভুবনকে বোম্বে মেলের গাড়িতে তুলে দিল তার মায়ের কাছে পাঠাবার নাম করে। গল্পের শেষে দেখি পরিকে বনমালী স্থান দিয়েছে বাড়ির নীচের তলায় পরিচারিকাদের সঙ্গে। ভুবনের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ জেনেও তার প্রতিক্রিয়া — "আপদ গেছে, যাক।" গল্পের শেষ বাক্য আমাদের চিনিয়ে দেয় অর্থকেন্দ্রিক সামাজিক পরিকাঠামোতে মানুষের পাশবিক লোভ ও স্বার্থপরতা: "ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দর বনের উপরে পৌছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।"[১২] সমাজের উঁচু তলার মানুষের মনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কুৎসিত কদর্য সরীসৃপরূপ চমৎকারভাবে আবিষ্কার করেছেন মানিক এই গল্পে। মূল্যবোধের চরম অবনমনে তাই মানুষ বনের পশুদের সঙ্গে সমীকৃত।

এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি রচনার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু না হলেও যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে বিশ্বজুড়ে। সারা বিশ্বময় একটা আতঙ্কিত অবস্থা। যুদ্ধের আশঙ্কার প্রভাব এবং দুর্ভাবনা আমাদের দেশেও এসে পড়েছে। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব, কালোবাজারী, দ্রব্যমূল্যের অতিবৃদ্ধি, শাসন ব্যবস্থার অবনতি — প্রভৃতি ঘটনা সামগ্রিক সমাজ পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছিল। আর এইসব ঘটনার অভিঘাত মানুষের মধ্যে তৈরি করেছিল চূড়ান্ত অ্যাবসার্ডিটি। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে সমকালীন যুগজীবনের বিকার, কুটিল মনোবৃত্তি, যৌনবিকৃতি, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ও জীবনসংগ্রাম অনেকটা জায়গা জুড়ে স্থান লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯।

২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ৪৯৩।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৩।

৪. 'মহাজন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬।

৬. 'বন্যা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭।

৭. 'মহাকালের জটার জট', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০।

৮. 'প্যাঁক', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫।

৯. 'সরীসৃপ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৯।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮০।

১৯৪০

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩২তম বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সমগ্র মানব সভ্যতাকে বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতও এই যুদ্ধের দাবানল থেকে রক্ষা পেল না। ব্রিটিশদেশ সঙ্গে ভারতও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। কমিউনিস্ট যুবকদের উদ্যোগে কলকাতায় অভিনিত হল *কেরানি* নাটক, এই নাটকে সরকারি অফিসের কেরানিদের শোষিত জীবনের ছবি তুলে ধরা হল। রামগড়ে 'আপস বিরোধী' সম্মেলনে আগত সমাজবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবীদের নিয়ে অতিন্দ্রমোহন রায় RSP নামে দল প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশের সঙ্গে আপস করার নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্রের ডাকা সম্মেলনে সারাভারতের অসংখ্য মানুষ ও বিপ্লবী নেতা যোগদান করেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ না দিয়ে হাজার হাজার মানুষ সুভাষচন্দ্রের আপস বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করেন। এই ভাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা-র বিরুদ্ধে অন্ধকূপ হত্যার বদনাম দিয়ে হলওয়েল মনুমেন্ট নির্মাণ করে ইংরেজরা, যা সমগ্র জাতির দাসত্ব ও অবমাননার প্রতিক রূপে প্রতিভাত হয়। পুনরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়। ব্রিটেন যদি ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়, তাহলে কংগ্রেস যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অনড় সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "দেশবাসীকে আমি বলে যেতে চাই ভুলো না, দাসত্বের চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর নেই। ভুলোনা অন্যায় অবিচারের সঙ্গে আপোস করা মহা অপরাধ। জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয় — এই হল চিরকালের নিয়ম।"

ফেব্রুয়ারি ১৯ অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে গান্ধিজির হাতে একটি পত্র তুলে দিয়ে শান্তিনিকেতনের শুভাশুভ দেখার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

মার্চ ১ পাটনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আইনঅমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মার্চ ১৯ রামগড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসু।

মার্চ ১৯-২০ রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের ৫৩ তম সম্মেলন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলেনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোযাণা করে, তাদের সাথে কোনো প্রকারের সহযোগিতা না করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

মার্চ ২৪ মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশন মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে। অন্ধ্রে সর্বভারতীয় কিষাণ সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল ৬-১৩ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক একটি জাতীয় সপ্তাহ পালন করে ও সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন চালাবার পক্ষে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়।

এপ্রিল ৯ জার্মানির ন্যাৎসি বাহিনী ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করে। নরওয়ের মন্ত্রীরা লণ্ডনে পালিয়ে যান।

এপ্রিল ২০ ব্রিটিশ ব্রিগেড ফরাসিতে পদার্পন করে।

RSP নামে দল প্রতিষ্ঠা করার জন্য অতীন্দ্রমোহনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

মে ৭ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ডি. লিট.' উপাধিতে ভূষিত করবে বলে ঘোষণা করে।

মে ১০ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুশেক্সবার্গ আক্রমণ করে জার্মান সৈন্য।

জুন সুভাষচন্দ্র গান্ধিজিকে একটি পত্রে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার উপযুক্ততম মুহূর্ত এসেছে বলে তা আরম্ভ করতে অনুরোধ করেন।

জুন ১৭-২০ ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ বৈঠকে গান্ধি-নীতি প্রত্যাখ্যাত হয়।

জুন ১৮ নাগপুরে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জুন ২০ ওয়ার্ধায় গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ। অহিংস নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবার জন্য সুভাষচন্দ্র আবেদন জানালেও গান্ধিজি রাজি হননি।

জুলাই ২ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের প্রাক্‌কালে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন।

জুলাই ৩ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন শুরু।

জুলাই ৩-৭ দিল্লিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দাবি উত্থাপিত হয় যে যদি যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয় তবেই কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে সাহায্য করবে।

জুলাই পূর্ণচন্দ্র দাস সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হন।

আগস্ট ৭ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেসকে যোগদান করার জন্য ভাইসরয় আমন্ত্রণ জানান।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তিনিকেতনে এসে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ডক্টর অব লেটার্স' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আগস্ট ৮ বড়লাট ঘোষণা করেন যুদ্ধ সমাপ্তির পর ভারতীয়রা নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করবেন, দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা; কি ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে, কি ভাবেই বা তারা কাজ করবেন, এসব স্থির করবে, ব্রিটিশ সরকার এমন কোনো ভারতীয় সরকারকে স্বীকার করবে না যে সরকার মুসলিম রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আগস্ট ১৯ ভাইসরয়কে আবুল কালাম আজাদ পত্র দিয়ে জানান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কি কি পার্থক্য রয়েছে।

আগস্ট ৩১ মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ভাইসরয়ের 'আগস্ট প্রস্তাব'-এর ইঙ্গিতকে স্বাগত জানিয়ে ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সেপ্টেম্বর 'বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায়' প্রতিষ্ঠান, আইন ১৯৪০ বিলটি পাশ হয়।

সেপ্টেম্বর ২৬ মার্কসবাদী, জার্মান নাট্যকার ওয়াল্টার বেঞ্জামিন নাৎসিদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যা করেন।

সেপ্টেম্বর ২৯ সাম্প্রদায়িক কারণ দেখিয়ে মুসলিম লীগ ৮ আগস্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই।

অক্টোবর গান্ধিজি এক নতুন পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করার কথা উদ্ভাবন করেন। স্বাধীনতা লাভ এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল 'স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা'। এই সংগ্রামের নাম দেওয়া হয় 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ'।

অক্টোবর ১৭ যুদ্ধ বিরোধী প্রচারের জন্য গান্ধিজির নির্দেশে বিনোবা ভাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করেন।

অক্টোবর ২৮ জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইনসভার ভোটে নির্বাচিত হন।

অক্টোবর ২৯ প্রেসিডেন্সি জেলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করেন।

অক্টোবর ৩০ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য জওহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হন ও তাঁকে চার বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর ৫ বিনা শর্তে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর ২২ কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন।

মে ৮ পৃথিবী ও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্টকে রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রেরণ।

মে ১০ হিটলার লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস আক্রমণ করেন।

জুন ১০ ইতালি ব্রিটেন ও ফ্রান্স আক্রমণ করে।

জুন ১৪ হিটলার কর্তৃক ফ্রান্স দখল।

আগস্ট ৭ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধি দান।

সেপ্টেম্বর ২৩ জাপান কর্তৃক ভারত ও চীন আক্রমণ।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অনুরাধা দেবী : *কপোত কপোতী* / কালিদাস রায় : *বৈকালী* / কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *মৈনাক* / বুদ্ধদেব বসু : *নতুন পাতা* / মণীশ ঘটক : *শিলালিপি* / মৃণালকান্তি দাশ : *আকাশ* / রবীন্দ্রনাথ : *নবজাতক, রোগশয্যায়, সানাই* / বনফুল : *অঙ্গারপর্ণী* / সমর সেন : *গ্রহণ* / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *উত্তর ফাল্গুনী* / সজনীকান্ত দাস : *কেডস ও স্যান্ডেল* / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *পদাতিক* / সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : *জোনাকি*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আদর্শ হিন্দু হোটেল* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *কালিন্দী* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *শহরতলি* / বনফুল : *নির্মোক* / প্রবোধ কুমার সান্যাল : *নদ ও নদী*। **গল্পগ্রন্থ** : লীলা মজুমদার : *বদ্যিনাথের বাড়ি* / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : *রাণুর তৃতীয় ভাগ* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *বৌ* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *কুড়িয়ে ছড়িয়ে*। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত প্রথম আধুনিক কবিতা সংকলন 'আধুনিক বাংলা কবিতা'।

পত্রিকা প্রকাশ – *কেয়া* : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / *সমসাময়িক* : নীরদ চৌধুরী।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

মৃত্যু : মোহাম্মদ ত্রয়াকুব আলী চৌধুরী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

এই বছরের প্রথম দিকে মানিকের নিজের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ'। জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *শহরতলি* প্রথমপর্ব। এই বছরেই *পরিচয়* পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় মানিক সম্পর্কে সম্ভবত প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে মানিক চরম দারিদ্র্যকে অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন, গুজরান করছেন। ২৩.১১.৪০ এর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখা একটি চিঠিতে মানিকের দারিদ্র্যতার ছবি ফুটে উঠেছে –

> রাঁচী যাওয়া এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্মানোর খরচ প্রভৃতির জন্য আমি গত কয়েক মাস বাবাকে কিছু দিতে পারি নাই। এখন হইতে পূর্বে যাহা দিতাম তাহার চেয়ে দশ-পনের টাকা অতিরিক্ত দিবার জন্য ওষুধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ওষুধ অপেক্ষা মানসিক শান্তি বেশি উপকারী হইবে। সাত দিন পূর্ব হইতে চা সিগারেট কমাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আর সাত দিন পরে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিব।[১]

এই বছরেই মানিকের ডায়েরিতে মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটি তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। তালিকাটিতে চোখ রাখলে আমরা মানিকের শারীরিক অবস্থা ও তৎপ্রসুত মানসিক অবস্থা এই সময় কেমন ছিল তা বুঝতে পারব।

২৬.৪.৪০	—	রাঁচী যাওয়ার পথে ট্রেনে During Sleep.
২৭.৪.৪০	—	রাঁচীতে দিনের বেলা তিনবার জোরালো।
১৫.৫.৪০	—	রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে একবার মাঝারি।
২৭.৫.৪০	—	রাত্রে ঘুমের মধ্যে আধঘণ্টা, পরে দুবার জোরালো।
২৮.৫.৪০	—	বেলা দশটার সময় একবার জোরালো।
৩০.৬.৪০	—	দুপুরে মাঝারি।
১৯.৮.৪০	—	শেষ রাত্রে, সকালে এবং বেলা চারটার পর জোরালো।
১৭.৯.৪০	—	রাত্রে ঘুমের মধ্যে জোরালো।
১৮.৯.৪০	—	দুপুরে জোরালো।
৫.১১.৪০	—	রাত্রে ঘুমের মধ্যে জোরালো।
৬.১১.৪০	—	দুপুরে জোরালো।

২৪.১১.৪০	—	রাত্রে ঘুমের মধ্যে একবার মাঝারি।
১৩.১২.৪০	—	রাত্রে একবার মাঝারি।
১৪.১২.৪০	—	রাত্রে একবার মাঝারি।
৯.১.৪১	—	রাত্রে মাঝারি।
১০.১.৪১	—	দুপুরে জোরালো।
৭.৩.৪১	—	দুপুরে একবার, রাত্রে একবার জোরালো।
৩০.১০.৪১	—	রাত্রে ঘুমোবার আগে একবার।[২]

এই বছরে বিভিন্ন গল্প প্রকাশিত হয়: 'কাজল' (*অলকা,* চৈত্র ১০৪৬), 'মানুষ কাঁদে কেন' (*চতুরঙ্গ,* চৈত্র ১৩৪৬), 'সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ' (*ভারতবর্ষ,* বৈশাখ ১৩৪৭), 'উদারচরিতা নামের বৌ' (*ভারতবর্ষ,* শ্রাবণ ১৩৪৭), 'অকর্মণ্য' (*শারদীয় নবশক্তি,* আশ্বিন ১৩৪৭), 'ভাঙাঘর' (*নতুন পত্র,* আশ্বিন ১৩৪৭), 'স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই' (*অলকা,* আশ্বিন, ১৩৪৭), 'প্রতিক্রিয়া' (*শারদীয় নরনারী,* আশ্বিন ১৩৪৭), 'গৃহিনী' (*মাসিক পত্রিকা,* কার্ত্তিক, ১৩৪৭)। 'জুয়াড়ির বৌ' (*ভারতবর্ষ,* অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭), 'মালী' (*চতুরঙ্গ,* পৌষ, ১৩৪৭)।

উপন্যাস-১ : শহরতলি

শহরতলি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব স্বতন্ত্র গ্রন্থ, মানিকের গ্রন্থ তালিকায় এটি ত্রয়োদশ সংখ্যক গ্রন্থ এবং সপ্তম উপন্যাস। প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ৯ জুলাই ১৯৪০। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, পৃষ্ঠা - ৪ + ২০৮, মূল্য ২ টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *আনন্দবাজার পত্রিকা* ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে উপন্যাসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কোনো সাহিত্যপত্রের শারদ সংখ্যায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি এই উপন্যাসটিকে দিয়েই শুরু হয়। পত্রিকায় প্রকাশকালে *শহরতলি* কে প্রথম পর্ব বলে উল্লেখ করা হয়নি, অল্প পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রথম পর্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

এই উপন্যাসের হাত ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন পথে যাত্রা শুরু করলেন। পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে মানিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মধ্যবিত্ত জীবনের ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, ভাববাদী হৃদয় সর্বস্বতার পথ পরিহার করেছিলেন। শরৎচন্দ্রীয় হৃদয়াবেগ সর্বস্বতা ও কল্লোলীয় রোমান্টিক ভাবালুতার কারবারি তিনি নন। এই উপন্যাসেই মানিক প্রথম শ্রমজীবী গরিব মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ছবি এঁকেছেন। এখানেই প্রথম স্পষ্টভাবে পুঁজিপতি মালিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ ও সংগ্রাম বিশ্লেষিত হয়েছে। এই উপন্যাস রচনার সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি অপ্রতিরোধ্য শ্রমিক অন্দোলনের ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। নানারকম বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল, তার প্রকাশ এই সময়ে প্রবলভাবে দেখা যায়। ১৯৩৭ সালে কানপুরে ৪০,০০০ শ্রমিক ৫০ দিন ধরে ধর্মঘট

পালন করে। ১৯৩৮ সালে মুম্বাইতে ৯০ হাজার শ্রমিক প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের চল্লিশ হাজার শ্রমিক এক মাসের বেশি ধর্মঘট পালন করে। এই সময় কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল সোয়া তিন লক্ষ। ১৯৪০ এর মার্চ মাসে মুম্বাইতে পৌনে দু লক্ষ সুতাকলের শ্রমিকরা চল্লিশ দিন ধরে ধর্মঘট করে। এই সময় শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে দমন করতে এবং শ্রমিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তি নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার ও দমন পীড়ন চালাচ্ছিল। দেশের জাতীয় জীবনে ও সমাজের মধ্যে এই শ্রমিক আন্দোলনগুলি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সমাজসচেতন শিল্পী মানিকও এই আন্দোলনের প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁর ডায়েরী ও চিঠিপত্রে যেমন এই সমস্ত ঘটনা ও উদ্বেগের বিষয়ে আমরা জানতে পারি, তেমনি একাধিক গল্প উপন্যাসেও তিনি সমকালীন এই জীবন সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে লেখকের জীবনচেতনা। গ্রাম বা শহর — কোনোটাই নয়। গ্রামীণ অস্তিত্বের সঙ্গে শহরের ক্লেদাক্ত মিতালিতে গড়ে ওঠে শহরতলি। আর এই শহরতলির অধিবাসীদের মধ্যে না আছে পল্লিজীবনের সারল্য ও বলিষ্ঠতা, না আছে শহরাঞ্চলের চূড়ান্ত উদাসিন্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সুলভ মানবমন। বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল এবং *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার মালিক শচীদানন্দ ভট্টাচার্যের আদলে মানিক এই উপন্যাসের প্রধান কুটীল চরিত্র সত্যপ্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন। সত্যপ্রিয়ের রহস্যময় করুণা, নকল দেশপ্রীতি, শ্রমিক কল্যাণের অছিলায় নোংরামি, আপাত ভালোমানুষীর আড়ালে প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্যমূলক স্নেহ ভালোবাসা ও নিষ্ঠুর ব্যবহার তাকে শয়তানে পরিণত করেছে। আর তার উল্টোদিকে নির্যাতিত অসহায় দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির নেত্রী যশোদা তার না আছে জ্ঞান না আছে আর্থিক স্বচ্ছলতা, না আছে সামাজিক প্রতিপত্তি, না আছে সত্যপ্রিয়র বিপক্ষে দাঁড়ানোর মত শক্তি। সে ব্যক্তিত্বময়ী, হৃদয়ের বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে বিপ্লবে পরিণত করতে চেয়েছে কিন্তু সত্যপ্রিয়র কারসাজির সামনে সে অসহায়ভাবে পরাজিত হয়েছে। সত্যপ্রিয়র চক্রান্তে শ্রমিকরা যশোদাকে ত্যাগ করে চলে যায়। তার বাড়ির সমস্ত ভাড়াটে কুলি-মজুরদের সুখ-দুঃখে সে আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছিল। তার কথায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করে, ধর্মঘট তুলে নেয়। যশোদা সেই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়। পুলিশ, মিল মালিক, শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ কোনো পক্ষই তাকে টলাতে পারেনা। যশোদা শ্রমিকদের নেত্রী কিন্তু আন্দোলন সম্পর্কে তার কোনো চেতনা নেই, যুক্তিপূর্ণ ভাবনা নেই। সে শ্রমিক দরদী, অশিক্ষিত রমণী। কিন্তু দরদী মন নিয়ে শ্রমিকদের সকল উপকার করা যায় না। তাই সত্যপ্রিয়র চক্রান্তে তার পরাজয় ঘটে।

এরকম বিষয় নিয়ে এবং এ ধরনের আঙ্গিকে মানিক আগে লেখেননি। শ্রমিক-মলিক বিরোধ বা সরাসরি শ্রেণিসংগ্রামের গল্প আগে কোনো রচনায় আঁকেননি মানিক। এই প্রথম কোনো উপন্যাসে মানিক পুঁজিপতি এবং শ্রমজীবী মানুষের বিরোধ ও শোষণের চিত্র এত স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। পরবর্তীকালে

মানিক মার্কসবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসটি রচনার সময় মার্কসীয় শ্রেণি সংগ্রামের বোধ পরিচ্ছন্নরূপে তাঁর মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। সমকালীন সময়ে ঘটে চলা বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী মানিকের চেতনায় শ্রেণিসংগ্রামের চিত্রটি স্পষ্ট করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং তোষণ কিভাবে আমাদের সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তা মানিক নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছিলেন।

মানিক যখন এই উপন্যাস লিখছেন তখন দেশের বড় বড় শহরগুলির সম্প্রসারণ ঘটছে। শহরের আশে পাশে গড়ে ওঠা কলকারখানাকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে শহরতলী। সেই সব শহরতলীতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষজন নতুন করে বসবাস আরম্ভ করেছে। মানিক নিজেও শহরতলী অঞ্চলে বেশিরভাগ সময় থেকেছেন। ফলে এই শহরতলীর জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিবিড় অভিজ্ঞতা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়া সেইসব অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামী প্রতিবাদী চেতনাকে আশ্রয় করে মানিক *শহরতলী* প্রথম পর্ব উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার নানারকম অস্থিরতা, স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন সহ নানান ঘটনাবলী চল্লিশের দশককে শুরু থেকেই অস্থির করে তুলেছিল। এই উপন্যাসে আমরা সেই অস্থির সময়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

গল্পগ্রন্থ-১ : বৌ

বৌ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম গল্প সংকলন এবং একাদশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। ভ্রাতা সুবোধ কুমারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদয়াচল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা তৈরি করেছিলেন মানিক। এই প্রকাশনা সংস্থা থেকেই ১৯৪০ সালে *বৌ* গল্প গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ + ১৮১, দাম দেড় টাকা।[৪]

প্রথম সংস্করণে গল্পের সংখ্যা ছিল আট। গল্পগুলি যথাক্রমে: *দোকানীর বৌ, কেরাণীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজি বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পুজারীর বৌ, রাজার বৌ*। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে মার্চে। প্রকাশক এম সি সরকার এণ্ড সন্স্, কলেজ স্কোয়ার। দাম দু টাকা বার আনা। এই সংস্করণে আরো পাঁচটি নতুন গল্প যুক্ত হয়। গল্পগুলি: *সর্ববিদ্যা বিশারদের বৌ, উদার চরিত নামের বৌ, জুয়াড়ির বৌ, অন্ধের বৌ, প্রৌঢ়ের দুনম্বর বৌ*, গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশসূত্র নিম্নরূপ[৫]:

কেরানীর বৌ	উত্তরা	শ্রাবণ ১৩৪০
পূজারীর বৌ	উত্তরা	আশ্বিন ১৩৪০
রাজার বৌ	উত্তরা	অগ্রহায়ণ ১৩৪০
কুষ্ঠরোগীর বৌ	উত্তরা	ফাল্গুন ১৩৪০
বিপত্নীকের বৌ	উত্তরা	আষাঢ় ১৩৪২
সাহিত্যিকের বৌ	ভারতবর্ষ	শ্রাবণ ১৩৪৩

দোকানীর বৌ	প্রবাসী	শ্রাবণ ১৩৪৩
সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ	ভারতবর্ষ	বৈশাখ ১৩৪৭
উদারচরিত নামের বৌ	ভারতবর্ষ	শ্রাবণ ১৩৪৭
জুয়াড়ীর বৌ	ভারতবর্ষ	অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
অন্ধের বৌ	ভারতবর্ষ	বৈশাখ ১৩৪৮
প্রৌঢ়ের বৌ	ভারতবর্ষ	কার্ত্তিক ১৩৪৮

বৌ গল্পগ্রন্থে নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে মানিক বিস্ময়কর দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। এই গল্প গ্রন্থের নারীদের মনস্তত্ত্বে যেমন সামাজিক চেতনার প্রভাব পড়েছে, তেমনি সেখানে ধরা পড়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের মানসপ্রবণতা। মোট ১৩টি গল্পের সমবায়ে গড়ে উঠেছে মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থের অবয়ব। সমাজের নানা প্রান্ত থেকে নির্বাচিত ১৩ জন পুরুষের বৌদের নিয়ে নির্মিত এই গল্পগুচ্ছে নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এমন অনুপম প্রয়াস আর দেখা যায় না। গল্পগুলির শিরোনামেই আছে গ্রন্থটির মূল চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট আভাস। এই গল্পগ্রন্থে যে সব নারীর ছবি অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে মনোবিশ্লেষণ। মনোবিশ্লেষণের সূত্র ধরেই গল্পগুলিতে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থাৎ গল্পগুলিতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পটে উন্মোচিত হয়েছে সমাজ বাস্তবতারই বহুমাত্রিক ছবি।

দোকানীর বৌ

বৌ সিরিজের প্রথম বৌ সরলা, দোকানীর বৌ হিসেবে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। স্বামী শম্ভুকে আয়ত্বে রাখার জন্য সরলার নানা ধরনের কৌশল ও মনস্তাত্বিক টানাপোড়েন এই গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়। একজন নারী তার স্বামীকে একান্তভাবে প্রত্যাশা করে — কিন্তু সেখানে যদি কেউ ভাগ বসাতে আসে, তাহলেই নারী চিত্তে জাগ্রত হয় নানামাত্রিক অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। সরলার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এমন পরিস্থিতি। তাই দোকানে পুরুষ ক্রেতা এলে শম্ভুর ব্যবহারে সরলা মজা পেলেও নারী ক্রেতার ক্ষেত্রে ঘটে ভিন্ন পরিস্থিতি—

> মানুষ বুঝিয়া এমনসব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকের আড়ালে সরলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুর ব্যবহারে এরকম মজা লাগে সরলার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শম্ভুর দোকানে শধু পুরুষেরাই জিনিস কিনতে আসে না।[৬]

বাজারে নতুন দোকান দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভাইদের সঙ্গে শম্ভুর ঘনিষ্ঠতাকেও সরলা ভালোভাবে মেনে নিতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত বাজারে দোকান দেওয়ার টাকা চুরি গেলে স্বস্তি ফিরে পায় সরলা — কেননা এখন শম্ভু তারই থাকবে। বাজারে দোকান বা ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর থাকবে না তাই সরলার ভাবনা দূর হয়, বাবার কাছ থেকে টাকা আনার কথা বলে আশ্বস্ত করে শম্ভুকে —

সরলা তাড়াতাড়ি বলিল, এমন করে না লক্ষ্মী। যেমন দোকান করছিলে তেমনি কর এখন, বাবাকে বলে আর কিছু টাকা —

আর কি টাকা দেবে তোমায় বাবা!

সহজে কি দেবে ? আমি কাঁদা কাটা করলে—

ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া গিয়া সরলা স্বামীকে একবাটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল। সস্নেহে বলিল, খাও। না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে ? বাবা টাকা যদি নাই দেয়, — দেবেন ঠিক, যদির কথা বলছি — আমি গয়না বেচে তোমায় টাকা দেব।[৭]

কেরাণীর বৌ

নারী মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ প্রকাশ ঘটেছে *কেরাণীর বৌ* গল্পে। কংক্রীটের শহরে বন্দি-গ্রামীণ নারী সরসীর অসহায়তা এবং অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির আনন্দ এই গল্পের মূল উপজীব্য। শ্বশুরবাড়িতে এসে সরসীর বন্দিত্বের যন্ত্রণা ক্রমে তীব্ররূপ ধারণ করে। বড় বৌয়ের অসহযোগিতায় একসময় স্বামীকে নিয়ে পৃথক বাড়িতে গিয়ে সরসী খুঁজে পায় মুক্তির আনন্দ। মুক্তির জন্য সরসীর তৃষ্ণা এবং আকুলতা মানিক তুলে ধরেছেন —

> মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালিতেছে, ছাদের কোথায় একটুকরো ভাঙা কাঁচ পড়িয়াছিল, সরসীর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কোমরে কোনমতে কাপড় আঁটা আছে কিন্তু দেহের ঊর্ধ্বাংশ একেবারেই অনাবৃত, সরসীর খেয়াল নাই। আকাশে একটা চিলের সকাতর চিৎকারে সরসী শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে আজ তার আনন্দের উত্তেজনার বান ডাকিয়াছে, সে উন্মাদিনী। তার বহুদিনের দেওয়াল চাপা দুর্বল প্রাণে খোলা ছাদের এই সকরুণ দুঃসাহস, মানুষকে ভয় না করার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি, বুকের চামড়ায়, পিঠের চামড়ায় পৃথিবীর গরম বাতাস আর আকাশের রূঢ় রৌদ্র লাগানোর উগ্রব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না। তার ইচ্ছা হইতেছে, অর্ধাঙ্গের কার্পাস তুলার বাঁধনটা টানিয়া খুলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, দিয়া পাগলের মত সমস্ত ছাদে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে।[৮]

এই মুক্তি অবশেষে সরসীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে, ঘরসংসারে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে, তাকে করে তোলে পরিপূর্ণ নারী। গল্পের শেষে ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যে তার পরিপূর্ণ নারী সত্ত্বার প্রকাশ—

> এবার কোন কাজটা আগে করিবে ? বাক্সগুলি গোপনে রাখা চলিবে না, এদিকে সরাইয়া আনিতে হইবে, জলের কুঁজোটা যেখানে আছে সেইখানে।
>
> জলের কুঁজো! সরসীর দুচোখ চকচক করিয়া উঠিল। কি তৃষ্ণাই তার পাইয়াছে! হাতের কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না। উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকিটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল। কি তৃষ্ণাই সরসীর পাইয়াছিল।[৯]

সাহিত্যিকের বৌ

এই গল্পে বিখ্যাত এক সাহিত্যিকের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর মনোযন্ত্রণা এবং অন্তর্গত রক্তপাত শিল্পীত রূপ পেয়েছে। সাহিত্যিক সূর্যকান্ত এবং তার স্ত্রী অমলার মনোজাগতিক বিচ্ছিন্নতাকে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা এবং সূক্ষ্ম রহস্যচেতনার আলোকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থান কিভাবে তাদের মনস্তত্ত্বকে পাল্টে দেয়, মানিকের এ গল্পে তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। গল্পের সমাপ্তিতে অমলার মর্মদাহী পরিণতি পাঠক চিত্তে সঞ্চার করে গভীর সহানুভূতি। সূর্যকান্ত ও অমলার বয়সগত পার্থক্য, সূর্যকান্তের দায়িত্ববোধের অভাব, একান্নবর্তী পরিবারে নিজেকে একান্তভাবে পাবার সুযোগহীনতা — এসব অনুসঙ্গ সূর্যকান্ত ও অমলার মধ্যে সৃষ্টি করেছে মেরদূর ব্যবধান —

> চেহারায় একটা দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে... কথাবার্তা চলা ফেরায় সে খুব ধীর ও শান্ত — অনেকটা বৃহৎ সংসারের আকণ্ঠ সংসারী বড়-কর্তাদের মত.... পাকা সাঁতারুর মত সহজ অস্বাভাবিকভাবে সে সাঁতার কাটে জীবন সমুদ্রে।[১০]

"সংসারের কাজ করিতে করিতে সে অন্যমনা হইয়া যায়। বড়-জা, বিধবা ননদ, দুটি দেবর এবং আরো যারা বাড়িতে থাকে, পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সকলে মুখের দিকে তাকায় অমলা। মেয়েরা ফিসফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করে।"[১১]

একান্নবর্তী পরিবারে সকলের মধ্যে থেকেও অমলা মর্মে মর্মে ছিল নিঃসঙ্গ ও একাকী। স্বামীকে সে পেতে চেয়েছিল একান্তভাবে, কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতি ক্রমেই তাকে স্বামীর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে বহুদূরে। একান্নবর্তী পরিবারে অমলা কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। তার এই বেমানান স্বভাবটা ক্রমেই তাকে নিক্ষেপ করেছে সত্তা-শূন্যতার জটিল যন্ত্রণাগর্ভে।

বিপত্নীকের বৌ

এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে বিবাহপূর্ব এবং বিবাহ উত্তর এক নারীর বহুমাত্রিক মনস্তাত্ত্বিক ছবি। জীবনের দুই পর্বকে একাত্ম করে প্রতিমার যে ছবি এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তাতে ধরা পড়েছে নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে মানিকের সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের পরিচয়। একত্রিশ বছর বয়সী দোজবর স্বামীর সংসারে একান্নবর্তী পরিবার কাঠামোতে, অষ্টাদশী প্রতিমার দাম্পত্য জীবন কি কঠিন বিরূপতার মধ্যে নিপাতিত হয়। পরিবারের সকলের সম্মিলিত ঔদাসিন্য ও উপেক্ষায় প্রতিমার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ ও নিরানন্দময়। বিপত্নীক রমেশের ঘরে অষ্টাদশী প্রতিমার বধূসত্তা বিপর্যস্ত হয়েছে, পরিবারের সামূহিক বিরূপতায় সে হয়েছে ক্রমশ সঙ্কুচিত ও অন্তর্ধর্মে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। রমেশের পূর্ব স্ত্রী মানসীর মতো হতে চায়নি প্রতিমা, সে থাকতে চেয়েছে নিজের মতো। কিন্তু পরিবারের সবাই তার মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করেছে মানসীর অস্তিত্ব। এই সংকটই প্রতিমাকে কঠিন মানসিক যন্ত্রণাবর্তে নিক্ষেপ করেছে —

> মানসীর মতো করিয়া পাইতে চাহিলে প্রতিমাকে কেহ পায়না, মানুষকে পাইতে চাহিয়া না পাহিলে ভাল লাগিবার কথা নয়। অথচ প্রতিমার স্বকীয় আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া কাছে গেলে বড়ো সুন্দর একটি হৃদয়ের পরিচয় মেলে।[১২]

তেজী বৌ

এ গল্পে সুমতি চরিত্রের মাধ্যমে মানিক তুলে ধরেছেন নারী চিত্তের বিদ্রোহ চেতনা। শাশুড়ীর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুমতির বিদ্রোহ এ গল্পে চমৎকার ভাষারূপ পেয়েছে। সুমতির বিরুদ্ধে সময় খড়্গহস্ত ছিল তার শাশুড়ী, যেকোনো কাজেই শাশুড়ী খুঁত ধরত সুমতির —

> মেজাজটা শাশুড়ীর ভাল ছিল না। সকালে খোকাকে দুধ খাওয়ানোর সময় খোকা ভয়ানক চিৎকার জুড়িয়া দেওয়ায় শাশুড়ী বিশেষ কোনো অসন্তোষ বা বিরক্তি বোধ না করিয়াও নিছক শাশুড়ীত্ব খাটানোর জন্যই একবার বিলয়াছিলেন, না কাঁদিয়া দুধটুকু পর্যন্ত খাওয়াতে পারোনা বাছা![১৩]

এই গল্পে নারীর বিরুদ্ধে যেমন নারীর বিপরীত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, নারীর বিরুদ্ধে সামাজিক পুরুষতন্ত্রের ছবিটিও পরিষ্কার। কিন্তু কোনো বাধাই শেষ পর্যন্ত সুমতিকে আটকাতে পারেনি। তেজ দেখিয়েই সে প্রতিবাদ করেছে স্বামীর বিরুদ্ধে, শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।

কুষ্ঠরোগীর বৌ

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত যতীনের বৌ মহাশ্বেতার জীবনযন্ত্রণা, সেবাপরায়ণতা এবং যতীনের মানসিক বিপন্নতা নিয়েই গড়ে উঠেছে গল্পটি। অসুস্থ স্বামীর নানা আবদার মেটানোর চেষ্টা করে মহাশ্বেতা। ফলে মহাশ্বেতার মধ্যে ক্রমশ দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রোগীও সুস্থ মানুষের অবস্থান বদলে যায়। এ গল্পেও আছে পুরুষতন্ত্রের দাপট। যতীনের ভাষায় ও ব্যবহারে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ স্পষ্ট —

> ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায় ? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে ? যতীন বিশ্বাস করেনা। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি তার প্রয়োজন যতীনের পাশের ঘরখানা কি দোষ করিয়াছে ? নির্জন দুপুরে নিচের তলায় কোনার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা যাওয়া করিতে পারে ?[১৪]

যতীনের সন্দেহপ্রবণতা ও অমানবিক আচরণে বিষিয়ে ওঠে মহাশ্বেতার মন, সর্বব্যাপ্ত শূন্যতায় সে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। তার এই মানস অবস্থা মানিক তুলে ধরেছেন —

> মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, ... সব গোলমাল হইয়া যায়। ... জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র করে পচা ভ্যাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বারবার জন্মিয়া বারবার মরিয়া যায়।[১৫]

পুজারির বৌ

এই গল্পের নায়িকা কাদম্বিনী পরপর দুটি পুত্রকে পৃথিবীতে এনেও বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তার ছেলে দুটির মৃত্যু ঘটে। তৃতীয় সন্তানটি আসবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে অনুভব করে এই সন্তানটিও পৃথিবীতে এসে বেশিদিন বাঁচবে না। কাদম্বিনীর স্বামী গুরুপদ মন্দিরের পূজারি। সে ধার্মিক, সংযত এবং শান্ত। স্বামীর এই শান্ত মনোভাব দেখে কাদম্বিনীর কষ্ট আরো বেড়ে যায়, একসময় সে মানসিক যন্ত্রনায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তাই তৃতীয় সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই সে এক ধ্বংসাত্মক আবেগে দেবমন্দিরের কলসী নিয়ে দিঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করে। ডোবার আগে দেববিগ্রহের দিকে মুখ করে বিদ্রুপের সঙ্গে মনে মনে বলে, "তুমি আমার দুটি ছেলে চুরি করেছ। আমি শুধু তোমার একটি কলসী নিলাম। তোমার ক্ষমা চাই না।"[১৬]

রাজার বৌ

সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে রূপসী যামিনীর বিয়ে হয়েছিল রাজা উপাধিধারী জমিদার পুত্র ভূপতির সঙ্গে। ১৮ বছরের তরুণীর সঙ্গে ২৩ বছরের যুবকের এই পরিণয়, তাদের মধ্যে একটি গভীর উন্মাদ ব্যাকুল প্রেমের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে এই প্রেম-উন্মাদনা বহন করতে না পেরে ভূপতি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যামিনীর পুত্র সন্তান প্রসব করার সময়ে ভূপতি যামিনীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে চায় কাজের জগতে। কিন্তু যামিনী আঁকড়ে ধরতে চায় ভূপতিকে, পূর্বের প্রেমের তীব্রতা আর জেগে ওঠেনা। যামিনীর অন্তরাত্মা তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে রোমান্টিক প্রেমের জন্য। একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে পায় না আর আগের মতো।

উদারচরিত নামের বৌ

এই গল্পের যতীন নাম কেনবার মোহে নিজের আত্মজনের দিকে না তাকিয়ে, বাইরের লোকেদের জন্য অর্থ ব্যয় করে। তার অবস্থা ভালই ছিল কিন্তু সুখ্যাতির লোভে সে নিজের সংসারকে বরং গুরুত্ব দেয় না। নিজের বোনের বিয়ে দেয় অল্প খরচে অযোগ্য পাত্রে আর অন্যের বোনের বিবাহ সমস্যায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। তার চরিত্রের ভণ্ডামি আর সংকীর্ণতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে।

প্রৌঢ়ের দুনম্বর বৌ

এক প্রৌঢ়ের দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তরুণী বধূটির সঙ্গে প্রৌঢ় স্বামীর সম্পর্ক স্থাপনের সংকটের কথা তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে। রসিক প্রৌঢ়টির সঙ্গে বিবাহ হয়েছে একটি তরুণী মেয়ের, সে যৌবনধর্মে প্রাণ চঞ্চল। প্রৌঢ় পুরুষটি তার স্বভাব গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে কিছুতেই তরুণী বধূটির কাছে সহজ হতে পারে না। এই ধরনের সমস্যা নিয়েই 'প্রৌঢ়ের দুনম্বর বৌ' গল্পটি গড়ে উঠেছে।

সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ

এই গল্পে সুকুমারীর স্বামী নিবারণ সমস্ত বিষয়েই নিজেকে বিশারদ বলে মনে করে। বিবাহের রাত্রে সে স্ত্রীকে ডান দিক থেকে বামদিকে এসে শুতে বলে। স্ত্রীকে তার অভ্যস্ত ক্রিমটিকে মুখে মাখতে দেয় না, কেননা সে জানে সেই ক্রিম ভালো নয় — এরকম অনেক কিছুই সে জানে। সর্ববিদ্যাবিশারদ এই নিবারণ নিয়ম মেনে স্ত্রীর অভিমান ভাঙায়, নিয়ম করে স্ত্রীকে ভালোবাসে। স্বামীর এই ধরনের আচরণ সুকুমারীর মধ্যে তৈরী হয় একপ্রকার মানসিক সংকট। স্বামী সবসময়ে সববিষয়ে নিজের বিদ্যা জাহির করতে চায়। তাই সুকুমারী স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। ফলে তার দাম্পত্য সুখ ক্রমশ বেরঙিন হয়ে ওঠে।

অন্ধের বৌ

মনোবিশ্লেষণের নিপুণ পরিচয় আছে এই গল্পে। প্রথম বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পরের দিন হঠাৎ ধীরাজ অন্ধ হয়ে যায়। তার স্ত্রী সুনয়নার মধ্যে দেখা দেয় তীব্র পাপবোধ। সে ভাবে তার অতিরিক্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসই স্বামীর এরকম পরিণতি ডেকে এনেছে। এই পাপবোধই সুনয়নাকে করে তোলে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত। তার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে —

> সুনয়না সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, 'কার দোষ তবে ? কে তোমার টকটকে লাল চোখ দেখেও তোমায় ঘুমোতে দেয়নি ? সকালে কে তোমায় বলেছে, একটু

ঘুমোলেই সব সেরে যাবে ? আমি তোমার চোখ নষ্ট করেছি — স্বামীর চোখখাগী হতভাগী আমি, আমার মরণ নেই। আমিও অন্ধ হয়ে যাব — নিজের চোখ উপড়ে ফেলব।[১৭]

জুয়াড়ির বৌ

গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প এটি। মাখন ছাত্র বয়স থেকেই জুয়া খেলে অনেক টাকা ধার করে। এবং বন্ধুর ধারের টাকা মেটাতে না পেরে তার ছোটোবোন নলিনীকে বিয়ে করে পণের টাকা থেকে ধারের টাকা কাটান দেয়। মাখনের অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়, সে একটা চাকরিও করে। কিন্তু উপার্জনের বেশির ভাগটাই সে জুয়া খেলে নষ্ট করে। এই অবস্থায় তার স্ত্রী নলিনীর ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা ও আত্মসংকট এই গল্পের প্রধান বিষয়।

মানিকের বৌ শীর্ষক প্রতিটি চরিত্রের যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে। প্রতিটি বৌ চরিত্রই যেন আমাদের সমাজের দহন সহ্যকারী বিমূর্তরূপ। সামাজিক সংকটের সঙ্গে নারীর বন্দিদশা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন মানিক এই গ্রন্থে। এই গল্পগ্রন্থের সব বৌদের ভাগ্যই যেন এক ল্যাণ্ডস্কেপের মতো একই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তীব্র মানসিক বিক্ষেপে, অনিবারণীয় আতঙ্কে, শোকে ও বেদনায়, আক্ষেপে ও গ্লানিতে বৌ সমাজ অন্তহীনভাবে জর্জরিত। গভীর মনোবিশ্লেষকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সমাজের অভ্যন্তরে নারীর যে আসবাব সুলভ মূক-বধির চরিত্র, সেটা স্পষ্ট রূপে পরিস্ফুটন ঘটানোর প্রয়াস চালিয়েছেন মানিক। সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সমাজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা মনোবিকলনকেও তিনি আবিষ্কার করেছেন। যেন দুঃস্বপ্নের বেড়াজালে আটকে খাবি খাচ্ছে এই নারীরা। দাসত্বের শৃঙ্খলের প্রবল বিভীষিকার মধ্যে তারা আঁকড়ে ধরে আছে তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ধর্মাচার ও জীবনপ্রত্যয়। সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমরা জীবনের প্রতি স্তরে দেখতে পাই; তার সবটুকুই যেন মানিক ফুটিয়ে তোলার গভীর প্রয়াস চালিয়েছেন *বৌ* গল্পগ্রন্থে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মন্দা, সামাজিক অসাম্য, অস্থিরতা, অবক্ষয়, প্রতিযোগিতা, অনিশ্চয়তা, বেকারী, কালোবাজারী, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা, ক্ষোভ, হিংসা ইত্যাদি জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দাম্পত্য জীবনে এবং সংসারেও এর প্রভাব ছিল তীব্র। মানুষের অর্থলোভ ও স্বার্থপরতার ফলে সাংসারিক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ, সংশয় এবং সংকট তৈরি হয়েছিল, তার বৈচিত্রিক প্রকাশ ছড়িয়ে রয়েছে এই গল্পগ্রন্থে।

তথ্যসূত্র:

১. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ২৯০।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র, ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০, পৃ. ৪৫৯।

৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫।

৬. 'দোকানির বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৮. 'কেরানির বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

১০. 'সাহিত্যিকের বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

১২. 'বিপত্নীকের বউ' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

১৩. 'তেজী বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

১৪. 'কুষ্ঠরোগীর বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

১৬. 'পুজারীর বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

১৭. 'অন্ধের বউ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

১৯৪১

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৩তম বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমাগত ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মকরূপ লাভ করে চলেছে। ইংরেজদের দমন পীড়ন চলছে, দেশের মধ্যে পূর্ণস্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ইংরেজ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে চরম লড়াইয়ের পথে এগিয়ে আসছেন। কলকাতায় এলগীন রোডের বাড়িতে অন্তলীন থাকা অবস্থায় সুভাষচন্দ্র ইংরেজ পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে গৃহত্যাগ করেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি বিদেশী সামরিক শক্তির সাহায্য পেতে অক্ষশক্তির দেশগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। নভেম্বরে 'আজাদ হিন্দ সংঘের' প্রথম বৈঠকে স্বদেশী মনোভাবের পরিচায়ক সম্ভাষণ হিসেবে **'জয়হিন্দ'** শব্দের প্রচলন শুরু হয়। এই সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্র বসুকে **'নেতাজী'** নামে সম্বোধন করেন সংঘের সদস্যরা। জার্মান সরকারের সহযোগিতায় বার্লিনে সুভাষচন্দ্র Three India Center স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। জাপানের সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল পুনরায় গ্রেপ্তার হন। হুগলী জেলায় ট্যাক্সী বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক দাশরথী ঘোষালের জেল-বন্দি অবস্থায় মৃত্যু।

জানুয়ারি ৫ গান্ধিজি আবার ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন পুনর্জাগরণ ঘটান।

জানুয়ারি ১৩ প্রখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েস জুরিখে প্রয়াত হন। জন্ম ২-২-১৮৮২।

জানুয়ারি ১৭ নজরবন্দী থাকা অবস্থায় পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহত্যাগ।

ফেব্রুয়ারি ৮ ত্রিশ বছর বিদেশে কাটাবার পর বিপ্লবী হো-চি-মিন সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে ভিয়েতনামে প্রবেশ করেন।

ফেব্রুয়ারি ১২ বাংলার আত্মত্যাগী নাট্যশিল্পী বিনোদিনী দাসী প্রয়াত হন। জন্ম ১৮৬৩।

মার্চ বোম্বাই-এর বয়নশিল্পগুলিতে কমিউনিস্টদের ধর্মঘট আহ্বান। দেড় লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটে সামিল হন। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ইংরেজ সরকার ভারতরক্ষার আইন অনুসারে কমিউনিস্ট বলে কথিত ৪৮০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

মার্চ ১৮ কাবুল থেকে মস্কোর উদ্দেশ্যে ট্রেনে সুভাষচন্দ্র যাত্রা করেন।

মার্চ ২৮ ইতালীয় পাসপোর্ট জোগাড় করে মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এপ্রিল ৩ সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছান। বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে তিনটি প্রস্তাব রাখেন। প্রথমটি তিনি বার্লিন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার করবেন; দ্বিতীয় জার্মানীতে থাকা ভারতীয় যুদ্ধ বন্দিদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করবেন এবং তৃতীয় অক্ষশক্তি এক জোট হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘোষণা করবেন।

জুন ১৪	সুভাষচন্দ্র ইতালির রাজধানী রোমে যান। রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাঁকে।
জুন ১৫	ন্যাৎসি বাহিনীর হাতে প্যারিসের পতন ঘটে।
জুন ২২	হিটলার জার্মান চুক্তি ভঙ্গ করে ভোর বেলা সোভিয়েত রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করেন।
জুলাই ২২	ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে ‘শ্বেতপত্র’ উপস্থাপন।
জুলাই ২৫	অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
জুলাই ৩০	রবীন্দ্রনাথকে অস্ত্রোপচারের জন্য যখন শোয়ানো হয় তখন তিনি মুখে বলে যান শেষ কবিতা ‘তোমার সৃষ্টির পথ…’। অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন সরকার সহ চিকিৎসকমণ্ডলী।
সেপ্টেম্বর ৩০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ চালায় মস্কোতে।
অক্টোবর ১	কলকাতায় ইন্ডিয়ান ‘স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম’ অনুসৃত হয়।
অক্টোবর ২০	কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘নবযুগ’ পত্রিকার প্রকাশ।
নভেম্বর ২	সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে ফ্রী ইণ্ডিয়া সেন্টার ও আজাদ হিন্দ সংঘের জন্ম হয়। এই সংঘের প্রথম পরিকল্পনা ছিল এর অধীনে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রচার বিভাগ। ভারতের উদ্দেশ্যে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি এবং আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা প্রচার করা হবে ক্রমাগত। পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি ছিল সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
ডিসেম্বর ৮	আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে।
ডিসেম্বর ১১	আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানি ও ইতালি যুদ্ধ ঘোষণা করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপকতর হয়।
ডিসেম্বর	আর এস পি.র প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক অতীন্দ্রমোহন রায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।
ডিসেম্বর	ইংলণ্ড থেকে গিয়ে কুসুমরঞ্জন পাল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ বেতারে প্রচার কার্য চালান।
ডিসেম্বর ৩	মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহেরুকে মুক্তি দেওয়া হয়।
ডিসেম্বর ৭	জাপান আমেরিকার বিশাল সুরক্ষিত নৌঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করে।
ডিসেম্বর ১০	সিঙ্গাপুরে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।
মে ৮	পঁচিশে বৈশাখ ভারতব্যাপী রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন।
মে ১৩	ত্রিপুরা রাজদরবার থেকে প্রতিনিধিরা এসে রবীন্দ্রনাথকে ‘ভারতভাস্কর’ উপাধি দান করেন।
এপ্রিল ৬	ইতালির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জার্মানি গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে।
জুন ২২	অনাক্রমণ চুক্তি বর্জন করে হিটলারের বলশেভিকদের ধ্বংসের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ।
জুলাই ৩১	হিটলারের ইহুদি নিশ্চিহ্ন করার আদেশ।
আগস্ট ৭	২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮, বেলা ১২-৩০ মি., রাখিপূর্ণিমার অবসানে কবি রবীন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। মৃত্যুকালে বয়স ৮০ বৎসর ৩ মাস।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *নীল আকাশ* / অন্নদাশঙ্কর রায় : *উড়কি ধানের মুড়কি* / অশোকবিজয় রাহা : *রুদ্র বসন্ত, ডিহাং নদীর বাঁকে ও অন্যান্য কবিতা* / কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *সোনার কপাট* / জগদীশ ভট্টাচার্য : *ক্ষণশাশ্বতী* / দিনেশ দাস : *কবিতা ১৩৪৩-৪৮* / নির্মল চট্টোপাধ্যায় : *আকাশগঙ্গা* / বিষ্ণু দে : *স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ* / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : *স্নায়ু* / মোহিতলাল মজুমদার : *হেমন্ত গোধূলি* / যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *সায়ম* / যতীন্দ্রমোহন বাগচী : *পাঞ্চজন্য* / রবীন্দ্রনাথ : *আরোগ্য, জন্মদিনে* / বিষ্ণু দে : *পূর্বলেখ*। **নাটক** — শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *ভারতবর্ষ* / বিধায়ক ভট্টাচার্য : *রক্তের ডাক* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *কালিন্দী* / মনোজ বসু : *প্লাবন* / জলধর চট্টোপাধ্যায় : *হাউসফুল*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বিপিনের সংসার, দুইবাড়ি* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *শহরতলি* (২য় খণ্ড), *অহিংসা, ধরাবাঁধা জীবন* / প্রমথনাথ বিশী : *কোপবতী* / বনফুল : *মৃগয়া*। **গল্পগ্রন্থ** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বেনীগীর ফুলবড়ী* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *তিনশূন্য* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বসন্তে* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *প্রজাপতয়ে* / বুদ্ধদেব বসু : *ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *সভ্যতার সঙ্কট, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *ঘরোয়া, বুড়ো আংলা*।

পত্রিকা প্রকাশ — *একক* : শুদ্ধসত্ত্ব বসু / *বৈশাখী* : বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / *দৃষ্টিপ্রদীপ* : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : আবদুশ শাকুর, মাহমুদুল হক।

মৃত্যু : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনোদিনী দাসী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

এই সময়ে প্রায় প্রতিমাসেই একাধিকবার তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। মৃগী রোগ কেন হয়, লক্ষণ কি, উপশমের উপায় কি, প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি ব্যাপক পড়াশোনা করছেন। বহুমুখী মানসিক উদ্বেগ কমিয়ে, শান্ত এবং সরল জীবন যাপন করতে পারলে এই রোগের হাত থেকে কিছুটা অব্যাহতি পাওয়া যায়, এমন ভাবনায় তিনি মানসিক উদ্বেগ কমানোর সযত্নে চেষ্টা করতেন। মধ্যবিত্ত জীবনে চেষ্টা করলে সব কাজ করা যায় না এ ভাবনাও তাঁকে পীড়িত করছে। পারিবারিক দিক থেকে নানা অশান্তি ও উদ্বেগ ছিল — তা চিঠি পত্র থেকে জানা যায়। এই সময়ে সারা দেশে এবং বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেক বেশি পরিমাণে নাগরিক জীবনকে অস্থির করে তুলেছিল। জাপানী বোমার ভয়ে কোলকাতার অসংখ্য মানুষ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জনরক্ষা সমিতি গঠন করে পাড়ায় পাড়ায় জাপানী আক্রমণ প্রতিহত

করার চেষ্টা চলতে লাগল। কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট মানিকও ছিলেন এই উদ্যোগের একজন। এই সময়ের বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও মানিকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দুর্গাপূজোর সময় ষষ্ঠীর দিন জ্যেষ্ঠপুত্র খোকনের প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্ম হয়।

এই বছরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মানিকের তিনটি উপন্যাস: *শহরতলি* দ্বিতীয় পর্ব, *অহিংসা* ও *ধরাবাঁধা জীবন* এপ্রিলে *প্রবর্তক* পত্রিকায় *আদায়ের ইতিহাস* উপন্যাসটি, প্রকাশিত হতে শুরু করে। এ বছরে প্রকাশিত গল্পগুলি: 'আততায়ী' (*আনন্দবাজার*, দোল, ১৩৪৭), 'অন্ধের বৌ' (*ভারতবর্ষ*, বৈশাখ, ১৩৪৮)। 'ঘটক' (*পরিচয়*, বৈশাখ, ১৩৪৮), 'ফাঁদ' (*বৈশাখী*, গ্রীষ্ম, ১৩৪৮), 'ধনজনযৌবন' (*চতুরঙ্গ*, আশ্বিন ১৩৪৮), 'ট্র্যাজেডির পর' (*দেশ*, সেপ্টেম্বর), 'প্রৌঢ়ের দুনম্বর বৌ' (*ভারতবর্ষ*, কার্ত্তিক, ১৩৪৮)।

উপন্যাস-১ : অহিংসা

অহিংসা মানিকের চতুর্দশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ ও অষ্টম উপন্যাস। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী, কোলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ + ২৬১, দাম আড়াই টাকা। প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৮। গ্রন্থে প্রকাশের পূর্বে *অহিংসা* পরিচয় পত্রিকায় মাঘ ১৩৪৫ থেকে পৌষ ১৩৪৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১]

অহিংসা মানিকের সৃষ্টিসম্ভারে মধ্যবর্তীকালীন ফসল। অনেকে উপন্যাসটিকে 'কাঁচা'[২] বা 'অপরিণত'[৩] রচনারূপে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। উপন্যাসের মধ্যে কোথাও ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে, সংলাপে, কিংবা পরিবেশ সৃষ্টিতে খুব একটা অসংলগ্নতা নেই। বরং মানিকের রচনাগুলির মধ্যে বেশ পরিণত রচনাই বলা যায় এটিকে। তন্ময় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সংযম ও সাহসের উপর ভর করে নির্বাচিত এই উপন্যাসটির পাতায় পাতায় এক নতুন ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। জীবনের অস্তিত্বের স্বরূপকে কিভাবে অপসৃত করা হচ্ছে, তা সরস তীর্যক দৃষ্টিতে মানিক দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির নামকরণে বা কাহিনী সংস্থাপনে ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। হয়তো এজন্যই পরবর্তীকালে প্রতিবিম্ব উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন —

> আমার *অহিংসা* বইখানা নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠেছিল। দেশে অহিংসা নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম অহিংসা। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংস্রব আছে।...
>
> প্রশ্নকর্তা তিনঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, আমার বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলিনি! নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে, এবং এই

সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটি তাকে কোন মতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।[৪]

অনামী প্রশ্নকারী এবং সমালোচকদের মানিক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সাধারণ মানুষের সাধারণ অভিপ্রায়ও কখনো কখনো অসাধারণ হতে পারে। উপন্যাসটির *অহিংসা* নামকরণের সার্থকতা বিচারে না গিয়েও বলা যায় নামটি সুপ্রযুক্ত। একটি আশ্রমকে কেন্দ্র করে, সেই আশ্রমের সাধু সদানন্দ এবং মাধবীলতার কাহিনী উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে সদানন্দ-বিপিন, সদানন্দ-মহেশ, মহেশ-বিভূতি, মহেশ-বিভূতির মা, বিভূতি-মাধবীলতা, মহেশ-বিপিন ইত্যাদি নানা সম্পর্কের জটিলতা উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে।

অহিংসা নাম দেখে চল্লিশের যুগে সাধারণ পাঠকের এই ভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে তখন মহাত্মা গান্ধির আধিপত্য। গান্ধির কাছে যা ছিল জীবনসত্য, জনসাধারণের কাছে যা প্রিয় শ্লোগান — তাই এই অহিংসা। জনগণমনে তোলপাড় সৃষ্টির এই নীতি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা আশ্চর্যের কিছু নয়। মানিক এই বোধ থেকেই বোধ করি উপন্যাসটির নামকরণ করেছেন।

কাহিনিটি গড়ে উঠেছে আশ্রমকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তথাকথিত ধর্মব্যবসা ও তার ক্লেদাক্ত স্বরূপ বিশ্লেষণ মানিকের অন্বিষ্ট ছিল না। আশ্রম ও তৎসংলগ্ন তপোবন পেরিয়ে তিনি ভেতরের মানুষ ও প্রকৃতির যথার্থ অবস্থান নির্ণয়েই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যে চরিত্রটি তিনি সদানন্দ — আশ্রমের সাধু। যার অহিংসা ও প্রেমের কথা ভক্তদের "মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মত মাখা হইয়া যায়, মধুপের মত গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া রোমাঞ্চ হয়।"[৫]

সদানন্দ সম্পর্কে মানিক জানাচ্ছেন —

> দেবতার মতই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভাল।... মাথায় জটা নাই বলিয়া ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপসোস করে। যার সৌম প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায় ?[৬]

উপন্যাসের আর এক ভিলেন চরিত্র বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। সদানন্দ ও বিপিনের সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে যায় মাধবীলতার আবির্ভাবে। ইতিমধ্যে যতদিন আশ্রম চালু হয়েছে, '৬'টি নারী ঘটিত ব্যাপারে বিপিন জড়িত। সদানন্দ এসবের বিরুদ্ধে। তার সাধুগিরিতে ভড়ং আছে, কিন্তু শান্তির সাধনা অকৃত্রিম। এবং সে সাধনা নারী বর্জিত। ঘটনাচক্রে আশ্রমে

নবাশ্রিতা মাধবীর প্রথম রাত কাটে ঘুমন্ত সাধুর শয্যায়। 'প্রায় একযুগ' পর সদানন্দের এই নারী সান্নিধ্য লাভ। খুব ভোরে সেই নবযৌবনের তরুণীটিকে পাশে শুয়ে থাকতে দেখে সে অপলক চেয়ে থাকে —

> এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ পাতাল আলো-অন্ধকার কিভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে; সময় বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত রচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মত মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।
>
> তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ, এমনিভাবে কৌতুহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ় বয়সী দৈত্যটির পুতুল খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।[৭]

সাহিত্যে যৌনমিলনের চিত্র অনেকে এঁকেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে রাবীন্দ্রিক বা শরৎচন্দ্রীয় পরিমণ্ডলে এরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিছানা-বিপ্লবের ছবি প্রায় অকল্পনীয়। সাধু ও অপাপবৃদ্ধা কুমারীর এই যে অসম ও অসংগত সম্পর্ক তাতে দুটি চরিত্রই দিশেহারা হয়ে পড়ে। একদিকে যেমন আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতির মত পরিস্থিতির উদ্ভব, অন্যদিকে তেমনি সদানন্দ-মাধবীর জীবনে এল এর তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিপন্ন বিস্ময় ও অপ্রস্তুত অস্তিত্ব সংশয়ে তারা জর্জরিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মাধবী-বিভূতির বৈধ সম্পর্কেও দেখা যায় সেই সংশয় ও অসুখের বীজ।

চরিত্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বিচারে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শুধুমাত্র একটি নিটোল কাহিনির প্রয়োজনে তাদের জটিলতা ও তার গ্রন্থিমোচন নয়। আসলে মানিক মানুষ-প্রকৃতি, নারী-পুরুষ, জীবন-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, শুভ-অশুভ, সুখ-অসুখ, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুস্থ-অসুস্থ, স্বস্তি-অস্বস্তি, হিংসা-অহিংসা, তপস্যা-বিফল সাধনা, গুরু-শিষ্য, আশ্রম-লোকালয় প্রভৃতি মানব অস্তিত্বের ধারক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে শিল্পরসান্বিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। বহু বিচিত্র জীবনাভূতি ও তার বিচিত্র অভিব্যক্তি উপন্যাসটির প্রতি অনুচ্ছেদে প্রকাশমান। আশ্রমের অন্বিষ্ট শান্তি সদানন্দের জীবনে এল না, কেন না অহিংসার আবরণে হিংসা, সাধনার আড়ালে কামনার দাবদাহে তার দেহমন পীড়িত। বিপিন-মহেশের ভিন্নমুখী জীবন সাধনা, পরাজিত ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও বিপর্যস্ত আদর্শবাদের যোগাযোগ সম্ভাবনায় উপন্যাসের উপসংহার। কিন্তু তৎপূর্বে প্রতিটি চরিত্রের এক একটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা মানব মনের গভীর গহ্বনে ও তার উপমহাদেশে সঞ্চারণের অধিকার লাভ করি।

অহিংসা রচনার সময় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯২১ এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকে কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে শায়ত্ব শাসনের দিকে ক্রমবর্ধমান। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ভীত,

সন্ত্রস্ত অবস্থা, সারাবিশ্বে রাজনৈতিক পালাবদল, অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি, সামাজিক জীবনে অবক্ষয় ইত্যাদি ব্যক্তি চৈতন্যের গভীরেও অস্তিত্বের সংকট তৈরি করেছিল। এই অস্তিত্ব সংকট থেকে জন্ম নিয়েছিল আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, নানারকম চারিত্রিক জটিলতা। একদল মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল আর একদল মতলবি ধান্দাবাজ মানুষ। ধর্মীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নানারকম স্বার্থসিদ্ধি চালিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে *অহিংসা* উপন্যাসের কাহিনিবৃত নির্মিত হয়েছে। আমাদের সমাজে ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত যে ব্যবসা, কূটনীতি, হিংসা ঘটতে থাকে সেই ব্যবস্থাকে উপন্যাসে ব্যঙ্গ করেছেন মানিক। মানসিক বিকার বা যৌনবিকৃতির পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা ও সমকালীন সময়ের খণ্ডচিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে।

উপন্যাস-২ : শহরতলি (দ্বিতীয় পর্ব)

শহরতলি দ্বিতীয় পর্বের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৯৪১। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬ + ১৩৫, দাম দুই টাকা। পরবর্তীকালে মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা থেকে *শহরতলি* প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে একটি অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪ + ২৬৭, মূল্য ৯ টাকা। *শহরতলী* দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *পত্রিকা* নামক একটি মাসিক পত্রে আট কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৮]

শহরতলী উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় শহরাঞ্চলের ক্রমবৃদ্ধি এবং আধুনিকতার হাওয়া এসে লাগতে থাকে শহরতলীর জনজীবনে। তৈরি হয় অনেক বড় বড় বাড়ি। বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এসে বসবাস আরম্ভ করে। পুঁজিবাদী শ্রেণির আগ্রাসন ও নগরকেন্দ্রীক সভ্যতার বিকাশ প্রায়হাত ধরাধরি করে শহরাঞ্চলে দেখা দেয়। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা দেখি যশোদা আবার তার বাড়িটি ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে এবং চারপাশের মানুষজনদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মধ্যবিত্ত বাড়ির রমণীদের সঙ্গে যশোদার পরিচয় ও মেলামেশা শুরু হয়। শহরতলি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যপ্রিয় তার কারখানা সম্প্রসারণ করে। এই অঞ্চলের পুরানো বাড়িগুলিকে সত্যপ্রিয় নামে-বেনামে কিনে নেয়, যশোদার কাছেও বাড়ি বিক্রির প্রস্তাব আসে কিন্তু প্রতিবাদী যশোদা রাজি হয় না। সে আবার বাড়ি ভাড়া দেয়। যশোদার ভাড়াটেরা এবার আর কুলী-মজুর নয়, তারা সবাই নিম্নমধ্যবিত্ত দম্পতি। এদের মধ্যে একজোড়া দম্পতি অজিত ও সুব্রতা। এই অজিত ও সুব্রতাকে অবলম্বন করে যশোদা আবার নতুন করে বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়।

যশোদা এই অঞ্চলের কুলিমজুরদের সঙ্গে নতুন করে আলাপ পরিচয় শুরু করে, সত্যপ্রিয় সাময়িকভাবে শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিলেও সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেনি। উপন্যাসে আবার নতুন করে শ্রমিক আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিধুবাবু যশোদাকে আবার আন্দোলনমুখী করে। যশোদা উপলব্ধি করে —

> এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্ক বিতর্ক পরিস্কার বুঝিবার মত জ্ঞান সে কোথায় পাইবে ? তার মত ঠ্যাক্না দিয়া দশ-বিশজন শ্রমিককে কোনরকমে খাড়া করিবার মত এদের নয়। ধনতান্ত্রিক চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা ওদের কাজ। সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভালো বাসিয়াছিল, একটা শ্রেণি হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া দ্যাখে নাই।[৯]

এরপর আমরা উপন্যাসে দেখি সত্যপ্রিয়র মেয়ে-জামাইকে আশ্রয় দেবার জন্য যশোদাকে সত্যপ্রিয় ঘর ছাড়বার পরিকল্পনা করে — শহরতলির উন্নতির জন্য রাস্তা সম্প্রসারিত হবে এবং সেই রাস্তা যাবে যশোদার বাড়ীর ওপর দিয়েই। এই মর্মে যশোদার কাছে নোটিশ আসে। উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে যশোদাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে যশোদার যে অনুভূতি আমরা লাভ করি তাতে শহরের তথাকথিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের প্রতি ঘৃণা সোচ্চারিত হয়ে উঠেছে। মার্কসীয় সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু মধ্যবিত্তের কোন স্থান নেই, তাই এই সামাজিক পরগাছা, মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি লেখক তীব্র কটাক্ষ করেছেন —

> ভদ্রলোকেরা নাকি বড় বেশি ছোটলোক, যারা পুরো ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটা অদ্ভুত অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি মজুরও ভালো। বাবুদের চক্ষুলজ্জা আছে, কুলিমজুরের ভয়-ডর আছে, কিন্তু না-বাবু না-কুলি মজুরদের চক্ষুলজ্জাও নাই, ভয়-ডরও নাই। সাহসের অভাব হইলে যে ভয়-ডর হয়, সে ভয়-ডরের কথা যশোদা বলিতেছে না, ওরকম ভয়-ডর এ শ্রেণির লোকগুলির পুরো মাত্রাতেই আছে, সে হিসাবে ওরা সব কেঁচোর মতো অপদার্থ জীব, ওদের ভয়-ডর নাই।... কেমন যেন চাল-চলন ওদের, কেমন যেন ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের হিসাব, কোকেন খোরদের মত।[১০]

আপন সংগ্রামী অভিজ্ঞতা দিয়ে যশোদা বুঝেছে ভদ্রলোকেরা মানুষ নয়, কারণ তারা কৃষক ও শ্রমিকদের ঘৃণা করে, পুঁজিপতির পদলেহন করে। ভাব দুর্বলতায় ভোগে, স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করে বিলাসীতাই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি যশোদার কোন অনুরাগ নেই, বরং কুলিমজুরদের সে অন্তরঙ্গভাবে পেতে চায়। অর্থনৈতিক চাপে, অভাবে নিষ্পেষিত হয়ে যাদের অধঃপতন ঘটেছে, সেই কুলি-মজুরদের মধ্যে যশোদা মনুষ্যত্ব খুঁজে পায়। যাবতীয় সামাজিক সমস্যার প্রতি মনোযোগী মানিক দেখিয়েছেন, কিভাবে একটা জলের কল বসাবার জন্য মানুষকে হাঙ্গামা করতে হয়; অথবা অভাবের চাপে পড়ে পিতা-মাতার স্নেহ লালিত পরিধি পেরিয়ে জীর্ণ শীর্ণ শিশুগুলো দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় সংবাদপত্র বা চানাচুর বিক্রি করে পয়সা রোজগার করে।

অতি সচেতন এবং মানবদরদী দৃষ্টি নিয়ে মানিক সমকালীন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলন জনিত সমস্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে *শহরতলি* উপন্যাসে। ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির সমস্যাকে এবং শ্রমিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা সহযোগে সাহিত্যের পাতায় তুলে এনে বিরল নজির সৃষ্টি করলেন মানিক। এই শ্রমিক আন্দোলনের শ্রমিকদের নেত্রী যশোদার কোনো রাজনৈতিক দীক্ষা ছিল না। আবেগ দিয়ে সে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছিল এবং শক্তিশালী মালিক শ্রেণির চক্রান্তে সে বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। মানিক আসলে বলতে চেয়েছেন, পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই রাজনৈতিক দীক্ষা ও সম্মিলিত গণ-আন্দোলন।[১১]

উপন্যাস-৩ : ধরাবাঁধা জীবন

ধরাবাঁধা জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যায় পঞ্চদশতম গ্রন্থ এবং দশম উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৪১, প্রকাশক ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ +৯২, মূল্য ১ টাকা। এটি প্রথমে গল্পরূপে *ধরাবাঁধা জীবন* নামে *নরনারী* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৪৮ এ প্রথমে প্রকাশিত হয়।[১২]

১৯৪১ এ প্রকাশিত এই উপন্যাসটি আকারে ছোট, তাই একে অনেকে বড় গল্পও বলতে চেয়েছেন। এর আগের ছ' বছরে মাসিক ছ' টি বড় উপন্যাস লিখেছেন। সদ্য লেখা *অহিংসা*র জটিলতার মধ্য দিয়ে যাবার পরে লেখকের মানস বিশ্রামের ইচ্ছে জাগা স্বাভাবিক। অবশ্য লেখকের বিশ্রাম লেখার মধ্যেই। তাই হয়তো একটু সরল ধাঁচের বই লেখার কথা তিনি ভেবে থাকবেন। আকারে ছোট, ঘটনাবিরল, কমচরিত্রের একটি বই *ধরাবাঁধা জীবন* যদিও মানিকের পক্ষে মানুষের কাহিনি বলতে গেলেই তার ভেতরের জট এড়ানো সম্ভব হয় না। এখানেও জটিলতা আছে, কিন্তু পূর্বের উপন্যাসগুলির মত নয়। এখানে ছোটগল্পের মেজাজ বিশেষভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

ধরাবাঁধা জীবন ধরাবাঁধা জীবনেরই কাহিনি কোনো গভীর সামাজিক বা রাজনৈতিক তাৎপর্য এই উপন্যাসে নেই। কাহিনি গড়ে উঠেছে একটি মধ্যবিত্ত চরিত্রকে অবলম্বন করে। ভূপেনের বৈচিত্র্যহীন জীবনে স্ত্রী সরমার উপস্থিতি একটা স্বাভাবিক অভ্যাসের মতো হয়ে গিয়েছিল। সংসারজীবন তার কাছে ছিল নিরস ও ক্লান্তিকর। বন্ধুর বোন প্রভা ছিল তার গতানুগতিক জীবনে একটা নতুন স্বপ্নের মতো। হঠাৎ একদিনে দুই ঘণ্টার ব্যবধানে ভূপেনের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু হয়। স্ত্রী, পুত্রকে হারিয়ে ভূপেন শোকে ভেঙে পড়ে না, বরং প্রভার ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। প্রভার প্রতি তার দীর্ঘকাল মনে পুষে রাখা প্রেম এতদিনে চরিতার্থ হবার সুযোগ পেল। এমনকি স্ত্রী-পুত্রের শোক স্তিমিত হওয়ার আগেই ভূপেন প্রভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রভা প্রথমে রাজি হয় নি, যদিও পরে রাজি হয়। তবে তারা দুজনেই বিয়ের সিদ্ধান্তে পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারেনি।

দুই পরিবারের লোকজনও এই বিয়ে সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। প্রভার দাদা এবং ভূপেনের বৌদি সামনে এসে বিয়ের ব্যাপারে অমত প্রকাশ করেছে। কেননা এ বিয়ে তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। অবশেষে একদিন প্রভা অনেক চিন্তা ভাবনা করে ভূপেনকে বলে, "আমি ভাবছি, বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরাবাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পারব না।... আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রইলাম। যেদিন খুশি যখন খুশি আমাকে চাইলেই পাবে।"[১৩] ভূপেন প্রভাকে একান্ত করে আপনভাবে পেতে গিয়ে বুঝতে পারলো, জীবনটা ছন্দবিহীন ক্লান্তিকর অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি দিয়ে জালবোনা। স্বপ্নের সঙ্গে সত্যকে মেলাতে গেলে স্বপ্ন যায় মিলিয়ে, সত্য যায় হারিয়ে —

> জীবনে তার প্রথম আসিয়াছিল সরমা। তারপর মনে আসিয়াছিল প্রভা। তারপরেও সরমার সঙ্গে তার জীবন কাটিয়াছে বছরের পর বছর, প্রভাকে সে চাহিয়াছে মনে মনে। আজও সে প্রভাকে চায়, কিন্তু সরমাকে ছাড়া কি করিয়া তার দিন কাটিবে, তাও সে ভাবিয়া পাইতেছে না। সরমার উপলব্ধ উপস্থিতি, এ সবও যে তার বাঁচিয়া থাকার জন্য এত বেশি প্রয়োজনীয়, ভূপেন তা জানিত না। সারাটি সন্ধ্যা প্রভাকে ঘিরিয়া মনে মনে স্বপ্ন রচনা করিয়া শুইতে গেলে আজও তাই সরমার অভাবে বিছানা খালি মনে হয়, মাঝরাতে ঘুম তার ভাঙে সরমাকে চাহিয়া। ভূপেনের গভীর সংশয় জাগে, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রভাকে কাছে না পাইলেও তাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিতে বুনিতে দিন যদি বা কাটানো চলে, বাস্তব জীবনে সরমার অভাব সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।[১৪]

প্রাক্ বিবাহিত প্রণয় ও বিবাহোত্তর প্রেমহীনতার সম্ভাবনায় এবং কোন এক অনির্দেশ্য পিছুটানে প্রভা ও ভূপেনের শেষ পর্যন্ত বিবাহ হয় না। প্রভার সিদ্ধান্তে ভূপেন সাময়িকভাবে নিশ্চিন্ত হলেও, পরে তার মন অশান্ত ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এবং আরও পরে সে উপলব্ধি করে যে, প্রেম ছাড়াও জীবনে অনেক কিছু আছে যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই উপন্যাসে মানিক আমাদের প্রথাগত প্রেম ভাবনাকে আগাগোড়া বদলে দিতে চেয়েছেন। ধরাবাঁধা গতানুগতিক কত ফাঁকি, কত বিপত্তি, কত ছলনা — তাকেই ব্যক্ত করেছেন মানিক এই উপন্যাসে। ধরাবাঁধা জীবনের বাইরেও জীবনের অন্য তাৎপর্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। দাম্পত্য জীবনের বাইরে ভালোবাসার অন্য মানুষ থাকলে যে ধরনের দ্বন্দ্ব ও সমস্যা তৈরি হতে পারে, তাকে ঘিরেই এই উপন্যাস। এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সামাজিক চিন্তার। বিবাহ না করেও দুই জন নারী পুরুষ একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলে, আমাদের ধরাবাঁধা জীবনে আলোড়ন তৈরি হতে পারে। কিন্তু মানিক এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে আসলে অতিক্রম করতে চেয়েছেন গতানুগতিক ধরাবাঁধা জীবনের জলাভূমি।

দুই মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সামাজিক জীবনের নানা অস্থিরতা ও সংশয় এবং মানসিক জীবনে যে নানা টানাপোড়েন প্রকট হয়েছিল, তার অভিঘাতে প্রথাগত ধারণা ও মূল্যবোধ ভেঙে নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভব ঘটতে থাকে। এই সময়কার সমাজ-জীবনে এবং ব্যক্তি-চৈতন্যে প্রবল আলোড়ন ও ভাঙাগড়া

থেকে প্রত্যেকটি মানুষ নিজের মত একটি দর্শন অবলম্বন করে, অতিক্রান্ত হতে চাইছেন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ চলমান সময়পর্বকে। ফলে আমাদের প্রচলিত ধরাবাঁধা জীবনের অনেক হিসেব যাচ্ছে ভেঙে, পরিবর্তে তৈরি হচ্ছে, এমনসব আবহ যা আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসে ভীষণ বেমানান। মানিক সমকালীন সময়ের স্বরকে এই উপন্যাসে একটি বিশেষ সমস্যার অভ্যন্তরে তাৎপর্যময় করেছেন এই উপন্যাসের কাহিনীর অভ্যন্তরে।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র,* তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০, পৃ. ৪৮৫।

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ, ২০০৮, পৃ. ২৮২।

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যসের কালান্তর,* দে'জ, ২০০৩, পৃ. ২৭২।

৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র,* চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ১৭৮।

৫. 'অহিংসা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৭. পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ২২ - ২৩।

৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১।

৯. 'শহরতলী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১।

১১. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৫৯।

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৯।

১৩. 'ধরাবাঁধা জীবন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০।

১৯৪২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৪তম বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমাগত একটি নারকীয় নিধনযজ্ঞে পরিণত হয়ে চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডে গণহত্যার নায়ক নাজী হেড্রিনচককে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। প্রতিশোধ নিতে নাৎসী বাহিনী ২০১ নারী সহ ৩৩১ কে নাগরিককে হত্যা করে। ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধে কবি পল এলুয়ার অংশগ্রহণ করেন। অ্যাটমবোমার কার্যকারিতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিউ ম্যাক্সিকো স্টেটের মরু অঞ্চলে প্রথম অ্যাটম বোমা পরীক্ষামূলকভাবে ফাটানো হয়। স্তালিন গ্রাদে ঐতিহাসিক যুদ্ধে জার্মানিক সিক্সথ্ আর্মি নিশ্চিহ্ন হয়। কলকাতায় সাইরেনের শব্দ, আমেরিকার সৈন ও বোমাতঙ্কে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছেন। কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ বাহিনীর জন্য একটি প্রতীক চিহ্ন তৈরি করলেন — ঝাঁপিয়ে পড়া একটি বাঘের ছবি। সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জানালেন — স্বাধীনতা কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। রাসবিহারী বসু টোকিও থেকে বেতার বার্তায় ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, দৃঢ়তার সাথে সংকল্প নিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য। *হরিজন* পত্রিকায় গান্ধিজি লেখেন যে, ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা একটিমাত্র অবস্থার উপরে নির্ভরশীল এবং তা হচ্ছে ভারত থেকে ব্রিটেনের চলে যাওয়া। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু চেয়েছিলেন ব্রিটিশদের সাহায্য করতে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধিজি তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বলেন — 'তোমরা প্রত্যেকেই এই আন্দোলন শুরু হবার মুহূর্ত থেকে নিজেদের স্বাধীন পুরুষ অথবা নারী হিসেবে মনে করবে এবং সেই ভাবেই কাজ করবে যেন তুমি মুক্ত। ... আমরা করবো অথবা মরব। হয় আমরা ভারতকে মুক্ত করবো, না হয় সেই প্রচেষ্টায় মৃত্যু বরণ করব।' ভাগলপুরে ও সুলতানপুরে বিপ্লবীরা জাতীয় সরকার গঠন করে। মানঝি, একমা, দিঘওয়ারা, দারাউলি, রঘুনাথপুর, শিশোয়ান, পারসা, বৈকুণ্ঠপুর, গরখা প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব লোপ পায়। মধ্যপ্রদেশের সকল জেলাতেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মেদিনীপুরে 'বিদ্যুৎবাহিনী' ও জনসাধারণ যে সমস্ত অঞ্চল দখল করেছিল মেদিনীপুরের স্বাধীন জাতীয় সরকার সেই সমস্ত অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে। গুজরাটে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। আমেদাবাদে সাড়ে তিনমাস হরতাল চলে। রেলপথে নাশকতামূলক কাজ করে আন্দোলনকারীরা দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। উড়িষ্যায় বিচ্ছিন্ন আকারে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। পশ্চিম গোদাবরী জেলার ভীমবরণে পতাকা উত্তোলনকালে পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নিহত হন। ক্ষুব্ধ জনতা রেলপথ ধ্বংস করে, সেতু ও পথঘাট নষ্ট করে, টেলিগ্রাম, টেলিফোনের লাইন অচল করে দেয়। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য গান্ধিজিসহ কংগ্রেসের প্রথম

সারির সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কংগ্রেসের কোনো নেতা কারাগারের বাইরে না থাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সহিংস গণ-অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে।

জানুয়ারি ৫ গান্ধিজি নিজেকে কংগ্রেস সেবক এবং সত্য ও অহিংসার উপাসক হিসাবে ঘোষণা করে জানান, ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশকে সাহায্য করার মনস্থ করেছে, যাতে ব্রিটেন ভারতকে স্বরাজ প্রদান করে।

জানুয়ারি ৬ বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা চালু করে প্যান আমেরিকান এয়ারলাইন্স।

জানুয়ারি ২৮ বার্লিনে সুভাষচন্দ্র ফ্রি ইন্ডিয়ান লিজিয়ন গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র বলেন এর মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

ফেব্রুয়ারি ১৫ জাপানের আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে ৪৫০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী জাপানী ফুজিয়ারার হস্তগত হয়। মোহন সিং এঁদের অনুরোধ করেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে।

ফেব্রুয়ারি ১৬ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তেজো তাঁর সমর্থনের কথা জানান।

ফেব্রুয়ারি ১৭ চীনের প্রধানমন্ত্রী চিয়াং কাইসেক সস্ত্রীক এক স্পেশাল ট্রেনে কলকাতায় আসেন। বাংলার গভর্ণর স্বয়ং হাওড়া স্টেশনে সংবর্ধনা দেন।

ফেব্রুয়ারি ২৮ গুপ্ত বেতারকেন্দ্র থেকে প্রথম ভাষণ দেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের তরফ থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নেতাজি।

মার্চ রাজনৈতিক জগতে বাংলার রাজনৈতিক কবিরাজ রূপে পরিচিত অনাথ নাথ রায় গুপ্তভাবে সংবাদ আদানপ্রদান ও নেতাজির বেতার বক্তৃতার সর্টহ্যান্ড নোট গ্রহণ করে গোপনে সাইক্লোস্টাইল করে সাধারণের মধ্যে প্রচার করছেন।

মার্চ ৬ অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ-এ যুদ্ধের প্রয়োজনে 'ব্লাড ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়।

মার্চ ৭ জাপানের আক্রমণে রেঙ্গুনের পতন।

মার্চ ৮ ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য মার্ক্সবাদী আন্দোলনের কর্মী সোমেন চন্দ নিহত হন।

মার্চ ৯ টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকে রাসবিহারী বসু ভারতীয় শহীদ ও নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। সিঙ্গাপুরে তাইল্যান্ড ও মালয়ের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মার্চ ১১ চার্চিল পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠানো হচ্ছে।

মার্চ ১২ রাসবিহারী বসু টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকে শ্রী অরবিন্দকে আহ্বান জানান ভারতমাতার মুক্তি সাধনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য।

মার্চ ১৮ রাসবিহারী বসু জওহরলালকে ভারতের কর্ণধার হিসেবে উল্লেখ করে। এই বক্তৃতা টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।

মার্চ ১৯ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস করাচীতে এসে পৌঁছোন ও ব্রিটিশ প্রস্তাবাবলীর কথা ব্যক্ত করেন।

মার্চ ২৩ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দিল্লিতে এসে পৌঁছোন।

মার্চ ২৫ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা শুরু।

মার্চ ২৮ রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে টোকিওতে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয়দের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসুকে আহ্বান জানানো হয়। এই দিনই ফ্যাসীবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠা হয়।

মার্চ ২৮-৩০ রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে জাপান, চীন, মালয় ও শ্যামদেশের বহু ভারতীয়কে নিয়ে টোকিওতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সরকারিভাবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয় তিনটি কথা — একতা, বিশ্বাস ও বলিদান।

মার্চ ৩০ স্টাফোর্ড ক্রিপসের ভারত সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হয়।

এপ্রিল ১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *জনযুদ্ধ* প্রকাশিত হয়।

এপ্রিল ২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 'ক্রিপসের প্রস্তাব' খারিজ করে দেয়। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন আবুল কালাম আজাদ।

এপ্রিল ৬ জাপানী বোমারু বিমান থেকে ভারতে বোমা বর্ষণ করা হয়।

এপ্রিল ১২ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারত ত্যাগ করেন। চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তার করে জানান ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়েছে।

এপ্রিল ২৩ ৪২'এর ভারতছাড়ো আন্দোলন সমর্থন করে লেখা প্রকাশের জন্য তৎকালীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের আদেশে দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এপ্রিল ২৬ গান্ধিজি ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করার জন্য বিবৃতি দেন।

এপ্রিল ২৮ ভারতে দুই প্রভাবশালী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মহম্মদ আলি জিন্নার উদ্দেশ্যে টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে বক্তৃতা দেন রাসবিহারী বসু। ব্রিটিশশক্তি সুচতুর পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন থেকে ভারতবাসীকে দিক্‌ভ্রষ্ট না করতে পারে, তারই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয় এই বক্তৃতায়।

এপ্রিল ২৯ *হরিজন* পত্রিকায় গান্ধিজি লেখেন 'ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তার একটিমাত্র অবস্থার উপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে ভারত থেকে ব্রিটেনের চলে যাওয়া।'

এপ্রিল ২৯-মে ২ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে রাজাগোপালাচারীর ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব বাতিল করা হয়।

মে ১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *জনযুদ্ধ* সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ২৩-০৪-১৯৪৬ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

মে ১০ অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু মহাসভার আহ্বানে এইদিন পাকিস্তান বিরোধী দিবস পালন করা হয়।

মে ১৮ গান্ধিজি জানান 'ভারতের অঙ্গচ্ছেদ সবচেয়ে বড় পাপ'।

মে ২৭	সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎকার।
জুন ১১	সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে একটি চুক্তি সাক্ষরিত করে। ফ্যাসিস্টদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে দুই দেশ পরস্পরকে সামরিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয়।
জুন ১৫-২৩	ব্যাঙ্ককে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে প্রবাসী ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের একটি বৃহৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে একশোর বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন।
জুলাই ৬	ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধিজি 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
জুলাই ৯	কলকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে শিশুদের আসরে কবিতা পাঠ প্রচার শুরু করার পরই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তারপর আর বাক্‌শক্তি ফিরে পাননি।
	মুসলমানদের সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমর্থনে রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন।
জুলাই ২৩	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বেআইনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।
আগস্ট	আগস্ট আন্দোলনে বীরভূমের দুবরাজপুর সিভিল কোর্ট ও ডাকঘর অভিযানে মূল সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন নেপাল মজুমদার।
আগস্ট ১	কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর কলকাতার টাউন হলে প্রথম প্রকাশ্য সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক রাহুল সাংকৃত্যায়ন।
আগস্ট ৭-৮	বোম্বাইতে প্রস্তাবিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে বিপুল ভোটাধিক্যে অহিংস গণ আন্দোলন চালাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।
আগস্ট ৮	'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' এই দাবি তোলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত হয় "কংগ্রেস দল ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র মুখপাত্র নয়"। মধ্যরাত্রে গান্ধিজিসহ কংগ্রেসের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আগস্ট ৯	গান্ধিজির গ্রেপ্তারের খবরে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণায় গণ্ডগোল শুরু হয়।
আগস্ট ১০	বাংলা সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তার শাখাগুলিকে বে-আইনি ঘোষণা করে।
আগস্ট ১১	বিহারের পাটনা শহরে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ৭ জন ছাত্র নিহত ও বহুজন আহত হয়।
আগস্ট ১২	পাটনা শহরে রেল যোগাযোগ ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোন যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয়, যার ফলে পাটনা শহরটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
আগস্ট ১৩	কলকাতায় প্রথম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু। ধর্মঘটী ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হলে সশস্ত্র পুলিশের দল ছাত্রদের আক্রমণ করে।
আগস্ট ১৪	বিডন স্ট্রীটে পুলিশের সাথে জনতার এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

আগস্ট ১৮	ভাগলপুরে জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়।
আগস্ট ২২	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সৈন্য স্তালিনগ্রাদ অবরোধ করে।
আগস্ট ২৯	বোলপুর স্টেশনে (শান্তিনিকেতন) ব্রিটিশ পুলিশের হাতে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যু।
আগস্ট ২৯	তমলুক থানা আক্রমণ করার সময় পুলিশের গুলিতে তমলুকের কল্যাণচক্ গৌরমোহন ইন্‌স্টিটিউশনের তিনজন ছাত্র ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ও বহু সংখ্যক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ সরকার আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৯৬টি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়।
আগস্ট ৩১	সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে ৫০ হাজার ভারতীয় বন্দিদের নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠন করেন।
সেপ্টেম্বর ১	ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে সরকারিভাবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ স্থাপিত হয়।
সেপ্টেম্বর ১৮	মেদিনীপুরের জনতার ওপর প্রথম গুলি বর্ষণ করা হয়। তিনজন নিহত ও বহু লোক আহত হয়।
সেপ্টেম্বর ২০	কনকলতা বড়ুয়া নামে সতের বৎসরের একটি বালিকার নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা দরং জেলার সোহপুর থানার সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ তাকে গুলি করে।
সেপ্টেম্বর ২৪	'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় বিদ্যুৎবাহিনী বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য আশুতোষ কুইলা মহিষাদল পুলিশ থানা আক্রমণের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান।
সেপ্টেম্বর ২৭	মেদিনীপুরের তমলুকে এক গোপন সভায় মিলিত হয়ে তমলুক মহকুমার থানা, আদালত ধ্বংস করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিদ্রোহীরা।
সেপ্টেম্বর ২৮	'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়ে ১৬ বছরের গৌরহরি কামিলা ও ৩৫ বছরের যুবক গুণধর সাহু পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।
সেপ্টেম্বর ২৯	তমলুক পুলিশ থানা আক্রমণ করার সময় পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরা মারা যান।
অক্টোবর	'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ কারারুদ্ধ হন।
অক্টোবর ৩	মানুষের তৈরি প্রথম ভি-২ / এ-৪ রকেটটি মহাকাশে পৌঁছায়।
অক্টোবর ১৬	বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ে ৪০,০০০ নর-নারী-শিশুর মৃত্যু হয়। মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণা জেলায় ১৫,০০০ মানুষ মারা যান।
নভেম্বর ৬	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে জার্মানীরা পরাজিত হয়ে মিশর ত্যাগ করে।
ডিসেম্বর ৩১	জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্তালিনগ্রাদের লড়াই শেষ হয়।
ডিসেম্বর	হিন্দু মহাসভা তাদের কানপুর অধিবেশনে প্রস্তাব নেয়, যে কোনো মূল্যে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করতে হবে।
ডিসেম্বর ১	বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কারারুদ্ধ অবস্থায় পুলিশের অত্যাচারে বহরমপুর জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডিসেম্বর ৭ জাপানী বোমারু বিমান চট্টগ্রাম বন্দরে বোমা নিক্ষেপ করে।

ডিসেম্বর ১৬ মেদিনীপুর জেলায় পুলিশী নির্যাতন গুলিবর্ষণ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

ডিসেম্বর ১৭ মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার ধাড়া, সতীশ সামন্ত প্রমুখের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার (তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার)স্থাপিত।

নিরাপত্তা আইনে ডাঃ প্রসূন দাশগুপ্তকে আটক করা হয়। 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুরুলিয়ার মানবাজার পুলিশ থানা আক্রমণের সময় গোবিন্দ মাহাতো পুলিশের গুলিতে নিহত হন। বঙ্গদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় আদিবাসী রিয়াং বিদ্রোহ শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আজাদ হিন্দ রেডিও, জাতীয় কংগ্রেস রেডিও ও আজাদ-মুসলিম রেডিও নামে তিনটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাসবিহারী বসু টোকিও বেতার থেকে ভারতবাসীকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য অনুরোধ জানান। জাপানী সৈন্যরা আন্দামান দখল করে। রাসবিহারী বসু টোকিও বেতার থেকে এক বক্তৃতায় মহম্মদ আলি জিন্নাকে অনুরোধ করেন, কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে নয়, ভারতের জাতীর নেতা হিসেবে তাঁর যেন আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারতের গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহক সমিতিতে শ্রম বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন বি. আর. আম্বেদকার। পুনরায় একটি অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। রত্নগিরি জেলায় জনসাধারণ সরকারি অফিসারদের বয়কট করে। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় নানা পাতিলের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গড়ে ওঠে। স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করার পর রাস্তা পরিভ্রমণ করে ও বিভিন্ন পার্কে সভা করে গান্ধিজির উক্তি বলে কথিত 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' শপথ গ্রহণ করে। নিদিয়াদে ৫০ জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। উড়িষ্যার দশ সহস্র লোকের একটি মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে ১৯ জন নিহত ও ১৪০ জন আহত হয়। কোরাপুট জেলে ঠাসাঠাসি করে রাখার ফলে ৫০ জনের মৃত্যু হয়। বিহারের তেঘরা, সিমারাঘাট, রূপনগর এবং রাজওয়ারা থানাগুলি দখল করা হয়। মুঙ্গেরে একটি বিমান আটক করা হয় ও দুজন বৈমানিককে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে। জনতা কয়েকটি পুলিশ থানা দখল করে। রাজস্থানের যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, ভরতপুর, কিষেণগড়, কোটা ও শাহপুরে সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। সুলতানপুরে সিয়ারাম সিং-এর নেতৃত্বে জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। টাটা কোম্পানির ২০০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ, কার্তিক প্রসাদ, ব্রজকিশোর প্রসাদ সিং, বৈদ্যনাথ ঝা, শ্যামসুন্দর প্রসাদ প্রমুখ বিপ্লবীরা নেপালের তরাই-এ আশ্রয় নেন ও গেরিলাবাহিনী গঠন করার চেষ্টা করেন। উত্তরপ্রদেশে বালিয়া, আজমগড়, গাজিপুর, বস্তি, মীর্জাপুর, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, বেনারস, জৈনপুর, গোরক্ষপুরে ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান ঘটে। বালিয়া জেলায় চিত্তু পাণ্ডের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গড়ে ওঠে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাঁচদিন ধরে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে রাখে।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অজিত দত্ত: *নষ্টচন্দ্র* / অশোকবজিয় রাহা: *ভানুমতির মাঠ* / অন্নদাশঙ্কর রায়: *নূতন রাধা* / অমিয় চক্রবর্তী: *মাটির দেয়াল* / কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: *শিবির* / জীবনানন্দ দাশ: *বনলতা সেন* / দিনেশ দাস: *কবিতা* / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: *গ্রহচ্যুত* / বুদ্ধদেব বসু: *বাইশে শ্রাবণ, এক পয়সার*

একটি / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়: *মনপাবন* / মণীন্দ্র রায়: *একচক্ষু* / সজনীকান্ত দাস: *পঁচিশে বৈশাখ, মানস সরোবর* / সমর সেন: *নানাকথা* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য: *সংকলিতা*। **নাটক** — মন্মথ রায়: *মমতাময়ী হাসপাতাল* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *দুই পুরুষ*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: *অনুবর্তন* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: *গণদেবতা* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *চতুষ্কোণ* / বুদ্ধদেব বসু : *কালো হাওয়া*। **গল্পগ্রন্থ** — জগদীশ গুপ্ত: *তৃষিত সৃক্কনী* / শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: *চুয়াচন্দন, কাঁচামিঠে* / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়: *রাণুর কথামালা* / মনোজ বসু: *একদা নিশীথকালে* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: *ইনি আর উনি*।

পত্রিকা প্রকাশ – *জনযুদ্ধ*: বঙ্কিম মুখার্জী / *প্রভাতী*: সুধা ঘোষ / *বিশ্বভারতী* : প্রমথ চৌধুরী / *সম্প্রতি*: প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : সমরেশ মজুমদার।

মৃত্যু : সোমেন চন্দ, যোগেন্দ্র চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, লজ্জাবতী বসু।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপ্তি মানিককে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে যোগদান এবং লেখালেখির মধ্যে তার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। ৮ই মার্চ তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী ও লেখক সোমেন চন্দ ঢাকায় নিহত হন। এই ঘটনায় কোলকাতায় শিল্পী সাহিত্যিকরা নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং জন্মলাভ করে ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ। মানিক এই সংঘের সঙ্গে প্রথম দিকে জড়িত না থাকলেও লেখক হিসেবে সমস্ত ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ ও সচেতন দৃষ্টি রাখছেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী নতুন চিন্তা যে দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করছিল তাও তিনি লক্ষ্য রেখেছেন।[১] বিডন স্ট্রিটে ছাত্রদের উপর পুলিশের অত্যাচারে মর্মাহত মানিক দেশের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন।

শারদীয় আনন্দবাজারে সম্পূর্ণ উপন্যাস *শহরবাসের ইতিকথা* প্রকাশিত হয়। মে মাসে প্রকাশিত হয় দশম উপন্যাস *চতুষ্কোণ* পাটনার *প্রভাতী* পত্রিকায় এই বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় অসম্পূর্ণ উপন্যাস *দর্পণ*। এই বছরে প্রকাশিত গল্পগুলি: 'প্যানিক' (*দেশ*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯), 'ভয়ঙ্কর' (*সম্প্রতি*, বার্ষিক সংখ্যা), 'বিবেক' (*দেশ*, অক্টোবর)। 'হলুদপোড়া' (*পরিচয়*, কার্ত্তিক ১৩৪৯)।

উপন্যাস-১ : চতুষ্কোণ

নিজের সাহিত্য সৃষ্টির কারণ হিসেবে মানিক দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, জীবনকে যতভাবে আমি জেনেছি, পাঠককে তার ভাগ দেওয়ার জন্যই আমি লিখি।[২] তখন আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না লেখক জীবন সমুদ্রের কোন গভীরতায় অবগাহন করেছেন। সাহিত্যে শুধুমাত্র যৌনতা আমদানি করার জন্য যখন মানিক সমালোচকদের দ্বারা অভিযুক্ত হন, তা আমরা মেনে নিতে পারি না। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো যৌনতা নিয়ে আদিখ্যেতা করেন নি, তিনি কখনই ভাবেননি যৌনতাই জীবন। একমাত্র যৌনতানিষিক্ত আখ্যান কোন দিনই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। সমাজ বাস্তবতায় তাঁর অধিকার ছিল। বাস্তবতার নিরীক্ষায় তিনি পূর্বসূরীদের থেকেও এগিয়ে ছিলেন। আলাদা ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মনোবিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান চর্চায় তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন। অর্থনৈতিক সংকট বা সামাজিক সংকটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন সচেতন লেখকের যে ভূমিকা নেওয়া উচিৎ সেভাবেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর জীবনবীক্ষা ও সাহিত্যবীক্ষার মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না।

চতুষ্কোণ মানিকের একটি বিতর্কিত উপন্যাস। মানিক সাহিত্যে অবচেতন মন বা যৌনতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন অনেক সমালোচক। কিন্তু অনেক সময় যে তাঁরা ভ্রান্ত দর্শনে উপবিষ্ট হয়েছেন, যেমন *চতুষ্কোণ* উপন্যাসটির আলোচনা করলেই তা বোঝা যায়। *চতুষ্কোণ* প্রকাশের পর কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে সাহিত্য বিচারে অতিসংকীর্ণতা বা অতিউদারতা কোনটাই আদর্শ উপায় নয়। সমালোচক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "মানুষের কামপিপাসার জীবন্ত মূর্তি এঁকে তিনি আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন।"[৩] ফলে কিছুটা বে-আব্রু বর্ণনা মানিকের উপন্যাসে দেখা যায়। *চতুষ্কোণ* সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "লেখকের যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি আঁকিবার যে প্রবল প্রবণতা আছে (ইহা) তাহারই চূড়ান্ত উদাহরণ।"[৪]

চতুষ্কোণ নিয়ে আমাদের আলোচনা এমন একরোখা হতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের একটি মন্তব্য, "...প্রথম পর্বেও ছিল এক ধরনের কচলাকচলি, ক্লিনিক্যাল মনোবিকলনের নাছোড় প্রবণতা। শেষদিকে আরো দেখা দিয়েছিল শ্রেণিতত্ত্বে শ্রেণিসংগ্রামে নিজের চাপানো আস্থায় ইচ্ছাপূরণের চরিত্র আর ঘটনার সৃষ্টি করা। সব মিলিয়েই মানিক... লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, মার্কসীয় দর্শন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই গ্রহণ করেছিলেন। এসব তত্ত্ব তাঁকে অধিকার করে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বানায় নি।"[৫]

চতুষ্কোণ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজকুমার। তার স্বরূপ নিয়ে চরম বিভ্রান্তি পাঠক মহলে। এই উপন্যাসের আখ্যান রাজকুমার এবং চারটি নারী চরিত্রকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। উপন্যাসের ভূমিকায় মানিক লিখছেন, "রাজকুমারের মতো অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানারকম, কিন্তু আসলে এক।

রাজকুমারকে টাইপ বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।”[৬] মানিক সচেতনভাবেই জানাচ্ছেন রাজকুমার চরিত্রটিকে তিনি বিশেষভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রধান নারী চরিত্রগুলিও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফসল।

রাজকুমারের যে পরিচয় আমরা পাই — সে অবিবাহিত, সম্ভবত বিত্তবান, হাই সোসাইটিতে তার মেলামেশা, সে চাকরী করে, সে মালতীর প্রাইভেট টিউটর, যদিও শিক্ষকতা তার পেশা নয়; মেয়েদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট আছে, সে ভালো বক্তা, যুক্তিবোধসম্পন্ন, স্বাধীন ও পিছুটানহীন। তার পরিবার ও নিকটজন সম্পর্কে লেখক আমাদের কিছুই জানাননি, ফলে ধরে নিতে হয় যে, পারিবারিক জীবনে সে নিঃসঙ্গ, কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার সে যে লম্পট বা কামুক চরিত্র নয় তাও লেখক জানিয়েছেন। রাজকুমারের মাথা ধরার ঘটনা দিয়ে উপন্যাসটির শুরু, মাঝেমাঝেই তার এমনটি হয়, কিন্তু সাধারণ মাথাধরার সঙ্গে এই মাথা ধরার তফাৎটা রাজকুমার টের পেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার ঘুম আসেনা। বোঝা যায় যন্ত্রণা আসলে মাথায় জন্ম নেওয়া কোনো নতুন চিন্তা থেকেই সে অনুভব করছে।

রাজকুমার কতটা সামাজিক, কতখানি নিঃসঙ্গ, কেন সে একা ও তার বিচ্ছিন্নতার জগৎই কি চতুষ্কোণের জগৎ ? রাজকুমারের চারকোণা ঘরই চতুষ্কোণ ঘর। এই চারকোণা ঘরে তার কিভাবে অবস্থান, তা লেখকের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়েছে —

> চারকোণা মাঝারি আকারের ঘর, আসবাব ও জিনিসপত্রে ঠাসা এই ঘরখানাই রাজকুমারের শোওয়ার ঘর, বসিবার ঘরে, লাইব্রেরী, গুদাম এবং আরো অনেক কিছু। অনেক কালের পুরানো খাট খানায় এক চতুর্থাংশ স্থান দখল করিয়া আছে। বই বোঝাই তিনটি আলমারি ও একটি টেবিল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ঔষধের শিশি, কাঁচের গ্লাস, চায়ের কাপ, জুতা পালিশের কৌটা, চশমার খাপ প্রভৃতি অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিস বোঝাই আর একটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, একটি ট্রাঙ্ক এবং দুটি বড় ও একটি ছোটো চামড়ার সুটকেশ, ছোট একটি আলনা ... কেবল পা ফেলিবার স্থান রাখিয়া বাকি মেঝেটা আত্মসাৎ করিয়াছে।
>
> তবে রাজকুমার কোন অসুবিধা বোধ করে না। এঘরে থাকিতে তার বরং রীতিমত আরাম বোধ হয়, ঘর খানা যেমন জিনিসপত্রে বোঝায়, তেমনি অনেক দিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠতার স্বস্তিতে ঠাসা।[৭]

এই ঘরেই তার মাঝে মাঝে মাথা ধরার অভ্যাস রপ্ত হয়েছে। এই ঘরের বর্ণনায় তার বদ্ধতা, অস্তিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার সংকট প্রকটিত। কিন্তু এই ঘরটিতো আর বাস্তব জগৎ নয়, এর বাইরেও আছে বাস্তবিক অনেক কিছু। এই চারকোণা ঘরের বহুদিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠ বিচ্ছিন্নতা রাজকুমারের ভেঙে যায় গিরি-কালী-মনোরমা-মালতী-সরমা-রিণির অভিজ্ঞতায়। আসবাব ভর্তি ঘরের সীমা থেকে রক্তমাংসের মানুষের অভিজ্ঞতার ধাক্কায় চতুষ্কোণের বদ্ধতা ভেঙে জীবনের প্রাঙ্গণে দাঁড়ানোর কাহিনী *চতুষ্কোণ*। এই

যে এক ধরনের বদ্ধ যাপন থেকে মুক্ত বিস্তারে প্রেম-নারী-যৌনতাকে নানাভাবে দেখা, তার মধ্য দিয়ে মানিক আঘাত করতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের ট্যাবু ও সংস্কারকে।

কিন্তু কেন *চতুষ্কোণ* কে যৌনবিকারের উপন্যাস মনে করা হল ? প্রথমত, হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করে দেখার ছলে গিরির বুকে রাজকুমারের হাত দেওয়া; দ্বিতীয়ত, শিশুসন্তানকে স্তনপান করানোর সময় মনোরমার স্তন স্পর্শ করতে রাজকুমারকে প্রায় বাধ্য করা; তৃতীয়ত, চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় রাজকুমারের মুখের সামনে রিনির মুখ তুলে ধরা; চতুর্থত, মালতীর চুলে রাজকুমারের মাথা রাখা; পঞ্চমত, গিরির প্রতি রাজকুমারের আচরণের সচেতন পুনরাবৃত্তি কালীর উপর ঘটানো; ষষ্ঠত, রাজকুমারের অদ্ভুত কিছু ইচ্ছা; নারীতে নারীতে পার্থক্য কি তা বোঝার জন্য রিণি, সরসী আর মালতীর পাশে কালীকে রেখে তাদের দেখা, নারীর শারীরিক গঠনের সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক বুঝতে একসঙ্গে বেশ ক'জন নারীর ছবি তোলা এবং নারীর নগ্ন শরীর দেখতে চাওয়া; স্নানরত অবস্থায় রিনির নগ্ন শরীর দেখতে চাওয়া ইত্যাদি।

রাজকুমারের এই আচরণগুলি শূন্য থেকে আসেনি। গিরির বুকে হাত দেওয়া প্রসঙ্গে বলা যায় নিতান্ত রসিকতা করেই সে কাজটি করেছিল। কামচেতনা এতে নেই, যদি কিছু থাকে, তা রাজকুমারের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। মনোরমার আচরণ রাজকুমারের প্রতি যৌন আকর্ষণ বহন করে না। চুম্বনের প্রত্যাশায় রাজকুমারের মুখের সামনে রিনির মুখ তুলে ধরা অস্বাভাবিক কোন আচরণ নয়; যৌন আকর্ষণ এতে থাকতে পারে, কিন্তু মুখ্য বিষয় হল আবেগ। রাজকুমার তাতে সাড়া দেয়নি বলে রিনির প্রতিক্রিয়াও তার শ্রেণি অবস্থান নির্দেশিত। মালতীর চুলে রাজকুমারের মাথা রাখার ব্যাপারটাও সেরকম বিশেষ কোনো মুহূর্তে খুব স্বাভাবিক, যৌনতার কিছুই এতে নেই। মালতীর সঙ্গে রাজকুমারের সম্পর্ক শ্রদ্ধাকে ভালোবাসা মনে করার সম্পর্ক। নারীর দৈহিক গঠনের সঙ্গে তার মনের যোগ আর নারীতে-নারীতে পার্থক্য বোঝার চেষ্টায় রাজকুমার যা করতে চেয়েছে, তা তার অনুসন্ধান প্রবণে বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়ই বহন করে।

আসলে রাজকুমার যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সৎ, আধুনিক এবং শেষপর্যন্ত মানবিক এক চরিত্র। তাকে আবেগহীন মনে হতে পারে কিন্তু তা প্রচলিত বাংলা উপন্যাসের নায়কদের মতো মোটেই নয়। তার আবেগ, ইচ্ছা, যুক্তি এমন এক বাস্তবতায় পৌঁছে যায় যা স্বাভাবিক সামাজিক রীতিনীতিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দেয়। উন্মাদ রিনির যখন থেকে সে চিকিৎসা শুরু করেছে, তখন থেকেই তার মধ্যে আবেগের রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। রিনির শুশ্রূষা করতে করতেই রাজকুমার সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। রিনির শোয়ার ঘরে যখন রাজকুমারকে থাকতে হয়, লোকে কি বলবে এই ভেবে সে রিনিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রিনির বাবা এতে আপত্তি জানায় —

> আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতোই আমাদের দিন-রাত একত্র থাকতে হবে— কতকাল ঠিক নেই।
>
> রাজু স্ত্রী পাগল হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে।
>
> তবু আপনার মনে যদি —
>
> আমার মনে কিছু হবে না রাজু। শুধু মনে হবে তুমি রিনিকে সুস্থ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ। সেদিন বলিনি তোমাকে, রিনিকে আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি। তোমাকে ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলবে না, আমার পাগল মেয়ের জন্যে তুমি সব ত্যাগ করবে আর আমি নীতির হিসাব করতে বসব ?[৮]

রাজকুমার চরিত্রটি বিশ শতকের আধুনিক জীবন দৃষ্টির অবদান। রাজমুমারের আচরণ থেকে তাকে যৌন বিকারগ্রস্ত ভেবে ভুল করার যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু তার চিন্তা জগতের দিকে লক্ষ্য রাখলে, এমনকি নিজের সম্পর্কে সে যা ভাবছে ও বলছে তাতে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারা যায় — সে আধুনিক ও সময় সচেতন। যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ রাজকুমার চরিত্রের ভিত্তি। আসলে রাজকুমার সমাজ নির্দেশিত গতানুগতিক পথের মানুষ নয়। সে নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্যের অনুগামী। সামাজিক রীতি-নীতি বা সমাজে কেমন করে চলতে হবে, সে বিষয়ে তার সচেতনতার অভাব আছে, কিন্তু উপেক্ষা নেই। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আসলে আপোশমূলক। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নির্বাচন করে, সমাজের রীতি-নীতির কোনটি সে গ্রহণ করবে। সামাজিক বিষয়-আশয় নিয়ে ব্যক্তির নির্বাচন মনস্কতা দেখিয়ে দেয় কোন নৈতিক স্তরে তার অবস্থান। এই অবস্থান থেকে, নারী-যৌনতা-সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে রাজকুমারের মনোভাব বুঝে ওঠা সম্ভব হলে, চরিত্রটি নিয়ে বিভ্রান্তি থাকে না।

কোন কোন সমালোচক উপন্যাসটিতে বেআব্রু বর্ণনার বা অশ্লীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসটির কোথাও তেমন অশ্লীলতা পাওয়া যায় না। রাজকুমারের সঙ্গে গিরি, মনোরমা, সরসী, কালী, রিনি — এই পাঁচটি চরিত্রের বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তের বর্ণনায় এমন একটিও শব্দ ব্যবহার করেননি লেখক, যা 'ভদ্র সমাজে' উচ্চারণ করা যায় না। একটিও স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার নেই। উপন্যাসের সংলাপে 'স্ল্যাং' আসতেই পারে, চরিত্রের বিশ্বাস যোগ্যতার স্বার্থেই অনেক সময় এটা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু *চতুষ্কোণে* বেআব্রু বর্ণনা কোনভাবে একটুও নেই। এমনকি, রাতে সরসী যখন নগ্ন হয়ে রাজকুমারের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনকার বর্ণনাও বেআব্রু নয়। তাই 'লেখকের যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি আঁকিবার' উদাহরণ এই উপন্যাস হতে পারে না।

রাজকুমারের মধ্যে আমরা দেখি, সে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় শরীর সংক্রান্ত প্রচলিত সংস্কার ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে। নারীর দেহকাঠামো ও মনের সম্পর্কের খোঁজ করতে যাওয়াটাই রাজকুমারের সেই নিজস্ব পথ। রবীন্দ্রনাথ যখন *নিস্ফল কামনা* কবিতায় 'খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি / যে অমৃত লুকানো তোমায় সে কোথায় ?' ইত্যাদি প্রশ্নে প্রেমিকার হাতে হাত

রেখে বসে থাকা প্রেমিকের আত্মানুসন্ধানকে প্রকাশ করেন, তখন বোঝা যায় শরীরকে অতিক্রম করতে না পারলে, সেই মনের মানুষ বা কাঙ্ক্ষিত অমৃতের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। অথচ শরীরকে বাদ দিয়ে জীবন বা মনেরও কোন অস্তিত্ব নেই। শরীরকে স্বীকার করে নিয়েই শরীরের মায়াজাল অতিক্রম করতে হয়। আমাদের ভাবনায় রাজকুমারও সেই শরীর ও শরীর অতিক্রমী গবেষণায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে, কয়েকজন নারী চরিত্রের মধ্যে রাখলে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং নারী সম্পর্কে কি মনোভাব সেই ব্যক্তির মধ্যে গড়ে উঠতে পারে, তাও এই উপন্যাসের বিবেচ্য বিষয়।

সরসী, রিনি, মালতী ও কালী — এই চার নারীর চতুষ্কোণ জগতে রাজকুমার কিভাবে জড়িয়ে পড়ে, তা উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন মানিক। যেসব সমস্যা তাদের মধ্যে হাজির হয়েছে, তা কোনো সাধারণ সমস্যা নয়, ব্যক্তির জীবনযন্ত্রনা প্রধান নয়। এটা সমাজের বিশেষ একটা স্তরে বিশেষ এক ব্যক্তির চিন্তা বা আইডিয়াকে বাস্তবে দেখতে যাওয়ার সমস্যা। চারজন নারী রাজকুমার সম্পর্কে চার রকমের প্রতিক্রিয়া বা অভিব্যক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। রাজকুমার নিজের আইডিয়াকে বাস্তবে দেখতে গিয়ে বা অনুসন্ধানকে পরিণতি দিতে গিয়ে মুখোমুখী হয়েছে সমাজে বিদ্যমান শরীর ও সম্পর্ক, আবেগ সংক্রান্ত নানা সংস্কার ও জিজ্ঞাসার। এর মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছে রিনির আচরণ ও তার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনা। এখান থেকেই নিজেকে সামলে রাখতে না-পারা রাজকুমারের উত্তোরণ শুরু। এই উত্তোরণ ব্যক্তির খেয়াল খুশি থেকে দায়িত্বশীল সামাজিক জীবনে ব্যক্তির উত্তোরণ।

৩০-৪০ এর দশকে ভেঙে পড়া সামাজিক পরিকাঠামো যুগমনে তীব্র অস্তিত্বের সংকট তৈরি করেছিল। সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে অস্থিরতা ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তার ফল সরাসরি এসে পড়ছিল মানুষের জীবনের পরিমণ্ডলেও। তার ফলে বিকৃত রুচি, বিকারগ্রস্ততা, অপরাধবোধ ও অপরাধপ্রবণতা, জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, যৌনবিকৃতি যুবসমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মানবিক বৃত্তির অবনমন যুবক-যুবতীদের মধ্যে তৈরি করেছিল প্রতিকারহীন এক অসুখ। সেই অসুখের নানা বিক্ষিপ্ত লক্ষণ এই উপন্যাসে আমরা পেয়ে যাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকে সমাজ ভাবনায় নানা পরিবর্তন ও নানা ভাঙাগড়া শুরু হয়েছিল। পুরাতন সামাজিক সংস্কারগুলি যেমন ভেঙে পড়ছিল, তেমনি গড়ে উঠছিল আধুনিক মানসিকতালগ্ন নতুন চিন্তা-চেতনা। প্রেম এবং নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে উপন্যাসে। তাই রাজকুমারের কাছে নগ্ন নারীদেহ দর্শন অপরাধ বলে মনে হয় না, বা রাজকুমারের সামনে নিজেকে নিরাবরণরূপে উপস্থিত করতে রিনির মধ্যেও কিছু দ্বিধা বা জড়তা দেখা যায় না। আসলে মানিক বুঝতে পেরেছিলেন, নর-নারীর একান্ত প্রেমের সম্পর্কের বাইরেও যে তাদের আরো কিছু জগৎ থাকতে পারে, তাদের অন্য কোন সম্পর্কের মাত্রা বা ডাইমেনশন তৈরি হতে পারে। আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে আমরা নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সেই সব বহুমাত্রিক ছবি লক্ষ্য করে থাকি। 'চতুষ্কোণে'

বহুমাত্রিক সম্পর্কের নানা কৌণিক ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এবং তাকে অস্বীকার করা যাবে না, তা বাস্তব এবং সময়োচিত।

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৬১।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা, কেন লিখি*, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ. ৪৮।

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ, ২০০৩, পৃ. ৫৬৪।

৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ, ২০০৮, পৃ. ২৮৪।

৫. হাসান আজিজুল হক, *মানিকের কথা — গদ্যবাস্তবের ভিরতপিঠ*, উত্তরাধিকার : মানিক স্মরণ সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৮৩।

৬. ‘চতুষ্কোণ’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ১১।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

১৯৪৩

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৫তম বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় আচ্ছন্ন গোটা পৃথিবী। আমেরিকা সেনাবাহিনীর কাছে জাপান সেনাদের একাংশের আত্মসমর্পণ। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীকে ইতালি জনগণ প্রত্যাখান করলে মুসোলিনী সরকারের পতন। টোকিও থেকে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে একটি বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। বার্লিনে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স কমিটি' গড়ে ওঠে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দুঃসাহসী ভারতীয় যুবক ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেয়। নেতাজি দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণপূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কর দ্বীপের পাশে, উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে একটি ভেলায় ভাসতে ভাসতে লাইভ জ্যাকেট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে পৌঁছান। সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র ভারতীয় নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন ঝাঁসিরাণী বাহিনী। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে বলেন, আজ আমার জীবনে পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন। কারণ কোন ভারতীয়ের কাছে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নেতা হওয়ার চেয়ে বেশি সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না। আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে কয়েকদিনের মধ্যে নয়টি রাষ্ট্র জাপান, জার্মান, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও মাঞ্চুরিয়া স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করে নেয়। টোকিওতে জাপান সম্রাট সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বাগত জানান। 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কুশল কানোয়ারের আসামের জোড়হাট জেলে ফাঁসি হয়। ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয়। সভাপতি হুমায়ুন কবীর ও সহসভাপতি আতাউর রহমান। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জানুয়ারি ২৬ বার্লিনে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেন।

সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং তমলুকে 'জাতীয় সরকার' স্থাপিত হয়। এক ঘোষণায় 'বিদ্যুৎ বাহিনী'কে জাতীয় সেনাবাহিনী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই জাতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক বা Commander in Chief নিযুক্ত হন সুশীল কুমার ধাড়া।

জানুয়ারি ২৯ গান্ধিজি অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ফেব্রুয়ারি ২ সোভিয়েত লাল ফৌজ স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জয়ী। জার্মান সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ।

ফেব্রুয়ারি ৮ জাপান সরকারের অনুরোধে জার্মান সাবমেরিনে কিয়েল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গী আবিদ হোসেনকে নিয়ে টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন।

ফেব্রুয়ারি ১৪ প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে পুনরায় সমর্থন জানান।

	গান্ধিজির অনশনের সময় রাজাগোপালচারী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তান মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে জিন্নার সঙ্গে আলোচনার অনুমতি চেয়ে নেন এবং জিন্নার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।
ফেব্রুয়ারি ২৮	হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্রসেতু) সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।
মার্চ ২	গান্ধিজি অনশন ভঙ্গ করেন। সরকার মুক্তি দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি।
মার্চ ৩	লাহোর অ্যাসেম্বলিতে স্বাধীন ও পৃথক পাকিস্তান চাই — এই রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়।
মার্চ ৯	বোম্বাইতে অকংগ্রেসী দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
মার্চ ১০	ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া দলিল প্রস্তুত করেন।
মার্চ ১৮-২১	কলকাতায় ভারতসভা হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবানী সেন।
এপ্রিল ৩	'ইন্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ' বা ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সর্বসময় কর্তৃত্ব রাসবিহারী বসুর উপর ন্যাস্ত করা হয়।
এপ্রিল ১০	কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 'খসড়া প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করে।
এপ্রিল ২৪	বাংলার স্যার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।
মে ১১	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সার্বানে পৌঁছোন সুভাষচন্দ্র।
মে ২৫	'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা ও প্রথম সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।
মে ২৮	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পার্টি কংগ্রেস (২৮মে থেকে ১ জুন) বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন পি. সি. যোশী।
জুন ১৩	সুভাষচন্দ্র টোকিওতে পৌঁছান।
জুন ১৪	জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সাথে সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ করলে তোজো সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।
জুন ১৬	প্রধানমন্ত্রী তোজো জাপানী ডায়েট বা পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে জাপান ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে ভারতবাসীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।
জুলাই ২	টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। তাঁর সাথে ছিলেন রাসবিহারী বসু, কর্ণেল ইয়ামামাটো এবং মিঃ সেনদা। বিমানবন্দরে সুভাষচন্দ্রকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।
জুলাই ৫	'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনে অনুষ্ঠিত এক প্যারেডে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত বাহিনীগুলি পরিদর্শন করেন সুভাষচন্দ্র। এই দিন প্রথম 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়।
জুলাই ৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের সুবিধার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত।
জুলাই ১২	সুভাষচন্দ্র 'ঝাঁন্সি রানি' বাহিনী গঠন করেন।
আগস্ট ২৩	মুজফ্‌ফর আহমেদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে পিপলস রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।
আগস্ট ২৫	সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, **দিল্লি চলো** ডাক দেন।

সেপ্টেম্বর ২৭ চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর সদস্য মানকুমার বসু ঠাকুর, নন্দকুমার দে, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে সামরিক আইনানুসারে মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর ২৯ জনগণের জন্য রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। এই সময় হাজার হাজার মানুষের অনাহারে মৃত্যু ঘটে।

অক্টোবর ২১ সিঙ্গাপুরের ক্যাথায় বিল্ডিং হলে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক ঐতিহাসিক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

অক্টোবর ২১ সুভাষচন্দ্র ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন।

অক্টোবর ২৩ জাপান সরকার স্বাধীন 'আজাদ হিন্দ সরকার'কে স্বীকৃতি দান করেন।

অক্টোবর ২৯ জার্মানি 'আজাদ হিন্দ সরকার'কে স্বাধীন সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

নভেম্বর ১ জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ করলে তোজো তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে স্বাগত জানান।

নভেম্বর ৫-৬ জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষচন্দ্রের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন।

নভেম্বর ৯ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' যুদ্ধ যাত্রা শুরু করে।

নভেম্বর ১৮ টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র রওনা হন।

নভেম্বর ২৪ আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ বাহিনী তাইপিং থেকে রেঙ্গুন যাত্রা করে।

নভেম্বর ২৮ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইথটন চার্চিল, আমেরিকান রাষ্ট্রপতি রুশভেল্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট স্তালিনের মধ্যে তেহরানে বৈঠক। এই বৈঠকে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়।

ডিসেম্বর ৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানী বোমারু বিমান দুপুরবেলা কলকাতা শহরে বোমাবর্ষণ করে।

ডিসেম্বর ৩০ আন্দামান সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন সুভাষচন্দ্র। রস দ্বীপে আন্দামানের চিফ কমিশনারের বাংলোতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়তে থাকে। সুভাষচন্দ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম বদল করে রাখেন যথাক্রমে শহীদ ও স্বরাজ দীপপুঞ্জ।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অমিয় চক্রবর্তী : *অভিজ্ঞান বসন্ত* / অরুণ মিত্র : *প্রান্তরেখা* / কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *রাজধানীর তন্দ্রা* / বাণী রায় : *জুপিটার* / বুদ্ধদেব বসু : *বিদেশিনী, দময়ন্তী* / সমর সেন : *খোলাচিঠি* / সুধীরচন্দ্র কর : *অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু*। **নাটক** — রবীন্দ্রনাথ : *ছড়া* / বুদ্ধদেব বসু : *দময়ন্তী* / অমিয় চক্রবর্তী : *অভিজ্ঞান বসন্ত* / বিজন ভট্টাচার্য : *আগুন, জবানবন্দী*। **উপন্যাস** — বনফুল : *সে ও আমি, জঙ্গম* / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : *মোহানা* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *উপনিবেশ তিনখণ্ড*।

গল্পগ্রন্থ — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রতিধ্বনি, দিল্লিকা লাড্ডু* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *সমুদ্রের স্বাদ*।
গদ্য ও প্রবন্ধ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *সাহিত্যের স্বরূপ* / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *জোড়াসাঁকোর ধারে, আপন কথা* / রাজশেখর বসু : *কুটির শিল্প*।

পত্রিকা প্রকাশ — *পূর্ণিমা* : যতীন্দ্রমোহন বাগচী / *দিগন্ত* : অজিত দত্ত / *নতুন পত্র* : পরিমল গোস্বামী, সুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য / *অভিযাত্রী* : অজিতকুমার চক্রবর্তী / *রঙমহল সংবাদ* : পরিমল গোস্বামী।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুল মান্নান সৈয়দ।

মৃত্যু : দীনেন্দ্রকুমার রায়, মানকুমারী বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেমলতা দেবী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রন্টের চাকরিতে মানিক ইস্তফা দেন এই বছরের শেষের দিকে। এটিই তাঁর শেষ চাকরি। চাকরি সূত্রে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরার এবং সেই সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার সহ নানারকম বেতার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ। যেমন — আগস্ট মাসে 'ডেভিড কপারফিল্ড' এবং 'মেজাজের গল্প' শীর্ষক বেতার কথিকা পাঠ। এই বছরের গোড়ার দিকে ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে মানিক যোগদান করেন। এ সম্পর্কে চীনমোহন সেহানবীশ জানিয়েছেন —

> কিছু দিনের মধ্যে একদিন একান্তে পেয়ে তাকে সভয়ে জানিয়েছিলাম আমাদের মতামত। 'সভয়ে' কারণ বড়ো লেখকের উতুঙ্গ আত্মভিমানের পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি পরে পরে। মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে — "অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয় নি এই বলতে চান তো। তা কি করে হবে বলুন ? কতটুকু জানি আপনাদের ? যখন আপনাদের ঠিক চিনবো দেখবেন তখন গল্প উতরয় কি উতরয় না![১]

শারদীয়া যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উপন্যাস *প্রতিবিম্ব*। সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *সমুদ্রের স্বাদ*। সেপ্টেম্বর মাসে *পূর্বাশা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *রাঙামাটির চাষি* উপন্যাসের প্রকাশ শুরু হয়। পরবর্তীকালে উপন্যাসটি *চিন্তামণি* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুনীল কুমার ধর সম্পাদিত *নতুনজীবন* পত্রিকায় ডিসেম্বর মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *খুনী* উপন্যাসটি। কনিষ্ঠা কন্যা শিপ্রার জন্ম।

প্রকাশিত গল্প: এবছরের শারদ সংখ্যাগুলি সমৃদ্ধ হয় মানিকের নানান গল্পে। *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত হয় 'বাস'। *সঞ্চয়ণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিলামসন', *অলকা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

'দিশেহারা হরিণী'। এ বছরে প্রকাশিত অন্যান্য গল্পগুলি: 'স্বামী-স্ত্রী' (*বৈশাখী*, নভেম্বর), 'মৃতজনে দেহ প্রাণ' (*সংকেত*, নভেম্বর), 'রোমান্স' (*রূপান্তর*, পৌষ ১৩৫০)। 'তোমরা সবাই ভালো' (*সঞ্চয়ণ*, ডিসেম্বর)।

গল্পগ্রন্থ-১: সমুদ্রের স্বাদ

সমুদ্রের স্বাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তদশতম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ২ +১৫২ এবং দাম দু টাকা। প্রথম সংস্করণে মোট বারোটি গল্প ছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে আরো একটি গল্প *মানুষ হাসে কেন* সংযোজিত হয়। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ[২]:

সমুদ্রের স্বাদ	পত্রিকা	ভাদ্র ১৩৪৬
পূজা কমিটি	নতুন পত্র	শারদ ১৩৪৬
কাজল	অলকা	চৈত্র ১৩৪৬
মানুষ হাসে কেন	আনন্দবাজার পত্রিকা	শারদ ১৩৪৬
মালী	চতুরঙ্গ	পৌষ ১৩৪৭
আততায়ী	আনন্দবাজার পত্রিকা	দোল ১৩৪৭
একটি খোয়া	অরণী	আশ্বিন ১৩৪৮
গুণ্ডা	আনন্দবাজার পত্রিকা	শারদ ১৩৪৮
বিবেক	দেশ	শারদ ১৩৪৯
সাধু	ভৈরব	১৩৫০
ভিক্ষুক	ভারত	?
ট্র্যাজেডির পর	দেশ	?
আপিম	ভারত	?

এই গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে ১৩৫৩ সালে দি বুকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে মানিক ভূমিকা স্বরূপ লিখেছিলেন —

> ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে *সমুদ্রের স্বাদ* এর গল্পগুলি গেল। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষি-মাঝি-কুলি-মজুরদের কাহিনি রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করা। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর-মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানা অতিসুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মতো মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে।

> তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবন যুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত। ... আজ নিজের লেখাগুলি আবার পবে বুঝতে পারি, সেরকম জোরালো বিশ্বাস ছিল না। আমিও যে মধ্যবিত্ত, পথ খুঁজে না পাওয়ার আতঙ্কে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত বলেই নির্মম আত্মসমালোচক ...। মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে, তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটোলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি, পথ খুঁজে না পাই পথের ইঙ্গিত জেনেছিলাম।[৩]

সমকালে দেশের বিভিন্ন আন্দোলন, বিপ্লব ও যুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় সমাজ পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন এবং দেওলিয়াপনা, মানুষের মানসিক জগতেও তৈরি করেছিল শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর জনিত উদ্ভুত পরিস্থিতির বিবরণ ও সমস্যা এই গল্পগ্রন্থে প্রধানভাবে উঠে এসেছে। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি হল: *সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পূজা কমিটি, আপিম, গুণ্ডা, কাজল, আততায়ী, বিবেক, ট্র্যাজেডীর পর, মালী, সাধু, একটি খোয়া, মানুষ হাসে কেন*।

সমুদ্রের স্বাদ

নীলা নামের একটি মেয়ের বেদনাময় জীবনের গল্প *সমুদ্রের স্বাদ* । নীলার আজীবনের স্বাদ ছিল সমুদ্র দেখার। বাবা সামান্য কেরানি। তার বাবা-মা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীর সমুদ্র দেখে এলেও তাকে নিয়ে যায় না। আর্থিক কারণ এবং নীলার বিবাহযোগ্য বয়সের জন্য। দুটি কারণই নিম্নবিত্ত পরিবারের অবস্থা জনিত। নীলার বাবা তাকে পূজোর ছুটিতে সমুদ্র দেখাবার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নীলার বাবা মারা যায়। সমুদ্র না দেখার কারণে নীলা বহুবার কেঁদেছে, কেঁদেছে আরও নানা কারণে। এবার সে বাবার জন্য কাঁদে। অনাদরে অসহায়ভাবে মামাবাড়িতে আশ্রয় জোটে তাদের। কিছুদিন পরে তার ভাইটিও মারা যায়। হাসপাতালের কম্পাউন্ডার আধাপাগল অনাদির সঙ্গে নীলার বিবাহ হয়। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য অপুষ্ট জীবনশক্তির অসুন্দর পাত্র অনাদি। মামাবাড়ির অবহেলার চেয়ে তবু নীলার স্বামীগৃহের আশ্রয় বেশি সম্মানের মনে হয়। এখনও কারণে অকারণে নীলা কাঁদে। সবাই তাকে ছিচকাঁদুনি বলে বিদ্রুপ করে। চোখের জলের নোনাস্বাদ সে জিভ দিয়ে চেটে নেয়। এই নোনা স্বাদ তাকে সমুদ্রের নুনের স্বাদের আস্বাদ দান করে। আসলে নীলার এই কান্না শুধুমাত্র সমুদ্র না দেখার কান্না নয়, সমুদ্র এখানে বৃহৎ, বিস্তৃত ও কাঙ্ক্ষিত জীবনের প্রতীক। যে জীবনে প্রবেশের সম্ভাবনা তার নেই—

> গুমরাইয়া গুমরাইয়া এই কথাটাই দিবারাত্র মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছে যে সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই, দেবার নাই — সানাই বাজাইয়া একদিন তার জীবনের স্বাদ, আহ্লাদ, সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।[৪]

এই কান্না তার জীবনের স্বপ্নভঙ্গের কান্না। যে জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার অবচেতনে ছিল, সে স্বাদ কোনো দিনই তার পূর্ণ হবে না, তাই সে কাঁদে, ছোটোবেলায় সমুদ্র না দেখার কান্না আর এখনকার কান্নার মধ্যে

এক তীর্যক তাৎপর্য তৈরি করেন লেখক। সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নীলার মতো অনেক মানুষেরই জীবনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। জীবনে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের এই দুঃখ বেদনার দিকটিকে মানিক *সমুদ্রের স্বাদ* গল্পে নীলার বেদনাময় পরিণতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

ভিক্ষুক

চল্লিশের দশকে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আত্মসম্মানবোধ হীনতা কতখানি বিপর্যস্ত হয়েছিল, মানিক এই গল্পে তা দেখিয়েছেন। অল্পআয়ের চাকুরিজীবী যাদব কিভাবে ভিক্ষুকে পরিণত হল তাই নিয়ে এই গল্প। কলকাতা শহরে যাদব কিছুদিন চাকরি করার পর গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে আসে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য। তার কাছে অল্প টাকা ছিল, বাসে সেই টাকা চুরি যাবার ভয়ে সে অচেনা সহযাত্রীর কাছে নিজের বেকারত্বের ও দারিদ্র্যতার কাল্পনিক গল্প বলে, বড়োছেলের মরণাপন্ন অসুখের কথা বলে। সহযাত্রীটি বিদায় নেবার আগে যাদবের ছেলের চিকিৎসার জন্য দশটি টাকা দেয়। আত্মসম্মানজ্ঞানহীন যাদব অল্প পরিশ্রমে কত সহজে দশটি টাকা পাওয়া গেল ভেবে বিস্মৃত হয়। কলকাতায় এসে সে এই ভিক্ষার জীবিকাটিকে উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নেয়। ভিক্ষাতে রোজগার বেশি বলে সে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবে। একদিন শেওড়াফুলীগামী বাসে তার আলাপ হয় কেতা দুরস্ত একটি লোকের সঙ্গে, যে তার পকেট কাটার কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে যাদবের কাছে অর্থ সাহায্য চায়। ভিক্ষাবৃত্তির এই আধুনিক কৌশল দেখে যাদব বিস্মৃত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সমাজের সর্বস্তরে দেওলিয়া ভাব দেখা দিয়েছিল। সেই সঙ্গে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে করেছিল আরো ভয়াবহ —

> খাদ্যাভাব, অনটন, কালোবাজারি, দুর্নীতির ফলে সমাজ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। সর্বগ্রাসী হতাশায় ডুবে গিয়েছিল অধিকাংশ মানুষ। অথচ তারা প্রতিবাদে মুখর হতে পারেনি। আত্মরক্ষার তাগিদে, বেঁচে থাকার তাগিদে একশ্রেণির মানুষ যেন ভিক্ষাবৃত্তিকে শ্রেয় মনে করেছিল। এই অবমাননাকর পরিস্থিতিকে মানিক তীব্র শ্লেষে ব্যক্ত করেছেন 'ভিক্ষুক' গল্পে।[৫]

মানুষ হাসে কেন

হাসির প্রধান কারণ যে অসঙ্গতি এই সত্যটি পঞ্চাশ বছর বয়স্ক প্রৌঢ় ডাক্তার রসময় ভুলে গিয়েছিল। অল্পবয়সের স্বাভাবিক হাসির ফোয়ারা তার শুকিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বার সে বিয়ে করেছিল ছেলে মেয়েদের থেকেও বয়সে ছোটো একটি বালিকাকে। সন্ধ্যায় তার ডিসপেনসারিতে চেনা লোকেরা আড্ডা দেয়, বিপিন সরকার সকলকে হাসায় এবং সকলে তার রসিকতায় মজা পায়। শুধুমাত্র রসময় হাসে না। সে বুঝতে পারে না, মানুষ হাসে কেন। তার ঘরভর্তি পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাই, নাতি-

নাতনী সকলেই আছে। হাসির কথা শুনলে সকলেই হাসে, কিন্তু রসময়ের হাসি আসে না। প্রতিবেশী এক অল্প বয়সী দম্পতির বাড়িতে অসুস্থ মহিলাটিকে দেখতে যায় রসময়, মহিলাটি সামান্য সুড়সুড়ি লাগলে হেসে অস্থির হয়। এই দম্পতির মৃদু দাম্পত্য আলাপ ও কথাবার্তা শুনে রসময় নিজের চরিত্রের অসঙ্গতি খুঁজে পায়। সে নিজে বৃদ্ধ কিন্তু বিয়ে করেছে তার ছোটোমেয়ের থেকেও বয়সে ছোটো একটি মেয়েকে, যে মেয়ে তার থেকে বেশি বয়স্ক পুত্র-কন্যাদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। নিজের জীবনের এই অসঙ্গতি আবিষ্কার করামাত্র রসময়ের এতদিনের রুদ্ধ হাসির আগল খুলে যায় —

> ঘুম ভাঙিয়া রানি বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চাহিয়া থাকে। তাতে তার হাসি যেন আরও বাড়িয়া যায়। হাসিতে তার ভয়ানক কষ্ট হয় তবু সে পাগলের মতো হাসিতে থাকে। হাসি পাইলে মানুষ না হাসিয়া পারিবে কেন।[৬]

পূজা কমিটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজাকমিটির আলোচনা সভায় মধ্যবিত্ত মানুষের চারিত্রিক অসঙ্গতি, লোভ, কপটতা, হীনমন্যতা, কৃত্রিম বিনয় ও নানা অসঙ্গতির চিত্র মানিক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন —

> সকলেই পরিস্কার জামাকাপড় পরিয়া আসিয়াছে, বয়স্কদের সকলের হাতেই প্রায় ছড়ি অথবা লাঠি। মিটিংয়ে আসিতে অনেকে দেরি করিলেও এবং পাড়ার সাধারণ বৈকালিক আসরের মতো নিজেদের মধ্যে সাধারণ গল্পগুজব চালাইতে থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় নিজের নিজের গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।[৭]

অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের বাড়ির লনে এই সভাটি আয়োজিত হয়। অতি সাধারণ মানুষগুলিও নিজেদেরকে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ মনে করে গাম্ভীর্য প্রকাশ করে। গগনবাবুর গতবারের মতো এবারেও প্রেসিডেন্ট হবার ইচ্ছা, কিন্তু অতিরিক্ত বিনয় দেখাতে গিয়ে তার প্রেসিডেন্ট হওয়া ফসকে যায়। উপস্থিত সকল চরিত্রগুলির আচরণের মধ্যেই মানিক মধ্যবিত্তের নানা অসঙ্গতি, ছলনা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন।

আপিম

এই গল্পে হরেন আফিম খায় নিজের দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোলার জন্য। সে নেশা করে বলে সকলে তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু সমাজের সকলেই এক একটা নেশায় আচ্ছন্ন। তার ছোটোভাই নরেন লটারির টিকিট কিনে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে নেশায় বিভোর, তার স্ত্রীর নেশা ছেলে বড়ো হয়ে বিশাল চাকরি করবে, তার ছেলের নেশা বিমলবাবুর ধনী কন্যা সবিতার প্রণয় লাভের, সকলেরই কিছু না কিছু নেশা রয়েছে। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদ ও স্বার্থপর মানসিকতার প্রকাশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে মানিক। আর গল্পের শেষে তিনি ব্যঙ্গের সুরে বলেন —

> বাড়িতে আফিম খায় একজন কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখে সকলেই। হরেনের পনের বছরের মেয়ে অমলা পর্যন্ত কাকিমার চোখ এড়াইয়া এত রাত্রে খোলা ছাদে একটু বেড়াইতে যায় — ছাদে গিয়া নানা কথা ভাবিতে তার বড়ো ভালোলাগে।[৮]

নিজের সামাজিক অবস্থানে বন্দি মধ্যবিত্ত মানুষের অসহায়তা ও সামর্থের বাইরে গিয়ে স্বপ্ন দেখার সত্যটিকে মানিক চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ভিক্ষুক গল্পে।

গুণ্ডা

ফেলনা নামের একটি চরিত্র এই গল্পের নায়ক। সে সমাজবিরোধী এবং গুণ্ডা। তার কোনো রোজগার সৎপথে নয়। একবার সাত বছরের ও একবার তিন বছরের জেল খাটবার সম্ভাবনাকে সে কৌশলে বন্ধ করে দেয় উকিল শ্যামলালের সাহায্যে। ফেলনার ভালোবাসার মানুষ রাসি দেহোপজীবিনী হলেও ফেলনার প্রতি বিশ্বস্ত, সে ফেলনার জন্য টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সোনার বালা বাঁধা দেয়। ফেলনা ফিরে আসায় সবচেয়ে বেশি খুশি সে হয়। সেই রাত্রেই বড়ো দান মারার সুযোগ থাকলেও অসুস্থতার জন্য ফেলনা ডাকাতি করতে যেতে পারেনা। অথচ ভোরবেলা তাকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। অভিযোগ, গতরাত্রে একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে এবং ফেলনা এই খুনের সঙ্গে জড়িত। এই গল্পের মধ্য দিয়ে মানিক দেখাতে চেয়েছেন, ফেলনার মতো কিছু মানুষ পাপচক্রের মধ্যে পড়ে এমনভাবে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে তাদের জীবনে অন্ধকার অবস্থা কখনো কাটে না।

কাজল

রানি নামের এক তরুণীর কাজলপরা চোখের সৌন্দর্যে বিকাশ নামের এক ধনী যুবক আকৃষ্ট হয়। তাই রানি তার চোখের প্রসাধনে বিশেষ যত্ন নেয় এবং মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয় এই ভেবে যে তার কাজলহীন চোখ দেখলে বিকাশের ভালোলাগা আর থাকবে কি না ? রানির ধারণা তার কাজলহীন চোখ দুটি দেখলে বিকাশের অনুরাগ আর থাকবে না। এই ভাবনায় সে মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ঘটনাক্রমে একদিন রানি চোখে কাজল দিতে ভুলে যায় এবং বিকাশের সঙ্গে মোটরে চেপে বাইরে যায় বেড়াতে। যখন তার খেয়াল হয়, সে উদ্বেগে চিন্তায় হীনমন্যতাবোধে শুকনো হয়ে যায়। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই রানির বেদনার্ত বিনীত চোখ দেখে বিকাশ মুগ্ধ হয় আরো বেশি এবং রানীর বহু আকাঙ্ক্ষিত বিবাহ প্রস্তাবটি উচ্চারণ করে। গল্পটিতে মেয়েদের প্রসাধন বিলাসিতা এবং কৃত্রিম সৌন্দর্য ভাবনাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় থেকে যে অন্তঃসারশূন্যতা মনের মধ্যে তৈরি হয়, তারই প্রভাব ভাবনাবিহীন সৌন্দর্য চেতনায় এসে পড়ে। মানুষের বিকারগ্রস্ত মন তাই সহজেই আকৃষ্ট হয় নকল সৌন্দর্যের প্রতি —

রূপ বাড়ানোর নামে মেয়েদের কত হাস্যকর প্রসাধনের প্রক্রিয়া মানুষের চোখ-শোভা হইয়া গিয়াছে, রূপের ফাঁকি আড়াল করা কত প্রকাশ্য ও স্থূল রঙের পর্দা মানুষ চাহিয়া দেখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, কৃত্রিম রূপের মোহেই বেশি মুগ্ধ হইতে শিখিয়া রীতিমতো দাবি করিতে শিখিয়াছে কৃত্রিম রূপ।[৯]

আততায়ী

দিবাকর-কৃত্তিবাস বালক বয়সে প্রাণের বন্ধু ছিল। কৃত্তিবাস অবস্থাপন্ন গৃহের সন্তান আর দিবাকরের বাবা ছিল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। ছোটোবেলায় তারা স্কুল ফাঁকি দিয়ে নানা কুকর্ম করত। একদিন সকালে স্কুল ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে কৃত্তিবাসের বাবা ধনদাসের কাছে দুজনেই মার খায়। দিবাকরের পরামর্শে কৃত্তিবাস নিজের বাড়িতে আগুন লাগায়, শাস্তি স্বরূপ ধনদাস একটা জ্বলন্ত কাঠ কৃত্তিবাসের পিঠে চেপে ধরে। ফলস্বরূপ তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। দুইবন্ধু পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় কৃত্তিবাসের নিঃসন্তান পিসির কাছে আশ্রয় নেয়। কলকাতায় পড়াশোনা করে দিবাকর হয় চোখের ডাক্তার আর কৃত্তিবাস হয় সাধারণ ডাক্তার। কৃত্তিবাসের বিয়ে হয় একটি সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। কৃত্তিবাসের পিতা ধনদাস মারা গেলে সে কলকাতায় দুই ডাক্তারের উপযোগী একটি চেম্বার খোলে। কৃত্তিবাসের অনুপস্থিতির সুযোগে দিবাকর চিকিৎসার নামে আফিম খাইয়ে পিসিমাকে হত্যা করে। পিসেমশাই দুঃখে দিবাকরকে কলকাতার সব সম্পত্তি লিখে দিয়ে দেশে চলে যান। দিবাকর গোপনে কৃত্তিবাসের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গোপন প্রণয়লীলা চালাতে থাকে। চিকিৎসার নাম করে দিবাকর কৃত্তিবাসের আর একটি চোখও নষ্ট করে দিয়ে তাকে পুরোপুরি অন্ধ করে দেয়। কৃত্তিবাস বুঝতে পারে দিবাকরের ষড়যন্ত্র এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে গোপন সম্পর্কের কথা। সে প্রাণভয়ে সব ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মানবচরিত্রের হিংসা, জটিলতা ও পাশবিক প্রবৃত্তিকে মানিক আর্থ-সামাজিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এই গল্পে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

বিবেক

আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রে যত অসঙ্গতি এবং জটিলতা মানিক দেখেছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত *বিবেক* গল্পটি। বেকার যুবক ঘনশ্যাম অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ধনী বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে পায় মাত্র পাঁচ টাকা। সুযোগ বুঝে সে ধনী বন্ধুটির সোনার ঘড়ি চুরি করে পকেটে পুরে নেয়। বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার আর এক দরিদ্র বন্ধু শ্রীনিবাস, অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য তার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে। ঘনশ্যামের বাড়িতে এই অবস্থা দেখে শ্রীনিবাস বালা বিক্রি করে সংগ্রহ করা টাকা থেকে দশটাকা ঘনশ্যামকে দেয় তার স্ত্রীর চিকিৎসা করানোর জন্য। তারপর অন্যমনস্ক শ্রীনিবাস তার মানিব্যাগটি ফেলে রেখেই চলে যায়। ঘনশ্যাম সেটিকে চুরি করে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে শ্রীনিবাস ব্যাকুলভাবে ব্যাগটি খুঁজলেও আর ফিরে

পায়না। বেকার যুবক শ্রীনিবাসের ছেলের চিকিৎসার টাকা চুরি করে ঘনশ্যামের কোনো বিবেক দংশন হয় না। বরং সে মনে মনে পীড়িত হয় ধনী বন্ধুর ঘড়িটি চুরি করার জন্য। ডাক্তারের গাড়ি এসে থামলে সে ভীত হয়, পুলিশের গাড়ি এলো কিনা ভেবে। ধনী বন্ধুটি যদি তাকে পুলিশে দেয়, এই ভয়ে সবসময় সে গুটিয়ে থাকে। কিন্তু দরিদ্র বন্ধুটির অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার টাকা চুরি করার পর তার মধ্যে কোনো অপরাধবোধ জাগে না। সমকালীন দ্রুত বদলে যাওয়া সমাজব্যবস্থায় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কিছু মানুষ এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন যে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক মূল্যবোধ ও চেতনাগুলি হারিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে চরিত্রের অভ্যন্তরে দেখা দিয়েছিল নানা অসঙ্গতি ও মনস্তাত্ত্বিক বিকার। আমাদের আলোচ্য 'বিবেক' গল্পের ঘনশ্যাম চরিত্রটির মানসিক বিকার ও জটিলতা সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন।

ট্র্যাজেডীর পর

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সমাজের কতগুলি অবস্থা ও চারপাশের প্রিয় ও অপ্রিয় কিছু মানুষের সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। কোনো মানুষ যখন সমাজ-সংসার, পরিবার-পরিজন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে নিজের জগতে বাস করে এবং অন্য সকলের প্রতি উদাসীন থাকে, তখন আস্তে আস্তে সময়ের নিয়মে সমাজ-সংসার ও চারপাশের মানুষজনও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় তাকে ভুলে যায়। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিহির কলকাতায় পড়াশুনা করে, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলতে মদ-মাংস-নারীর সংস্পর্শে জড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তার বাবা তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু মিহির নিজের বেদনাকে এত বড়ো করে দেখে যে উদাসীনতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে সে আর সহজ হতে পারে না। একসময় সে আবিষ্কার, করে যেমনভাবে সে সকলকে ত্যাগ করেছে, তেমনি আসতে আসতে সবাই তাকে ভুলে গেছে। তাকে না জানিয়েই ভাগ্নির বিবাহ উৎসবের আয়োজন চলে। একসময় প্রতিবেশিনী ললিতার মা তাকে ভীষণ আদর-যত্ন করতেন কন্যার ভাবি পাত্র হিসেবে; সে বাড়িতেও আজ মিহির অনাহূত এক জন। তার দিদি তাকে ঘরের দক্ষিণের জানালা খুলতে বারণ করে, কেননা সেদিকে পুকুরের ঘাটে মেয়েরা স্নান করে। তার সম্পর্কে বাড়ির লোকেদের, প্রতিবেশীদের সবরকম আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। সে দেখে তার বিছানার চাদর বহুদিন পাল্টানো হয়নি, জলের কুঁজোয় একফোঁটা জল নেই, আজ সে সমস্ত সংসারে উপেক্ষায় অনাদরে অবহেলিত। বিকৃত ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও চারিত্রিক অসঙ্গতি কখনো কখনো এমন অবস্থা তৈরি করে — যুগের বিচ্ছিন্ন মানসিকতা ও সংকট মানুষের চেতনায় চারিয়ে দেয় এমনি নানা অসুখ। যার কবলে পড়ে অসহায় মানব চরিত্র মুক্তির পথ খুঁজে পায় না।

মালী

তরুণ মালী মনোহর আগে কাজ করত রায়বাহাদুরের বাগানে। পরে সে কাজ পায় কালেক্টর সাহেবের স্ত্রীর সৌখিন বাগানে। কালেক্টরের স্ত্রী লাইয়নের দাক্ষিণ্য দরিদ্র মনোহরকে মুগ্ধ করে। সে নিজের শ্রেণির লোকেদের কাছে এই সব ঘটনা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে নিজের মূল্য বৃদ্ধি করতে চায়। রায়বাহাদুরের বাগানের সুগন্ধী ফুলের টানে সেখানে ফিরে যাবার কথা ভেবেও সে যায়না। মিসেস লাইয়নের দাক্ষিণ্য ও আকর্ষণ তাকে বেশি টানে। নিম্নশ্রেণির চরিত্রকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মানিক এই গল্পে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

সাধু

গোপাল দশ-এগারো বছর আগে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কামনা-বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে না পারায় আবার ফিরে আসে স্ত্রীর কাছে। আসে স্বামীত্বের অধিকারবোধ নিয়ে। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে স্বামী হিসেবে নয়, প্রেমিক পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করে। স্ত্রী সুমতি তাকে স্বামীত্বের মর্যাদা দেয়নি, ফলে গোপালও সুমতিকে গ্রহণ করে না। যে গোপাল নিজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মূল্য না দিয়ে চলে গিয়েছিল, আজ সে ফিরে এসে সেই মূল্য দাবি করছে — কখনো কখনো মানুষের চরিত্রে এমন স্ববিরোধ ও অসঙ্গতি দেখা যায়। চরিত্রের লক্ষণীয় অসঙ্গতি ও মানসিক বিকারের পাশাপাশি সাধু-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ প্রকাশ করেছেন মানিক, যা তাঁর অন্য অনেক লেখাতেও আমরা দেখতে পাই।

একটি খোয়া

উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মঅহংকার ও অভিজাত দেখনদারি প্রায়শই একটা বিকারের রূপ নেয়। আলোচ্য গল্পে রায়বাহাদুর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ করে দেওয়ার জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে যায়। কেননা গ্রামে তার ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন অনেক বেশি মানুষের চোখে লাগবে —

> যতই ঘটা করা যাক, শহরে যেন জমে না, কারো চমক লাগে না। শহরে ধনীর সংখ্যাধিক্য রায়বাহাদুরকে পীড়ন করে। মেয়ের বিবাহ দিতে তাই দেশের বাড়িতে আসিয়াছেন। আত্মীয়কুটুম্বে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে, দশটা গ্রামে সাড়া পড়িয়াছে, কত যে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি সমাজে সেটা বুঝা যাইতেছে স্পষ্ট। মানুষের ঈর্ষা, ভয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তোষামোদে রায়বাহাদুরের আমিত্ব ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বেলুন হইলে ফাটিয়া যাইত।[১০]

রায়বাহাদুরের এক আত্মীয় অনুষ্ঠানের ভিড়ে জহরকে না দেখতে পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে, রায়বাহাদুর তাকে নেমন্তন্ন না করার কথা জানান। স্বদেশী করার অপরাধে তিনি জহরকে ত্যাগ করেছেন এবং জহরকে বাড়িতে ডেকে এনে তিনি নিজের বিপদ আর বাড়াবেন না। আগে জহর ছিল

রায়বাহাদুরের একান্ত স্নেহধন্য। কিন্তু শিষ্যের এমন বিপরীত আচরণে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জহরের বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ রাখতে রায়বাহাদুরের বাড়িতে উপস্থিত হলেও জহর বাড়িতেই থাকে। সে তিন বছর জেল খেটেছে, এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে সে সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এবং বাড়ির বাইরে এক পাও বেরোয় না। ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে মানসিক অসুস্থতা। একজন স্বদেশি করা ছেলের এই পরিণতির মধ্য দিয়ে মানিক দেখাতে চেয়েছেন, সমকালীন স্বদেশি আন্দোলনের একটি নেতিবাচক ছবি। এদেশের এমন অনেক যুবকেরই স্বদেশি করার অপরাধে ভয়ঙ্কর করুণ পরিণতি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য হাজার হাজার যুবক নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেই অবস্থারই একটি উদাহরণ আমরা জহরের মধ্যে পাই।

তথ্যসূত্র:

১. চিন্মোহন সেহানবিশ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন*, পরিচয় পত্রিকা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ. ৬।

২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৫৫১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৪. 'সমুদ্রের স্বাদ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

৫. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অঞ্জলি, ২০১০, পৃ. ৬৩।

৬. 'মানুষ হাসে কেন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।

৭. 'পূজা কমিটি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৮. 'আপিম', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৯. 'কাজল' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

১০. 'একটি খোয়া', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

তৃতীয় অধ্যায়

মানিক জীবনের রাজনৈতিক পটভূমি:
প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব (১৯৪৪-১৯৪৭)

১৯৪৪

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৬তম বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমাগত চূড়ান্ত পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। বছরের শুরুর দিকেই এদেশে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা। নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের হাত থেকে আলবেনীয়াকে মুক্ত করে আলবেনীয়ার জনগণ। জুনে এগার হাজার বোমারু বিমান ও সুবিশাল সেনাবাহিনীসহ ব্রিটিশ-মার্কিন নৌবাহিনী নোঙর ফেলল ফ্রান্সে। আগস্টে স্বাধীন হল ফ্রান্স। স্তালিনগ্রাদে লাল ফৌজের কাছে হিটলার বাহিনীর পরাজয়। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে ইংরেজদের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। 'স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু' এই ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীজমন্ত্র। তিরিশ হাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে এক জনসভায় সুভাষচন্দ্র বলেন, বাইরে থেকে ইংরেজদের আক্রমণ না করলে দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা প্রতিরোধগুলি ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে না। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভাগের তীব্র বিরোধীতা করে সুভাষচন্দ্র এক বেতার ভাষণে বলেন, "আমরা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ভারত সৃষ্টির সংকল্প গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা বিরোধিতা করব। আয়ারল্যাণ্ড ও প্যালেস্তাইন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। আমরা বুঝেছি যে একটা দেশকে বিভক্ত করার অর্থ হল অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিগত দিক থেকে তাকে ধ্বংস করা।" ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকাকালীন বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র বণিকের মৃত্যু হয়, ৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন।

জানুয়ারি ৪০০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে (দিনে গড়পড়তা ২৫ মাইল করে হেঁটে) আজাদ হিন্দ ফৌজের সুভাষ ব্রিগেড রেঙ্গুনে পৌঁছান।

জানুয়ারি ৪ মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে নেতাজী রেঙ্গুনে এসে পৌঁছান।

জানুয়ারি ১০ বিপ্লবীদের সন্ধানে বিহারের রামচকে পুলিশ অভিযান চালায়।

জানুয়ারি ১৭ সুভাষচন্দ্রের *এগিয়ে চলো* শীর্ষক একটি লেখা আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে বিলি করা হয়।

জানুয়ারি ২৮ রেঙ্গুনে নেতাজির নেতৃত্বে সেনা সমাবেশ।

জানুয়ারি ৩০ ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের ৪৪ জন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে জাপানিরা।

ফেব্রুয়ারি ৪ নেতাজি সুভাষচন্দ্র ডাক দিলেন 'দিল্লি চলো'। আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে।

মার্চ ১ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হল ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে।

মার্চ ১৮ আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ভূমিতে প্রবেশ করে।

মার্চ ১৯ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী উত্তর মণিপুরে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

মার্চ ২১	সুভাষচন্দ্র সাংবাদিক বৈঠকে এক নাটকীয় ঘোষণায় বিশ্ববাসীকে ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রবেশের কথা জানান।
এপ্রিল ২	রুশ বাহিনী রুমানিয়ায় প্রবেশ করে।
এপ্রিল ৮	আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমা দুর্গ এবং ডিমাপুর-কোহিমা রোডে একটি ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করে।
এপ্রিল ৩০	আজাদ হিন্দ সরকার মেমিও থেকে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকার হল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার।
মে ৭	আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে।
জুন ৪	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি রোমে প্রবেশ করে।
জুলাই ৮	হিন্দু-মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে রাজাগোপালাচারীর 'সি. আর. ফরমুলা' গান্ধিজির অনুমতি নিয়ে মহম্মদ আলি জিন্নাকে পাঠানো হয়।
জুলাই ২২	ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে পোল্যাণ্ড মুক্ত হয়।
জুলাই ২৬	জাপান প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে ইম্ফল অভিযান আপাতত বন্ধ থাকবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো পদত্যাগ করেন।
আগস্ট	আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যরা পিছু হটতে থাকে।
আগস্ট ৮	তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের এই দিন অবসান ঘটে।
আগস্ট ২৫	স্বাধীন হলো ফ্রান্স। স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের হাতে হিটলার বাহিনীর পরাজয়।
সেপ্টেম্বর ৯	বোম্বাইতে গান্ধি ও জিন্নার মধ্যে আলোচনা শুরু।
সেপ্টেম্বর ১৮	সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে উত্তর বর্মার রণাঙ্গনগুলির দিকে রওনা হন।
সেপ্টেম্বর ২৭	গান্ধি-জিন্নার আলোচনা শেষ হয়। এই আলোচনায় গান্ধিজি নিজে থেকে ভারত ভাগে সম্মতি দেন।
অক্টোবর ৯	সুভাষচন্দ্র জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসোর কাছ থেকে টোকিও যাবার আমন্ত্রণ পান।
অক্টোবর ২২	জার্মানরা আলবেনিয়া ত্যাগ করে। কমিউনিস্টরা অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে।
নভেম্বর ৪	জাপানের প্রধানমন্ত্রী কোইসোর সঙ্গে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন সুভাষচন্দ্র।
ডিসেম্বর ৩	রোঁমা রোঁলার মৃত্যু।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অমিয় চক্রবর্তী : *দূরযানী* / অরুণ ভট্টাচার্য : *ময়ূরাক্ষী* / জীবনানন্দ দাশ : *মহাপৃথিবী* / দিনেশ দাস : *ভুখা মিছিল* / ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : *লিখি ইতিহাস* / বিষ্ণু দে : *সাত ভাই চম্পা* / বুদ্ধদেব বসু : *রূপান্তর* / মণীন্দ্র রায় : *ছায়া সহচর* / সমর সেন : *তিনপুরুষ*। **নাটক** — শচীন্দ্রনাথ

সেনগুপ্ত : *ধাত্রীপান্না* / বিধায়ক ভট্টাচার্য : *তেরশো পঞ্চাশ* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: *বিংশ শতাব্দি* / বিজন ভট্টাচার্য : *নবান্ন* / শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *ধাত্রীপান*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *অনুবর্তন* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *মন্বন্তর, পঞ্চগ্রাম, কবি* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রতিবিম্ব* / শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : *বিষের ধোঁয়া* / সুবোধ ঘোষ : *তিতাঞ্জলি* / গোপাল হালদার : *পঞ্চাশের পথ*। **গল্পগ্রন্থ** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *নবাগত, তাল নবমী* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *যাদুকরী, স্থলপদ্ম* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *ভেজাল* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *হৈমন্তী, কায়গল্প* / মনোজ বসু : *দুঃখ নিশার শেষে* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *যতন বিবি* / অন্নদাশঙ্কর রায় : *দু-কান কাটা*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *জোড়াসাঁকোর ধারে*।

পত্রিকা প্রকাশ : *উজ্জয়িনী* : উমা চক্রবর্তী / *গীতবিতান* : প্রভাত গুপ্ত / *সাথী* : শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

মানিকের ব্যক্তিজীবনের খবর

এই বছরের শেষের দিকে মানিক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং আ-মৃত্যু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। সেইসঙ্গে পার্টির নির্দেশে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সঙ্গেও যুক্ত হন। তিনি যে কমিউনিস্ট, এ কথা গর্বের সঙ্গেই স্বীকার করতেন। জানুয়ারিতে ফ্যাসি বিরোধী শিল্পী সংঘের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হন। প্রথম থেকেই মানিক মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা, ন্যাকামি এবং ভণ্ডামির প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং চাষি, মজুর, শ্রমিকদের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির জীবন এবং মানবতায় বিশ্বাসী মানিক বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। মহাসম্ভাবনাময় আগামী বিপ্লবের চিন্তাধারা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে লাগল। তিলে তিলে গড়ে তুলতে লাগলেন বিপ্লবের তিলোত্তমাকে। আ-মৃত্যু অক্লান্ত সংগ্রামী মানিক জীবনজয়ী এই সাধনায় রত ছিলেন।[১] *সাহিত্য করার আগে* শীর্ষক আত্মকথনমূলক প্রবন্ধে তাঁর জীবনে মার্কসবাদের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন —

> লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার দৃষ্টিতে কতো মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি

> আমদানি করেছি— জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে দেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও....
> নেহাত সখের খাতিরে, নামকরা লেখক হওয়ার লোভে সাহিত্য করতে নামিনি সেটাই বলাবাহুল্য। এটুকু সম্বল করে নামলে সাহিত্যিকের বেশি দিন হালে পানি পাবার সাধ্য থাকেনা।[২]

এই বছরেই মানিক প্রথম প্রবন্ধ লেখেন — *কেন লিখি* এবং *ভারতের মর্মবাণী* ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ থেকে *কেন লিখি* নামে তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জবানবন্দী হিসেবে যে বইটি প্রকাশিত হয়, তাতেই মানিক *কেন লিখি* নামের নিবন্ধটি লেখেন। তিনি লিখেছেন —

> জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।... কলমপেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবে![৩]

অক্টোবরে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *ভেজাল* গল্পগ্রন্থ। আগস্ট মাসে *রূপমঞ্চ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *ভয়ঙ্কর* নাটিকা। সেপ্টেম্বর মাসে *নতুন জীবন* পত্রিকায় ছাপা হয় *যৌনজীবন* প্রবন্ধ। গণনাট্য সংঘের প্রকাশনায় বের হয় *ভারতের মর্মবাণী* প্রবন্ধটি। সঞ্চয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'Stories of Rural Bengal' গ্রন্থে সংকলিত হয় মানিকের গল্প *Hut Makers Romance*। এ বছরে প্রকাশিত অন্যান্য গল্প : 'অতিথি' (*সঞ্চয়ন*, ফাল্গুন) 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' (*মহামন্বন্তর গল্পসংকলন*, মার্চ), 'সন্ধ্যা ও তারা' (*প্রাঙ্গন*, মার্চ), 'সাড়ে সাত সের চাল' (*অর্চনা*, বৈশাখ), 'জোতদার' (*সম্প্রতি*, শারদ সংখ্যা)।

উপন্যাস-১ : প্রতিবিম্ব

প্রতিবিম্ব মানিকের একাদশতম উপন্যাস এবং অষ্টাদশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৪ + ৭৪। দাম এক টাকা চার আনা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে শারদীয় *যুগান্তরে* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সূচীপত্রে এটি বড়োগল্প রূপে উল্লিখিত হয়েছিল।[৪]

যে সময়ে এই উপন্যাসটি লেখা, তখন দেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। সমগ্র বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা ও স্বাধীনতার জন্য চরম স্তরে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন; প্রতিবাদ-প্রতিরোধ; ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু সামগ্রিকভাবে সমাজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। এই সময়ে আমাদের দেশে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার প্রচার ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা মানুষের মধ্যে আসতে আসতে বাড়তে

থাকে। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি আবর্তিত যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি — তাদের ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক প্রয়াসী হয়েছিলেন। মানিকের পূর্বসূরী লেখকদের ছিল বুদ্ধির আভিজাত্য আর শিল্পীত আবেগ কিন্তু মানিক ছিলেন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। তথাকথিত শিক্ষিত আর সভ্য সম্প্রদায়ের শূন্য অহমিকার প্রতি মানিকের অশ্রদ্ধা ছিল প্রবল। এই মধ্যমনস্ক শ্রেণির চিন্তার ভ্রান্তি, আচরণের কৃত্রিমতা এবং চিন্তা ও কর্মের মধ্যে অসঙ্গতি— এই হল মানিকের গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তিনি খুব স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন এই শ্রেণি, শুধু অন্যকে নয়, নিজেকেও ফাঁকি দেয় ও সমাজের উপর তলার মানুষ যাদের মুখ সর্বদাই ডোবানো লাভের পাত্রে — মানিকের লেখনী তাদের ক্ষমা করেনি। সমাজমানসের অসঙ্গতির দিকগুলি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। *প্রতিবিম্ব* গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকালে মানিক একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন —

> মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাব ধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাব-প্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব কি রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে, সোজা ভাষায় বলি তারকের মতো ছেলেদের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা যে রূপ নিয়েছে, *প্রতিবিম্ব*তারই একটা দিককে রূপ দেবার চেষ্টা।[৫]

যদিও মানিক ভূমিকায় জানিয়েছেন — গল্পটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নয়, তবুও একথা বলাই যায় এ গল্পের পটভূমি চল্লিশের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন। রাজনৈতিক উপন্যাসের মতো রাজনীতি প্রধান লেখা না হলেও, রাজনীতির মধ্যে যে রাজনীতি থাকে — অনেকটা সেই দিকে ইঙ্গিত করেছেন মানিক এই উপন্যাসে। এক যূথবদ্ধ প্রক্রিয়ায় চলে এই দলের কাজকর্ম। এক বিশাল পরিধির মধ্যে এই দলের কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে। ঘটনাচক্রে এই দলের মধ্যে এসে পড়ে তারক। এক বিশেষ চেতনাশ্রয়ী মন তারকের সমস্যা। বাস্তববোধের সঙ্গে ভাবপ্রবণতার যে দ্বন্দ্ব যুবকদের মধ্যে, দেখা যায়, তা তারকের মধ্যে প্রবল। পিতার এনে দেওয়া চাকরির আবেদনপত্র যথাস্থানে না পাঠিয়ে সে ফেলে দেয়। তার স্বপ্ন চাকরি নয়, দেশ ও সমাজ। বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যে যুক্ত হয় কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে। কিন্তু এই সমাজবাদী দলের মধ্যেও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে রক্ষণশীলতা, সেই রক্ষণশীলতা তারককে বিপর্যস্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়ায় দুলছে গোটাবিশ্ব। বাংলায় তখন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ — সমস্ত ঘটনাগুলির কার্য-কারণ সমাধান করতে পারে না তারক। তার মন গ্রামবাসীর দুর্দশা দেখে কেঁপে ওঠে, সে বুঝতে পারেনা রিলিফ দিয়ে এই বিপদ ঠেকানো যাবে কি ? শিক্ষিত যুবক আদর্শবোধের তাড়নায় সামাজিক কাজে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু হয়ে বুঝতে পারে সমাজের প্রকৃত বাস্তবচিত্র। সে বুঝতে পারে না কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করা উচিত — “ফ্যাসিজম্, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তা, পীড়ন, চোরাকারবার,

দুর্ভিক্ষ, গ্রো-মোরফুড — সব কিছুর মানে আছে, কিন্তু সবমিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে, তা যেন শুধু একটা জগাখিচুড়ী।"[৬]

বিষয়টি তারক বুঝতে পারলো, যখন পার্টির মূলশাখা — কলকাতা শাখার সঙ্গে যুক্ত হল। স্বাধীনচেতা, উদার, বিশ্লেষণধর্মী তারকের মন নির্ভেজাল সত্যকে চায়। কিন্তু সে দেখে সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার দাপাদাপি। কনফারেন্সের মূল বিষয় যখন হয়ে ওঠে বহু কথিত, বহু আলোচিত একটি প্রস্তাব পাশ — অথচ যে প্রস্তাব কোনো পার্টির সদস্যদের কাছেই পরিষ্কার নয়, তখন গোটা বিষয়টিকে তারকের অর্থহীন মনে হয়। কংগ্রেসের বক্তব্য যেখানে — "স্বাধীনতা চাও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামছি।" সেখানে আলোচ্য বিশেষ দলটি চায় — "আগে বিপ্লব চাই, পরে স্বাধীনতা।" অনুভূতিপ্রবণ তারক অকারণ নীতি বিরোধীতার কোনো উৎস খুঁজে পায় না, সেই সঙ্গে খুঁজে পায় না জনগণ থেকে বিচ্যুত একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে আবৃত এই কনফারেন্সের কোনো প্রয়োজনীয়তা। যে আদর্শবোধ তারককে সমাজের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে, যে নৈতিকতা সমাজ থেকে তাকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে দেয় না, যে মানবিকতাবোধের কারণে সমাজ-সংসার তার মনে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সোজাভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় — সেই মন কিন্তু পার্টির বিভ্রান্তিকর ক্রিয়াকলাপে অত্যন্ত সংশয়াতীত হয়ে ওঠে। তৎকালে ঘটে যাওয়া যে মন্বন্তরের খবর পরবর্তীকালে ইতিহাস হয়ে যায়, সেই ঘটমান দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষদের দুর্দশা নিরসনে দলে কোনো কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয় না। অথচ বাগাড়ম্বরপূর্ণ কনফারেন্সে এরাই সমাজবিপ্লবের কথা বলে। তারক তার ভিতরের প্রতিবাদকে কিছুতেই নিরস্ত্র করতে পারে না, যখন তাকে দেখতে হয় — হৃষিকেশ বাবুর মতো এক অনৈতিক লোককে দল স্বাগত জানাচ্ছে। সুতরাং দলের সদস্যবৃদ্ধি, কৃচ্ছ্র সাধনা, কনফারেন্স — কোনো কিছুই যখন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় না, তখন তা নেহাতই নিরর্থক।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই দলের কর্মী, শুধু তারা পরস্পর একসঙ্গে কাজই করে না, একই জায়গায় একসঙ্গেই তাদের থাকা, খাওয়া, শোয়া ইত্যাদি চলে। এক নিগূঢ় পদ্ধতিতে চলে রসায়নাগারে অন্য এক পরীক্ষা — যাতে অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারিক ঘর্ষণের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের যৌন আকর্ষণ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু এই পরীক্ষার ফল হল উল্টো। বিকর্ষণের ধারাটি সবসময় বয়না। মানিক দেখিয়েছেন, সীতানাথ মনোজিনীর জন্য কি উদগ্রভাবে পিপাসু। আবার অন্যদিকে তারকও মনোজিনীর মধ্যে এক অন্তর্গূঢ় অনুভূতিময় সুসম্পর্কের ধারা বয়ে চলে। তারকের প্রতি মনোজিনীর গভীর মমত্ববোধ, তাকে বোঝাবার আন্তরিক চেষ্টা তারককে কামনামদির করে তোলে, অথচ তারকের মর্মস্পর্শী তীক্ষ্ম অনুভূতিতে আসে অন্য এক মাত্রা।

জীবনের সমস্ত সময়টুকু দেশের কাজে নিয়োগ করবে বলে তারক চাকরি করতে চায় না, সংসারের বন্ধনে জড়াতে চায় না, অথচ যে দলের মাধ্যমে সে তার আদর্শনিষ্ঠার এমন সর্বাঙ্গিণ স্ফুরণ চায়, সেই দলই হয়ে দাঁড়ায় তার প্রতিপক্ষ। চাকরি করব না বলে তারক তার স্নেহান্ধ বাবাকে ঠকিয়েছিল, অথচ

সেই তারকই দলের অনুরোধে চাকরি প্রার্থী হয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হয়। রামবাবুর অনুরোধে সে ঘুরে ঘুরে চাষিদেরকে বোঝায়। শেষপর্যন্ত সে শহুরে আন্দোলন থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে যায় গ্রামে চাষি-মজুরদের মধ্যে —

> আমি সত্যি ওদের ভালো করে জানি না, প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি, একসঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করেছি — কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। হয়তো আনমনা হয়ে থাকতাম, লক্ষ্য করতাম না। আমার নিজের জানা একটা সমস্যা আছে, ওরা এক একজন এক একটা টুকরো মাত্র, এরকম ভাব ছিল মনে। আমার বাড়ির কাছে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধহয় লাখ খানেক কথা ওর সঙ্গে আদান প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখেছি, লোকটা কি ভাবে — কেমন করে ভাবে — কিছুই জানি না। মানুষগুলিকে একটু চিনে আসি।[৪]

অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত আন্দোলন বাস্তবসম্মত হতে পারবে না। দেশের এই মানুষগুলির সঙ্গে না মিশলে, কোনো মতেই তাদের প্রগতি সম্ভব নয়। তারকের মতো সেই সময়কার অসংখ্য যুবকদের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিবিম্বই এই উপন্যাস্যের কাহিনি—

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিজ্ঞান সচেতন মন নিয়ে তারকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তারকের পরিবর্তনশীল মনোভাবের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বলতে চেয়েছিলেন যে, সাম্যবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যদেশের অনুসরণ করে আমাদের দেশের কৃষক মজুরের সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে, কৃষক-মজুরদের জায়গায় নিজেকে রেখে তাদের সমস্যাকে উপলব্ধি করলে তবেই তার সমাধান সম্ভব। উপন্যাসে বিশেষ মতাদর্শের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ ঘটেনি বরং সেই মতাদর্শের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থেকেই মানিক চেয়েছিলেন সুযোগ্য নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে, আন্দোলন-প্রতিরোধ গড়ে তুলে দাবি আদায় সম্ভব। উপন্যাসে এই কথা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন।[৮]

উপন্যাসটি প্রকাশের পর নানা বির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পরবর্তী সংস্করণে মানিক ভূমিকায় জানান— কোনো পার্টির সমালোচনা তাঁর এই উপন্যাসের বিষয় নয়, তিনি আসলে রক্ষণশীল সমাজ ও যুবমানসকে প্রতিবিম্বিত করতে চেয়েছেন উপন্যাসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই বছরেই মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। তবে মার্কসবাদী দর্শনে আস্থা তাঁর পূর্বেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তিনি সমকালীন অবস্থায় নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন আন্দোলনের পদ্ধতিগত ত্রুটিকে এবং বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন গণ-মানসের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে গণ-আন্দোলন সার্থকতা পাবে না।

গল্পগ্রন্থ-১ : ভেজাল

ভেজাল মানিকের সপ্তম গল্পসংকলন এবং ঊনবিংশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫১, প্রকাশক সিগনেটপ্রেস, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬ + ১৪৪, দাম আড়াই টাকা। প্রথম সংস্করণে 'প্রকাশকের কথা' শিরোনামে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার গল্পগ্রন্থগুলি সম্পর্কে একটি পরিচিতি দেওয়া হয়েছিল। মানিকের গল্পের স্বরূপ বুঝতে যা আমাদের সাহায্য করবে —

> মানিকবাবু শক্তিমান লেখক। তবু তাঁর সম্বন্ধে এ বিশেষণটা যথেষ্ট শক্তিশালী হলনা। আরো বেশি করে বলা উচিৎ, বেশি করে বলতে না পারার দরুন সংক্ষেপে বলতে হয়, তিনি অসাধারণ তার অর্থ এ নয় যে তিনি অস্বাভাবিক। বরং মানুষের প্রকৃতিতে যা গোপন ও গহননিহিত, দুঃশ্ছেদ্য ও দৃঢ়লগ্ন, সহজাত ও অভ্যাস-অধিগত, তাকেই তিনি উদ্‌ঘাটন করে দেখান। তাই তাঁর দৃষ্টিটা সহজ ও সাধারণ দৃষ্টি নয়, সত্য দৃষ্টি।
>
> জীবনের একটা বাঁ দিক আছে। যেদিকটা মানুষ ঢেকে রাখে তার ঐশ্বর্য-বিলাসে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, পরিবেশ-প্রসাধনে; যেদিকটা প্রচ্ছন্ন, হয়তোবা কর্দমাক্ত। বাইরে যেটা ত্যাগ, ভিতরে সেটা বাঞ্ছা; বাইরে যেটা উৎসর্গ, ভিতরে সেটা লুব্ধতা... ডানহাত যখন দান করে তখন সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত যে ক্ষতিপূরণের ফিকির খোঁজে, সে খবরটা মানিকবাবু ধরে ফেলেছেন। এক হাতের সেবার পাশে আর এক হাতে যে দীন অনুনয় থাকে, উন্মুখ হয়ে সেটা একটু বাঁয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যায়। দেখা যায় বিরহে ডানচোখ অশ্রুপাত করলেও বাঁচোখ রেহাই পাবার আনন্দে চকচক করছে। দেখা যায়, যা ফাঁপা তাই লেফাফা দুরস্ত হয়ে সমাজে, সংসারে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাপট্যের তকমা পরেই যত কিছু পরিপাট্য। বাইরে যা শোভা ও শান্তি, সেটা প্যাশান ও শোষণেরই প্রকারান্তর। ডানচোখ দেখে শুধু মসৃণ চামড়া, সুগোল মাংস কিন্তু বাঁচোখ দেখে হাড়-গোড়, মূল-মজ্জা, নারীচক্র। যা আপাত দৃশ্যমান সে ডানচোখের, আর যা পরিণাম-প্রামাণিক তাই বাঁ-র...
>
> মানিকবাবু শাখার নন শিকড়ের। যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের নন, লঘুকরণের। এই গল্পগুলি তাঁর জীবনদর্শণের বিশেষ বোধক। কতখানি খাদ মিশিয়ে সোনা, গাদ মিশিয়ে মধু ও ক্লেদ মিশিয়ে রূপ তারই তিনি নির্ভুল ফর্মূলা কষে দিয়েছেন। মানুষের জীবনে প্রকাশ্যের চেয়ে প্রচ্ছন্নের ব্যঞ্জনা যে অনেক গভীর, তার সমস্ত গতি-বিরতির যে ব্যাখ্যাটা সহজগ্রাহ্য তারও চেয়ে যে একটা দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যা আছে, তার অবচেতনায় তার সমস্ত সারল্য যে দুর্বোধ্য এক কূটিলতার কুণ্ডলী তার সমস্ত প্রেরণা আসছে উর্ধ্বস্থ আকাশ থেকে নয়, আদিম ও যৌন মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে, তারই উদ্ভাষণ এই গল্পগুলিতে। আর এই বলা ও দেখা কি আশ্চর্য মিলেছে তার সজাগ শিল্পবোধের সঙ্গে। ভঙ্গির সঙ্গে মিলেছে আঙ্গিক, বিস্ময়ের বক্রতার সঙ্গে মিলেছে ভাষার তীক্ষ্ণতা। আর, যা সূক্ষ্ম তাই তীক্ষ্ণ, যা সত্য তাই রূঢ় ও নির্মম।[৯]

গ্রন্থের পরিচিতি অংশের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে মানিকের গল্পবিশ্বের স্বকীয়তা বোঝা যায়। গল্পকার মানিক কেন অনন্য, কেন অনেকের মধ্যে থেকেও তিনি আলাদা, তা প্রকাশক জহুরীর চোখে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশকাল সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:[১০]

ধনজনযৌবন	চতুরঙ্গ	আশ্বিন ১৩৪৮
মুখেভাত	ত্রিকাল	বার্ষিক ১৩৪৮
ভয়ঙ্কর	সম্প্রতি	আশ্বিন ১৩৪৯
দিশেহারা হরিণী	অলকা	শারদ ১৩৫০
বিলামসন	সঞ্চয়ন	শারদ ১৩৫০
বাস	আনন্দবাজার পত্রিকা	শারদ ১৩৫০
মেয়ে	রূপমঞ্চ	কার্তিক ১৩৫০
মৃতজনে দেহ প্রাণ	সংকেত	অগ্রহায়ণ ১৩৫০
রোমান্স	রূপান্তর	পৌষ ১৩৫০
স্বামী-স্ত্রী	বৈশাখী	বৈশাখী ১৩৫০

ভয়ঙ্কর

গল্পের নায়ক প্রসাদ ভীরু, দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন, বছর ত্রিশের এক যুবক। নিরীহ, বোকা, ভালোমানুষ হয়েই সে থেকেছে। কখনও প্রতিবাদ করতে শেখেনি। প্রসাদ কাজ করে মনিব ভূষণের কছে। সবসময় সে মনিবের ও মনিবপত্নীর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে —

> প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ, বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে। মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের। প্রকাণ্ড মাথায় ঠাস বুনোনী, কদমকেশর চুল, ফোলা ফোলা গাল, নাকের বড়ো বড়ো গহ্বর দুটি কাঁচা পাকা চুলে ভরা। পূরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি আর নির্মম কঠোরতার প্রতীক অবশ্য আছেন তার দেবতারা, কিন্তু তার মনে তাদের প্রভাবও ভূষণের মতো জোরালো নয়, ভূষণ প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। প্রতি মুহূর্তে তার অস্তিত্ব, উপস্থিতি অনুভব করা যায়।[১১]

ভূষণ ও তার স্ত্রী, প্রসাদকে নিজেদের মতো চালনা করে। প্রসাদ তার মনিব ও মনিবপত্নীর সামনে কথা বলতেও ভয় পায়। ঘটনাচক্রে প্রসাদ একদিন ভূষণের কারখানায় টাকা পৌঁছাতে গিয়ে প্রবল ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে পড়ে। ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ জাতীয় চরিত্র প্রসাদ এই আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘূর্ণিপাকে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে যায়। ঝড়কে সে প্রচণ্ড ভয় পেত, দরজা জানালা বন্ধ করে ঝড়ের সময় সে ঘরের

এক কোণে আশ্রয় নিত। সেই প্রসাদ কালবৈশাখীর দূর্দমনীয় ঝড়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রথমে মাটিতে শুয়ে পড়ে, পরে একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়লে সে বুঝতে পারে এইভাবে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। মনিবের দেওয়া টাকাও কোথায় পড়ে যায়। ভীষণ ঝড়, প্রখর বর্ষণ, চোখ ঝলসানো বাজ এমন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করে, তখন প্রসাদ বুঝতে পারে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার মৃত্যু অবধারিত। সে ঝড়কে উপেক্ষা করেই এগিয়ে যায় এবং বিপদ থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে সে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অতিক্রম করে একপ্রকার মুক্তির আনন্দ, উল্লাস ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করে। ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রসাদের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভূষণ ভয় পেয়ে যায়, প্রসাদও বুঝতে পারে হার না মেনে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলে ভূষণও তাকে ভয় পেতে পারে। ক্রমে ক্রমে প্রসাদের মোহভঙ্গ হয় এবং সে বেরিয়ে আসে ভূষণের আতঙ্ক থেকে, ভুষণের স্ত্রী আশার অবৈধ কামনার আকর্ষণ থেকে। সেই রাত্রেই সে স্নান খাওয়া দাওয়া করে ভূষণের দামি টর্চ নিয়ে হারিয়ে যাওয়া টাকার খোঁজে বার হয় এবং মনে মনে পরিকল্পনা করে, এই সাতশ তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে সে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে, তার জীবন ও সংসার, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ঝড় এই গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবন কখনো সমান্তরাল শান্ত গতিতে বয়ে চলে না। ঝড় জীবনে আসে এবং সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়ে যায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হয়। সভ্যতার আদিমলগ্ন থেকেই মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে আসছে। এরকম ঝড়ের মধ্য দিয়েই আসে পরিবর্তন। হয় নতুনের সূচনা। সমকালীন সমাজব্যবস্থায় মানিক দেখাতে চেয়েছেন অর্থবান, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলি অত্যাচারিত হতে হতে একসময় ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবেই। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে মার্কাস নাম দিয়েছেন শ্রেণি-সংগ্রাম, সংগ্রামী মানুষের প্রত্যয় ও স্বপ্ন এই গল্পের উপসংহারে প্রতিকায়িত।

রোমান্স

এই গল্পের নায়িকা সুখময়ী নটবরের স্ত্রী। গ্রাম্য যুবতী বধূ সুখময়ীর তীব্র প্রণয় আকাঙ্ক্ষার গল্প রোমান্স। সুখময়ীর প্রতি প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয় বিপত্নীক সুবল মোক্তার। স্নান সেরে ফেরার পথে সুখময়ীকে সুবল তার হৃদয়ের কাতর আবেদন জানান এবং সুখময়ী তার গ্রাম্যবধূ হওয়ার অসুবিধার কথা জানিয়ে সুবলের সঙ্গে দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সুবল রাজি হয় না। সে মোক্তারি করে দু'পয়সা রোজগার করতে শুরু করেছে। এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সম্ভাবনা ছেড়ে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে চায় না। কিন্তু সুখময়ী পাগলিনীর মতো তাকে আবেদন জানায়, স্বপ্ন দেখায় নতুন জীবনের। কিন্তু সুবল যেতে না চাইলে নিরাশায় সুখময়ী বাড়ি ফেরে এবং বাড়ি ফিরে এসে চমৎকার অভিনয়ে সুকৌশলে সুবলের সঙ্গে তার কলঙ্কের কথা ছড়িয়ে দেয়। যাতে সুবল তাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতি সে তৈরি করে। কলঙ্কের রটনাটা একটু বেশি রকমেরই হয়।

স্বামীর হাতে সে প্রচণ্ড মার খেয়ে রক্তা হয় এবং শাশুড়ী তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে। তাড়িয়ে দিলে সে কোথায় যাবে, এই ভেবে সুখময়ী ভীত হয় এবং রাত্রে চুপ করে শুয়ে থাকে। স্ত্রীকে শাসন করে অনুতপ্ত নটবর রাত্রে আবার স্ত্রীকে কাছে টেনে নেয়, দাম্পত্য মিলনের পর সুখময়ী কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং তার মনের ভয়ও কেটে যায়। স্বামী ঘুমিয়ে যাবার পরে সে আবার গিয়ে সুবলের সঙ্গে দেখা করে এবং পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করে। সুবলের অনুরোধে সিমেন্টের বাঁধানো ঘাটে সুখময়ী সুবলের সঙ্গে মিলিত হয়, সুখময়ীর পিঠের রক্তে সিমেন্টের ঘাট লাল হয়ে যায়। এইভাবেই গল্পটির সমাপ্তি আসে। মানব মনস্তত্ত্বের নিখুঁত জ্ঞান মানিকের লেখনীকে দিয়েছিল এক অদ্ভুত শক্তি। চরিত্রের গহনে কত জটিলতা লুকিয়ে থাকে এই ধরনের গল্পগুলিতে মানিক তা দেখিয়েছেন। অবৈধ কামনা, নারীর উগ্র যৌন আকাঙ্ক্ষা, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত বিকার মানিকের বেশ কিছু গল্পে চোখে পড়ে। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমাজের সার্বিক অবক্ষয়ে জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও মূল্যবোধগুলি ভাঙতে থাকে। তার ফলেই সুখময়ী, সুবল— এই ধরনের খণ্ডিত, বিকৃত চরিত্রগুলি উঠে আসে।

ধনজন যৌবন

ধনী ব্যবসায়ী নির্মলেন্দু অর্থের অহংকার, লোলুপতা ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবোধ থেকে তার মনের কামনা মেটাতে দরিদ্র গৃহবধূ সুমতীকে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সম্ভোগ করে। আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনায় সুমতী অপমানিত বা পীড়িত না হয়ে, বরং খুশী হয়। সে নিজেকে অনেক বেশি সম্মানীতা অনুভব করে। এই ঘটনায় সুমতীর স্বামী রাঘব রেগে গিয়ে বলে; যে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে নির্মলেন্দু সুমতীকে ভোগ করে গেছে, সেই পিস্তল দিয়ে সুমতীকে হত্যা করে যায়নি কেন ? সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় পালিত পুরুষের কাছে স্ত্রীর প্রাণের মূল্যের থেকেও সতীত্বের মূল্য বেশি। কিন্তু সুমতীর ভাবনা ভিন্ন রকম শ্লেষের তাৎপর্যে লেখক ব্যক্ত করেছেন, "আর তাও বলি বদমাস গুণ্ডা তো নয়, লাখপতি বামুনের ছেলে। সেকালের মুনি ঋষি অতিথি হলে রাজারা যেচে রাণিকে পাঠিয়ে দিত তাদের কাছে। ভাগ্যি বলে মানত। একটা রাজার বংশ থাকত নইলে ?"[১২] অথচ যে রাঘব স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে এত চিন্তিত, তারও একটি নারীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল।

ধনী ব্যবসায়ী নির্মলেন্দু একপ্রকার নির্মোহ চরিত্র। সে বিশ্বাস করে টাকার বিনিময়ে স্নেহ-ভালোবাসা-আরাম সবই কেনা যায়। একজন ব্যবসায়ীর মতোই যথার্থ তার মানসিকতা। কেননা সে জানে আত্মপ্রতারণায় ভরা এই তথাকথিত ভদ্র সমাজ। মানুষের হাসির বেশির ভাগই কৃত্রিম এবং লোকদেখানো। গল্পের আর একটি নারী চরিত্র মাধবী, ধনীর কন্যা সে, নির্মলেন্দুর ঐশ্বর্যের স্থায়ি অধিকারের লোভে সে পুরোপুরি নির্মলেন্দুর কাছে ধরা দেয় না, আকর্ষণ জাগিয়ে রাখে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুযোগ সন্ধানী, ছলনাময়ী নারী চরিত্রের রূপ মাধুরীর মধ্যে প্রকট। মাধুরীর কাছে প্রত্যাখাত

হয়ে নির্মলেন্দু বন্ধুদের নিয়ে ভাড়া করা সস্তা মেয়েদের সঙ্গে আমোদ করে, গ্রামে ফিরে আবার তার সাক্ষাত হয় সুমতির সঙ্গে। গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আরো কিছু চরিত্রকে দেখানো হয়েছে, যারা আপন স্বার্থ পূরণের তাগিদে কিভাবে ফাঁকি ও ছলনার আশ্রয় নেয়।

গ্রামে গড়ে তোলা নির্মলেন্দুর চামড়ার কারখানার প্রচণ্ড দূষণ ছড়ায় চারিদিকে। নির্মলেন্দুর অত্যাচারে কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে আন্দোলন করলে পুলিশের সাহায্য নিয়ে নির্মলেন্দু সে আন্দোলন দমন করে। একদিন গ্রামের মানুষরা সংঘবদ্ধ হয়ে নির্মলেন্দুর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ গড়ে তোলে। মানিক এই গল্পে দেখিয়েছেন ধনীর অত্যাচার আর অর্থবল শেষ কথা নয়, শেষ কথা হল শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের রুখে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম। এবং এই সংগ্রামী মানুষদের কাছে একদিন শোষক শ্রেণির পরাজয় ঘটবেই।

মুখেভাত

এই গল্পে অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং মানসিক বিকারের ছবি চমৎকার শ্লেষের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। বেলারানি তার প্রথম খোকার মুখেভাত উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসেছে। এই মুখেভাতের ভোজ রান্না করবে গগন ঠাকুর। বেলারানির বিয়ের পূর্বে গগন এ বাড়িতে রান্নার কাজ করত, সে সময় দুর্বল, অপুষ্ট, অপূর্ণ যৌবনের বেলারানি নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের অভাবে বাড়ি ঠাকুর গগনের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গগনও উচ্চশ্রেণির মনিব কন্যার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে নিজের শ্রেণি অবস্থানের প্রশ্নে পুলকিত হয়। তারপর বেলারানির বিয়ে হয়ে যায়। লেখকের ইঙ্গিতে বেলারানির প্রথম সন্তানটি গগনেরই সন্তান। সেই সন্তানের মুখেভাতে এসে শিশুটিকে কোলে নিয়ে গগন অনুভব করে এই সন্তানটি জারজ এবং তাকে কোল থেকে নামিয়ে দেয় ঘৃণায়। ব্রাহ্মণ সে জারজ সন্তানকে ছোঁবে না। তাই সহকারী ঠাকুর কানাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে গগন বলে : "আমার হোক, যার হোক, বেজন্মা বটে তো। বামুনের ছেলে, ঘেয়ো কুত্তার পা চাটবে তো বেজন্মার ছায়া মাড়াবে না। শাস্তরে আছে।"[১৩]

সন্তান জন্মের পর বেলারানির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন তার দেহে ভরা যৌবন। হঠাৎ পাওয়া এমন স্বাস্থ্য নিয়ে বেলারানি ভেবে পায় না সে কি করবে। এই বেলারানিকে দেখে গগনের মনেও আবার কামনার আগুন লাগে। রাতে ছাদে সে একা শুয়ে থাকে বেলারানির অপেক্ষায়। কিন্তু বেলারানি আসেনা, বা সকালেও তার ব্যবহারে গগনের প্রতি কোনো আনুগত্য চোখে পড়ে না। রাগে ক্ষোভে প্রতিশোধ স্পৃহায় গগন সমস্ত রান্নায় বেশি করে নুন দেয়। সেই রান্না কেউ খেতে পারে না। গল্পের প্রধান চরিত্র দুটিই স্বাভাবিক মূল্যবোধ থেকে ভ্রষ্ট। তাদের মধ্যে অসংযম, অহংকার ও নির্বোধ মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধগুলি ভেঙে মানুষের মধ্যে এই ধরনের বিকার দেখা গিয়েছিল।

মেয়ে

মাতাল চরিত্র নীরদ। প্রতি রাতেই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত এবং স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত। কোনো এক শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং সাংসারিক জীবনের প্রতি মনোযোগী হয়। সে আবিষ্কার করে, বড়ো মেয়ে চারু আগামি বছর মেট্রিক দেবে, সে রীতিমত বিস্মিত হয়। নীরদের স্ত্রী অনুরূপা স্বামীর ক্রমাগত দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মেয়েকে নীরদের সেবার জন্য এগিয়ে দেয়। নীরদও মেয়ের সেবায় যত্নে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। নীরদ চারুর লেখাপড়ার উন্নতির জন্য তরুণ মেধাবী যুবক জগৎকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে। চারু জগতের প্রেমে পড়ে এবং জগতের সঙ্গে তার বিয়ে না হলে পড়াশোনা করবে না জানায়। নীরদ এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়ের স্কুলে গিয়ে তার নাম কাটিয়ে আসে এবং দীর্ঘদিন পর আবার মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কন্যার প্রতি পিতার এবং পুত্রের প্রতি মায়ের যে আকর্ষণ তা লিবিডো তাড়িত। বড়ো মেয়ে চারুর প্রতি নীরদের আচরণের মধ্যে সেই কমপ্লেক্স চিহ্নিত করা যায়। প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে মানিক ফ্রয়েডীয় যৌনমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণকে খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন কাহিনিতে। এই গল্পটিও এই শ্রেণির —

> মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তলায় কোথায় যে ভাঙন ধরে, কোথায় প্রাণের শিরা শুকিয়ে যায় অনেক সময়ই আমরা তার খবর রাখিনা, সচেতনভাবে বুঝিও না। সম্পর্কের সেই চোরাবালি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বহুবার বহুভাবে ধরা পড়েছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলোচনায় মানিকের দক্ষতা বিস্ময়কর। চারু তার বাবাকে খুবই ভালোবাসে, ... এই সব আচরণের বর্ণনায় মানব চরিত্রের বিচিত্র জটিলতার খবর পাওয়া যায়।[১৪]

দিশেহারা হরিণী

গল্পের নায়িকা মৃগনয়না সতের বছরের কিশোরী কন্যা, তার চোখ সত্যই সুন্দর, বড়ো বড়ো টানা দৃষ্টি চকিত অথচ ভাব গভীর। মেয়েটির মধ্যে বেশ তীব্র ভাবাবেগের প্রাধান্য আছে এবং সে একটু খেয়ালী ধরনের। সে কোনো এক পলিটিক্যাল পার্টির সদস্যা। এই পার্টিতে যুবকদের আকর্ষিত করে নিয়ে আসার জন্য সে কাজ করে। তার আকর্ষণী ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে দুজন যুবক ইতিমধ্যে পার্টিতে যোগ দিয়েছে। তবে এই দুই যুবকের আকর্ষণের টানে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে তার যোগ্য পাত্রের সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সে অচেনা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করতে রাজি নয়। সে নিজেই ঠিক করে বিশু বা যতীন নয়, সে বিয়ে করবে পার্টির খাঁটি কর্মী প্রশান্ত দত্তকে। কিন্তু প্রশান্ত দত্ত তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পার্টিও চায় মৃগনয়না বিয়ে না করে এই ভাবে আর কিছুদিন পার্টির কাজ করে যাক। গল্পটিতে মানিক বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতির প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন। আসলে যেকোনো রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত আদর্শবোধ ও সৎ সংকল্পের মাধ্যমে যুব মনে প্রভাব বিস্তার করা। তার পরিবর্তে নারীর আকর্ষণী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে পার্টির

কাজে যুবকদের আকৃষ্ট করার পদ্ধতি খুবই নিন্দনীয়। হয়তোবা মানিক তার সমকালে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মৃতজনে দেহ প্রাণ

একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। ভূপতির স্ত্রী প্রমীলা ভূপতিকে ত্যাগ করে পরাশরের সঙ্গে থাকে। ভূপতি দুর্বল, ভীরু ও অসুস্থ এক চরিত্র। ভূপতির সঙ্গে প্রমিলার সম্পর্ক ছেদ না হলেও, প্রমিলা পরাশরের সঙ্গে অবৈধ জীবন যাপন করে। যদিও স্বামী ভূপতির প্রতি পরাশরের মনে আবেগ ও সহানুভূতি পুরোপুরি হারিয়ে যায় নি। মানুষের অন্তর্গত জটিলতা এবং যৌন বিকার সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যা মানিক লক্ষ্য করেছিলেন এই গল্পে সেরকম কয়েকটি চরিত্রকে আমরা পাই।

যে বাঁচায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই গল্পটিতে যুদ্ধ সময়কালে ধনঞ্জয় কন্ট্রাক্টের ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে। যে যুদ্ধের কারণে ধনঞ্জয়ের বড়লোক হয়ে ওঠা, সেই যুদ্ধের কারণেই হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মরছে। চল্লিশের দশকে যে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ছবি এখানে পাওয়া যায় —

> কলকাতায় লোকারণ্য কেন? ফুটপাতে মানুষ মরতে আসছে কেন? কলকাতায় খাবার আছে। বেশি খেতে দিলে চারদিকের লোক বাঙলায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামলাতে পারবেনা। কি অবস্থা! ছোটো মগের মাপে দেব ভাবছি। বেশি সইতেও পারবে না, পেট খারাপ হয়ে যাবে।
>
> অন্নই আসল জীবন, ব্যঞ্জন নয়, সাধ গন্ধ নয়।
>
> নিশ্চয় ভিক্ষের চালে আবার কাড়া-আকাড়া।
>
> এমন অবস্থা আর হয়নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোথা লাগে![১১]

সমকালীন দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত সমাজের ছবি এবং রিলিফকে কেন্দ্র করে কিছু অসাধু স্বার্থপর মানুষের রাজনীতি, চক্রান্ত, কপটতা এই গল্পে মানিক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী কলমে তুলে ধরেছেন। যেখানে ঘরের যুবতী মেয়ে পেট ভরাবার জন্য দেহ বিক্রি করে, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা ভাঙা ঘরে অসহায়ভাবে মারা যায়, কেউ জানতেও পারে না শুধু শেয়াল ছাড়া।

বিলামসন

মেরুদণ্ডহীন জমিদার মহীধরের এস্টেটের ম্যানেজার বিলামসনের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি এই গল্পটি। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মানিক দেখেছিলেন এদেশিয় কিছু দুর্বল জমিদার ও অত্যাচারী

ইংরেজদের। দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী জমিদার মহীধরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিলামসন ধীরে ধীরে গোটা রাজ্যে একছত্র অধিকার কায়েম করে। তার নির্মম অত্যাচারে প্রজাদের নাভিশ্বাস ওঠে। সদরে যাওয়ার জন্য সে একটি পিচ রাস্তা নির্মাণ করে, কিন্তু সেই রাস্তায় গোরুরগাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে চাষিদের ঘুরপথে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে সদরে যেতে হয়। খাজনা আদায়ের কৌশলের নামে বিলামসনের প্রজাপীড়ন সীমাহীন হয়ে ওঠে। তার অত্যাচারের নানা ঘটনা গল্পে মানিক তুলে ধরেছেন। নিজের কন্যা অরেলোকে কাজে লাগিয়ে বিলামসন জমিদার মহীধরকে আয়ত্তে বেঁধে রাখে। গ্রামের মানুষজন বিলামসনের অত্যাচারের প্রতিবাদে একসময় সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কিন্তু বিলামসনের ষড়যন্ত্রে সে প্রতিবাদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহীধর বিলামসনকে বিদায় করতে ভয় পায়, কেননা অরোলোকে সে হারাতে চায় না। গল্পটি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইংরেজ অত্যাচারের কাহিনি। এভাবে বহু ইংরেজ সাহেব এদেশের মানুষের উপর হিংস্র অত্যাচার চালিয়েছিল। পরাধীন দেশের অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধি ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সমকালের এইসব মরমী জীবনচিত্রকে তাঁর লেখায় প্রতিফলিত করেছেন।

বাস

১৯৪৩এর যুদ্ধকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যে মন্বন্তরের কালো ছায়া বাংলার বুকে নেমে এসেছিল, সেই পটভূমিতে লেখা এই গল্পটি। কাহিনি যা আছে তা অতি সংক্ষিপ্ত। খড়পা গ্রামে বাস আসতে দেরি হওয়ায় সমবেত যাত্রীগণের কথাবার্তায় গল্প এগিয়ে গিয়েছে। গল্পে শ্রীমন্ত, গোবর্ধন, গুণবতী, দণ্ডধারী অনেক চরিত্র এসে ভিড় করেছে এবং চরিত্রগুলির শ্রেণি অবস্থান জনিত স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষজন দুর্ভিক্ষের কারণে ঠিকভাবে খেতে পায়না, তাদের অসহায়তা ও আকুতি মানিক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দরিদ্র চাষি গোবর্ধন বাস আসতে দেরি হওয়ায় একটি পনের সের কুমড়ো নিয়ে গিয়ে হাজির হয়, এই আশায় যে, কেউ যদি তার কুমড়োটা কেনে। বাসের দেরি হওয়ায় উপস্থিত চরিত্রগুলি তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে থাকে। বাসের জন্য জলভরা বালতি নিয়ে অপেক্ষা করে নিবারণ, বাসের ড্রাইভার ঈশ্বর তার জন্য ভালো চাল আনবে, নিবারণের বাড়ির সবাই দীর্ঘদিন ধরে খারাপ চাল অল্প পরিমাণে খেয়ে অসুস্থ। যুদ্ধের বাজারে ভালো চালও দুর্লভ। বাস আসার সঙ্গে যাদের কোনো প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই তারা সন্ধ্যে হওয়ায় দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। গোবর্ধন কুমড়োটিকে আগলে ঝিমোতে থাকে। বাস আসে অনেক রাত করে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গাড়ির তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় বাস থামিয়ে বাসের সমস্ত তেল নিয়ে নেন। বাস সেদিনের মতো খড়পা এসে রয়ে যায়, তেলের অভাবে আর যায় না। বাসের প্যাসেঞ্জার ও কর্মীরা আটকে পড়ে। গ্রামের বেশিরভাগ পরিবার যুদ্ধের মন্দার বাজারে প্রায় নিরন্ন হয়ে আছে, তাদের কাছে চাল ডাল চেয়ে রান্না করা উচিত হবে না। তাই বাসের ড্রাইভার ঈশ্বর ব্যবসায়ী ধনেশ সাহাকে চাল-ডাল দেওয়ার জন্য এবং আজ রাত্রির মতো আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তার সম্পন্ন অবস্থা। নিজের রাঁধুনিকে দিয়ে

ধনেশ সাহা খিঁচুড়ি রান্না করার ব্যবস্থা করে। গোবর্ধনের কুমড়োটিও কিনে নেয় দু'সের চালের পরিবর্তে। গ্রামের উপবাসী মানুষেরা ভিড় করে আসে। সকলেই খিচুড়ি খায়, দীর্ঘদিন পরে উপবাসী পেট তাদের ভরে যায়। দীর্ঘ এই গল্পটিতে সমকালীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং দুর্ভিক্ষ ও মন্দা জনিত পরিস্থিতির ছবি তুলে ধরেছেন মানিক। গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবার গুলির দুরবস্থার এমন ছবি এই সময়ের অন্যান্য লেখকদের রচনাতেও আমরা পাই।

স্বামী-স্ত্রী

ভেজাল গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প *স্বামী-স্ত্রী*। একটি মিষ্টি দাম্পত্য প্রেমের গল্প এটি। গোপাল আর তার স্ত্রী মেনকার খুব বেশি দিন বিবাহ হয়নি। পরস্পরের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ সুমধুর। এক রাতে ট্রেন বিভ্রাটে গোপালের ভাইরাভাইও তার নববিবাহিত স্ত্রী এসে পৌঁছায় গোপালের বাড়িতে। মধ্যরাত্রিতে গোটা বাড়িটি জেগে ওঠে অতিথিদের আপ্যায়ণের জন্য। মেনকা চরিত্রটি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের গৃহবধূ, স্বামীর প্রতি তার মমতা ও প্রেম সদা জাগরুক। অতিথি দম্পতির জন্য নিজেদের শোওয়ার ঘর ছেড়ে দিয়ে দুই ননদিনীর মাঝে শুয়ে মেনকা ব্যাকুল হয়ে ওঠে স্বামীর সান্নিধ্যে বঞ্চিত হওয়ার জন্য। গোপাল অ্যাসপিরিন খোঁজার অছিলায় তাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেলে পরস্পরের দাম্পত্য প্রণয়ের মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংসলীলা সূচিত হয়েছিল তার গ্রাস থেকে বাদ যায়নি আমাদের দেশও। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মন্দা, কালোবাজারী এবং দুর্ভিক্ষের ফলে এই সময়ে তৈরি হয়েছিল তীব্র খাদ্যসংকট। এই খাদ্য সংকটে সরকার এবং এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের সংযোগও ছিল। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মন্বন্তরের কবলে বাংলাদেশের গ্রামগুলি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের গরিব কৃষকেরা আরো গরিব, সর্বশান্ত হয়ে পড়ল। গ্রামে গ্রামে দেখা দিল খাদ্যের জন্য হাহাকার। অনাহারে, অর্ধাহারে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানের চেহারা নিয়েছিল। বেঁচে থাকার প্রাণপণ তাগিদে কিছু মানুষ শহরে গিয়ে ভিড় করে। শহরের স্বার্থপর লোভী মানুষেরা এই সমস্ত দরিদ্র অসহায় মানুষদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে নানারকম খারাপ কাজে তাদেরকে লিপ্ত করেছিল। সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে দেখা দিল লোভ, হিংস্রতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে চল্লিশের দশকের ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থার নানারকম সংগত অসংগত চিত্র আমরা দেখতে পাই।

তথ্যসূত্র

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য করার আগে' *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ১২৬।

৩.	‘কেন লিখি’, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

৪.	*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৫৫৫।

৫.	‘প্রতিবিম্ব’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

৬.	পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২।

৭.	পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯।

৮.	রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ-শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অঞ্জলি, কলকাতা, পৃ. ৬৬।

৯.	*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৬।

১০.	*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ৫৯৬।

১১.	‘ভয়ঙ্কর’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫।

১২.	‘ধনজন যৌবন’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

১৩.	‘মুখেভাত’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

১৪.	কৃষ্ণা বসু, *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ৮৪।

১৫.	‘যে বাঁচায়’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪।

১৯৪৫

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৭তম বছর। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তথা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক থেলমেন জেলের মধ্যে খুন হন। ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েতের ইয়ালটায় মিত্রশক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এপ্রিলে মিত্র শক্তির কাছে নাৎসী সরকার আত্মসমর্পণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলার ছাত্রসমাজ। রেঙ্গুন ছেড়ে যাওয়ার আগে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ঘোষণায় সুভাষচন্দ্র বলেন — সহযোদ্ধাগণ! এই সংকট মুহূর্তে আমি তোমাদের একটি নির্দেশই দিতে পারি, সেই নির্দেশটি হল, যদি সাময়িকভাবে পরাজয় মেনে নিতেই হয় তবে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সংগ্রাম করতে করতেই পরাস্ত হও। পরাস্ত হবে বীরের মতো — নিজে মুছে যাবার আগেও মর্যাদা ও শৃঙ্খলার মহত্তম বিধানগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাবে। সিঙ্গাপুর ত্যাগের আগে সুভাষচন্দ্র একটি নির্দেশনামায় বলেন — পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা ভারতকে পদানত রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবে এবং তা অনতিকালের মধ্যেই।

জানুয়ারি ১ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আকিয়াব অধিকার করে।

জানুয়ারি ১২ আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ডিভিসন কয়েকটি জায়গায় তাদের বিজয় উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সুভাষচন্দ্র বার্মায় পৌছোন।

জানুয়ারি ১২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেড আর্মি-বাহিনী পোল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়।

জানুয়ারি ২১ মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জীবনাবসান।

ফেব্রুয়ারি ১২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্তালিনের মধ্যে বৈঠক।

ফেব্রুয়ারি ১৯ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন ভারত পরিদর্শনে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হচ্ছে।

মার্চ ১৫ ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে অ্যাটলের বিবৃতি।

মার্চ ১৬ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে।

মার্চ ২১ ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য লর্ড ওয়াভেলের লন্ডন যাত্রা।

এপ্রিল ৫-৮ মুজফ্‌ফর আহমেদের সভাপতিত্বে সারা ভারত কিষাণ সভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল ১৫ ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে ইয়েজিনস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সংঘর্ষে ফৌজের পরাজয় ঘটে।

এপ্রিল ২৩ জাপান সরকারিভাবে জানায় বিনা যুদ্ধে তারা রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাবে।

এপ্রিল ২৩ সোভিয়েতের লালফৌজ বার্লিনে প্রবেশ করে।

এপ্রিল ২৫ আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোতে প্রথম বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫০ টি দেশের সদস্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ লেখা শুরু হয়।

এপ্রিল ২৫ মিত্রশক্তির নানা দিক থেকে আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে জার্মানি যখন প্রায় পদানত তখন ন্যাৎসী সরকার মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল।

এপ্রিল ২৭ ইতালীয় বিপ্লবীরা মুসোলিনীর প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এই দিনই কলকাতার মেয়র হন হিন্দু মহাসভার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এপ্রিল ২৭ ভারতীয় সাংবিধানিক অবস্থা নিয়ে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে।

এপ্রিল ২৭ জার্মানিতে রুশ-মার্কিন ঐক্য।

এপ্রিল ২৮ ফ্যাসিস্ট, একনায়কতন্ত্রী বেনিতো মুসোলিনিকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর পত্নীও মারা যান।

এপ্রিল ৩০ বিশ্বত্রাস ফ্যাসিস্ট অ্যাডলফ হিটলার এবং তাঁর প্রেমিকা, স্ত্রী ইভা ব্রাউন বার্লিনের বাঙ্কারে আত্মহত্যা করেন। তাঁদের দেহ বাঙ্কারের মধ্যেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। হিটলারের জন্ম ২০.৪.১৮৮৯।

এপ্রিল ৩০ হিটলারের আত্মহত্যা।

মে ২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বার্লিন দখল করেন।

মে ২ ইতালিতে, ৪ মে উত্তর-পশ্চিম জার্মানি, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে জার্মান সেনারা আত্মসমর্পণ করল।

মে ৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘণ্টা বাজিয়ে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ন্যাৎসি বাহিনীকে পরাজিত করে জার্মান সংসদভবন রাইখস্টাগে সোভিয়েত পতাকা উড়িয়ে দেয়।

মে ৪ ব্রিটিশ বাহিনী রেঙ্গুন পুনর্দখল করে।

মে ৫ চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্টরা আত্মগোপন থেকে বের হয়ে দেশব্যাপী অভ্যুত্থানে যোগ দেয়।

মে ৮ জার্মান সেনাদল মিত্রশক্তির কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

মে ৮ সোয়িয়েত-লালফৌজের বার্লিন বিজয়ের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শক্তি পরাজিত হলো।

মে ৯ ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল সরকারীভাবে।

মে ৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। রুশ -জার্মানী চুক্তি সাক্ষরিত হয়। ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং লালফৌজের তথা মিত্রশক্তির জয় হয়। এই যুদ্ধে বিশ্বের ২ কোটি ৬৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এর মদ্যে ৮৮ লক্ষ ৬০ হাজার লাল ফৌজ। ১৭০০ শহর, ৭০ হাজার গ্রাম এবং ৩১,৮৫০টি শিল্প ধ্বংস হয়। ১ কোটি জার্মান নাগরিকেরও প্রাণ যায়।

মে ১০ ন্যাৎসী বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয় চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ।

মে ১৪ সুভাষচন্দ্র বসু ব্যাঙ্ককে পৌঁছান।

জুন ১৪ ওয়াভেল বেতার ঘোষণা মারফৎ জানান যে, শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান রচনার কাজ শুরু হবে।

ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সিমলাতে বৈঠক করার কথা ঘোষণা করেন।

জুন ১৫ বন্দি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

জুন ২৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় প্যারেড মস্কোর রেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন যোসেফ স্তালিন।

জুন ২৫ সিমলায় রাজনৈতিক সম্মেলন শুরু হয়। গান্ধিজি সিমলায় উপস্থিত থাকলেও সম্মেলনে যোগ দেননি।

জুলাই ১৩ পৃথিবীর তিন শক্তিমান দেশের প্রধান জেভি স্টালিন, ট্রুম্যান এবং চার্চিলের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়।

আগস্ট ৬ জাপানের হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকি শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে দুটি শহরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

আগস্ট ৮ জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।

আগস্ট ৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নাগাসাকিতে 'ফ্যাটম্যান' নামক অ্যাটমবোমা নিক্ষেপ করে। প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ নিহত হন। আহত হন অসংখ্য মানুষ।

আগস্ট ৯ বাংলা সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। নিলামের দিন ধার্য হয় ১৫ই আগস্ট।

আগস্ট ১০ জাপান শান্তিস্থাপনে রাজি হয়।

আগস্ট ১৩ সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর পৌঁছে সামরিক ও অসামরিক প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। জাপান আত্মসমর্পণ করে।

আগস্ট ১৪ রাশিয়ার কাছে জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

আগস্ট ১৫ একজনও সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি কেনার জন্য উপস্থিত হননি।

আগস্ট ১৬ সকাল সাড়ে নটায় এস. এ. আয়ার ও হবিবুর রহমানকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ব্যাঙ্ককে পৌঁছান।

আগস্ট ১৮ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী সরলাদেবী চৌধুরানীর জীবনাবসান।

আগস্ট ১৮ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাইওয়ানে (জাপান) বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। অনেকের ধারনা তিনি এই দুর্ঘটনায় নিহত হন। জাপান সরকার খবরটি সেইভাবে প্রচার করে।

আগস্ট ২০ ফরমোজা থেকে বিমানযোগে যাওয়ার সময় সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন।

আগস্ট ২৩ মুজফ্‌ফরপুর আহমদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ পিপলস রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।

আগস্ট ২৩ জাপান নেতাজির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করে বলেন নেতাজির বিমান দুর্ঘটনা বেলা দুটোয় ঘটে। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ রাত্রি ৯ টায় নেতাজি নিহত হন।

আগস্ট ২৯ সমস্ত রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে কলকাতায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ ও মিছিল।

সেপ্টেম্বর ২ হো চি মিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন।

সেপ্টেম্বর ৮ মার্কিনসেনা কোরিয়ার মাটিতে প্রথম পদার্পন করে।

অক্টোবর ৩ বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়।

অক্টোবর ২৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিন তাই রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস হিসাবে পালিত হয়।

অক্টোবর ২৯ পৃথিবীর ৬৩টি দেশের ৪৩৭ জন প্রতিনিধি ও ১৪৮ জন দর্শক নিয়ে লন্ডনে এক সম্মেলন হয়। এখান থেকেই বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তৈরি হয়। শান্তির পৃথিবী গড়তে শপথ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

অক্টোবর ৩০ ভারত ইউ. এন. এ (রাষ্ট্রপুঞ্জ) সদস্যপদ লাভ করে সভায় যোগদান করে।

অক্টোবর ৩১ কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষকসভা, পিপলস রিলিফ কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় সারা বাংলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর ৫ দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচার শুরু হয়। অভিযুক্ত অফিসার ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ খান, ক্যাপ্টেন সায়গল ও লেঃ ধীবল-এর পক্ষে ব্যারিস্টার হিসেবে দাঁড়ান তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই ও জওহরলাল নেহেরু।

নভেম্বর ২০ ন্যুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক বিচারশালায় নাৎসী বাহিনীর ধৃত বন্দিদের বিচার শুরু হয়।

নভেম্বর ২১ ধর্মতলা স্ট্রিটে শোভাযাত্রায় ছাত্রকর্মী রামেশ্বর ব্যানার্জী ও আবদুস সামাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

ডিসেম্বর ৪ হাউস অফ লর্ডসে ভারতসচিব পেথিক লরেন্স ভারতকে যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে তা প্রথম সরকারিভাবে ঘোষনা করেন।

নভেম্বর ২১ কলকাতায় ছাত্র মিছিলে গুলি চললে নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদে হরতাল।

ডিসেম্বর ১২ বন্দি ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদের (INA) মুক্তির দাবিতে সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শচীন্দ্রনাথ বারিক গুলিতে আহত হবার পর ঐ দিনই মারা যান।

ডিসেম্বর ২৫ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রমণীমোহন সরকার।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অপরাজিতা দেবী : *বীরাঙ্গনা* / কাজী নজরুল ইসলাম : *নতুন চাঁদ* / জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : *নবজীবনের গান* / মণীন্দ্র গুপ্ত : *লঘুছন্দা*। **নাটক** — বনফুল : *কাঞ্চি, বিদ্যাসাগর* / দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *অন্তরাল* / সীতাদেবী : *পরভৃতিকা*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *কেদার রাজা* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *দর্পণ* / সতীনাথ ভাদুড়ী : *জাগরী* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী*। **গল্পগ্রন্থ** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপলখণ্ড, বিধু মাষ্টার, ক্ষণভঙ্গুর* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রসাদ মালা, হারানো সুর* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *হলুদপোড়া* / শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : *কালকূট, গোপন কথা, দন্তরুচি, পঞ্চভূত* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কালো রক্ত, কাঠ-খড়-কেরোসিন* / অন্নদাশঙ্কর রায় : *হাসন সখী* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *অসমতল*।

পত্রিকা প্রকাশ — *হরিজন* : রতনমণি চট্টোপাধ্যায় / *গল্পভারতী* : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : ভাস্কর চক্রবর্তী

মৃত্যু : সরলা দেবী চৌধুরাণী, পাঁচকড়ি দে।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

৩-৮ মার্চ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। সম্মেলনে মানিক সংঘের কার্যকরী কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১২ই মে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা থেকে তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকদের বক্তৃতা উপস্থাপন, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা বেতার থেকে 'সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব', '১৮-১৯ শতকের বাঙালি সঙ্গীতকার' বিষয়ে কয়েকটি বেতার কথিকা উপস্থাপন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরোধিতা তখন চরমে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির দাবিতে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার রাস্তায় ছাত্র আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলে মানিকও এই আন্দোলনে পা মেলান।

সে মাসে প্রকাশিত হয় *হলুদপোড়া* গল্পগ্রন্থ। জুন মাসে প্রকাশিত হয় *দর্পণ* উপন্যাস। অক্টোবর মাস থেকে *নতুনজীবন* পত্রিকায় মুদ্রিত হতে থাকে *ডাক্তারবাবু* উপন্যাস। পরে এটি গ্রন্থাকারে *পেশা* নামে প্রকাশিতহয়। এই বছরে প্রকাশিত গল্পগুলির *আগুনের ফুলকি* (*রূপমঞ্চ*, মাঘ-ফাল্গুন)। 'নেড়ী' (*পরিচয়*, জ্যৈষ্ঠ), 'সাঁওতাল' (*নতুন জীবন*, জ্যৈষ্ঠ), 'শত্রুমিত্র' (*চতুরঙ্গ*, জুন)। 'কষ্টিপাথর', (*পূর্বাশা*, জুন)। 'দুঃশাসনীয়' (*যুগান্তর*, আশ্বিন), 'কৃপাময় সামন্ত' (*পরিচয়*, আশ্বিন)। 'বেড়া' (*কৃষক*, কার্তিক), 'নেশা' (*রূপমঞ্চ*, সেপ্টেম্বর), 'বুড়ী' (*পূর্ণিমা*, সেপ্টেম্বর), 'মঙ্গলা' (*পূর্বাশা*, অক্টোবর), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (*বসুমতি*, অগ্রহায়ণ)।

উপন্যাস-১ : দর্পণ

দর্পণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশতম উপন্যাস এবং একবিংশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৫২, প্রকাশক দি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৪ + ৩৩০, মূল্য সাড়ে চার টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি পাটনা থেকে প্রকাশিত *প্রভাতি* পত্রিকায় *জাগো জাগো* নামে কিছু অংশ প্রকাশিত হয়।[১]

মানুষকে বুঝবার, বিশ্লেষণ করবার চিরকালীন কৌতূহল মানিককে বিজ্ঞানীর মতো সন্ধিৎসু ও তাড়িত করেছে। তাই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন *দর্পণ* উপন্যাসের আখ্যানে লক্ষ্য করি। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির তুলনায়

স্বতন্ত্র এই উপন্যাসের কাহিনি। কাহিনির শুরু কলকাতায়, শ্রমিকদের নিয়ে লোকনাথবাবুর কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের মধ্য দিয়ে। শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নেতারা শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ-আন্দোলনকে মদত দিয়ে জিইয়ে রাখে। কৃষ্ণেন্দু শ্রমিকদের নেতা, লোকনাথের ছেলে হীরেণকে প্রভাবিত করে কৃষ্ণেন্দু দলের মধ্যে টেনে এনেছে। শ্রমিকদের অধিকার ও দাবিকে হীরেণ সমর্থন জানায়। বড়লোকের শিক্ষিতা মেয়ে মমতা দলের কাজ করার জন্য নিজেকে শ্রেণিচ্যুত করে শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়। পরবর্তীকালে হীরেণের সঙ্গে মমতার বিয়ে হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব থেকে মমতা হীরেণকে ত্যাগ করে শ্রমিক বস্তিতে চলে আসে বসবাস করার জন্য।

কাহিনির দ্বিতীয় অংশে আছে ঝুমুরিয়া গ্রাম, বীরেশ্বর সেই গ্রামের একজন স্বচ্ছল কৃষক। বীরেশ্বর সাহসী মানুষ। বীরেশ্বরের মেয়ে রম্ভা এই উপন্যাসে শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছে। করাত কলের মজুর রামপালের সঙ্গে বিয়ে হয়ে সে বস্তিতে থাকতে শুরু করে। শ্রমিকদের নেতা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। গ্রামের মেয়ে হলেও রম্ভা যুক্তির কথা বলতে পিছুপা হয়না। কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিল রম্ভা, সেইসঙ্গে লক্ষ্য করেছিল শহর জীবনের নানা বিকৃতি। সে দেখে কাঠগোলায় যখন শ্রমিক অসন্তোষ, তখন তাদের নেতা কনফারেন্সে বক্তৃতা দিচ্ছে। শহরের শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রামের কৃষক আন্দোলনকে মানিক এই উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঝুমুরিয়া গ্রামের কৃষকদের অত্যাচারিত হওয়ার ও প্রতিবাদের কাহিনি উপন্যাসে মানিক দেখিয়েছেন। হীরেণ ও কৃষ্ণেন্দুর কথাবার্তায় সে সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশের ছবি স্পষ্ট —

> দেশ সম্বন্ধে কতগুলি কথা তুই ভুলে থাকিস ভাই। ধর্ম আর সংস্কার যে এদেশের মন কিভাবে গ্রাস করে আছে। খেয়াল থাকলে কেন ওকে সকলে এত ভয় আর খাতির করে তুইও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারতিস। এদেশে ধর্ম ছাড়া কথা নেই। চারিদিকে তার প্রমাণ তো দেখতেই পাশ সর্বদা। ধর্মের দোহাই ছাড়া এদেশে রাজনীতি হয় না, আন্দোলন চলে না। এদেশে নেতাকে হতে হয় মহাত্মা। আধ্যাত্মিকতার স্তরে টেনে তুলতে না পারলে এদেশে কিছুই করার উপায় নেই এটা তোরা ভুলে থাকিস। ধর্ম আর সংস্কারের কথা শুনলে অবশ্য তোরা বামপন্থীরা অসন্তুষ্ট হোস। আমরা বলি অন্নহীন, পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম নেই। আমরা বলি, সমস্ত সংস্কার ভাঙতে হবে,... ভাষা শুধু বক্‌বক্ করার জন্য সৃষ্টি হয়নি, বোঝারও কাজে লাগে। নিজের মন যা বলে শুধু সেই কথা না বলে, যাদের জন্য বলা তারা যা জানে, বুঝে তার মানে সেই কথা বললেই হয়। শ্রোতার ভাষা না জেনে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি ? অন্নহীন পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম নেই বললে যখন কেউ কানে তোলে না, তখন বললেই হয় ওরকম হয়ে থাকা অধর্ম, মহাপাপ — বললেই হয় অন্নাভাব, পরাধীনতা, অত্যাচারের প্রতিবাদ আর প্রতিকারই ধর্ম।... এদেশে ধর্ম আর সংস্কারের সর্বব্যাপী প্রভাব যখন অস্বীকার করা যায় না, সে সত্যটাকে মেনে নিয়ে কাজে লাগানোই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। কিন্তু এদের কথা আলাদা।

ওসব কাজে লাগাতে তোদের সংকোচ হয়। পাছে তার মানে দাঁড়ায় যে তোরাও মেনে নিয়েছিস, প্রশ্রয় দিয়েছিস। স্বর্গে যেতে হবে, কিন্তু ফ্যাসনেবল পথটি ছাড়া অন্য পথে তোরা চলতে রাজি নোস।[২]

সমকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের চরিত্র পূর্ববর্তী উপন্যাসেও মানিক কিছুটা সমালোচনার দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, সেই সঙ্গে কিছু প্রশ্নও মানিকের বিশ্লেষণী কলমে ধরা পড়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের কাহিনি এগিয়েছে ঝুমুরিয়া গ্রামে। অত্যাচারী শ্রেণির প্রতিনিধি হেরম্ব, পুলিশ প্রশাসন তার হাতের মুঠোয়। যুদ্ধের বাজারে হেরম্ব ঠিকা দিয়ে বিভিন্ন কাজ করায়। বিহারী ও সাঁওতাল নারী পুরুষদের বন কাটার কাজে লাগায় হেরম্ব। একটি সাঁওতাল মেয়ের প্রতি হেরম্ব জোর খাটাতে চাইলে, ক্ষুব্ধ হয়ে সাঁওতাল মজুররা কাজ ছেড়ে চলে যায়। গ্রামের কৃষকেরাও হেরম্বের কাজ করতে রাজি হয় না। হেরম্বের রাগ গিয়ে পড়ে গ্রামের কৃষকদের প্রতিনিধি বীরেশ্বর ও জালালউদ্দিনের উপর। হেরম্বের ধারণা এই দুইজন গ্রামের কৃষকদের উত্তেজিত করে তার কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। হেরম্বের হুকুম আর লাঠির গুতোয় বাধ্য হয়ে গ্রামের মানুষকে বন কাটতে যেতে হল মাঠের ফসল কাটা ফেলে রেখে। বীরেশ্বর ও জালালউদ্দিনকে দাঙ্গার মিথ্যা অভিযোগে জেলে যেতে হল। জেলের মধ্যে নিউমোনিয়ায় জালালউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

বীরেশ্বরের মেয়ে রম্ভা ঝুমুরিয়ায় এসে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে এবং বীরেশ্বরকে জামিনে মুক্ত করে আনে। বীরেশ্বরের মুক্তির দিন গ্রামের মানুষেরা উৎসাহে উত্তেজনায় বিশাল শোভাযাত্রা করে। রাস্তা তৈরিতে হেরম্ব গ্রামের মানুষদের কাজ করার জন্য বাধ্য করলে বীরেশ্বর গ্রামের মানুষদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে বীরেশ্বরকে খুন হতে হয়। হেরম্বের বাড়তে থাকা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কৃষ্ণেন্দু, হীরেণ, রামপাল সবাই ঝুমুরিয়া গ্রামে আসে। কৃষ্ণেন্দু সকলকে একত্র করে হেরম্বের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি মিছিলের আয়োজন করে। পুলিশ কৃষ্ণেন্দু সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলে শুরু হয় আরো তীব্র আন্দোলন। বিরাট এক প্রতিবাদী মিছিল সমাবেশ আয়োজিত হয়। হেরম্ব পিস্তলের ভয় দেখিয়ে মিছিল আটকাতে চাইলে, বিক্ষোভ আরো বেড়ে যায় এবং ক্ষিপ্ত জনতা হেরম্বের বাড়িসহ হেরম্বকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ড: সরোজমোহন মিত্র উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন —

উপন্যাসটির নাম *দর্পণ*। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এই দর্পণ। একদিকে লোকনাথ, উমাপদ, হেরম্ব, হীরেণ, শশাঙ্ক, দীগম্বরী, আর অন্যদিকে কৃষ্ণেন্দু, রম্ভা, বীরেশ্বর, মহীউদ্দীন আর শম্ভুর দর্পণ। অত্যাচারী ধনী হেরম্বদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ঝুমুরিয়া গ্রামবাসীর বিক্ষোভের দর্পণ। ...এককালের আদর্শবাদী হতাশায় ম্রীয়মান ঘুষখোর দারোগা শৈলেন দাসের দর্পণ, বস্তি জীবনের, বাগদী পাড়ার, দেহ বেচার উপজীবী অশিক্ষিত নিম্নস্তরের মানুষদের দর্পণ। এই উপন্যাসের নেতা কৃষ্ণেন্দু হলে নায়িকা রম্ভা। মানিকবাবুর বাস্তবনিষ্ঠ মার্কসবাদীয় দৃষ্টিতে শোষণজর্জর সমাজের এক অনবরত দর্পণ।[৩]

উপন্যাসের শেষে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হেরম্ব জনগণের প্রতিবাদী আন্দোলনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জাগ্রত জনতার আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। ঝুমুরিয়ার গ্রামবাসীদের মধ্যে যে সচেতন সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায় তার সাহস ও প্রেরণা সমকালীন সচেতন রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। সমকালের সময়, যুগজীবন ও সমাজ প্রেক্ষিতকে বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন মানিক এই উপন্যাসে। ১৯৪৫ -এর মাঝামাঝি মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল ভীষণ উত্তপ্ত, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার এবং পূর্ণস্বাধীনতার জন্য লড়াই তখন চরমে। ভারতছাড়ো আন্দোলন ব্যার্থ হওয়ার পর হতাশ দেশবাসী এইসময়ে পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্র বসু ও তার আজাদহিন্দ ফৌজের বীরত্বে। ১৯৪৫ -এর নভেম্বরে আজাদহিন্দ বাহিনীর বন্দি সেনানায়কদের বিচার ও বিচারে কারাদণ্ড ঘোষিত হলে সারাদেশে প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তার ফলে ইংরেজ সরকার এই সেনানায়কদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর সারা বিশ্বজুড়ে দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভারতসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ এসময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

সারা বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শিল্পী সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সংগঠনগুলি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন ও সংগ্রাম সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ-বিপ্লবের চেতনা সঞ্চারিত করেছিল। দর্পণ উপন্যাসে সমকালীন সময়ের আন্দোলন ও বিক্ষোভপূর্ণ পরিস্থিতির প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন —

> এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত হয়। সেজন্য যুদ্ধের ফলে বিশাল ক্ষয়-ক্ষতিতে দেশবাসী হতাশাগ্রস্ত না হয়ে বরং ভাঙনের মধ্যেও নতুনকে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। তাই গ্রাম, শহর সর্বত্রই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ জোরদার হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপলব্ধ করেছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তা নয়, তার সঙ্গে প্রয়োজন গণ-আন্দোলনেরও। দেশের সামগ্রিক সেই পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই *দর্পণ* উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে গ্রাম ও শহর সর্বত্রই যে প্রতিবাদী আন্দোলন চলছিল তাতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি যেভাবে একে অপরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল তার বাস্তব রূপায়ণ দেখা গেল *দর্পণ*উপন্যাসে।[৪]

গল্পগ্রন্থ-১ : হলুদপোড়া

হলুদপোড়া মানিকের অষ্টম গল্পসংকলন এবং বিংশতিতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, প্রকাশক কমলা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ১৬৭, মূল্য দু-টাকা। এই গল্প সংকলনে মোট গল্প সংখ্যা দশ। গল্পগুলি হল — *করুণ, হলুদপোড়া, বোমা, তোমরা সবাই ভালো, চুরি চুরি খেলা,*

ধাক্কা, ওমিলনাইন, জন্মের ইতিহাস, ফাঁদ, ভাঙাঘর, অন্ধ ও ধাঁধা। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:[৫]

ধাক্কা	বিচিত্রা	চৈত্র ১৩৩৮
জন্মের ইতিহাস	বিচিত্রা	আষাঢ় ১৩৩৯
ওমিলনাইন	উত্তরা	শ্রাবণ ১৩৪৩
বোমা	চতুরঙ্গ	আশ্বিন ১৩৪৫
ভাঙাঘর	নতুন পত্র	আশ্বিন ১৩৪৭
ফাঁদ	বৈশাখী	গ্রীষ্ম ১৩৪৮
হলুদপোড়া	পরিচয়	শারদ ১৩৪৯
তোমরা সবাই ভালো	সঞ্চয়ণ	পৌষ ১৩৫০
চুরি চুরি খেলা	?	?
অন্ধ ও ধাঁধা	?	?

পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি কয়েকটি গল্প মানিকের প্রথম জীবনের রচনা। গল্পগুলি কোন কারণে সংকলনভুক্ত হয়নি। লেখক হিসেবে যখন মানিক নিজেকে তৈরি করছেন, সেই সময়ে লেখা কয়েকটি গল্পে তাই পরিণত সৃষ্টির ছাপ কম।

হলুদপোড়া

মানিকের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির মধ্যে *হলুদপোড়া* একটি। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক মানুষের জীবন কতখানি অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে তা দেখানো হয়েছে এই গল্পে। কুসংস্কারের প্রভাবে শিক্ষিত যুবক ধীরেণের বিজ্ঞান মনস্ক মন কিভাবে যুক্তিহীন অন্ধ কুসংস্কারে একেবারে ডুবে গেল, সেই পরিণতি গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই। গল্পের প্রধান চরিত্র ধীরেণ ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করছে সাত বছর ধরে। কিন্তু স্কুলে তাকে পড়াতে হয় ভূগোল। যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক উদ্যোগী যুবক ধীরেণ একসময় সাতচল্লিশটি বই নিয়ে গ্রামে লাইব্রেরি, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে সাধারণ রোগের বিণামূল্যে চিকিৎসা ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ করত। কিন্তু বিয়ের পর সংসার সন্তান ইত্যাদি নিয়ে সে কিছুটা বিব্রত এবং সেই সঙ্গে গ্রামের মানুষদের উৎসাহের অভাব থেকে সে উদ্যম এবং আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই ধীরেণের জীবনে ঘটল একদিন শোচনীয় ঘটনা। তার গর্ভবতী ছোট বোনটিকে কারা যেন পুকুর ঘাটে গলা টিপে হত্যা করে গিয়েছে। আকস্মিক এই ঘটনায় ধীরেণের মনের স্বাভাবিকতা বিপর্যস্ত হয়। এই ধাক্কা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ধীরেণের বোন শুভ্রা খুন হবার তিনদিন আগে তাদের গ্রামের বলাই চক্রবর্তী খুন হয়েছিল। গ্রামের লোকে এই দুটি খুনের ঘটনা কাল্পনিক কাহিনিতে বাঁধতে চাইল কিন্তু শুভ্রার সঙ্গে বলাই চক্রবর্তীর কিছুমাত্র কোন যোগাযোগ না থাকায় কোন রসালো গল্প তৈরি হল না।

গ্রামের মানুষগুলির কুসংস্কার প্রবণতা, গুজব, কানাকানি ইত্যাদিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো নবীনের স্ত্রী দামিনী একদিন সন্ধ্যাবেলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং ভূতগ্রস্থের মতো আরচণ করে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দামিনীকে ভূতে ধরেছে। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার ধীরেণকে ডাকা হয়, সে পাশ করা ভালো ডাক্তার কৈলাশ ডাক্তারকে ডেকে আনার পরামর্শ দেয়। অনেকে ভূত তাড়ানোর জন্য কুঞ্জগুণীণকে ডেকে আনার কথা বলে এবং শেষপর্যন্ত কুঞ্জগুনীনকে ডেকে আনা হয়। কুঞ্জগুণীণের ভূত তাড়ানোর দৃশ্যটি লেখকের কলমে অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে —

> কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।...
> বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলোচুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে। দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না।...
> উঠানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়স তাদের বেশি। কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে... দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।[৬]

হলুদপোড়া সহযোগে ঝাড়ফুঁকের সময় ভূতগ্রস্থ দামিনী ঘোষণা করে সে শুভ্রা। বলাই চক্রবর্তী তাকে খুন করতে পারে। কুঞ্জগুণীণ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যাও করে দেয় কিভাবে মৃত বলাই চক্রবর্তী কোন একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে। গ্রামের লোকেরা এই খবর বিশ্বাস করে নেয় এবং চারিদিকে আলোড়ন পড়ে যায়। ভৌতিক পরিমণ্ডলে অসহায় ধীরেণের মানসিক ভারসাম্য অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। ক্রমাগত সে অপ্রকৃতিস্থ হতে শুরু করে। স্কুলে সবাই তার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায় এবং তাকে জোর করে এক মাসের ছুটি দেওয়া হয় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। ক্রমাগত ধীরেন অবসন্ন হয়ে পড়ে। বাড়ি ফিরে আসার সময় সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়ে কোনো কিছু নড়াচড়া করতে দেখে সে আর্তনাদ করে, চিৎকার করতে থাকে। ক্রমাগত সে মানুষের অশরীরী অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে থাকে। তাই সন্ধ্যার সময়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে যায় মৃত শুভ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আস্তে আস্তে সেও ভারসাম্যহীন ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিজের বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে একটি বাঁশ ডিঙাতে না পেরে হিংস্র জন্তুর মতো চাপা গর্জনের স্বরে

নিজেরই নাম ধরে সে ডাকতে থাকে। কুঞ্জগুণীণ আসে এবং জানায় বলাই চক্রবর্তী ধীরেনকে ধরেছে এবং সেই শুভ্রাকে খুন করেছে।

গল্পটিতে ধীরেণের এই পরিণতি দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ি। শিক্ষিত বিজ্ঞান মনস্ক যুবক ধীরেণ এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে পড়ে এমন পরিণতি লাভ করেছে। আসলে ধীরেণ ছিল সবদিক থেকে ব্যর্থ মানুষ। সে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনো করলেও তাকে পড়াতে হত ভূগোল। গ্রামে যে সামাজিক কাজগুলি সে আরম্ভ করেছিল সেগুলো সে সম্পূর্ণ করতে পারেনি। ব্যক্তিজীবনে সে ছিল সংসারের ভারে ভারাক্রান্ত মানুষ। সবদিক থেকে ব্যর্থ হতে হতে তার মনের মধ্যে নেগেটিভ এনার্জি জড়ো হচ্ছিল। নিজের অজান্তেই সে হারিয়ে যাচ্ছিল স্বাভাবিক জীবনের ভূমি থেকে — গ্রামের পরিবেশ, প্রতিবেশীদের ভূত সংস্কার, ছোটবোনের অপঘাতে মৃত্যু, পেঁচার ডাক শুনে স্ত্রী শান্তির ভয় পেয়ে গোঙাতে গোঙাতে বমি করা, ছেলেমেয়েদের ছোট পিসির ভূত হওয়া নিয়ে আলোচনা— ইত্যাদি বিষয় অসহায় ধীরেণের মনকে প্রভাবিত ও বিকারগ্রস্ত করে তুলেছিল। সব অর্থে একটি হেরে যাওয়া মানুষের গল্প *'হলুদপোড়া'*। মানিক তার প্রথম দিককার গল্পগুলিতে মনোবিকারের যে সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, সেই ধরনের একটি গল্প এটি। গোটা গল্প জুড়েই আমরা যেন হলুদ পোড়ার গন্ধ পাই, কুসংস্কার. আর ভৌতিক পরিবেশ এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে গল্পটিকে।

বোমা

> পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়... অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনকার মতো অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশি কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজি অতি বেঠিক হিসাবও হয়তো অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন : এত বোমা ফাটে কেন ?[৭]

যুদ্ধকালীন সময়ের বোমা ফাটার হিসেব দিয়ে গল্প শুরু হলেও গল্পটিতে সেরকম কোনো বিষয়ের প্রাধান্য নেই। স্বামী-স্ত্রীর জটিল মানসিক সমস্যার গল্প এটি। সুধা বিধবা হওয়ার পর, পুনরায় তার পূর্বের প্রেমিককে বিবাহ করে। সুধার ছিল প্রথমপক্ষের দুটি পুত্র সন্তান। দ্বিতীয় স্বামী গোপালকে বেঁধে রাখার জন্য সুধা আরো সন্তান চায়। পরপর সুধার আরো তিনটি পুত্র সন্তান হয়। কন্যা সন্তানের জন্য ব্যাকুল সুধা তার ষষ্ঠ সন্তানটিকে গর্ভেই মেরে ফেলে। কন্যা সন্তানের প্রতি ব্যাকুলতা সুধার মনে একপ্রকার যৌন তাড়নার ইঙ্গিত দেয়। চারবছর পর সুধার একটি কন্যা সন্তান হয়। সুধার মেয়ে মন্দা যুবতী হয়ে উঠবার পর তার জীবনেও দুজন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। মন্দার জীবনের এই সমস্যা একদা সুধার জীবনেও এসেছিল। মা এবং মেয়ের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ছাড়া এই গল্পে আর বিশেষ কিছু প্রতিপাদ্য নেই।

তোমরা সবাই ভালো

রমেন নামের এক যুবক তার দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। রমেন দেখে এই বাড়ির সবাই নানারকম মানসিক বিকারে আক্রান্ত। তাদের চরিত্রে নানা অসঙ্গতি ও ক্ষোভ, অভিযোগ, ভুল বোঝাবুঝি, হীনমন্যতা, দূরত্ব, লোভ, আক্রোশ। রমেন এই পরিবারে এসে চরিত্রগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মুছে দিতে চেষ্টা করে এবং তাদেরকে বোঝায় – তোমরা সবাই ভালো। তাদেরকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে তারা পরস্পরের আপনজন ও শুভাকাঙ্খি। এই বোধ থেকে চরিত্রগুলি আস্তে আস্তে সংশোধিত হয়ে ওঠে।

চুরি চুরি খেলা

গল্পটি মানিকের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিককার রচনা তাই অপরিণত ভাবনার ছাপ স্পষ্ট। অনন্ত ও কমলা ধনী দম্পতি, তাদের ঐশ্বর্যের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তাদের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে শীতলতা, শূন্যতা ও দূরত্ব। প্রায় মৃত এই দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের প্রতি বিরক্ত হয়। অনন্তের আশ্রিত কর্মচারী সুশীল নামের একটি পুরুষকে কমলা ভালোবাসে, আর সুশীলের স্ত্রীকে মনে মনে পছন্দ করে অনন্ত। কিভাবে তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক তৈরি হল তার ইঙ্গিত গল্পে নেই। এভাবেই অসম্পূর্ণ পরিণামে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ধাক্কা

এই গল্পটিও মানিকের প্রথম দিককার রচনা। সুমতি নামের একটি তেইশ বছর বয়সের সুন্দরী বিধবা মেয়ে কাজ করতে আসে অক্ষয় নামের এক তরুণ ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তারের স্ত্রী অলকা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাদের একটি শিশুপুত্রও আছে। সুমতি সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ির সব কাজ করে এবং ডাক্তারের শিশু পুত্রটিকেও স্নেহ মমতা দিয়ে আগলে রাখে। এই বাড়িতেই থাকে ডাক্তারের কম্পাউনডার নন্দ। নন্দ সুমতিকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু বিধবা সুমতি এখনো স্বামীর স্মৃতি ভুলতে না পারায় নন্দর আহ্বানে সাড়া দেয় না। একদিন ডাক্তারের স্ত্রী অলকা মারা যায়। দীর্ঘদিন অসুস্থ স্ত্রীর সান্নিধ্যে ক্লান্ত ডাক্তার নিঃসঙ্গতার কারণে বা হয়তো কিছুটা প্রভুত্বের দাবিতে সুমতিকে আকাঙ্ক্ষা করে। পুরুষের সামাজিক মূল্যবোধের অভাব এবং প্রেমকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে না দেখিয়ে মানিক গল্পটি রচনা করেছেন। গল্পের মধ্যে আর কোন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ইঙ্গিত নেই।

ওমিলনাইন

প্রমথ প্রথম যৌবনে সমবয়সিনী একটি তরুণীকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু মেয়েটির চারিত্রিক দুর্বলতা ও অস্থিরতার কারণে তাদের সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। প্রমথ ভীষণভাবে আহত

হয় এবং সুনীতিকে ভোলার জন্য অনেক দূরে চলে যায়। কিন্তু সুনীতির চুলের একটি বিশেষ গন্ধ তাকে বিভোর করে রাখে স্মৃতি মেদুরতায় — এই গন্ধের স্মৃতি তাকে এতটাই তাড়িত করে যে সে নিজের মধ্যে মানসিক কষ্ট এবং শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করে। মানসিক বিরোধের কারণে সে সমস্ত নারীদের থেকে নিজের দূরত্ব তৈরি করে। চাকরি পাবার পর পারিবারিক চাপে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, কিন্তু স্ত্রীর চুলেও সে সেই ওমিলনাইন তেলের গন্ধ খোঁজে। প্রমথ বুঝতে পারে এই স্মৃতি আক্রমণ থেকে তার মুক্তি নেই, তাই সে সুনীতির সঙ্গে দেখা করে এবং সুনীতির বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো কেশ তৈল স্ত্রীকে মাখতে দেয়। গল্পটির মধ্যে অবক্ষয়িত মনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রেমের স্মৃতি এবং প্রেমিকার শরীর নিঃসৃত বিশেষ একটি গন্ধের মধ্যে প্রমথের আক্রান্ত হওয়া একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক বিকার, যা প্রমথের স্বাভাবিক জীবনকে অস্বাভাবিক করে তোলে।

জন্মের ইতিহাস

বিকাশ এবং সুরতার বিবাহিত জীবন তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের প্রথম সন্তানের আগমন সম্ভাবনায় গল্পটি শুরু হয়েছে। বিকাশ ও সুরতার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক সুমধুর। পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে নতুন অতিথির আগমনের খবরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা এ গল্পের বিষয়। মানুষের জন্মের দার্শনিক প্রশ্ন এই গল্পে তুলেছেন মানিক— "সমস্ত জীবন মানুষ দুঃখ ভোগ করে, রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন ? এই অনাবশ্যক বীভৎষতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায় ?"[৮]

ফাঁদ

দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সুভদ্রা বার-তের বছর বয়স পর্যন্ত যাত্রার দলে কৃষ্ণ সাজত। তরুণী হয়ে উঠবার পর সে যাত্রার দল ছেড়ে বাড়িতে আসতে বাধ্য হয়। পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে অবশেষে একটি ছেলের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের মধ্যে ছেলেটিকে অসহ্যবোধ হওয়ায়, তাকে পরিত্যাগ করে দূর গ্রামে দিদির বাড়িতে গিয়ে সে ওঠে। সেখানে ভগ্নীপতির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, দিদির চোখে ধরা পড়ায় ভগ্নীপতির বিপত্নীক বন্ধু মহেন্দ্রের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন যাপনের পর সুভদ্রার মধ্যে আবার অস্থিরতা দেখা দেয়, রসিক নামের একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে মধ্য রাত্রে ধরা পড়ে এবং পালিয়ে গিয়ে এক বৈরাগীর সঙ্গে কিছুদিন বৈষ্ণবী সেজে পথে পথে জীবন কাটায়। এক ধনী গৃহে গান গাইতে গেলে সেখানে একজন মুসলমান ওস্তাদের সঙ্গে আলাপ হয়, ওস্তাদ সুভদ্রাকে গান শেখাতে চাইলে সুভদ্রা তার সঙ্গে আবার ঘর ছাড়ে — কিছুদিন পর ওস্তাদকে ছেড়ে স্বাধীনতাগামী বন্ধনবিমুখ মন নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়ে। আসলে সুভদ্রা চরিত্রটি সাধারণ মেয়েদের মতো নয়। কিশোর বয়সে কৃষ্ণের অভিনয় করতে করতে

তার মনের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের এক অদ্ভুত চেতনা জাগ্রত হয়, যা তাকে সারাজীবনে আর স্থির হতে দেয়নি।

ভাঙাগড়া

একটি বর্ষণমুখর দুর্যোগের রাতে এক পথিক আশ্রয় নেয় একটি দরিদ্র পরিবারে প্রায় ভাঙা একটি বাড়িতে। বাড়ির অনেকটা অংশ ভেঙে গেছে, অবশিষ্ট আছে একটি মাত্র ঘর। সেই ঘরের মধ্যে সবাই আশ্রয় নিয়েছে, সঙ্গে জিনিসপত্র, দম বন্ধ করা ঠাসাঠাসি অবস্থা। পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাদের আতিথ্য, ব্যবহার এত সুমধুর যে, এই পরিস্থিতিতে পথিকটির ভীষণ বেমানান মনে হয়। তাই পথিকটির মনে প্রশ্ন জাগে —

> আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের উচিৎ হয়েছে ? আশ্রয় না দেওয়ার অধিকার তো এদের ছিলই, কেবল তাই নয়, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের অন্যায় হয়নি ?[৯]

অন্ধ ও ধাঁধা

এই গল্প সংকলনের শেষ গল্প এটি। আগাগোড়া রহস্যে আবৃত গল্পটি। সুন্দরী তরুণী বধূ রাধা তার অকালবৃদ্ধ, অন্ধ স্বামী ও ভৃত্যসহ বায়ুবদলের উদ্দেশ্যে হেরম্বদের পাড়ায় বাসা ভাড়া করে আসে। হেরম্বের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর রাধা হেরম্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হেরম্বের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সন্তান না হওয়ার খবরে রাধা অত্যন্ত দুঃখ পায় এবং হতাশ হয়। সে বার বার জানতে চায় তাদের সন্তান না হওয়ার প্রকৃত কারণ কে ? আমরা বুঝতে পারি রাধার এমন কৌতূহলের কারণ কি ? রাধা হেরম্বকে বারবার অনুরোধ করে তার স্বামীকে আর কটা মাস বাঁচিয়ে রাখার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাধার স্বামী মারা যায়। জীবনে বাঁচার জন্য প্রত্যেকের একটি অবলম্বন দরকার হয়, রাধার জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারত তার সন্তান। সন্তান লাভের উপায় হিসেবে সে ভেবেছিল হেরম্বকে। কিন্তু সে আশাও রাধার পূর্ণ হয় নি। শেষ পর্যন্ত গল্পটি করুণ রসের অনুভবে সমাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তার থেকে মুক্ত করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছিল এই সময়েই। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত অসচেতন মানুষদের মধ্যে গতানুগতিক ধারণা, কুসংস্কারের প্রভাব তখনও প্রবলভাবে বাসা বেধে ছিল। সেই সঙ্গে মানব চরিত্রে নানারকম অসঙ্গতি, অসহায়তা, ত্রুটি, বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন মানিক এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৬০২

২. 'দর্পণ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২৩

৩. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য,* গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৪

৪. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* অঞ্জলি, ২০১০, পৃ. ৭২

৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০১

৬. 'হলুদপোড়া', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১

৭. 'বোমা' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

৮. 'জন্মের ইতিহাস' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

৯. 'ফাঁদ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

১৯৪৬

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৮তম বছর। হো-চি-মিন এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ শুরু। ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বাংলার ছাত্রসমাজ। মণিপুরে কৃষক অভ্যুত্থান। আগস্টে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, প্রায় ৫০০০ হিন্দু-মুসলমান নিহত এবং দশহাজার জন আহত হন। দাঙ্গা প্রশমণের জন্য কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-পাঞ্জাবে মহাত্মা গান্ধির সফর। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ভুখা মিছিল সংঘটিত। ব্রিটিশ পুলিশ নেপাল মজুমদারকে লয়াবাদ কয়লাখনি থেকে গ্রেপ্তার করে। নারায়ণগঞ্জের কমিউনিস্ট কর্মীদের সহযোগিতায় সুতাকল ও বস্ত্রকল সমিতির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালন। গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ২৯৬ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৫টি আসন ও মুসলিমলীগ ৭৩টি আসন পায়। শিখরা গণপরিষদে যোগদান করতে না চাইলে চারটি আসন শূন্য থাকে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই গণবিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে সেনাবাহিনীতে। ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয় নৌ-সেনাবিদ্রোহ। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ব্রিটেনের রাজনীতিতে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসায় ভারতেও রাজনীতির পট পরিবর্তনের আশা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড়লাট ওয়েভেল স্থির করেন ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সাম্প্রদায়িক বিরোধের অজুহাতে বন্ধ করে রাখা ঠিক হবে না। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ নেতা জিন্নাহ যদি যোগদান না করেন, তবে তাঁকে বাদ দিয়েই সরকার গঠিত হবে। পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য জিন্নাহ আগস্টে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' আহ্বান করলে কলকাতা, বিহার, এবং পাঞ্জাবে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, লুট, নারীনির্যাতন শুরু হয়। এই দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লীগনেতা সুরাবর্দী, যিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কট্টর সমর্থক ছিলেন। ফলে কয়েকদিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারান। ডিসেম্বরে গণপরিষদের সভায় নেহেরু বলেন, ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে গণপরিষদ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এখানে জনসাধারণের সকল অংশকেই সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের গ্যারেন্টি দেওয়া হবে এবং সংখ্যালঘু, অনুন্নতজাতি ও অঞ্চল সমূহের পর্যাপ্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখা হবে। বছরের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনের শুরু।

জানুয়ারি ৪ ব্রিটিশ শাসক 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বন্দিদের মুক্তিদান করে।

জানুয়ারি ৫ অধ্যাপক রবার্ট রিচার্ডসের নেতৃত্বে দশজন সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল ভারতে আসেন।

জানুয়ারি ১০ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যদের উৎপীড়নের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম শহরে এক লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হয়ে 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' ধ্বনি তোলে।

জানুয়ারি ২৮	ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল ঘোষণা করেন 'ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' গঠিত হবে।
ফেব্রুয়ারি ১২	বামপন্থীদের নেতৃত্বে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিপুল সমাবেশ হয় এবং সতীশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের নিষিদ্ধ অঞ্চল অতিক্রম করে।
ফেব্রুয়ারি ১৩	'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বন্দি সেনাপতি ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে কলকাতায় এক লক্ষের বেশি ছাত্র ও নাগরিকের শোভাযাত্রা বের হলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়।
ফেব্রুয়ারি ১৮	বোম্বাই-এর নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'তলোয়ার' জাহাজে ১৫০০০ নাবিক জাতি বৈষম্য, জঘন্য খাদ্য ইত্যাদির প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করে বিদ্রোহ করে।
ফেব্রুয়ারি ১৯	ক্যাবিনেট মিশন গঠিত হয়। ভারতীয় নাবিকেরা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভীর নাম বদলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভী রাখেন এবং তাঁরা কেবলমাত্র জাতীয় নেতাদের আদেশ পালন করবেন এই কথা ঘোষণা করেন।
ফেব্রুয়ারি ২০	করাচি, মাদ্রাজ ও কলকাতার নাবিকদের মধ্যে নৌ-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।
ফেব্রুয়ারি ২১	ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাসাল ব্যারাকের বিদ্রোহী নাবিকদের ঠাণ্ডা করতে পাঠানো হয়, কিন্তু বিদ্রোহীদের আবেদন সাড়া দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা নিজেদের ব্যারাকে ফিরে যায়। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইতে ৩ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। কলকাতায় প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক 'নৌ-বিদ্রোহের' সমর্থনে ধর্মঘট করে।
ফেব্রুয়ারি ২৫	বিমান-বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যগণ ধর্মঘট করে।
মার্চ ১৫	হাউস অব্ কমন্সে ভারতের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে অ্যাটলে বিবৃতি দেন।
মার্চ ১৮	দেরাদুন গুর্খা বাহিনী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
মার্চ ২৩	লণ্ডন থেকে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে।
মার্চ ২৪	দিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশন এসে উপস্থিত হন।
মে ৯	জওহরলাল নেহেরু আগামী কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন।
মে ১৬	ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীন ভারতবর্ষ এবং স্বাধীন পাকিস্তান প্রস্তাব ঘোষণা করে।
জুন ১৪	ভাইসরয়ের অন্তর্বর্তী সরকার গড়ার প্রস্তাব মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে।
জুন ১৬	ভারতে কেন্দ্রিয় সরকার প্রস্তাব গড়ার জন্য পার্লামেন্ট কমিটির পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।
জুন ১৮	গোয়ায় প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়।
জুন ২৫	মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে সম্মতি দেন।
জুলাই ১১	ডাক ও তার বিভাগের লোয়ার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়ন ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে সারা ভারতে ধর্মঘট করে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঐ ধর্মঘট সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।
জুলাই ২৯	তেভাগা আন্দোলন ও শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট পশ্চিমবঙ্গে পালিত হয়।
জুলাই ৩১	জিন্না বড়লাটকে জানিয়ে দেন তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করবেন না।

আগস্ট ১২	সরকারিভাবে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জওহরলাল নেহেরুকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান।
আগস্ট ১৫	বোম্বাইতে জওহরলাল জিন্নার সাথে সাক্ষাৎ করলেও জিন্না 'মিশন প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করেন।
আগস্ট ১৬	মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলকাতায় হাসান শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্ব সরকারি উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ব্যাপক গণহত্যা চালান হয়। ৫০০০ নরনারীর জীবনহানি হয়। এই দিনকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে' বলা হয়।
আগস্ট ২৪	বড়লাট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার তালিকা ঘোষণা করেন।
সেপ্টেম্বর ২	জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতে জাতীয় সরকার গঠিত হয়। মন্ত্রিসভায় লিয়াকত আলি খাঁ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জগজীবন রাম সহ ১১ জন সদস্য নিযুক্ত হন।
সেপ্টেম্বর ৪	মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে অসম্মত হয়।
সেপ্টেম্বর ৭	বঙ্গের সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দেন।
সেপ্টেম্বর ২৩	কলকাতা শহরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় কমপক্ষে দশজন নিহত ও প্রায় ষাটজন আহত হয়।
অক্টোবর ৬	নাৎসী-নায়কদের ফাঁসি।
অক্টোবর ১০	পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে উন্মত্ত মুসলিম জনতা গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করে, লুটপাট করে, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করে হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু করে।
অক্টোবর ২৫	হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে পাটনা, ছাপরা ও ভাগলপুর বিধ্বস্ত হয়।
নভেম্বর ৪	UNESCO (আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরো নাম United Nations Education Scientific Cultural Organization.
নভেম্বর ৬	সোদপুর থেকে নোয়াখালির উদ্দেশ্যে গান্ধিজি যাত্রা করেন।
নভেম্বর ২১	আচার্য জে. বি. কৃপালিনীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের ৫৪ তম বার্ষিক অধিবেশন মিরাটে শুরু হয়।
ডিসেম্বর	অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙড় ও ক্যানিং এ সুন্দরবন কৃষক অভ্যুত্থান বা তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়।
ডিসেম্বর ৮	ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদের প্রথম সভা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়।
ডিসেম্বর ৯	গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের সদস্যরা গণপরিষদে যোগদান করেন নি।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — আশুতোষ সান্যাল : *সন্ধ্যামালতী* / জসীমউদ্দীন : *রূপবতী* / যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *অনুপূর্বা*। **নাটক** — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *ভিটেমাটি* / শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *রাষ্ট্রবিপ্লব* / প্রমথনাথ বিশী : *পরিহাস বিজল্পিতম* / দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *তরঙ্গ* / বাণী রায় : *প্রেম*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *হীরা মানিক জ্বলে* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *সন্দীপন পাঠশালা, ঝড় ও ঝরাপাতা, অভিযান* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *শহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামনি* / বনফুল : *অগ্নি, নঞ-*

তৎপুরুষ / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *দীপপুঞ্জ* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *মন্দ্রমুখর*। **গল্পগ্রন্থ** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *অসাধারণ* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *আজকাল পরশুর গল্প, পরিস্থিতি* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *আসমান জমিন* / অন্নদাশঙ্কর রায় : *মনপবন* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *হলদে বাড়ি, উল্টোরথ*।

পত্রিকা প্রকাশ — *জন্মভূমি* : রণজিৎ মুখোপাধ্যায় / *পরিক্রমা* : কল্যাণী মুখোপাধ্যায় / *মাঙ্গলিক* : অমিয়কুমার গাঙ্গুলী।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

মৃত্যু : চন্দ্রকুমার দে, প্রমথ চৌধুরী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

জানুয়ারির শুরুর দিকে কমিউনিস্ট প্রার্থী কল্পনা দত্তের সমর্থনে জনসভায় যোগ দিতে চট্টগ্রাম গমন। সেখানকার মিলিটারি বর্বরতা নিয়ে লেখা তাঁর প্রতিবেদন ২০ জানুয়ারির জনযুদ্ধ পত্রিকায় ছাপা হয়। ৩১শে জানুয়ারি *প্রগতি লেখক সংঘের* কার্যালয়ে চিনা সাহিত্যিক চেনহান সেং এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। আগস্ট মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্রতা লাভ করলে টালিগঞ্জের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় মানিক বাড়িতে একাই থাকছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও সুরাশক্তি সঙ্গে নিয়ে লেখালেখি অব্যাহত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এলাকায় দাঙ্গাবিরোধী শান্তি স্থাপনে সক্রিয়তা তাঁর ডায়েরি থেকে আমরা জানতে পারি —

> সকালে Peace Committee গঠনের জন্য ডাকতে এলোনা, একটু আশ্চর্য হলাম। ভয়ানক সংবাদ আসতে লাগল। গুজব অনেক —কিন্তু তবু টের পেলাম, অবস্থা সাংঘাতিক। ...
>
> বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে। খুশি হয়ে নিজে বার হলাম — যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি — মিটমাটের জন্য সভায় যেতে।...
>
> মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকালের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়াল সেই কালো লোকটির লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমায় বোঝাবার চেষ্টা — তার পিছনে ভিড়ের সায়। পাকিস্তানের দাবি বাতিল করা হচ্ছে — ব্যাটারা টের পাচ্ছে! যেখানে মুসলমানেরা দলে ভারি সেখানে যে হিন্দুরাও টের পাচ্ছে — আমার এ যুক্তি উড়ে গেলো।...
>
> আজ বিকেলে আবার ফাঁড়ির সামনে দিয়ে পুলের তলা হয়ে K.P.Lane দিয়ে ঘুরে এলাম। ফাঁড়ির মোড়টা জনহীন — দূরে চারু মার্কেটের দিকে রাস্তায় হাঙ্গামা হচ্ছে। পাশে একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। K.P.Lane-এ বহু লোক — উত্তেজনা, হিংস্র। ছাদ থেকে এক ব্যাটা চিৎকার করল — 'ওই সেই ব্যাটা উপন্যাসিক যায়!' ধীর পথে চলতে লাগল (লাগলাম)। একজন পাশে চলতে চলতে লজ্জিত ভাবে বলল — 'দেখে যা ভাবছেন তা নয় — সব্বাই উত্তেজিত কিন্তু Aggressive নয়।'
>
> ব্রিটিশ সিংহ বুঝি মুচকি হাসছে! ...

> উত্তেজনা, উগ্র ভয়ার্ত হিংস্র উত্তেজনা, নিজেকে ক্ষয় করছে টের পাচ্ছি। অসুবিধায় সকলের প্রাণান্ত হচ্ছে। কার কি লাভটা হল — বারবার কানে আসছে। ভয়, উত্তেজনা, অবিশ্বাস কমতে কমতে স্বাভাবিক অবস্থা সাধারণ লোক নিজেদের মধ্যে নিজেরাই ফিরিয়ে আনছে টের পাচ্ছি।[১]

ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় *'সহরবাসের ইতিকথা'* উপন্যাস। এপ্রিলে *বসুমতী* পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় *'চিহ্ন'* উপন্যাস, সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। মে মাসে ছাপা হয় নাটক *'ভিটেমাটি'* এবং গল্পগ্রন্থ *'আজ কাল পরশুর গল্প'*। জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *'চিন্তামণি'*। সেপ্টেম্বর মাস থেকে পরিচয় পত্রিকায় *'জীয়ন্ত'* উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে শুরু করে। অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *'পরিস্থিতি'*।

প্রকাশিত গল্প: 'প্রাণ' (*দিগন্ত*, মার্চ), 'ছেঁড়া' (*চতুরঙ্গ*, মার্চ), 'মাসিপিসি' (*পূর্বাশা*, মার্চ), 'সিদ্ধপুরুষ' (*রংমশাল*, এপ্রিল), 'পেটব্যাথা' (*বসুমতী*, এপ্রিল), 'অমানুষিক' (*পূর্বাশা*, জুন), 'কংক্রিট' (*পরিচয়*, জুন), 'রাশের মেলা' (*পূর্বাশা*, জুলাই), 'পিংপং' (*রঙমশাল*, জুলাই), 'চক্রান্ত' (*কথাশিল্প গল্প সংকলন*, সেপ্টেম্বর), 'চালক' (*দেশ*, সেপ্টেম্বর), 'টিচার' (*বসুমতী*, সেপ্টেম্বর), 'একান্নবর্তী' (*যুগান্তর*, সেপ্টেম্বর), 'ভারতে' (*যুগান্তর*, সেপ্টেম্বর), 'প্রেমিক' (*যুগান্তর*, সেপ্টেম্বর), 'সহানুভূতি' (*গল্পভারতী*, সেপ্টেম্বর), 'মাটি' (*বসুমতি*, নভেম্বর), 'চোরাই' (*গল্পভারতী*, ডিসেম্বর), 'গুণ্ডামী' (*নতুন লেখা গল্পসংকলন*, ডিসেম্বর), 'প্রাণের গুদাম' (*গল্পভারতী*, ডিসেম্বর), 'শিল্পী' (*সীমান্ত*, ডিসেম্বর)।

উপন্যাস-১ : শহরবাসের ইতিকথা

এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেরোতম উপন্যাস, বাইশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫২, প্রকাশক ডি. এস. লাইব্রেরি, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ১২০, মূল্য – দু-টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে আশ্বিন ১৩৪৯ শারদ সংখ্যা *আনন্দবাজার পত্রিকায়* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।[২]

শহরবাসের ইতিকথা নগর কেন্দ্রিক জীবনের যাবতীয় অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লেখকের গভীরতর বিশ্লেষণ। সদ্য গড়ে ওঠা শহরগুলিতে গ্রাম থেকে মানুষজন চলে আসতে থাকে কাজের খোঁজে অথবা শহুরে আকর্ষণের হাতছানিতে। নগরকেন্দ্রিকতার স্বরূপ মানিক এই উপন্যাসে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিক্ষেপে তুলে ধরেছেন। শহরে গাড়ি চাপা পড়ে বাবার মৃত্যু হলেও মোহন সপরিবারে শহরে চলে আসে আধুনিক জীবন উপভোগ করার জন্য। সঙ্গে আসে বৃদ্ধা মা ও যুবতী স্ত্রী এবং আরো কয়েকজন। শহরে জীবন যাপনের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য মোহন বিলাস বহুল ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়, দামি গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে পার্টি দেয়। প্রয়োজন সর্বস্ব নগর জীবনের যান্ত্রিকতায় মোহন বুঝতে পারে আধুনিক জীবনের কৃত্রিমতা। শহুরে জীবনের নানারকম সমস্যা নিয়ে মানিক এই উপন্যাসের আলোচনা করেছেন।

সুবিধাভোগী বিত্তশালী শ্রেণির মানুষেরা শহরে বাস করে, তাই আধুনিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রশ্নে শহর প্রাধান্য পায়, গ্রাম নয়। দেশ নেতাদের অনুকম্পা গ্রামের মানুষদের ভাগ্যে জোটেনা। নানা কারণে গ্রামের মানুষ দুর্ভোগে পড়ে কষ্ট পায়, যন্ত্রণাদায়ক জীবনযাপনে বাধ্য হয়, আর শহরের মানুষদের জন্য জড়ো হতে থাকে বিলাসের প্রাচুর্য। শহরজীবনে নানা সমস্যা এবং অসঙ্গতি মানিক সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। দেখিয়েছেন এই আপাত চাকচিক্যময় জীবনের অন্তরালে কতাখানি ফাঁকি, কতখানি শূন্যতা এবং অতৃপ্তি লুকিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংলগ্ন পরিবর্তিত বাস্তবতায় যখন গ্রাম জীবন এবং নগর জীবনের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে, যখন লোকায়ত গ্রামীণতা এবং আধুনিক নাগরিকতার মধ্যবর্তী সম্পর্ক ক্রমহ্রাসমান, যখন গ্রামকে নিম্নবর্গীয় চক্রব্যূহের প্রান্তিকতায় ফেলে নগরই হয়ে উঠছে উচ্চবর্গীয় জীবনধারনের কেন্দ্রিয় স্বর্গ।— সেই কেন্দ্র হয়ে ওঠা নগরের প্রত্যাখানের ভাষাকেই প্রথম সনাক্ত করলেন মানিক তাঁর *শহরবাসের ইতিকথা* উপন্যাসে। মানিক দেখালেন উপনিবেশিক বাস্তবতার হাত ধরে 'কেন্দ্র' হয়ে ওঠা নগর কিভাবে গ্রামকে বর্জন করতে করতে, গ্রামকে অবজ্ঞা করতে করতে, গ্রামকে দমন করতে করতে ক্রমাগত প্রান্তে ফেলে দিচ্ছে। এই উপন্যাসের ভিতরে গ্রাম ও নগরের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচ্যুতির ভয়াবহ আর্তনাদটাই উপন্যাসের একমাত্র ভাষ্য হয়ে উঠেছে। এই ভাষ্য আজ যত সহজ সম্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ভাঙ্গনের কালে ততখানি সহজলভ্য ছিলনা। ভাঙ্গা সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে মানিক এই উপন্যাসে প্রথম দেখালেন সম্পর্কের থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষের অদ্ভুত অস্থির অনিশ্চিত আপাত কলোনিয়াল সত্তা। আখ্যানের কেন্দ্রভূমিতে মোহন মূলত সেই কলোনিয়াল সত্তারই সংকটপূর্ণ প্রতিরূপ হয়ে এসে গ্রামজীবন ও নগর জীবনের মধ্যবর্তী ব্যাবধানকে ক্রমশ আমাদের সামনে — সময়ের সত্যকে, সমাজের সত্যকে এবং বাস্তবের সত্যকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

শুধু গ্রাম ও নগর জীবনের আভ্যন্তরীন সংঘর্ষ দিয়েই নয়, এই উপন্যাসের আখ্যান মূলত আসল বাস্তব ও নকল বাস্তবের দ্বান্দ্বিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য বাস্তবের রূপ ধরেছে। সময়ের সত্য, সমাজের সত্য এবং বাস্তবের সত্য না বুঝলে যে জীবনের ইতিহাস রচনা করা যায়না। আসল বাস্তব ও নকল বাস্তবের দ্বন্দ্বে সংকটপূর্ণ মানুষের ভিতরে বিভ্রম বা ভিতরের বিভ্রান্তির যথাযথ উন্মোচন এই উপন্যাস। এর দ্বারা একদিকে তিনি বিভ্রমি চৈতন্যকে আঘাত করেছেন, অন্যদিকে বিভ্রান্ত মনস্তত্ববিদের প্রয়োজনীয় শুশ্রুষা করেছেন। আসলে ঐ উপন্যাসের আখ্যানে সর্বতোভাবেই তিনি দেখিয়েছেন — ভাঙন বা পৃথকীকরণের চূড়ান্ত বিনষ্টি। চতুর্দিকে সবই ভেঙে পড়ছে। সমাজ ভাঙছে, সম্পর্ক ভাঙছে, মানুষ ভাঙছে। চল্লিশের দশকে আমাদের সমাজের অনিবার্য ভাঙন দৃশ্যটি উপন্যাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন মানিক।

সেই চল্লিশের দশকেই দূরদর্শী লেখক মানিক তাঁর প্রাজ্ঞ সমাজবোধ থেকে বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে সম্পর্কবাহিত মনোবৈজ্ঞানিক কারণটিকে বুঝে নিতে না পারলে, সমাজের প্রয়োজনে তাকে

আস্তিক্যবাদী জীবনদর্শনে পরিনত করতে না পারলে, আজানা হোক কাল দ্রুত ভেঙে পড়বে জীবন খুব দ্রুত ভেঙে পড়বে সমাজ। সুতরাং সবকিছু ভেঙে পড়বার আগেই আমাদের সর্বতো ভাবেই সম্পর্কবাহিত মনো-বৈজ্ঞানিক বিকাশকে চেতনার অঙ্গিভূত করে নিতে হবে। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই —

মোহন তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
মোহন তার বোন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
মোহন তার ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
মোহন তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
মোহন তার গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
মোহন তার লোকায়ত শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই সর্বপ্রকার বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ সম্পর্ক বাহিত মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশের আভ্যন্তরিন অভাব। আর তারই ফলে সে ক্রমশ একটু একটু করে দূরে সরে গেছে আত্মার অভেদী আত্মীয়তার কার্য থেকে। মানিক মোহনের এই নোঙরহীন ভাসমানতার কথায় উপন্যাসের কাহিনিতে নানা ভাবে বলতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংলগ্ন বাস্তব অভিক্ষেপে, বাস্তব অভ্যাসে, মানিক যেন আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন পরবর্তী সময় ক্রমশ এক নকল বাস্তবের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে চলেছে।— সেখানে সত্যের থেকেও বড়ো হয়ে উঠবে সত্যভ্রম। সেখানে সত্যের থেকেও নির্মিত সত্য ব্যক্তি মানুষকে বেশিকরে সম্মোহিত করে রাখবে। সেক্ষেত্রে মানুষ চেষ্টা করেও বুঝতে পারবেনা কোনটা প্রকৃত সত্য আর কোনটাই বা কুয়াশাছন্ন নির্মিত সত্য। এর ফলে আত্মদীর্ণ মানুষ ক্রমশ বিভ্রমে পড়ে গিয়ে প্রকৃত সত্য ছেড়ে নির্মিত সত্যে নিজেকে সমর্পণ করে স্থূল আত্মপ্রসাদে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এভাবেই নাগরিক বস্তুবিশ্বের অন্তরালে রেখে দেয়। যার মধ্যে গ্রাম মুছে যায়, শিকড় ছিঁড়ে যায়, নিজত্ব ভেসে যায়, আর পারস্পরিক সম্পর্কগুলো একটার পর একটা অসংলগ্ন প্রলাপে জীবনবৃন্ত থেকে খসে পড়তে থাকে। নকল বাস্তব মানুষকে তার নিজের প্রতিবেদনের কাছে কিছুতেই পৌঁছতে দেয় না। পুঁজিবাদী রাজনীতির তলায় তলায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তলায়, তখন মড়ার মতন পড়ে থাকে মানুষের আক্রান্ত আখ্যান। এই উপন্যাসের মোহনও সেই আক্রান্ত আখ্যানেরই প্রতিনিধি হয়ে নকল বাস্তবের সলিলে ডুবেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন রুঢ় বাস্তবতাজাত মনোবিকলন মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিগত আমি-র অশুভ অসুখ তৈরি করে দিচ্ছিল মূলত সেই অশুভ অসুখের বিচ্ছিন্ন প্রতিনিধি মোহন। অস্পষ্ট অপরিকল্পিত পরিকল্পনার আধুনিক ব্যাধি চারপাশ থেকে তাকে এমনভবে ঘিরে ধরে যে ঠিকানাহীন এক ভয়াবহ বাস্তবের মধ্যে আশ্রয়হীন ভাসমানতায় ভেসে বেড়ানো ছাড়া কিছুই আর তার করার থাকেনা। মানিক

আধুনিক ভাসমানতার ছিন্নমূল এই ব্যাধির সংক্রমণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন মোহনের মধ্যে। মোহনের উপলব্ধি— ভাসমানতা কোনো জীবন নয়, জীবনের মধ্যে আশ্রয় তৈরি করতে হলে নোঙরের ব্যাবস্থা করতে হয় কারন নোউর ছাড়া জীবন হয়না। মোহন শুধু জীবন পাল্টাতে ও জীবনের রূপ পাল্টাতে গ্রাম থেকে শহরে এসেছে।— কোনো জীবনদর্শনে পৌঁছতে চায়নি। নোঙরহীন ভাসমানতার এই যে এক অশান্তি, এই যে একক অনিশ্চয়তা, এই Alienation — এর প্রচুর নিরপেক্ষ সংস্কার প্রয়োজন। আখ্যানের সত্যকেই লেখক মানিক আবার নতুন করে সামনে আনলেন, সামনে রাখলেন। মোহন সেই আক্রান্ত আখ্যানেরই চরম ও চূড়ান্ত সত্য।

এই উপন্যাসের আখ্যানে ব্যক্তি বিশ্লেষণ যেভাবে জীবন বিশ্লেষণে এবং জীবন বিশ্লেষণ যেভাবে ক্রমশ সমাজ বিশ্লেষণের গভীর তলে পৌঁছে গেছে — তা এক কথায় অসমান্য। মনস্তত্ত্বের দুর্ভেদ্য জটিল প্রহেলিকা ছিন্ন করে এই ভাবে যে শরীরবিজ্ঞান থেকে যৌনবিজ্ঞানে, যৌনবিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানে এবং মনোবিজ্ঞান থেকে সামগ্রিক সমাজবিজ্ঞানে পৌঁছে যাওয়া যায় — মানিকের *শহরবাসের ইতিহাস* তার দুর্দান্ত উদাহরণ। ফ্রয়েড দিয়ে নয়, মার্কস দিয়েও নয়, এই আখ্যানকে বুঝতে হবে সময় সমাজ মানুষ এবং বাস্তবের বহুরূপী আধুনিকতার চিহ্ন দিয়ে। বুঝতে হবে সংযোগ এবং বিয়োগ, পরিকল্পনা এবং অপরিকল্পনা, আশ্রয় এবং নিরাশ্রয়, সম্পর্ক এবং বিচ্ছিন্নতা, গ্রামীণ প্রাপ্তি এবং নাগরিক অপ্রাপ্তি, চলমান ফাঁকি এবং চিরকালীন সত্যের সহাবস্থান দিয়ে। আসলে মানিক গ্রাম এবং শহরকে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবতে চেয়েছেন। চেয়েছেন গ্রামকে শহরের মধ্যে এবং শহরকে গ্রামের মধ্যে বসাতে। একে অপরকে প্রত্যাখান করে নয়, ঘৃণা অবহেলা করে নয়, কোনো এক সামগ্রিক অভেদের সৌন্দর্য চেয়েছেন তিনি। কোনো একদিন মোহন বা মোহনের মতো মানুষেরা বুঝতে পারবে এই শহুরে জীবন আসলে তাদের একটা ফাঁপা স্থূল নকল ভিখারিতে পরিণত করে দিয়েছে। আধুনিক বিভ্রমের শিকড়হীন নকল ভিখারি মোহন — হয়তো এটাই মোহন বা মোহনের মতো চরিত্রদের সর্বশেষ পরিচয়।

উপন্যাস-২ : চিন্তামণি

এটি মানিকের চৌদ্দতম উপন্যাস এবং পঁচিশতম প্রকাশিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৫৩, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা - ২ +১০১, দাম এক টাকা বারো আনা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় উপন্যাসটি *'রাঙামাটির চাষি* নামে আশ্বিন ১৩৫০ থেকে মোট বারো কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলাদেশের বিধ্বস্ত গ্রামীণ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে কৃষক সমাজের করুণ কাহিনি এই উপন্যাসের উপজীব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি। তার ফলে বাংলার গ্রামজীবন ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষজন পেটের তাগিদে, বেঁচে থাকবার তাগিদে শহরে গিয়ে যে কোনো উপায়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

কেউ ভিক্ষা করে, কেউ শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়, কেউ পরিচারকের কাজ নেয়, কেউ দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সামগ্রিক এই ভয়াবহ পটভূমিকায় রচিত *'চিন্তামণি'* উপন্যাসটি তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ এর গ্রাম বাংলার বাস্তব কাহিনি।

উপন্যাসে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সময় উপন্যাসে দুভাবে আসে — উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনির সময়কাল এবং লেখক যে সময়ে লিখছেন তখনকার কাল বা পরিস্থিতি। *'চিন্তামণি'* উপন্যাসের আলোচনায় দুটি সময়কালই প্রায় কাছাকাছি এবং তা বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরময় পটভূমি। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ১৯৪২ -এ অনাবৃষ্টি এবং অনেক কম শস্য উৎপাদন, ১৯৪৩ -এ ফসলের উৎপাদন হ্রাস, বর্মা থেকে আসা মোটা চাল যুদ্ধের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া, যুদ্ধের জন্য বাজার থেকে খাদ্যশস্য তুলে নেওয়া, জাপানি আক্রমণে ভীত লক্ষাধিক শরণার্থীর বাংলায় আগমন ইত্যাদি এইসব কারণে ১৯৪৩ দেখা দিল মহামন্বন্তর। যাতে খাদ্যাভাবে বা কুখাদ্য খেয়ে মৃত্যু ঘটল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষের। সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে লাগল, পিতামাতা সন্তানকে বিক্রি করলেন, কোনো নারী নিজের দেহ বিক্রি করে প্রাণে বাঁচতে চাইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, বস্ত্র সংকট হাত ধরাধরি করে হাজির হয়েছিল। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন চিন্তামণি ও তার দিদি এই খাদ্যাভাবের কারণেই খিদের জ্বালায় গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। যুদ্ধের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে আকাল দেখা দেয়। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রামের মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। তার উপর জমিদার, মহাজন, আড়তদারদের শোষণে সাধারণ মানুষগুলি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে চিন্তামণি অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে প্রথমে কালিঘাটে এসেছিল, সেখান থেকে সে গিয়ে পৌঁছায় এক চালকলের মালিক নীলকণ্ঠ ঘোষালের বাড়িতে, সেখানে সে পরিচারিকার কাজ নেয়। যুদ্ধের বাজারে চালের দাম বাড়লেও তাতে চাষিদের কোনো লাভ হয়না, সমস্ত মুনাফা বাজারের আড়তদার কালোবাজারিদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয় —

> পৃথিবীতে বড়ো একটা যুদ্ধ বেধেছে। খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই। বাতাসে বাতাসে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। তা যুদ্ধ যদি বেঁধে থাকে থাকুক, বিলাত দেশে যুদ্ধ বাঁধলে সেটা আশ্চর্যের কথা কি এমন... বিদেশে বিদেশিদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষিদের কি সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে?... সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করছে ধীরে সুস্থে... জিনিসের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিসের দাম একেবারেই হয়ে যায় চড়কগাছ! কতগুলি দরকারি জিনিস একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে।[৪]

মধুবনীর চাষিদের চাষ করার জন্য সামান্য বীজ ধানও ঘরে নেই, ফলে তারা আগামী দিনের অবস্থা কল্পনা করে আরো দিশেহারা হয়ে পড়ে —

> বীজ ধানের অভাবে এবার অল্পবিস্তর সবাই কাতর। অনেক চাষির এ অভাবটা চিরস্থায়ী দায়... এবার এই স্বাভাবিক অভাব নয়, ফাঁদে পড়া সর্বজনের সর্ব্বজনীন অভাব। চাষিরা সব চিরকালই চাষি, চাষাড়ে জ্ঞান, চাষাড়ে মতিগতি। ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে দাদা-বাপ আর নিজে এই তিনপুরুষে তেমন শুধু স্বপ্ন দেখা ছিল, ... ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এসব কি ব্যাপার। ধারণ করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারেনা, শুধু গতদিনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কি একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে। কি যেন মুশকিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উল্টোপাল্টা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভালো ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের বাতাসা ভোগ। জমিদার, মহাজন, উকিল, ডাক্তার, দোকানি, পশারি, আত্মীয়পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে। কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া। লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতায়। লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য — আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে। কে জানে এসব কিসের সূচনা, কি আছে তাদের ভাগ্যে![৫]

বিশ্বযুদ্ধ এবং তার অনিবার্য কুফলগুলি এই মধুবনী গ্রামের অশিক্ষিত, নির্বোধ চাষিদের জীবনে কি ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছিল তার ইঙ্গিত দীর্ঘ বয়ানে মানিক লিপিবদ্ধ করেছেন। আছে জাপান যুদ্ধের কথা, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ, আছে চোরা কারবার, মজুতদারদের লোভের চিত্র। শুধু বাইরের আঘাত নয় ভেতরে ভেতরে সমাজে সংসারে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, ব্যক্তি মানুষের চৈতন্যেও যে ফাটল দেখা দিয়েছিল তার স্বরূপ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে আমরা দেখতে পাই। উপযুক্ত ঔষুধের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে, খাদ্যের অভাবে শিশু মারা যাচ্ছে, পেটের দায়ে ঘরের বউ দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। এসব খবর মানিক কোনোরকম আবেগ ব্যাকুলতা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। মানিক মানুষের দুর্গতির ও দুর্দশার যে ছবি স্থাপন করেছেন উপন্যাসে তা তাঁর চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশজুড়ে অন্য বাজার নেই, শুধু চোরাবাজার; চাল নেই, ঔষধ নেই, কাগজ, কয়লা, চিনি, তেল, কেরোসিন, কাপড় সবই অদৃশ্য। সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের, মনুষ্যত্বের, মায়া-মমতা–মান-ইজ্জতের।

উপন্যাসটি সম্পর্কে সরোজমোহন মিত্র বলেছেন — “এটি একটি অবক্ষয়ের উপন্যাস, ভাঙনের উপন্যাস। গ্রামভাঙা অসহায় মানুষের কলে কারখানায় মজুরগিরি করার ইতিহাস।”[৬] আমাদের বিবেচনায় উপন্যাসে খারাপ পরিস্থিতি বা দুর্গতি এলেই তাকে অবক্ষয়ের, ভাঙনের উপন্যাস বলা যায় না। লেখকের অন্যান্য রচনার সঙ্গেই স্থাপন করে এই উপন্যাসটির বিচার করলে আমরা তা বুঝতে

পারি। এই উপন্যাস লেখার সময়কালে মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীসংঘের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হয়েছেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেছেন। ফলে তিনি খুব কাছ থেকেই দেখেছিলেন চাষি-কৃষকদের দুরাবস্থা। সেই ভেঙে পড়া সমাজ ও মানুষের ভগ্নছবি এই উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই বলে একে অবক্ষয়ের উপন্যাস বলা যায় না। এখানে কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নেই ঠিকই কিন্তু চাষিরা নিজের নিজের মতো করে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেছে এবং বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে। এই উপন্যাসে একদিকে আছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের বিভীষিকা, অন্যদিকে আছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই। মানিক তাঁর প্রথম দিককার গল্প উপন্যাসে মানুষের অসঙ্গতি, যৌনবিকার ও চারিত্রিক নীতিবাচকতা দেখিয়ে সমাজকে ও তার গতানুগতিক ব্যবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই মানিক, যখন সমাজ ব্যবস্থা সত্যই ভেঙে পড়ছে, তখন তিনি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন। যা সময়ের হাত ধরে যেকোনো বিবেকী মানুষের প্রধান কর্তব্য। এই উপন্যাসে মানিক সেই কাজটি যত্নের সঙ্গে করেছেন।

গল্পগ্রন্থ-১ : আজ কাল পরশুর গল্প

'আজ কাল পরশুর গল্প' মানিকের নবম গল্পসংকলন এবং চব্বিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। গল্প গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা ৪ + ১৭০, মূল্য আড়াই টাকা।[৭] গল্পগ্রন্থটিতে গল্প সংখ্যা ষোলো। গল্পগুলি যথাক্রমে: *আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ি, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, নেশা, বেড়া, তারপর ?, স্বার্থপর ও ভিরুর লড়াই, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ী, সামঞ্জস্য*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই	অলকা	আশ্বিন ১৩৪৭
নমুনা	যুগান্তর	শারদ ১৩৫১
নেড়ী	পরিচয়	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২
শত্রু মিত্র	চতুরঙ্গ	আষাঢ় ১৩৫২
দুঃশাসনীয়	যুগান্তর	শারদ ১৩৫২
বুড়ি	পূর্ণিমা	শারদ ১৩৫২
নেশা	রূপমঞ্চ	শারদ ১৩৫২
বেড়া	কৃষক	শারদ ১৩৫২
কৃপাময় সামন্ত	পরিচয়	শারদ ১৩৫২
মঙ্গলা	পূর্বাশা	কার্ত্তিক ১৩৫২
আজকাল পরশুর গল্প	বসুমতী	অগ্রহায়ণ ১৩৫২
সামঞ্জস্য	গল্প-ভারতী	১৩৫২

গোপাল শাসমল	?	?
তারপর ?	?	?
রাঘব মালাকার	?	?
যাকে ঘুষ দিতে হয়	?	?

আজ কাল পরশুর গল্প

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে লেখা এই গল্পটিতে ভেঙে পড়া অবক্ষয়িত সমাজের ছবি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, মন্বন্তর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি — এইসব শহরের মধ্যবিত্ত মানুষদের যতটা না দুর্দশা তৈরি করেছিল তার থেকে বেশি বিপন্নতা দেখা দিয়েছিল গ্রামে গ্রামে। শহরের রেশনিং ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কিছুটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলি এই সামান্য সাহায্যটুকু থেকেও বঞ্চিত ছিল। গ্রামের মানুষগুলি খেতে না পেয়ে শহরের দিকে ছুটে গিয়েছে। গ্রামের মেয়ে বউ-রা দুটি খেতে পাবার জন্য শহরে গিয়ে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। মৌলিক নিরাপত্তা ভেঙে পড়ায়, সমস্ত প্রচলিত মূল্যবোধগুলিও ভেঙে পড়েছিল। ফলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই হয়ে উঠেছিল মানুষের প্রধান দায়, আর কিছু নয়।

রামপদ কাজের সন্ধানে শহরে যায়, গ্রামে সাত মাসের শিশু-পুত্র এবং অসহায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে। কিন্তু তার স্ত্রী অনাহারে শিশুটিকে বাঁচাতে পারেনা। নিজেও শেষ পর্যন্ত শহরে গিয়ে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। রামপদ গ্রামে ফিরে আসে। পথভ্রান্ত মেয়ে-বৌদের স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে কিছু সমাজসেবী সংগঠন এগিয়ে আসে এবং তাদের দ্বারাই মুক্তা পারিবারিক জীবনে ফিরে আসে। রামপদ ফিরে আসার পরে মুক্তা তার জীবনের করুণ অবস্থার কথা জানায় —

> খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোটা নেই। চাল গুড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরোলে দিন না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, কি করি! তাতেই শেষ হল।...
> শেষ দুটো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে...
> দাস মশাই দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে পরতে। তখন কি জানি মোর অদৃষ্টে এই আছে ? জানলেপরে রাজি হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচত। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।[৮]

গ্রামের মাথা ঘনশ্যাম দাস ও তার দলবল, যারা কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখতে চায়, মানুষের দুর্দিনে অসহায়তার সুযোগ নিতে চায়, তারাই রামপদর বাড়িতে এসে শমন জারি করে বৌকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা শহরে তার জাত গেছে। রামপদ কথা না শোনায় ঘনশ্যামের দলবল বিচার সভার আয়োজন করে। গ্রামের মানুষদের রামপদর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে ঘনশ্যাম। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুজেছে যখন বেঁচে থাকাটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর অন্য কিছু মাথায় আসেনা। অভাবের তাড়নায় স্বাভাবিক মূল্যবোধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বিচারসভা হয়

কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই সভায় প্রতিবাদ করে জানায় যে, মুক্তা কোনো দোষ করেনি। সাধারণ মানুষের সমবেত এই প্রতিবাদে ঘনশ্যাম বিপদ বুঝে নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব তোলে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আবার প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠে দোষ না করলে আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের। এই সকল গ্রাম্য মানুষজন নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝে নিতে পেরেছে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা। তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের এই ছবি দক্ষ কলমে মানিক ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। সেদিনের বিপর্যস্ত গ্রাম বাংলার জীবন্ত দলিল এই গল্পটি।

দুঃশাসনীয়

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার নিঃস্ব-রিক্ত মৃতকল্প চেহারার অতিবাস্তব সুনিপুণ রূপ এই গল্পটি। অর্থনৈতিক শোষনে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের শোচনীয় অপমৃত্যু, বস্ত্রসংকট প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে মানিক কতগুলি অসাধারণ গল্প রচনা করেছেন। তৎকালীন বাংলার বস্ত্রসংকটকে অবলম্বন করে রচিত *দুঃশাসনীয়* গল্পটি। বিদেশি সরকারের শোষনে নয়, স্বদেশের সরকারি শাসনে গ্রাম বাংলায় দরিদ্র মানুষকে যে অবর্ননীয় বস্ত্র সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে — এই গল্পে মানিক তার করুণ বাস্তব চিত্র এঁকেছেন।

এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সমসময়ের ভয়ঙ্কর বস্ত্র সংকট। ১৩৫০ -এ শুরু হয় মন্বন্তর, এই মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে গ্রামগুলো শ্মশান হয়ে যেতে থাকে। এই দুর্ভিক্ষ মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যবসায়ীরা কালোবাজারে কৃত্রিমভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। পরনের কাপড়ও হয়ে উঠল দুর্লভ। কাপড়ের অভাবে লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব। দেশে হাহাকার পড়ে গেল। প্রথমে গামছা, চট, বস্তা এবং অবশেষে কিছুই জুটলনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরে বিবস্ত্র বাংলার নিঃস্ব পল্লীর নগ্ন ছবি বলা যেতে পারে এই গল্পটিকে।

আগে রাত্রিবেলায় গ্রাম গুলিতে ভয়ে গা ছমছম করত। কিন্তু এখন দেখা গেল ছায়ার মতো মানুষগুলো অন্ধকারের আড়ালে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে নিচ্ছে। গ্রামের সমস্ত নারীই প্রায় বিবস্ত্রা, নারীর কায়া যেন ছায়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে —

> বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনীর বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে। দিদি, মাসি, খুঁড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে, কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে। আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে, এ-কুড়ে ও-কুড়ের পানে বিড় বিড় করে বকতে বকতে...

কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণণীয় রূপক বস্ত্রের মতো।
সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ, ভাই, স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না — স্ত্রীলোক সুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মা, মাসি, খুড়ি, পিসি, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি, বৌ, ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে। এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয়, কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।[৯]

গ্রামাঞ্চলে সবার বাড়িতেই আজ এই অবস্থা, সকলেই অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ক্ষুধার্ত ছেলে খিদেয় কাতর হয়ে মায়ের কাছে খেতে চাইলেও নগ্নদেহে ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার দিতে পারেনা মা। অথচ অপেক্ষমান জনতাকে বোকা বানিয়ে দালালরা আড়ত থেকে লরিভর্তি কাপড় নিয়ে পালায়। কাপড় যে একেবারে নেই তা নয়, কোনো কোনো বাড়ির মেয়েরা সকাল বিকেল আলাদা আলাদা কাপড় পরে, মহাজনের গুদামে কাপড় লাট হয়ে আছে, সরকারের দেওয়া রেশনের কাপড় মাঝ রাস্তায় বেহাত হয়ে যাচ্ছে, পুলিশ, দারোগা, ব্যবসায়ি সবার মধ্যে আছে যোগসাজোশ। কাপড়ের অভাবে প্রতি ঘরে ঘরেই দেখা দিয়েছিল ভীষণ সমস্যা। পেটে খেতে না পেলেও সহ্য করে থাকা যায় কিন্তু পরনের কাপড় না থাকলে লজ্জা নিবারণ করা যায় না। রাবেয়া তার স্বামীকে প্রতিবাদী কণ্ঠে জানায় — "আজ শেষ, আজ যদি কাপড় না আনবে তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুববো, ক্ষোদা কসম।"[১০] স্বামী খেতে না দিতে পারলে রাবেয়া কিছু মনে করেনা। কিন্তু পরতে দিতে না পারায় সে অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। রাবেয়ার এই আত্মহত্যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে লজ্জাকাতর নারীত্বের অন্তিম ধিক্কার। রাবেয়ার এই প্রতিবাদ তার স্বামীর বিরুদ্ধে নয়, তার প্রকৃত প্রতিবাদ অর্থপিশাচ, অমানবিক, লোভী মজুতদারদের বিরুদ্ধে। শতশত দুঃশাসনের রাজত্বে দরিদ্র চাষির সাধ্য কি স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করতে পারবে। মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের দায়িত্ব নিয়েছিল দুঃশাসন, আর একালে অসংখ্য দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের খেলায় মেতে উঠেছে। দুঃশাসনদের অত্যাচারে গ্রামের মেয়ে বৌ-রা আজ অন্ধকারে শুধু ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অপমান থেকে বাঁচার জন্য তাই হয়তো তাদের আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই। এই গল্পে মানিক সমকালের বস্ত্র সংকটকে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি শুধুমাত্র লেখক হয়েই থাকেননি, গ্রাম বাংলার অসহায় মানুষগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। সকল পীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে।

নমুনা

এই গল্পটিও সেকালের সমাজ ব্যবস্থার একটি নগ্নরূপকে প্রকাশ করেছে। কালোবাজারের টাকায় হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা কয়েকজন মানুষ দুর্ভিক্ষের দিনে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ঘরের মেয়ে-বৌদের দেহব্যবসার কাজে ঠেলে দিচ্ছিল। ব্রাহ্মণ কেশব তার কন্যা শৈলকে কালাচাঁদের কাছে বিক্রি করে দেয়, অভাবের তাড়নায় কেশব পুরাতন সংস্কার বসে নারায়ণ সাক্ষী করে মেয়ের নামমাত্র বিয়ে দেয় কালাচাঁদের সঙ্গে, তারপর কালাচাঁদ শৈলকে নিয়ে গিয়ে তোলে তার ব্যবসার কাজে। নামমাত্র বিবাহের বলেই কালাচাঁদ শৈলর প্রতি তার স্বামীত্বের প্রভাব খাটাতে চায়। সে যখন শোনে শৈলর ঘরে লোক আছে, তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু মন্দোদরী যখন কালাচাঁদের মুখের সামনে এক তাড়া নোট ছুড়ে দেয় শৈলর শরীরের মূল্য হিসেবে, কালাচাঁদের লোভ জেগে ওঠে, টাকা দেখে তার চোখ চকচক করে ওঠে এবং এই টাকা নিয়ে সে শান্ত হয়। অসাধারণ দক্ষতায় মানিক চল্লিশের দশকের আর্থসামাজিক অবক্ষয় এবং মানবচরিত্রের নীচতা-কপটতাকে তুলে ধরেছেন গল্পে। চল্লিশের দশকে ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থার এমন সদা-সচেতন কথাশিল্পী মানিক ছাড়া দ্বিতীয় আর কারও লেখায় পাওয়া যায় না।

বুড়ি

এই গল্পে বিয়ের এক বছরের মধ্যে নন্দর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী আশ্রয়হীনতার ভয়ে অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে পছন্দ করে না, ফলে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই গল্পের নায়িকা নন্দর স্ত্রী মেনকা নয়, একটি তিনকাল পার হওয়া বুড়ি। সেই বুড়িই মেনকাকে পরামর্শ দেয় মাটি কামড়ে পড়ে থাকার, কেননা এই বুড়িরও অল্প বয়সে বিয়ের রাতেই স্বামী মারা গিয়েছিল। কিন্তু সে আজও মাটি কামড়ে পড়ে আছে। এই গল্পে একটি চরিত্রের লড়াই করবার মানসিকতা আর সহ্যশক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। সেই সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মূল্য কতখানি আপেক্ষিক এবং অসহায় সেদিকটিও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

গোপাল শাসমল

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকালীন গ্রামবাংলার এক টুকরো ছবি গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। জেল থেকে ফিরে গোপাল তার গ্রামের দুরাবস্থার ছবি দেখে। গল্পটি স্কেচধর্মী, নির্দিষ্ট কোনো কাহিনি গল্পের মধ্যে নেই। যুদ্ধকালীন দেশের পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, শোচনীয় দুঃখের পরিণতি, ডাকাতি, কালোবাজারি ইত্যাদি নানা ঘটনার উল্লেখ গল্পটিতে আমরা পাই।

মঙ্গলা

স্বদেশী আন্দোলনের সময় মঙ্গলাদের গ্রামে রাত্রিবেলা পুলিশ হানা দেয়। গ্রাম ঘিরে রেখে গ্রামের ফেরারি যুবকগুলিকে ধরার চেষ্টা করে। গ্রামের লোকজন যে যেখানে পারে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মঙ্গলা ডোবার জলে ঝোপে আশ্রয় নেয়, মঙ্গলার পা কেটে গিয়ে ভীষণ রক্তপাত হয়। মঙ্গলার পা ফুলে ওঠে, জ্বরের ঘোরে সে দাওয়ায় আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। পরের দিন মঙ্গলার কাছে ফেরারি যুবক গোলক আসে, গোলক মঙ্গলাকে ভালোবাসে। গোলক জানায় তারা আর লুকিয়ে থাকবে না, ধরা দেবে পুলিশের কাছে, তাই আজকের রাতটা যে যার প্রিয়তমের সঙ্গে কাটাতে চায়। মঙ্গলা তার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে ইংরেজদের অত্যাচারের ছবি এবং দেশিয় মানুষজনের দুর্দশার ছবি খুব অল্প হলেও ফুটে উঠেছে।

নেশা

এই গল্পটিতে মানিক বলতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি মানুষেরই কোনো না কোনো নেশা থাকে। পুলকেশ ও যতীনের অল্প বয়সে নেশা ছিল নিজেদের বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব ও ভাবপ্রবণতাহীন ভাববাদ। অন্যেরা যখন সিনেমা যেত তখন তারা বাংলা সিনেমার অন্তঃশূন্যতা নিয়ে বিদ্রুপ করত। বিয়ে করার পর দুই বন্ধু জীবনের অসারতা বুঝতে পারে এবং পুলকেশ ধরে সিনেমার নেশা, আর যতীন ধরে মদের নেশা। বিশেষ যুগের পটভূমিকায় মানিক চরিত্রদুটির মধ্যদিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু নেশা থাকে, যা কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট।

বেড়া

জনার্দন ও গোবর্ধন দুই ভাইয়ের সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পিতার শ্রাদ্ধের দশদিনের মাথায়। দুই পরিবারের মধ্যে কলহ, বিদ্বেষ, ঝগড়া প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে। দুই বাড়িকে আলাদা করেছে উঠোনের মাঝবরাবর দেওয়া একটি বেড়া। দুই পরিবারের মধ্যে ভয়ঙ্কর শত্রুতা, এ বাড়ির মেয়ে বেড়ার ফুটোয় চোখ রাখলে ও বাড়ির কেউ সেই ছিদ্রে বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে চোখ প্রায় কানা করে দেয়। ও বাড়ির বেড়াল এ বাড়ির মাছ চুরি করলে আঁশবটি দিয়ে এ বাড়ির লোক বেড়ালটিকে খুন করে। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রভাব পড়ে দুই ভাইয়ের পরিবারে। জমি-জায়গা বিক্রি করে সংসার চালানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাদের, কিন্তু সে জায়গা বিক্রি করার জন্য উভয়ের সম্মতিস্বাক্ষর দরকার হয়। স্বার্থের কারণে এবং বিপদে পড়ে তারা পরস্পরের কাছে আসে। জনার্দনের নাতি মারা গেলে শোকের উপলক্ষে দুই পরিবারের মধ্যে আবার সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়। পরের আশ্বিনের ঝড়ে বেড়াটি ভেঙে গেলে আর তা তোলা হয়না। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও অভাবের তাড়নায় এইভাবে দুটি পরিবার আবার কাছাকাছি আসে।

তারপর ?

এই গল্পের নায়ক গজেন, ছোটো৭বেলায় তার মাকে কুমিরে টেনে নিয়ে যায়। সে সময় সে মায়ের কোলেই ছিল। তার মা তাকে বাঁচাতে দূরে ছুঁড়ে দেয়, সেই আঘাতে তার একটি হাত অকেজো হয়ে যায়। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত তার পড়াশুনো। তারপর সে নারীব্যবসার দালাল হয়ে মেয়ে চালান দিতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষের কালে দুমুঠো খেতে পাওয়ার জন্য উপবাসী দরিদ্র মেয়েগুলি দেহ ব্যবসায় নাম লেখাত। তারপর শরীর একটু ভাঙলেই পথে এসে দাঁড়াতে হত অথবা তাদের কোথাও চালান করে দেওয়া হত। তাদের শরীরে বাসা বাঁধত দুরারোগ্য ব্যাধি। এই কারবারে গজেন প্রচুর টাকা রোজগার করে। এমনকি নিজের সুন্দরী বিধবা ভাগ্নীটিকেও চালান দেবার কথা ভাবে সে। দু একজন মহিলাকে দিয়ে সে গ্রামের মেয়েদের প্রলুব্ধ করার কাজে লাগায়। কিন্তু কোনো এক নারীসংঘ থেকে কয়েকজন মহিলা ও বাবুরা এসে গ্রামের মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে যায় এ ধরনের প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য। এরপর গ্রামের ছেলেরা গজেনকে জানায় গ্রামে ঢুকলে তার আর একটি হাতও ভেঙে দেবে। গজেন ভয় পেয়ে সে রাত্রে একটি মেয়ে নিয়ে নৌকায় ফূর্তি করতে পালিয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে হাবো নামের মেয়েটি গায়ে একটিন কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে। কেননা সে গজেনকে ভালোবাসত। গল্পটি শেষ হয় আকস্মিক একটি তাৎপর্যে যেখানে সবাই আপশোস করে এই দুর্মূল্যের বাজারে একটিন তেল অপচয়ের জন্য, হাবোর মৃত্যুর জন্য নয়। মানুষের জীবনের মূল্য এতখানি সস্তা হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই

গল্পটির মধ্যে ব্যঙ্গাত্মকভাবে জনদরদি নেতাদের বিদ্রূপ করা হয়েছে। কেদার ঘোষাল জনপ্রিয় নেতা, আবেগময় বক্তৃতায় সে বুঝিয়ে দেয় গরিবের কল্যাণ করার জন্য তার ঘুম নেই। মিথ্যা অভিনয়ে মানুষকে সে বশ করে রাখে। কৈলাস বসু নামের আর একটি চরিত্র সে সুদে টাকা খাটায় কিন্তু ঠক বা প্রবঞ্চক নয়। জেলেপাড়ায় কেদার ঘোষালের জনপ্রিয় আবেগময় বক্তৃতা শুনে কৈলাস বসুরও মনে হয় গরিবদের জন্য তারও কিছু করা দরকার। দুজনই মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে একই পদের জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। গরিব মহল্লায় একই দিনে দুই দলের লোক সভা ডেকে বসে ফলে ব্যাপক হৈ চৈ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। কৈলাস খবর পেয়ে কেদারের কাছে যায়, এবং বলে তারা দুই নেতা সামনে গিয়ে দাঁড়ালে গণ্ডগোল থেমে যেতে পারে। কিন্তু কেদার বলে পুলিশ যা করার করবে, তাদের গণ্ডগোলের মাঝখানে গিয়ে আহত না হওয়াই ভালো। গরিবদের দুই নেতা — একজন স্বার্থপর, একজন ভীরু। মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে তারা নিরাপদ দূরত্বে থাকে আহত হওয়ার ভয়ে, এমনই তাদের গরিব প্রীতি। সমকালের রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ড চরিত্রদেরকে এভাবেই ব্যঙ্গ করেছেন মানিক এই গল্পে।

শত্রু মিত্র

দামোদর ও রসুল পরস্পরের ঘোর শত্রু। তাদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা চলে, একে অপরকে দেখলে রাগে তাদের মাথায় রক্ত উঠে যায়। মামলার জন্য তারা সদরে যায়, মামলার দিন পিছিয়ে যাওয়ায় তারা দলবল নিয়ে একই বাসে গ্রামের দিকে রওনা হয়। বাসের যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মাতাল গোরা সৈন্য ছিল। গোরা সৈন্যদের নজর পড়ে রসুলের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষী দামোদরের তরুণী স্ত্রী চাঁপার উপর। বাসের মধ্যেই গোরা সৈন্যরা মদ খেতে খেতে চাঁপার দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করে। বাসের অন্যান্য মানুষদের তারা মানুষ বলে গণ্য করে না। রসুল এবং দামোদর এক জায়গাতেই বাস থেকে নামে গ্রামে যাওয়ার জন্য। রসুল তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়। চলন্ত বাস থেকে গোরা সৈন্যরা নেমে পড়ে এবং চাঁপার আঁচল ধরে টানাটানি শুরু করে। রসুল শত্রুতা ভুলে লাঠি হাতে ছুটে আসে এবং গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। আসলে এই গল্পে মানিক বোঝাতে চেয়েছেন কে আমাদের প্রকৃত শত্রু কে আমাদের মিত্র। সমকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজ সৈন্যরা অমানবিকভাবে অত্যাচার চালাত এদেশিয় মানুষদের উপর। সেইসব বাস্তব ঘটনার এক টুকরো ছবি এই গল্পে ফুটে উঠেছে।

রাঘব মালাকর

এই গল্পটি যুদ্ধের পটভূমিকায় কঠিন বস্ত্র সংকটের প্রেক্ষাপটে রচিত। একদল স্বার্থপর মুনাফালোভী চোরাকারবারিদের চক্রান্তে কিভাবে বাজার থেকে বস্ত্র উধাও হয়ে গিয়েছিল এবং তার জন্য সাধরণ দরিদ্র মানুষদের কি দুর্গতি হয়েছিল, তার ছবি যেমন আমরা এখানে পাই, সেইসঙ্গে মানুষদের নিজের নিজের মতো করে প্রতিবাদ প্রতিরোধের চিত্রও এ গল্পে রয়েছে। রাঘব মালাকর গ্রামের লোকজনকে জড়ো করে আড়ত থেকে চোরা কারবারিদের কাপড়ের গাঁঠ লুঠ করে। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ঘরের মেয়ে-বৌদের লজ্জা নিবারণের। এই ঘটনার জন্য রাঘব মালাকর জেলে যায়, তবু সে এই কাজকে শ্রেয় মনে করে। বিরুদ্ধ প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে হার না মেনে সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদকে মানিক এই গল্পে দেখাতে চেয়েছেন —

> পুরাণে বলে একদা নবরূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন — বহুকাল পরে আবার তিনি... এবার অদৃশ্য থেকে তার প্রতিনিধিদের দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন... তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে শান্তনা দিও।[১১]

যাকে ঘুষ দিতে হয়

যুদ্ধের বাজারে ঘুষ দিয়ে বড়ো বড়ো কনট্রাক্ট জোগাড় করে মাখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে। সে এখন প্রচুর টাকার মালিক, অন্তত আর পাঁচজনের থেকে সে আলাদা। নিজের দামি নতুন গাড়িতে স্ত্রী সুশীলাকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে দেখা হয় দাস সাহেবের দামি গাড়িটির সঙ্গে। দাস সাহেব নিজের গাড়িটিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে মাখনের গাড়িতে উঠে আসে। দাস সাহেব মাখনকে সোয়া লক্ষ টাকার কনট্রাক্টের লোভ দেখিয়ে নিজের নিরালা বাড়িতে নিয়ে যায়। কৌশলে কনট্রাক্টে সই করার জন্য দাস সাহেব মাখনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। টাকার লোভে মাখন নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে সাহেবের কাছে রেখে যায়। লেখক ইঙ্গিত করেছেন মাখনকে ঘুষ দিতে হয় এবং ঘুষ দিয়েই সে কনট্রাক্ট পায়। আর মাখনের মতো লোকেরা অর্থের লোভে নিজের স্ত্রী-কেও ঘুষ হিসেবে দিতে পিছুপা হয়না। সমকালীন অর্থলোভী অসৎ মূল্যবোধহীন তথাকথিত ধনীলোকদের চাক-চিক্যময় চরিত্রের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কালো দিকটিকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এই গল্পে লেখক।

কৃপাময় সামন্ত

দরিদ্র বৃদ্ধপিতা কৃপাময়ের আদর্শবান ছেলে স্বদেশি করার অপরাধে জেলে যায়। দরিদ্র কৃপাময় পুত্রবধূ এবং নাতিকে নিয়ে দুর্ভিক্ষের বাজারে কোনোরকমে টানাটানি করে সংসার চালায়। এর বাড়ি, ওর বাড়ি থেকে চেয়ে আনলে তবেই তার সংসারে দুমুঠো রান্না হয়। ভূধর তাকে একটি লাউ দেয় আর কাতু জেলেনী কুচো চিংড়ি মাছ দেয়। কৃপাময় বাড়ি এসে পুত্রবধূকে লাউচিংড়ি রান্না করতে বলে। ছেঁড়া লুঙ্গির কাপড় পরা তার প্রতিমার মতো পুত্রবধূটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাঁদে, কৃপাময় বুঝতে পারে ঘরে চালও নেই। সহজ সরল ছোটো আকারের এই গল্পটিতে মানিক সমকালীন পরিস্থিতির শিকার একটি দরিদ্র পরিবারের কাহিনি তুলে ধরেছেন।

নেড়ী

বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা এই গল্পটি। দরিদ্র গৃহবধূ তারার মাথায় অজস্র চুল ছিল। তেলের অভাবে তারার চুল জট পাকিয়ে থাকে। দিনের পর দিন উপবাসে কাটিয়ে তারার ছেলে এবং স্বামী শহরে কাজের খোঁজে যায়। তারার আঠারো বছরের মেয়ে মনা বিধবা হয়ে ফিরে আসে। মনার কোলের শিশুটি দুধের অভাবে মারা যায়। তারার দশটি সন্তানের মধ্যে মাত্র দুজন বেঁচে আছে। হৃদয় পণ্ডিত মনাকে মাছ দুধ গহনার লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে শহরে বিক্রি করে দেয়। অসহায়, অভুক্ত তারা শহরের দিকে হাঁটা দেয়। সে পাগল হয়ে যায়, হাসপাতালের আয়নায় নিজের নেড়া মাথা দেখে তারা নিজেকে চিনতেই পারে না। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে গ্রামের মানুষগুলির কিরকম ছন্নছাড়া দুরাবস্থা হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত এই গল্পে মানিক তুলে ধরেছেন মানবিক মমতায়।

সামঞ্জস্য

শিক্ষিত, ভালো চাকুরিরত প্রমথ আদর্শহীন, বিবেকহীন, ন্যায়-নীতিহীন স্বার্থমগ্ন জীবনের হাত থেকে মুক্তির জন্য স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যায়। সেইসঙ্গে সে তার আত্মকেন্দ্রিক সৌখিন জীবনের প্রতি লোলুপ স্ত্রীর হাত থেকেও মুক্তি পায়। জেলে যাওয়ার দেড় বছর পরে স্ত্রীর কাছ থেকে সে প্রথম চিঠি পায় এবং জানতে পারে তার স্ত্রীও প্রমথের সঙ্গে মনের দূরত্ব দূর করার জন্য কোনোএক শিক্ষা সদনে যোগ দিয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রমথ বাড়ি ফিরে জানতে পারে, তার স্ত্রী গীতাও আন্দোলন করে জেলে গিয়েছে। প্রমথ ছুটে যায় জেলে বন্দি স্ত্রীর কাছে। দুজনের দেখা হওয়া মাত্রই শুরু হয় কলহ। প্রমথ বলে, গীতার জেলে আসার কি দরকার ছিল। গীতা বলে, জেলে না এলে দুজনের মধ্যে সামঞ্জস্য হবে কি করে ? আসলে এই দুই শিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে ছিল ব্যক্তিত্বের লড়াই, অস্তিত্ব প্রকাশের চাপা প্রতিযোগিতা। আর তার পরেই তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল ভুল বোঝাবুঝি। বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন মানুষের বিপন্নতা ও অস্থিরতার ছবি প্রমথ ও গীতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। যা সমকালের অনেক মানুষেরই চারিত্রিক অসঙ্গতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৩ -এর দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রাম বাংলার মানুষজন সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। অনাহারে বহুমানুষের মৃত্যু হয়, তারপরেও যারা বেঁচে ছিল তারা একমুঠো আহারের সন্ধানে শহরে চলে আসে। কেউ ভিক্ষা করে, কেউ অন্য কোনো উপায়ে বেঁচে থাকার জন্য একমুঠো খাওয়ারের জোগাড় করতে চায়। কিন্তু না খেতে পেয়ে শহরের ফুটপাতে বহু মানুষের মৃত্যু মিছিল সংঘটিত হতে থাকে। অসহায় মেয়েরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কালোবাজারি মজুতদারদের দৌরাত্মে খাদ্য, বস্ত্র, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবকিছুর সংকট দেখা দেয়। ১৯৪৫-৪৬ এর বিপন্ন বাংলাদেশের জীবনচিত্র এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে নানা ভাবে তুলে ধরেছেন মানিক। *‘আজ কাল পরশুর গল্প’* বাংলাদেশের তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের এক জীবন্ত দলিল।

গল্পগ্রন্থ-২ : পরিস্থিতি

এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশম গল্প সংকলন এবং ছাব্বিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল-আশ্বিন ১৩৫৩, প্রকাশক অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৪ + ১৬১, দাম আড়াই টাকা। এই গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা বারো, গল্পগুলি যথাক্রমে : *প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাশের মেলা, মলিসপিসি, অমানুষিক, পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রিট, রিক্সাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:[১২]

প্যানিক	দেশ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯
সাড়ে সাত সের চাল	অর্চণা	বৈশাখ ১৩৫১
রিক্সাওয়ালা	জনযুদ্ধ	কার্ত্তিক ১৩৫১

প্রাণ	দিগন্ত	চৈত্র ১৩৫২
মাসিপিসি	পূর্বাশা	চৈত্র ১৩৫২
ছেঁড়া	চতুরঙ্গ	চৈত্র ১৩৫২
পেটব্যথা	বসুমতি	বৈশাখ ১৩৫৩
অমানুষিক	পূর্বাশা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
কংক্রিট	পরিচয়	আষাঢ় ১৩৫৩
রাশের মেলা	পূর্বাশা	শ্রাবণ ১৩৫৩
প্রাণের গুদাম	গল্পভারতী	১৩৫৩
শিল্পী	সীমান্ত	১৩৫৩

প্যানিক

> জানাশুনা যত লোক শহর ছাড়িয়া পালাইয়াছে, জগদীশের মতো প্রিয়জনকে দূরে পাঠাইয়া নিজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, তাদের বিরুদ্ধে নিরুপায় বিদ্বেষ ও অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মানুষ সম্বন্ধে ধনেশের চেতনায় এক অদ্ভুত বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ট্রামে মানুষের ভিড়, পথে অজস্র লোক চলিতেছে। এত লোকের মধ্যে ভয়ার্ত ধনেশের নিজেকে একা অসহায় মনে হয়। ...শহরে শুধু চলাফেরা করিতেছে স্বার্থপর, হৃদয়হীন দুপেয়ে জীব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মুখোশ সকলের খসিয়া গিয়াছে।[১৩]

যে কোনো মুহূর্তে বোমা পড়ার সম্ভাবনা, মৃত্যুর আতঙ্ক, চারিদিকে অস্থির ভয়াবহ পরিস্থিত একটা সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করে রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা শহরে বোমাতঙ্ক ও ব্ল্যাক আউটের সময়কার ঘটনা এবং শহরের মানুষের দুর্বিসহ জীবনের ছবি এই গল্পে মানিক সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। প্যানিক নামটির মধ্যেও আতঙ্ক ও অস্থিরতার ইঙ্গিত। শহরে বোমা পড়ার ভয়ে অনেকেই তাদের পরিবারকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ধনেশ তার পরিবারকে কোথাও পাঠায়নি, কেননা তার সেরকম কোনো আশ্রয় ছিলনা তাই। ভয়ে, আতঙ্কে তার মানসিক ভারসাম্য কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, সে বিকারগ্রস্তের মতো আচরণ করে। বন্ধু জগদীশ তার পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে নিজে যে কোনো সময় চলে যাওয়ার। এই ঘটনায় ধনেশ আরো বিচলিত হয়ে পড়ে, নিজের পরিবারের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে। ছোটো ভাই তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইলে ধনেশ ক্ষিপ্ত হয়, ভাবে বিপদের দিনে সবাই তাকে ফেলে রেখে চলে যেতে চাইছে। ধনেশ আগামী ছয়মাসের খাদ্য বাড়িতে সঞ্চয় করে রাখে, ছেলেকে কোথাও পাঠাতে চায় না; কেননা সে শুনেছে জোয়ান ছেলেদের জোর করে যুদ্ধে পাঠাবার আইন পাশ হচ্ছে। সবদিক থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সে বুঝতে পারেনা কি করবে! এরকম ভয়ানক ও আতঙ্কিত পরিবেশে মানুষের মনের স্বাভাবিক গ্রন্থিগুলি দুর্বল হয়ে যায়, ধনেশ ও তার পরিবারের অবস্থাও তাই হয়। প্রতিটি চরিত্র অস্বাভাবিক ও উদ্ভট আচরণ করতে থাকে। যুদ্ধের সময়কালে বোমা পড়ার আতঙ্কে মৃত্যুভয়

সেদিন শহরবাসীর সাধারণ মানুষের জীবনে কিরকম উদ্বেগ, আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা ও ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছিল তার চমৎকার দৃষ্টান্ত *প্যানিক* গল্পটি।

সাড়ে সাত সের চাল

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত এই গল্পটিতে দেখা যায়, দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে সন্ন্যাসী গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল যে কোনোভাবে কিছু রোজগারের আশায়। সে গ্রামে ফেলে রেখে গিয়েছিল পরিবার আত্মীয়দের, যারা প্রত্যেকেই ছিল অভুক্ত। অনেক কষ্টে কয়েক দিনের চেষ্টায় সে সংগ্রহ করেছে সাড়ে সাত সের চাল। অনাহারে দুর্বল শরীরে রাত্রিবেলা স্টেশনে এসে সে পৌঁছায়। এক কাপ চা খেয়ে পেটের খিদে মেরে স্টেশনে রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলায় গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সে ঠিক করে। কিন্তু তার পরেই সে ভাবে এই চালটুকু এখনি বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে হয়তো অনাহারে মরণাপন্ন কাউকে সে বাঁচাতে পারবে। বহুদিনের অদেখা বাড়িটা তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে, সে ভাবতে থাকে দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে এখনও বাড়িতে কে কে বেঁচে থাকতে পারে? স্টেশন থেকে তার গ্রাম সাত মাইল পথ। চাঁদের আলোয় নির্জন পথে সে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তিন মাইল পথ পার হওয়ার পরে পড়ে সালাতি গ্রাম, গ্রামে কারো সাড়াশব্দ নেই। এমনকি কুকুর গুলোও কোনো চিৎকার করে না। মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর গা শিউরে ওঠে। থমকে দাঁড়িয়ে এলোমেলো নিশ্বাস নিতে নিতে সে আবার চলতে শুরু করে। চলবার শক্তিটুকু তার দেহে নেই, অনেক দিন না খেয়ে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। শুধু মনের জোরে একটি দেহকে সে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। নিজের গ্রামে পৌঁছে সোজা সে নিজের বাড়িতে যায়। বাড়ি পৌঁছে সে এক এক করে নাম ধরে ডাকতে লাগল সবার। কিন্তু কারো সাড়া নেই —

> গলা ছিঁড়ে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখ পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আর একটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে। ...
>
> কোনো ঘরে কেউ নেই। তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে। সবাই? দাওয়ায় সাড়ে সাত সের চালের পুটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটার হদিশ পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচে ছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বৌঠান সুদ্ধু? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল?...
>
> ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে একসময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।[১৪]

অসাধারণ বর্ণনায় মানিক সন্ন্যাসীর গ্রামে ফিরে আসা ও পরিবাবের মানুষ জনদের বাঁচানোর তাগিদ, সমকালীন দুর্ভিক্ষময় সর্বনাশা ছবি তুলে ধরেছেন —

> নির্জন নিরালা জ্যোৎস্না রাতে, দুর্ভিক্ষে পরিত্যক্ত গ্রাম, উপবাসী মানুষটির কিছু চাল সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আসার ব্যাগ্রতা, বিজনহীন ভিটেতে মধ্যরাতে একাকী সন্ন্যাসীর হাহাকার ভরা ডাক এবং তার মৃত্যু, সমস্ত এই গল্পটিতে একটি করুণ গীতি কবিতার মূর্ছনা তৈরি করেছে।[১৫]

প্রাণ

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা এই গল্পটিতে মানিক দেখিয়েছেন একজন কৃষক গৃহবধূর অসহায়তা। খাদ্যের টানে গ্রামের নিরন্ন উপবাসী মানুষজন শহরে চলে আসে, কিন্তু শহরেও অন্নাভাবে তারা মড়ার মতো ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অধিকাংশ মানুষই উপবাস করে দিন কাটায়, মেয়েদেরকে দেহ বিক্রি করে খাদ্য জোগাড় করতে হয়। এই গল্পে অটল ও তার স্ত্রী মালতি খাদ্যের আশায় শহরে এসে আশ্রয় নেয়, কিন্তু কিছুতেই দুমুঠো খাদ্যের জোগাড় হয়ে ওঠেনা। মালতিকে মনে ধরে কোনো এক বাবুর, অটল মালতিকে সেই বাবুর কাছে পাঠাতে চায়। কিন্তু সহজ-সরল গৃহবধূ মালতি কিছুতেই তার সহজাত সংস্কারের বেড়া ভেঙে যেতে পারে না —

> কতকাল ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে এসেছে, উপোস করে দিন কাটাচ্ছে। কি অবস্থায় লজ্জা ঘেন্না বরবাদ করে, আজও সে আছে ভীরু লাজুক গেঁও বৌ! চোখের সামনে কত লোকের কত বৌকে কি হয়ে যেতে দেখল অটল, নিজের বৌ বলে যেন বাদ পড়েছে মালতি। মালতি অবশ্য বলে যে আজও সে সতী আছে। পেটের দায়ে ছাড়াছাড়ি হোক তাদের সকালে দুপুরে, ফিরতে কোনো কোনো দিন রাত হয়ে যাক যেদিন যেমন কাজ জোটে, তাই বলে সে অসতী হবে কেন।... শকুনটার নজর যখন পড়েছে মালতির উপর, মালতির কথায় রাজি সে হয়ে যাবে। খুশি হয়েই রাজি হবে, বেশি রকম আগ্রহের সঙ্গে কথাটা যতবার ভাবে অটল ততবারই মনে মনে ছ্যা ছ্যা করে।[১৬]

নির্জন রাতে বাবুর বাগান বাড়িতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মালতি আগাম কিছু খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করে এনেছে। মালতি ও অটল পরিকল্পনা করে, রাত্রি বেলায় যখন বাবু ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তখন মালতি ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবে এবং দুজনে মিলে বাবুর সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে তারা অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে। মালতি আসবে বলে বাবুটি সে রাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু মালতি ভেতরে যেতে পারেনি। বাড়ির বাইরে গাঁদা বাগানের ঝোপে লুকিয়ে বসে থাকে। অপেক্ষা করে করে বাবুটি অবশেষে দরজা বন্ধ করে দেয়। অটল ও মালতি দুজনেই ফিরে আসে। তারা বুঝতে পারে একাজ তাদের নয়, তারা সরল দরিদ্র চাষি, চুরি করা বা লোককে ঠকানো তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এই গল্পে মানিক দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য সহজ সরল মানুষগুলোকে কিরকম নোংরা জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল সেদিন।

রাসের মেলা

মধ্যবয়সী নারী খাদু রাশের মেলা দেখতে গিয়েছিল। সংসারে সে একা, দরিদ্র, কাজ করে দত্তবাবুদের বাড়ির, নিজের উপার্জনের টাকায় সে এই প্রথম মেলা দেখতে যায় এবং একটি নকল সোনার আংটি কেনে। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে তার মনে হয় সে ভীষণ একা, তার পরিচয় হয়ে যায় তারই সমবয়সী একটি পুরুষের সঙ্গে। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে ভাব জমে, তারা নাগরদোলায় চাপে, চিনা সার্কাস দেখে। মনে মনে খাদু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইলেও তার প্রতিরোধ একের পর এক ভেঙে পড়ে, দীর্ঘদিনের পুরুষ সঙ্গহীন উপবাসী মনের কাছে। পুরুষটি রিক্সা ডেকে খাদুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। এই পর্বের গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের। এক মধ্যবয়সী নারীর দীর্ঘদিন উপবাসী থাকা হৃদয়ের পুরুষসঙ্গ কামনা এ গল্পটির বিষয়।

মাসিপিসি

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা এই গল্পটি দুই অসহায় নারীর প্রতিরোধের গল্প। আহ্লাদীর স্বামী তার উপর অত্যাচার করে এবং লাথি মেরে আহ্লাদীর গর্ভপাত করায়। স্বামীর ঘর ছেড়ে আহ্লাদী বাপের বাড়িতে চলে আসে। দুর্ভিক্ষের দিনে না খেতে পেয়ে আহ্লাদীর বাপ-মা-ভাই মারা যায়, বেঁচে থাকে শুধু দুই বৃদ্ধ মাসি-পিসি। তার দিনান্ত পরিশ্রম করে, ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, শাকসব্জী বাজারে বিক্রি করে দিন চালায়। দুই মাসি-পিসির মধ্যে ঈর্ষা থাকলেও, আহ্লাদী আসার পরে, আহ্লাদীকে আশ্রয় করে তাদের মধ্যেকার ঈর্ষা দূর হয়ে যায়। আহ্লাদীকে নিয়ে মাসি-পিসি বাঁচার স্বপ্ন দেখে। প্রতিকূল পরিবেশের হাত থেকে আহ্লাদীকে রক্ষা করার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। আহ্লাদীর স্বামী আহ্লাদীকে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু মাসি-পিসি আহ্লাদীকে আর শ্বশুরবাড়িতে পাঠায় না। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের ভয়ে। আহ্লাদী আবার সন্তান সম্ভবা হয়, মাসিপিসির কল্পনায় নতুন অতিথিকে ঘিরে নানা স্বপ্ন জেগে ওঠে। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কিছু অর্থবান লোক — জমিদার, পুলিশ, গুণ্ডারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায়। আহ্লাদীর দিকে নজর পড়ে এই গুণ্ডা বদমাশদের। চৌকিদার পুলিশ নিয়ে এসে মাসি-পিসিকে দারোগার কাছে যেতে বলে। মাসি-পিসি বুঝতে পারে সেই সুযোগ গুণ্ডা বদমাশরা আহ্লাদীর উপরে অত্যাচার চালাবে। হাতধোয়া ও কাপড়ছাড়ার নাম করে তারা ভেতরে যায় আর ধারালো বঁটী কাটারি নিয়ে এসে তাড়া করে। চিৎকার করে লোক জড়ো করে। মাসি পিসি জানে আবার আক্রমণ আসবে তাই হাতের কাছে দা-কাটারি বঁটি নিয়ে তারা প্রস্তুত থাকে।

অমানুষিক

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা এই গল্পটিতে ছিদাম নামের একটি যুবকের করুণ পরিণতি দেখানো হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ঘটি, বাটি, বাস্তুভিটেটুকুও তাকে ললিতবাবুর কাছে বাঁধা দিতে হয়।

শেষকালে আর কোনো উপায় না দেখে ছিদাম শহরে যায় বাড়িতে বৃদ্ধা মা-স্ত্রী-রুগ্ন শিশুপুত্রকে ফেলে রেখে। শহরে সে নানারকম চেষ্টা করে কিন্তু উপার্জনের কোনো পথ পায় না। বেশ কিছুদিন পরে সে পুনরায় গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। ফিরে এসে দেখে —

> বাড়ি তার নেই, বেদখল হয়ে গেছে... বাড়ির সামনের শিউলি গাছটা আজও ঝাকিয়ে উঠেছে, দেখে আর সাবান-কাচা তাঁতের কোরা রঙিন শাড়ি পরা কুন্তাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ছিদাম থ বনে যায়। কলসী কাঁখে ঘাটেই কুন্তা যাচ্ছিল, আগে যেমন যেত। ... চেহারা ফিরেছে কুন্তার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুন্তাকে। এ বড়ো অদ্ভুত কাণ্ড, নয়কি! বিয়ের সময়কার রোগা পেটকা মেয়েটা ছ-সাত বছর যতদিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাঁকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্ধানের সময়টাতে সে মরার বদলে পুরন্ত বাড়ন্ত যুবতী হয়ে গেছে।[১৭]

ললিতবাবুর আশ্রয়ে কুন্তা এখন ভালোই আছে, তার দেহে আনন্দ ও যৌবনের ছাপ স্পষ্ট। ছিদামের মনটা শুকিয়ে যায়, সে বিভ্রান্ত বোধ করে এবং চলে যেতে চায়। সেদিন ললিতবাবু আসবেনা জেনে ছিদাম কিছুক্ষণ বসে থাকে, তামাক চেয়ে কুন্তার কাছে সিগারেট পায়। এমন সময় হঠাৎ ললিতবাবু এসে পড়লে ছিদাম পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। গল্পটি মানবিক বেদনার কাহিনি। দুর্ভিক্ষের কবলে কিভাবে ছিদামের ঘরবাড়ি, স্ত্রী পর্যন্ত অন্য লোকের হয়ে গেল, নিজের ঘরে ফিরেও সে আশ্রয় পায় না, পথের ভিখারির মতো আবার পথে তাকে হারিয়ে যেতে হয়।

পেটব্যাথা

এই গল্পটিও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা। আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে ভৈরব তার ছাগলটিকে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বেশি দাম পাবার জন্য। শেষরাতে সে ছাগলটিকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হয়। দুর্ভিক্ষের কষ্টের দিনগুলো সে কোনোরকমে কাটিয়ে উঠেছে, শুধু মেয়েটাকে যা বাঁচাতে পারেনি। এবার মাঠে ফসল হয়েছে ভালো, কিন্তু দিনগুলো আর কোনোমতে চলে না। তাই সে ছাগলটিকে বিক্রি করতে যায়। ফেরার সময় ছাগল ব্যবসায়ী কৈলাস তার দলবল নিয়ে ভৈরবকে আক্রমণ করে, সে প্রতিবাদ করলে পেটে লাথি মেরে সব টাকা কেড়ে নেয়। গ্রামের লোকেরা ভৈরবকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার কৈলাসের কথা শুনে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয়, তার পেটের যন্ত্রণা আসলে অসুখ থেকে। দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রামের মানুষগুলি কৈলাসের উপরে ক্ষুব্ধ ছিল, আজ তারা আরো খেপে যায় এবং কৈলাসকে পিটিয়ে সেই ডাক্তারের কাছেই হাজির করে। গল্পটির মধ্যে দুর্ভিক্ষকালীন সাধারণ মানুষগুলির কষ্ট, অসহায়তা এবং সেইসঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ছবি তুলে ধরেছেন মানিক।

শিল্পী

যুদ্ধের সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন হয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে কাপড় বোনার সুতোও চোরাকারবারিদের চক্রান্তে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ছিল না। মদন তাঁতির জীবিকা তাঁত বোনা। তার হাতের কাজ খুব প্রশংসা পায়, তাই সে শিল্পী। চোরাকারবারি ভুবন অনেক বেশি দামে তাঁতিদেরকে মোটা সুতো দেয় এবং অল্প মজুরিতে গামছা বুনিয়ে নেয়। সাধারণ দরিদ্র তাঁতিরা পেটের দায়ে অল্প মজুরিতে গামছা বুনতে বাধ্য হয়। কিন্তু মদন হার মানে না। সে না খেয়ে উপবাস করে থাকে কিন্তু গামছা বুনতে রাজি হয়না। মদনের ঘরে নিদারুণ দারিদ্র্য, তারা সন্তান সম্ভবা স্ত্রী উপবাসে কষ্ট পায়, শিশুগুলি খেতে না পেয়ে কাঁদে, কিন্তু মদন তবুও হার মানে না। মদনের ঘর থেকে রাত্রিবেলা তাঁত চালাবার শব্দ পাওয়া যায়, প্রতিবেশিরা ভাবে মদন গামছা বুনছে, পরদিন সকালে সবাই কৌতূহল নিয়ে ছুটে আসে, মদন তাদের দেখায় তার তাঁত কলে কাপড় নেই। আসলে মদন কোনো কাপড় বা গামছা বোনেনি, শুধু হাত-পায়ের খিঁচ ছাড়াবার জন্য সে এমনি এমনি তাঁত চালিয়েছে সারারাত। গল্পটিতে যুদ্ধকালীন সময়কার চোরাকারবার ও অসাধু ব্যবসায়ীদের স্বরূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি একজন শিল্পীর আত্মসম্মান না হারানোর তীব্র সংকল্প ও মানবিকতাবোধ আমাদের মুগ্ধ করে।

কংক্রিট

রঘু সিমেন্ট কারখানায় কাজ করে, তার গ্রামের বেন্দাও সেই কারখানার শ্রমিক। কারখানার মালিক সিমেন্টের সঙ্গে গঙ্গামাটি মেশায়, বেন্দা মালিকের অসাধু চক্রের সাহায্যকারি এবং দালাল। কেষ্ট বাতাপি নামের একটি শ্রমিককে বেন্দার সাহায্যে মালিক হত্যা করে। রঘু সেই ঘটনা দেখে ফেলে কিন্তু তারই গ্রামের বেন্দার কথা ভেবে সে চুপ করে থাকে। কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ আগে থেকেই ছিল, কেষ্ট বাতাপির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা শুধু চায় এই হত্যাকাণ্ডের একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। রঘুর মুখ বন্ধ করার জন্য মালিক পক্ষ বেন্দার সাহায্যে রঘুকে মোটা টাকা ঘুষ দিতে চায়। রঘুর বিবেকবোধ জাগ্রত হয়, সে বুঝতে পারে তাকেও মালিকপক্ষ দালাল চক্রে টেনে নিতে চাইছে, পরে তাকেও নানান অসাধু কাজ করতে হবে। সে বুঝতে পারে আর চুপ করে থাকলে চলবে না, এই মুহূর্তে গিয়ে সবার সামনে জানিয়ে দিতে হবে হত্যাকাণ্ডটির ঘটনার কথা। এই গল্পে আমরা পুঁজিপতি মালিক শ্রেণির হীন চক্রান্ত ও জঘন্য নীচতার পরিচয় পাই, যারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে মানুষ খুন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।

রিক্সাওয়ালা

রিক্সার ভাড়া বৃদ্ধির খবর দিয়ে গল্পটির শুরু হলেও এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট কাহিনি নেই। যুদ্ধের বাজারে, জিনিসপত্রের দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির বাজারে ভাড়া বৃদ্ধির প্রসঙ্গ, রিক্সাওয়ালাদের মানবিক ব্যবহার,

রিক্সাওয়ালাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের ও সংগ্রামের নানান টুকরো টুকরো ছবি এই গল্পে মানিক তুলে ধরেছেন।

প্রাণের গুদাম

যুদ্ধের সময়কালের পটভূমিতে লেখা এই গল্পটিতে কালোবাজার ও মজুতদারদের চিত্র ধরা পড়েছে। সরকারি গুদামের কর্মী শশাঙ্ক গুদামে মজুত তেত্রিশ হাজার টন খাদ্যশস্য দেখে ভাবে, এই দুর্ভিক্ষের বাজারে মানুষজন অন্তত না খেয়ে মরবে না। শশাঙ্কের কাজ হিসাব রাখার এবং অর্ডার এলে মাল বের করে দেওয়ার। অবশ্য গুদামে অনেক মাল পচে নষ্টও হয়। শশাঙ্কের জামাই একজন চোরাকারবারির এজেন্ট, সে শশাঙ্ককে প্রস্তাব দেয় কিছু মাল গুদাম থেকে সরিয়ে এনে কালোবাজারে চালান দিয়ে মোটা টাকা রোজগার করবার। দরিদ্র হলেও সৎ বিবেকবান শশাঙ্ক জামাইয়ের প্রস্তাবে রাজি হয় না। তখন শশাঙ্কের জামাই বড়ো অফিসারকে হাত করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং চোরা কারবারের ব্যবস্থা পাকা করে আসে। শশাঙ্ক দেখে জামাই মোটা টাকা লাভ করে তার বাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করেছে। মানিক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যুদ্ধের বাজারে চোরাবাজারি, কালোবাজারের চক্রান্তে মানুষের নষ্ট মূল্যবোধ ও অসৎ সুযোগ সন্ধানী মানষিকতার নিখুঁত ছবি।

ছেঁড়া

ধীরেন ডাকবিভাগে কাজ করে, শহরে থাকে। গ্রামে তার সংসার আছে। বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী ফুলু, ছেলে শুনু, রুগ্ন অবিবাহিত বোন আর মা-বাপ মরা ভাগ্নে পচা। বৃদ্ধদাদু চায় পচা ভালো স্কুলে পড়ে ভালো ইংরেজি শিখে একটা চাকরি পাবে। যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন পাওয়া যায় না, তাই স্কুল ফিরে এসে পচা বিকেল বেলাতেই পড়তে বসে। ফুলু প্রতীক্ষা করে প্রবাসী স্বামীর জন্য। এই গল্পে একটি দরিদ্র পরিবারের ছবি আমরা পাই। একদিন ধর্মঘটে কাজ বন্ধ থাকলে ধীরেন দীর্ঘদিন পরে বাড়ি আসে। কিন্তু পরে সে অনুতপ্ত হয় এই ভেবে যে ধর্মঘটে তারও যোগ দেওয়া উচিৎ ছিল। তাই রাত শেষ হওয়ার আগেই সে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আবার কর্মস্থলের দিকে রওনা হয়। পচার স্কুলে মাইনে বাড়ানোর প্রতিবাদে ছাত্ররা দুদিনের ধর্মঘট ডেকে বসে। পচাকে জোর করে স্কুলে পাঠাতে চাইলেও সে মামার সঙ্গে ধর্মঘটে সামিল হতে যায়। ধীরেন হাত ধরে পচার। মানিক এই গল্পে দুই প্রজন্মের মধ্যে প্রতিবাদের সুরটি বেঁধে দিতে চেয়েছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দুর্ভিক্ষ মহামারিতে আক্রান্ত, দাঙ্গা পীড়িত, ইংরেজদের অত্যাচারে নির্যাতিত ১৯৪৫-৪৬ সালে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা ও মানুষের জীবনযন্ত্রণার নানান ছবি মানিক বর্তমান গ্রন্থের গল্পগুলির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই সেই সময়কার বাস্তব ও জীবন্ত ছায়াছবি।

নাটক-১ : ভিটেমাটি

ভিটেমাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং তেইশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৩, প্রকাশক স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা - ৪ + ৯৬, দাম দেড় টাকা।[১৮]

ভিটেমাটির প্রতি মানুষের টান আ-জীবন। এই মাটিতেই আমাদের জন্ম, তাই চিরবাসনা থাকে এই মাটিতেই যেন আমরা মরতে পারি। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে মানুষকে ছাড়তে হয় ভিটেমাটি, আশ্রয় নিতে হয় পথে প্রান্তে, শহরে ফুটপাতে, অলিতে গলিতে। বাংলাদেশে এ দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৪৪ -এ, দেখেছি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ পশুর মতো কিভাবে কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। মানিক শিশুকাল থেকেই গ্রামজীবন এবং ভিটেমাটির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। নাটকে ছোটোলাল চরিত্রের মুখ দিয়ে মানিক তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন —

> ভিটেমাটির মায়া এদেশে সংস্কারের মতো, মানুষের অস্থি মজ্জায় মিশে আছে। সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদ্বীপ জ্বলবে না ভাবলে তাদের বুক কেঁপে যায়। শহরের মানুষ বুঝতে পারেনা, তাদের ভাড়াটে বাড়িতে বসে, বড়োজোর একপুরুষের তৈরি বাড়িতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।[১৯]

ভিটেমাটি নাটকটির মধ্যে একদিকে আছে ভিটেমাটির প্রতি মানুষের প্রাণের সম্পর্ক, অপরদিকে আছে গণজাগরণের ইঙ্গিত। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় ছোটোলাল ও মধু চরিত্রদুটির মধ্যে। মধু সাধারণ গ্রাম্য খেটে খাওয়া অশিক্ষিত মানুষ, কিন্তু স্বাধীনতাবোধ, ভিটেমাটির প্রতি টান, বাপ-মা-বোনের প্রতি কর্তব্যবোধ, দেশের মানুষের প্রতি সহানুভূতি তার আছে। তাই সে অনায়াসেই প্রেমিকা পদ্মাকে ত্যাগ করতে পারে। বলতে পারে তার মুখের উপর —

> তুই মেয়ে মানুষ, বাপের ঘরে বড়ো হয়ে সোয়ামীর ঘরে চলে যাস, ঘর দোর জমির দরদ তুই কি বুঝবি ? বেড়া থেকে একটা কঞ্চি কেউ খুলে নিলে টের পেয়ে যাই। ক্ষেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে। সব ছেড়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে যাক, একা আমি আমার ক্ষেত খামার ঘরবাড়ি, গাই বাছুর আগলে গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।[২০]

এই মাটির সঙ্গে মধুর সম্পর্ক নাড়ীর টানের। তাই মাথা নেড়ে প্রেমিকা পদ্মাকে সে জানায় — আমার যাওয়ার উপায় নেই। এই অশিক্ষিত গাঁয়ের সাধারণ মানুষটির কি অসাধারণ কর্তব্যবোধ। কোনো অবস্থাতেই কোন লোভ, কোনো স্বপ্ন, এমনকি প্রেমিকা পদ্মার জন্যও সে তার ভিটেমাটি ত্যাগ করতে পারেনা। মধু ভালোভাবেই জানে যে, বিপদ আসছে, এই বিপদ থেকে তার নিজের রেহাই নেই, তবুও

তার বিশ্বাস, বিপদের মোকাবিলা করবার মতো শক্তি ও সৎসাহস তার আছে। দরকার হলে সে প্রাণ দিতে পারবে, তবু ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। কারণ এই ভিটেমাটি মধুর কাছে মায়ের মতো, আবার লক্ষ্মীর মতো। গ্রামের আকাশ-বাতাস, ধূলো-মাটির সঙ্গে মধুর জীবন গাঁথা হয়ে গেছে। যেকোনো বিপদ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছে তুচ্ছ। এই সহজসরল গ্রাম্য মানুষটির মধ্যে আছে দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। শুধু নিজে বাঁচা নয়, অপরকেও বাঁচানোর শিক্ষা সে এই ভালোবাসা থেকেই অর্জন করেছে। গ্রামের মানুষেরা শহরের মানুষদের মতো নকল অভিনয় করে না, তিন টাকা আয় আর পাঁচ টাকা ওজনের কথা বলে না, বিপদ দেখলে নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে লুকিয়ে পড়ে না। গ্রাম্য চাষি মানুষ মধু যেকোন বিপদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তাই সে বলে —

> যেমন বন্যা, তেমনি বাঁধ না হলে কি ঠেকানো যায়। বাঁধ বন্যায় ভেসে যায়। তবে সময় আসবে, বাঁধ আমরা বেঁধে তুলবো। সবাই মিলে হাত লাগাবো। সময় আসুক... এমন অবস্থা কি চলতে পারে। সবাই এক জোট হবে, হেথাহোথা ছাড়াছাড়া ভাবে নয়, সব ঠাঁয়ে।[২১]

আসন্ন বিপদ থেকে, শত্রুর হাত থেকে নিজের গ্রাম ও দেশকে বাঁচাতে গেলে সবাইকে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে,— একথা অশিক্ষিত মধু সহজেই ঘোষণা করতে পারে। ইতিমধ্যে মার্কসবাদী ভাবনায় দীক্ষিত মানিক উপলব্ধি করেছেন যেকোনো আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গণ-জাগরণ বা গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। এই নাটকটির অবয়বে এবং চরিত্রদের মধ্যে তাই তিনি জাগিয়ে তুলেছেন গণ-চেতনা। ব্যক্তিজীবনেও মানিক নানারকম গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মানিক লক্ষ্য করেছিলেন আমাদের সমাজের নানা অসঙ্গতির দিকগুলি — ধনী-দরিদ্র, বড়লোক-ছোটোলোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের পার্থক্য। মানিক নিজেই দারিদ্র্য এবং দুঃখ-বেদনা নিয়ে পাল ছেঁড়া নৌকার মতো ভাসতে ভাসতে স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের হাত ধরে কখনো কলকাতার উত্তরে বা দক্ষিণে ছুটে বেড়িয়েছেন। চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও ইংরেজ সরকারের প্রবল অত্যাচার দেখে মানিক এই সময়ে ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। নাটকের মধ্যে সময়ের এই চিত্র মানিক তুলে ধরেছেন।

নাটকে আমরা দেখি ব্ল্যাকমার্কেটার নকুড় দুর্দিনে সমস্ত খাদ্য মজুত করে লুকিয়ে রেখে, চড়া দামে বিক্রি করে বেশ পয়সা কামাচ্ছে। তাই ছোটোলাল নকুড়কে ডেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, —

> লোক এমনিতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার উপর তুমি যদি এভাবে চাল, ডাল, তেল, নুন আটকে রেখে বেশি দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্বহ করে তোল, একদিন খেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে, সেদিন তোমার গোলা লুঠ করবে, তোমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।[২২]

মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানিক তাঁর লেখার মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন — অধিকার চাইলে অধিকার পাওয়া যাবে না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। মার্কসীয় সাম্যবাদে বিশ্বাসী মানিক ভাবিত হয়েছেন — মানুষ কেন

তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ? দেশে খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষ কেন দুমুঠো খেতে পাবে না ? কেন মধুর মতো সাধারণ মানুষেরা সমাজে রামঠাকুর বামুন বা নকুড়ের মতো অসাধু ব্যবসায়ির কাছে চিরকাল ছোটো হয়ে থাকবে ? এই নাটকে মানিক নিজেই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করতে চেয়েছেন — গ্রাম ছেড়ে যারা চলে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, যাওয়ার কারণ কি ?

১৯৪৬ সালের অভিশপ্ত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রসঙ্গ এই নাটকে আমরা পাই। এই দাঙ্গা কলকাতাতে শুরু হয়ে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। তাই মানুষের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পালিয়ে গিয়ে বিপদ থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। নাটকে দেখি, কাদের মিঞা যখন আর গ্রামে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না — তখন ছোটোলাল তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, "কিসের ভরসায় যাচ্ছ ? কদমসাই গেলে কি জান বাঁচবে, মেয়েদের ইজ্জত বজায় থাকবে তাতে ? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমাদের মেয়ে বৌ যেখানে হেঁটে যাবে, ওরা সেখানে যেতে পারবেনা ? সেখানে বিপদ তোমাদের বেশি হবে। ... তার চেয়ে নিজের গাঁয়ে থাকা তো ঢের ভালো। বিপদে আপদে গাঁয়ের লোক দশটা ছুটে আসবে।"[২৩]

এই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন মানিক। মানুষের মধ্যে শান্তি এবং স্থিরতা বজায় রাখার জন্য তিনি নিজে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তার জন্য তাঁকে বিপদের মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। নিজের ডায়েরিতে সেদিনকার ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যায়ের শুরুতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের খবর দিতে গিয়ে আমরা সেসব কথা বলেছি। দাঙ্গার সময়ে কোনো গোলমাল শুরু হলে শাঁখ বাজিয়ে বা বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে সজাগ করে দেওয়ার প্রসঙ্গ আমরা এই নাটকেও দেখতে পাই —

> বাঁশি বলে গেরাহ্যি হোল না বুঝি ? আমি এটা মুখে তুললে কি হবে জান ? এদিকে ক্ষেন্তি, গোকুল, পদীপিসি, মনোরমা ওদিকে ছুতোর বৌ, মাখনের মা, আন্নাকালি, আর এই পশ্চিমে বিধূ, কৈবতী, মালতী এরা সবাই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধা বাঁশি মুখে তুলে ফুঁ দেবে, নয়তো শাঁখ বাজাবে, সেই বাঁশি শুনে দূরে দূরে যত বাড়ি আছে সব বাড়িতেই বাঁশি আর শাঁখ বাজতে থাকবে। সারা গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ যারা আছে দু-দশজন তারা লাঠি-সোটা নিয়ে আর মেয়েরা আঁশবটি নিয়ে ছুটে এসে তোমাদের দফা নিকেশ করবে।[২৪]

দাঙ্গার সময়কালে সমূহ বিপদের কথা বুঝতে পেরে সমস্ত শ্রেণির মানুষ মানবতাকে রক্ষার জন্য এক হয়েছিল। রামঠাকুরের মতো ব্রাহ্মণ, মধুর মতো নিম্নশ্রেণির কৃষক, পদ্মার মতো সাধারণ ঘরের মেয়ে, ছোটোলালের মতো শিক্ষিত মানুষ সবাই ভেদাভেদ ভুলে, জাত-পাত ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই নাটকে আমরা নারী জাগরণের প্রসঙ্গটিও লক্ষ্য করি। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে নারী জাগরণ ঘটেছিল তার প্রভাব এখানে আমরা পাই। বিপদে-আপদে নারীরা একদিকে যেমন পুরুষের কাজে সহায়তা করেছে, অপরদিকে নিজেরাও সমস্ত বিপদ, সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে পথে নেমে

এসেছিল। এই বিপদের দিনে সংসারের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকলে যে আর চলবে না, পথে বেরিয়ে এসে তাদেরও হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র। তাই সুবর্ণের উদ্দেশ্যে ছোটোলালকে বলতে শুনি —

> চোখ-কান বুজে থাকলে... আর চলবে না সুবর্ণ। কি হচ্ছে আর কি হবে জেনে বুঝে নিজেদের বাঁচবার উপায় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে। পাগলা কুকুর কামড়াবেই, গাছে চড়াটা শিখে রাখা দরকার।[২৫]

অন্যদিকে সুভদ্রার মুখে আমরা শুনি মেয়েদের সাহসের কথা —

> মেয়েদের নাকি দাঁত আছে, নখ আছে। মেয়েরা নাকি শিং মাছের মতো ধরতে গেলে পিছলে পালাতে পারে। ডোবার পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, বালিতে গর্ত খুঁড়ে আর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে মেয়েরা নাকি এমন করে লুকোতে পারে যে পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে গেলেও তাদের একজনও টের পায়না।... এত করেও যদি নিজেকে বাঁচানো না যায় মরে যাওয়াটা আর এমন কি কাজ — ছেলে খেলার ব্যাপার। দুটি ছেলে মানুষ বৌ বিষ মেশানো সিঁদুর কৌটায় ভরে সবসময় আঁচলে বেঁধে রাখে... মেয়েরা আত্মরক্ষার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা প্রাণ দিতে রাজি, কিন্তু কোনোমতেই তাদের নারীত্বকে বিসর্জন দেবে না।[২৬]

দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ এবং দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত এই নাটকে গ্রামের মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় অবস্থাও তাদের ভিটেমাটির প্রতি মমতা বর্ণিত হয়েছে। দাঙ্গার সময় যখন ভিত গ্রামের মানুষেরা দলে দলে ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে, তখন একদল লোভী স্বার্থপর মানুষ এই সব অসহায় মানুষদের ভিটেমাটি, জমিজায়গা দখল করে নিতে অথবা জলের দরে কিনে নিতে চেয়েছে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবক ছোটোলাল গ্রামের মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, যা সেদিনকার মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য করেছিল। মার্কসবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত মানিক সচেতনভাবেই তাঁর সাহিত্যে সমকালীন সমস্যা এবং সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃপৃ. ৯১-৯২।

২। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ৫ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৪৪৩।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬।

৪। 'চিন্তামণি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪।

৬। সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৮।

৭। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫।

৮। ‘আজকালপরশুর গল্প, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

৯। ‘দুঃশাসনীয়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

১১। ‘রাঘব মালাকর’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮।

১২। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮।

১৩। ‘প্যানিক’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২।

১৪। ‘সাড়ে সাত সের চাল’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০।

১৫। কৃষ্ণা বসু, *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ,* প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ১১২।

১৬। ‘প্রাণ’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১।

১৭। ‘অমানুষিক’ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

১৮। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪।

১৯। ‘ভিটেমাটি’ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

১৯৪৭

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৩৯তম বছর। ভারতমাতার মুক্তির বছর। ভারতবাসীর জীবনে পরাধীনতার অন্ধকার মুছে ফেলে নতুন সকালের বছর। তেভাগা আন্দোলন ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং বর্গাচাষিকে জমির মালিক করার দাবি জানিয়েছিল আন্দোলনকারীরা। দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, যশোর, চব্বিশপরগণায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময়ে ময়মনসিংহ-এর উপজাতি কৃষকেরা টাংকা আন্দোলন শুরু করে। হাউস অফ কমন্স-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ১৯৪৮এর জুনের আগে দায়িত্বশীল ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার কথা ঘোষণা করলে ওয়েভেল খুশি হননি। দিল্লিতে হিন্দু মহাসভা ওয়ার্কিং সভার বৈঠকে অখণ্ড ভারতের কথা ঘোষণা করে এবং 'পাকিস্তান বিরোধী দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দানের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের দুটি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিকল্পনা প্রকাশ করলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যতিত আর প্রায় সকলই দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। গান্ধিজি এই পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন —"So long as I am alive, I will never agree to the partition of India, nor will I , if I can help it, allow Congress to accept it." শেষ পর্যন্ত গান্ধিজি তাঁর মত পরিবর্তন করে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাউণ্ট ব্যাটেন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে বসে ভারত ভাগের পরিকিল্পনাটি চূড়ান্ত করেন। পরিকল্পনাটি এই রকম ছিল — হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হবে। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশকে ভাগাভাগী করে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানকে দেওয়া হবে। জাতীয় কংগ্রেস ভারত ভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা খান আবদুল গফ্ফর খান এবং তাঁর লাল কুর্তা দল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে দুজন কংগ্রেস এবং দুজন লীগ সদস্য নিয়ে Boundary Commission ভারত ভাগের প্রস্তাব ঘোষণা করে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির গণভোটের রায়ের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিল' পাশ হয়। এই আইন অনুসারেই ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। যেসব অসংখ্য বিপ্লববাদী ভারতসন্তান দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান করেছিলেন তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য ও ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বিপর্যস্ত হল দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে।

জানুয়ারি ২ গান্ধিজি দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি পরিদর্শন করেন।

জানুয়ারি ৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জানুয়ারি ৭ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য গান্ধিজি মুসলমানদের পরমসহিষ্ণু হবার আহ্বান জানান।

জানুয়ারি ১৩ মুসলিম সদস্যদের আপসবিরোধী মনোভাবের জন্য বল্লবভাই প্যাটেল ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন।

জানুয়ারি ১৫ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন।

জানুয়ারি ২২ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্রান্ত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মনসিংহ জেলায় ছাত্র আন্দোলনের সময় অমলেন্দু ঘোষ পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

জানুয়ারি ৩১ করাচিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত একটি দীর্ঘ প্রস্তাবে গণপরিষদের গঠন কার্যক্রমকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ৫ কংগ্রেস বড়লাটের কাছে দাবি জানায় মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে যেন বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু বড়লাট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

ফেব্রুয়ারি ২০ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করেন ১৯৪৮-এর জুনের আগে দায়িত্বশীল ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। খাঁপুর গ্রামে পুলিশ ও জোতদারদের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় কৃষকরা।

মার্চ ২২ লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসেবে ভারতে আসেন।

মার্চ ২৪ ভারতের বড়লাট হিসেবে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মার্চ ৩১ গান্ধিজি বলেন, একমাত্র তাঁর মৃতদেহের উপরই ভারত ভাগ হতে পারে, তিনি জীবিত থাকতে ভারত ভাগ হতে দেবেন না।

এপ্রিল পাকিস্তানের জন্য জিন্না পুরোপুরিভাবে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ দাবি করেন।

এপ্রিল ১৯ লর্ড মাউন্টব্যাটেন জানান 'পাকিস্তান রাষ্ট্র অবধারিত।'

এপ্রিল ২৮ বরোদা, কোচিন, জয়পুর, বিকানীর, পাতিয়ালা এবং রেওয়া রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরা গণপরিষদে যোগ দেয় এবং গণপরিষদে ভারত বিভাগের নীতি গৃহীত হয়।

মে ১০ ভারত বিভাগের পরিকল্পনা সংশোধিত আকারে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে দিয়ে অনুমোদন করে মাউণ্টব্যাটেন ভারতে ফিরে আসেন।

মে ১১ অখণ্ড সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা নিয়ে সোদপুরে সুরাবর্দি গান্ধিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জুন ২ লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগের কথা ঘোষণা করেন।

জুন ৩ ভারতের রাজনৈতিক দলের নেতারা ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া ভারত বিভাজন প্রস্তাব মেনে নেন। আলোচনায় ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, মহম্মদ আলি জিন্না। মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

জুন ৪ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন — 'ভারত ভাগ হিন্দুদের পক্ষে কখনও সমর্থনযোগ্য নয়।'

জুন ২০ বাংলা ভাগের পক্ষে 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জুন ২৩ পাঞ্জাব বিধান পরিষদে পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জুলাই ২	লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগের খসড়া বিল দেশের মানুষের সামনে পেশ করেন।
জুলাই ৪	হাউস অফ কমনসে ‘ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স বিল’ গৃহীত হয়।
জুলাই ৫	ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ হয় এবং অনুমোদন লাভ করে।
জুলাই ১৫	হাউস অফ লর্ডসে ‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স বিল’ গৃহীত হয়।
জুলাই ১৮	‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স বিল’ রাজার সম্মতি লাভ করলে এই আইনে ১৫ আগস্ট থেকে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।
জুলাই ১৯	ভাইসরয় হাউস থেকে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।
জুলাই ২২	ভারতের গণপরিষদ রাষ্ট্রীয় প্রতীক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভারতের পতাকার বর্তমান রূপটির জন্ম হয়।
জুলাই ২৭	গান্ধিজি দেশীয় রাজাদের ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানান।
জুলাই ৩১	কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় কুড়িজন নিহত এবং একশজন আহত হয়।
	মুসলমান ও শিখদের কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি, অমৃতসর প্রভৃতি শহরে ব্যাপক হত্যালীলা হলে পাঞ্জাবে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হয়।।
	কংগ্রেস, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের হিন্দু প্রধান অঞ্চলসমূহ যেন ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই দাবি জানায়।
আগস্ট ১১	পাকিস্তানের গণপরিষদ মহম্মদ আলি জিন্নাকে সভাপতি নির্বাচিত করে। গণপরিষদ জিন্নাকে কায়েদ-এ-আজম বা মহান নেতা আখ্যা দেয়।
আগস্ট ১৪	পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দিল্লিতে গণ পরিষদ অধিবেশন বসলে গণপরিষদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করে।
	পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন যথাক্রমে মহম্মদ আলি জিন্না ও লিয়াকত আলি খান।
আগস্ট ১৫	‘ভারত ডোমিনিয়ন’ এবং ‘পাকিস্তান ডোমিনিয়ন’ এই দুইভাগে বিভক্ত করে ব্রিটিশ সরকার ভারত ডোমিনিয়নের শাসন ক্ষমতা দেয় কংগ্রেসের হাতে ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের শাসন-ক্ষমতা দেওয়া হয় মুসলিম লীগকে। স্বাধীন ভারতের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও জুনাগড় তখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
আগস্ট ১৬	পশ্চিমবঙ্গে ডা: প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও তার মন্ত্রীসভার সদস্যরা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
আগস্ট ১৭	ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ব্যাটেলিয়ান স্বদেশে যাত্রা করে।
আগস্ট ২৯	বি. আর. আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান করে ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরির কমিটি হয়।
সেপ্টেম্বর ১	ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম প্রবর্তিত হয়।
অক্টোবর ৪	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৪র্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন কলকাতার ডেকার্স লেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সম্পাদক নির্বাচিত হন রমেন সেন।
অক্টোবর ২৬	কাশ্মীরের রাজা হরি সিং কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হন।
নভেম্বর ১০	ভারতীয় গণপরিষদ প্রথম ডোমিনিয়ন আইন সভা হিসাবে কাজ শুরু করে।

নভেম্বর ২১	স্বাধীন ভারতের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল সাড়ে তিন আনা। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৯০ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে প্রথম সভা শুরু হয়।
নভেম্বর ২৯	রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যালেস্তাইনকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার আহ্বান জানায়।
ডিসেম্বর ১৩	জওহরলাল নেহেরু ভারত স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র করার প্রস্তাব আনেন।
ডিসেম্বর ১৫	পূর্ব পাকিস্তানে *আনন্দবাজার* ও *স্বাধীনতা* পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অজিত দত্ত : *পুনর্ণবা* / অমরকুমার দত্ত : *মুক্তিপথের গান* / বিষ্ণু দে : *সন্দীপের চর* / রবীন্দ্রনাথ : *ভারত-তীর্থ, সঞ্চয়ণ* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *নতুন দিন* / সুকান্ত ভট্টাচার্য : *ছাড়পত্র*। **নাটক** —বিজন ভট্টচার্য : *অবরোধ* / তুলসী লাহিড়ী : *দুঃখীর ইমান* / দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাস্তুভিটা* / আশাপূর্ণা দেবী : *মিত্তির বাড়ি*। **উপন্যাস** — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *চিহ্ন, আদায়ের ইতিহাস* / বনফুল : *সপ্তর্ষি, স্বপ্নসম্ভব* / সুবোধ ঘোষ : *শতভিষা* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *মহানন্দা, স্বর্ণসীতা*। **গল্পগ্রন্থ** — জগদীশ গুপ্ত : *মেঘাবৃত অশনী* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *মুখোশ ও মুখশ্রী* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *ইমারত, শ্রীপঞ্চমী* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *খতিয়ান* / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *চাষাভূষা, সারেঙ*, নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *পতাকা*।

পত্রিকা প্রকাশ — *পূর্বাচল* : যতীন্দ্রমোহন বাগচী / *নাচ-গান* : সরোজ মিত্র, নিতাই বসু / *বর্তমান* : সরোজকুমার রায়চৌধুরী / *বঙ্গদর্শন* : কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় / *মশাল* : দিলীপ চৌধুরী, যোগীলাল হালদার/ *নবকল্লোল* : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীকুমার কৃষ্ণ বসু / *যুগদীপ* : বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ / *স্ফুলিঙ্গ* : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : হুমায়ুন আজাদ।

মৃত্যু : নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

জানুয়ারিতে নিজ উদ্যোগে টালিগঞ্জ সংস্কৃতি সংঘ নামে একটি পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ প্রতিষ্ঠা। এই সময় মানিক কমিউনিস্ট পার্টির কাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সভাসমিতিতে যোগদানের জন্য খুবই ব্যস্ত থাকছেন। দূর-দূরান্তের নানা জায়গায় সভাসমিতিতে তিনি যোগ দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারির শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে বরিশাল গমন। এপ্রিলে কলকাতা বেতারে স্বরচিত গল্পপাঠে অংশগ্রহণ। মে মাসে তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যুতে *স্বাধীনতা* পত্রিকায় লেখেন 'কবিও পেয়ে গেছে

নতুন যুগ'। পুজোর আগে প্রগতি লেখক সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ একযোগে এক অভূতপূর্ব দাঙ্গাবিরোধী মিছিলের ব্যবস্থা করে। সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হিন্দু মুসলমান নর-নারীর কাছে সেদিন শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলের দাঙ্গার আশঙ্কা বেশি সেই সব এলাকায় সেদিন মানিক, তারাশঙ্কর, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী প্রমুখেরা শান্তির প্রতি তাদের আস্থা জানিয়েছিলেন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। গণসাহিত্য শাখায় সভাপতির দায়িত্ব পালন।

জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *চিহ্ন* । আগস্টে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *খতিয়ান* । এই বছরের কোন এক সময়ে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *আদায়ের ইতিহাস* । সেপ্টেম্বর মাসে *শারদীয় স্বাধীনতা* পত্রিকায় ছাপা হয় *প্রতিভা* প্রবন্ধ এবং *শারদীয় বসুমতি*তে কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা *প্রথম কবিতার কাহিনি*।

প্রকাশিত গল্প: 'হারাণের নাতজামাই' (*পূর্বাশা*, জানুয়ারী), 'চৈতালী আশা' (*স্বাধীনতা*, এপ্রিল), 'ভূতরে গল্প' (*মৌচাক*, জুলাই), 'স্থানে ও স্তানে' (*পূর্ব্বাশা*, আগস্ট), সেপ্টেম্বরে শারদ সংখ্যাগুলোতে ছাপা হয় কয়েকটি গল্প: 'গায়েন' (*যুগান্তর*), 'ধান' (*সরাজ*), 'তথাকথিত' (*দেশ*), 'ছেলেমানুষী' (*ভারত*)। ডিসেম্বরে *পূর্বাশা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গল্প 'পেরাণটা'।

উপন্যাস-১ : চিহ্ন

চিহ্ন মানিকের পনেরতম উপন্যাস ও সাতাশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে প্রকাশকালের উল্লেখ ছিলনা। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় উপন্যাসটির প্রকাশকাল মাঘ ১৩৫৩। প্রকাশক বসুমতি সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ১৯৬। দাম তিন টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি দৈনিক বসুমতি পত্রিকায় ১৩৫৩ নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেন্দ্র করে সারাদেশে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত। গান্ধিজির ভারতছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর জাতীয় জীবনে যখন হতাশা নেমে এসেছিল, তখন সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং তাদের সংগ্রাম দেশবাসীকে নতুন করে আশা, বিশ্বাস ও ভরসার ভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে আত্মসমর্পণের ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। ১৯৪৫ এর নভেম্বরে দিল্লির লাল কেল্লায় আজাদহিন্দ বাহিনীর বিচার শুরু হয়। বাহিনীর তিন প্রধান সেনা নায়ককে দোষী সাব্যস্ত করা হলে সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে যায়। তাদের সমর্থনে এবং ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে কলকাতায় মিছিল বের হয়, সেই মিছিলকে ধর্মতলার মোড়ে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে এই দিন বিভিন্ন কলেজে সন্ধ্যায় ছাত্ররা মিছিল

করে এবং পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করে। ছাত্রদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর অন্ধকারে গুলি চালায় পুলিশ। গুলিতে দুজন ছাত্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু ছাত্ররা পিছু হাটেনি বরং প্রতিবাদ মিছিল আরো জোরদার হয়ে ওঠে। এই দিন সারারাত্রি এবং পরের দিন ছাত্ররা পথ অবরোধ করে কলকাতা শহরকে অচল করে দেয়। পরের দিন বিকেলে পুলিশ ব্যারিকেড তুলে নিতে বাধ্য হয়, এরপর কলকাতার রাস্তায় প্রায় তিনলক্ষ মানুষের শোভাযাত্রা বের হয়। স্বাধীনতার পূর্বে সেই অভূতপূর্ব জনজাগরণ ও ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানিক এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে কোন নির্দিষ্ট নায়ক-নায়িকা নেই, উপন্যাসের নায়ক প্রকৃত অর্থে রাজপথ। রাজপথের রাজনৈতিক সংগ্রামই এই উপন্যাসের প্লট রচনা করেছে। একটি চলমান ক্যামেরা যেন এই সংগ্রামের নানা টুকরো চিত্র ধারণ করে উপন্যাসের কাহিনিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে।

চিত্রগুলো নিম্নরূপ

ক. একুশ বাইশ বছরের যুবক গণেশ গ্রামের ছেলে। কলকাতায় বিদেশী মদের চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত একটি কোম্পানিতে সে কাজ করে। ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট দেখে সে পথে থমকে দাঁড়িয়ে ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই সময় পুলিশের গুলি লাগে তাকে। মৃত্যুর মুহূর্তে তার প্রশ্ন ছিল — এই বিশাল জনসমাবেশটি আর এগোবে না ?

খ. গুলিবিদ্ধ গণেশকে হাসপাতালে নিয়ে যায় কারখানার শ্রমিক বৃদ্ধ ওসমান। ওসমানের পুত্র হাবিব নিহত হয়েছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে। গণেশের মৃতদেহ যখন হাসপাতালের মর্গে, তখন তার বাবা-মা ছেলের খোঁজে কলকাতায় আসে। গণেশের বোন রাণি গ্রামে শাসকের ব্যভিচারের শিকার হলে সম্মিলিত গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করে এবং গ্রাম থেকে অন্যত্র পালানোর ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে তারা গণেশের কোনো সঠিক তথ্য পায়নি, বরং রাজনৈতিক অভিঘাতে কম্পমান এক অচেনা কলকাতায় এসে পড়ে তারা।

গ. হেমন্ত মেধাবী কলেজ ছাত্র, বাবা নেই, মায়ের আয়ে তাদের দুই ভাই ও এক বোনের পরিবারটি চলে। হেমন্ত দ্রুত পড়া শেষ করে একটা চাকরি নিয়ে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নেবে এমনটাই মায়ের ইচ্ছা। কিন্তু হেমন্তের সতীর্থ, রাজনীতি সচেতন সীতা চায়না হেমন্ত এভাবে পরিবার পালন করে একেবারে শেষ হয়ে যাক। কলকাতার আন্দোলিত রাজপথ হেমন্তকে আকর্ষণ করে, সভা ও মিছিলে যোগদান শেষে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরে সে। তার ভাই জয়ন্ত, বয়স তের বছর, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

ঘ. কিশোর রজত অনেকের সঙ্গে বসে থাকে রাজপথে। তার বোন শান্তি রাজনৈতিক কর্মী, সেও ধর্মঘটের মধ্যে আছে। এই সমাবেশে রজতের আসার কথা নয়, তাকে কেউ আসতে বলেনি, কিন্তু তার নির্ভিক কৌতূহলী কিশোর সত্তা একাত্ম হয়ে পড়েছে সহস্র মানুষের সংগ্রামে।

ঙ. রসুল কলেজ ছাত্র, দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের কৃষকদের মধ্যে রিলিফ দিতে গিয়ে চোরাকারবারী জমিদারের দ্বারা অত্যাচারিত। অবস্থান-ধর্মঘটকারীদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রসুলও আহত হয়। ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রসুল বসে থাকে, প্রচুর রক্তক্ষরণ তাকে দুর্বল করে দেয়। শিবনাথ তাকে নিয়ে হাসপাতালে যায়। আহত রসুলকে হাসপাতাল থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আবেগায়িত রসুল মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য গভীর রাতে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে বাড়িতে আসে।

চ. অক্ষয় ব্যাঙ্কে চাকরি করে, নিয়মিত মদ্যপান না করলে তার চলে না। মদ্যপান করতে গিয়েও সে বসে থাকে এবং ভাবে কিসের নেশায় তরুণ যুবক যুবতীরা পুলিশের গুলির সামনেও নির্ভয়ে এগিয়ে যায় ? শেষ পর্যন্ত সেও অবস্থানকারিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

ছ. অজয় চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানি। যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার চাকরি চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাকে চাকরি নিতে হয়েছে। পুরো সংসার তার উপরে নির্ভরশীল। তার বিবাহযোগ্যা বোন মাধুর পরনে এমন ছেঁড়া শাড়ি, যা দিয়ে লজ্জা নিবারণ হয়না। রাঁধুনির কাজ নিয়ে জীবিকা নির্বাহের পরিকল্পনা করে সে। এমন অভাবগ্রস্ত সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী অজয় পারিবারিক কর্তব্যবোধ অতিক্রম করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। চাকরি হারানোর ভয় সে পায় না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাকে সাহসী করে তোলে।

জ. জাতীয়তাবাদী নেতা বসন্ত রায়ের সহকারী অমৃত মজুমদার। বসন্ত রায়ের খ্যাতিতে সে ঈর্ষান্বিত হয়, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে সে তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নে পৌঁছতে পারেনা। রাজপথের আন্দোলনকারী ছাত্রদের প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সমর্থন নেই, কিন্তু নেতা হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে অমৃত মজুমদার বারবার আন্দোলনকারীদের কাছে যায়।

এরকম টুকরো টুকরো নানা গতিশীল চিত্র উপন্যাসটিকে সমগ্রতা দান করেছে। সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে রাজপথে ছাত্র-তরুণদের এক বিশাল শোভাযাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট ও পুলিশের বাধা দেওয়া, পুলিশের লাঠি চার্জ, গুলি, পিষে মারার হুমকি ইত্যাদি সবকিছু উপেক্ষা করে ধর্মঘটিরা রাতব্যাপী নিশ্চলভাবে রাজপথে অবস্থান করলে তাদের যে সাহস, দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠার প্রকাশ ঘটে — তাতে কোলকাতার সর্বস্তরের জনগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের মানুষের মনের গহ্বনে এই সংগ্রামের যে বিচিত্র অভিঘাত অনুভূত হয়, তারই ভাষ্য হয়ে উঠেছে এ উপন্যাস। একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিমনের যে পরিবর্তন সাধন, তার মর্মগাথা উপস্থাপনই এই উপন্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক।

মুহূর্তকালের জন্যেও পরিবারের কর্তব্যচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না যে হেমন্ত, মাতৃআজ্ঞাকে শিরোধার্য করে সবরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এড়িয়ে চলে যে হেমন্ত, বন্ধুমহলে ভালো ছেলে বলে উপহাসের

পাত্র হয় যে হেমন্ত, সে এই দিন মিছিলে অংশগ্রহণ করে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরেও, মায়ের অসম্মতি সত্ত্বেও সে পরের দিন আবার প্রতিবাদ মিছিলের উদ্দেশ্যে রওনা হয় —

> সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিলনা, সভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাইনি। এটা তবে কি রকম ব্যাপার হল ? হেমন্ত ভাবে।
> নিজের ব্যবহার বড় আশ্চর্য মনে হয় হেমন্তের নিজেরই কাছে, বিশেষত নিজের মনের চাল-চলন। সভায় গিয়ে দাঁড়াবার খানিক পরেই মন যেন বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে কোনো বিচার বিবেচনার হিসাব-নিকাশ না করেই বাতিল করে দিলে এতদিনকার কঠোরভাবে মেনে চলা রাজনীতি, এতদিন ধরে যা সে ভাবে এবং ভেবেছে আজ যেন ওভাবেও সব ভাববার দরকারটাই শেষ হয়ে গেছে একেবারে।[২]

ডানহাতে গুলিবিদ্ধ হয়েও রসুল এতটুকু দুঃখ পায়না, শুধু বলে: "বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না একহাতে কিন্তু।"[৩] রসুলের মা আমিনাও এই পরিবর্তনের অংশ হয়ে যায়। রসুলের মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ, সাহস ও সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের প্রশান্তি, তা তার মায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় —

> কে নিজের ছেলে, কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দুদণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে রসুলের মতোই সে তার চেনা জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ করা সন্তান।[৪]

নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত অক্ষয়ের মনোগত পরিবর্তনও তাৎপর্যবহ। স্ত্রীর কাছে সে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিল এইদিন মদ্যপান করবেনা। কিন্তু সন্ধ্যা যত নিকটতর হতে থাকে, প্রতিজ্ঞার বন্ধন তত শিথিল হতে থাকে। কিন্তু পথে বেরিয়ে তার ভাবনা বদলে যায় —

> অন্যদিনের চেয়ে বেশিই হয়তো আজ খেতাম সুধা, কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে-শোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনও ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কিসের নেশা ? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ওরকম নেশা হতে পারে, আমি তবে কেন বোকার মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি! এই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না।[৫]

পরিবর্তনের নানা চিত্র আঁকতে গিয়ে মানিক একটি রাজনৈতিক সত্যকে তুলে ধরেছেন, তা হল স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, মৃত্যুভীতি, পারিবারিক সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা প্রাধান্য

বিস্তার করে থাকে। কিন্তু এমন একটি সমষ্টিগত রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ মানুষ আর সংকীর্ণ স্বার্থসীমায় আবদ্ধ থাকে না, সমষ্টির সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। মিছিলের এক একটি লোক যখন বলে, আমরা তো একা নই, আমাদের সঙ্গে সবাই আছে। তখন বোঝা যায় এই রাজনৈতিক আন্দোলন মানুষের মনের মধ্যে কিভাবে পরিবর্তন এনেছে ১৯৪৫ এ কলকাতায় যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সেদিন ছাত্রদের সমর্থন করেছিল। ছাত্রদের সেদিন প্রধান দাবি ছিল পরাধীনতা থেকে মুক্তি। বলিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার কোন স্তরে পৌঁছালে তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, তাদের চেতনায় পরিবর্তন ঘটায়, তার বাস্তব চিত্র টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে মানিক তুলে ধরেছেন —

> চেতনার পরিবর্তন হয়েছিল বলেই হেমন্তের মতো বইমুখী ছাত্ররা জাতীয় আন্দোলনের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছিল। রসুলের হাত কাটা গেছে তবু তার মাকে বলতে শোনা যায় সব ছেলেদেরই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কর্মক্ষেত্রে ক্ষতি হবে জেনেও অজয় আন্দোলনের পরের দিন অফিসে না গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। অক্ষয় হোটেলে গিয়েও মদ্যপান করতে পারেনি। ছাত্র আন্দোলনের দুর্নিবার আকর্ষণে কলকাতার প্রতিটি মানুষ ঘর ছেড়ে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল। ... শুধুমাত্র মিছিলকে কেন্দ্র করে যে একটা উপন্যাস হতে পারে তা বাংলা সাহিত্যে মানিকই প্রথম দেখালেন। মিছিলের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের আরম্ভ, আর মিছিলের জয়ধ্বনির মধ্যে উপন্যাসের শেষ। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিক চিহ্ন, নতুন পদক্ষেপ। তাঁর এই উপন্যাস কেবল অসাধারণ নয়, বাংলা সাহিত্যে এক বিরল নিদর্শন। সেই সময়ের দেশীয় আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা আজও গণ-আন্দোলনের প্রেরণা।[৬]

একটি রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারি, কত বিচিত্র ও ব্যাপক হতে পারে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ *চিহ্ন* উপন্যাসে সমগ্রতা লাভ করেছে। রাজনৈতিক আন্দেলন ও তার প্রতিক্রিয়া কেবল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ঘটনাধারায় নয়, মানুষের জীবন ভাবনা ও জীবনোপলব্ধিতে রেখে যায় এক গভীর পরিণাম চিহ্ন। মানুষের চেতনালোকের স্বাভাবিক গতিতে সঞ্চারিত হয় নতুন আবেগের বেগ। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আধুনিক যুগের এমন এক শক্তিশালী উপাদান, যার প্রভাব মানব মনের উপর অত্যন্ত বলিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও পরিণাম সঞ্চারি — এ সত্য উন্মোচনই মানিকের অন্বিষ্ট ছিল *চিহ্ন* উপন্যাসে।

উপন্যাস-২ : আদায়ের ইতিহাস

এটি মানিকের ষোলতম উপন্যাস এবং আঠাশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির নির্ভুল প্রকাশ তারিখ পাওয়া যায়নি, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সূত্রে জানা যায় এটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত, প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। পৃষ্ঠা - ২ + ৮২, মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি *প্রবর্তক* পত্রিকায় ১৩৪৮

বঙ্গাব্দে কয়েকটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ১৩৫০ থেকে উপন্যাসটি আবার নতুন করে শুরু থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে এই পত্রিকায়।[৭]

এটি একটি ছোটো উপন্যাস, বেশ ছোটো, মোট ছয়টি পরিচ্ছেদ। তবে এটি ছোটগল্প নয়। এই উপন্যাসে লেখকই হলেন কথক। কথা এগিয়েছে সাধু ভাষায় আর চরিত্রেরা কথা বলেছে প্রচলিত চলিতে। উপন্যাসটির কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তিনটি চরিত্র ত্রিষ্টুপ, মনীশ, আর মনীশের বোন কুন্তলা, ত্রিষ্ঠপ সদ্যযুবক, সে বড়ো হতে চায়, কিন্তু কি করতে চায় সে সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নেই। চেনা ছক থেকে জীবনকে মুক্ত করার পথ খোজে সে। চাকরি পেয়ে সে কোনো আনন্দ অনুভব করেনা। মনের মধ্যে সবসময় তাকে কি যেন একটা অতৃপ্তির বোধ তাড়া করে বেড়ায়। বন্ধু মণীশের বোন কুন্তলাকে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু কুন্তলার প্রত্যাখ্যানে তার সমস্ত ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। উপন্যাসের মণীশ, কুন্তলা, ধীরেন চরিত্রগুলি স্বাধীনতা আন্দোলন বা সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। এরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবন যাপনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী। রোমান্টিক ভাবাবেগকে তারা মনের মধ্যে স্থান দেয়না, বরং জীবন দিয়ে স্বাধীনতা আদায় করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত চরিত্রদের পাশে ত্রিষ্ঠুপদের মতো আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রকেও দেখিয়েছেন মানিক। যারা সবকিছু বুঝেও সমসাময়িক জাতীয় ভাবনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। কুন্তলা চরিত্রটির দ্বারা মানিক ত্রিষ্ঠুপের ভাবনার জগতে পরিবর্তন আনেন। কুন্তলার কথায় এবং যুক্তিতে ত্রিষ্ঠুপ বুঝতে পারে তার জীবনের অসারতা এবং নিরাশার প্রকৃত উৎস। তার জীবনে ও ভাবনায় আসে পরিবর্তন। মার্কসবাদী ভাবনায় প্রভাবিত মানিক ত্রিষ্ঠুপের মতো আত্মমগ্ন যুবকদের সেদিনের সংগ্রামে একাত্ম করতে চেয়েছিলেন। কেননা এই যুবশক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে প্রতিবাদ মিছিলে এগিয়ে না এলে লড়াই সম্পূর্ণ হবেনা। ত্রিষ্ঠুপের মধ্যে গণজাগরণ জাগ্রত হওয়াই *আদায়ের ইতিহাস* উপন্যাসের মর্মকথা।

এই উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয়, তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। দেশের ইতিহাসের সেই দিনগুলি আন্দোলনে প্রতিবাদে বিপ্লবে উজ্জীবিত। একই সঙ্গে শাসকের অত্যাচারে স্বার্থলোভী নেতাদের চক্রান্তে ও মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাতে আলোড়িত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে দেশকে টুকরো করার চক্রান্ত সেই সময়কে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা জন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে দেশীয় ধান্দাবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলছিলেন এরকম একটি পরিস্থিতির ওপর দাড়িয়ে *আদায়ের ইতিহাস* উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। দেশ ও সমাজের

ইতিহাসের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলি ও তখনকার মানুষের যাপিত জীবনের সংবাদ এই উপন্যাসে আমরা পেয়ে থাকি।

গল্পগ্রন্থ-১ : খতিয়ান

এটি মানিকের একাদশতম গল্প সংকলন ও ঊনত্রিশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৩৫৪, প্রকাশক ভারতীভবন। পৃষ্ঠা ২ + ১৪৯, মূল্য আড়াই টাকা। এই গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা দশ টাকা। গল্পগুলি যথাক্রমে: *খতিয়ান, ছাটাই রহস্য, চক্রান্ত, গুন্ডামি, কানাই তাঁতি, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায়নি কেন, একান্নবর্তী*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:[৮]

খতিয়ান	স্বাধীনতা	শারদ ১৩৫৩
চালক	দেশ	শারদ ১৩৫৩
টিচার	বসুমতী	শারদ ১৩৫৩
একান্নবর্তী	যুগান্তর	শারদ ১৩৫৩
চক্রান্ত	কথাশিল্প (গল্পসংকলন)	আশ্বিন ১৩৫৩
চোরাই	গল্পভারতী	১৩৫৩
গুন্ডামি	নতুন লেখা (গল্পসংকলন)	অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
ছাটায় রহস্য	রূপান্তর	১৩৫৩
ছিনিয়ে খায়নি কেন	পূর্ণিমা	১৩৫৩
কানাই তাঁতি	?	?

খতিয়ান

১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত *খতিয়ান* গল্পটি। এখানে দাঙ্গার বাস্তব চিত্র এবং দাঙ্গা সৃষ্টিকারী স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থের খতিয়ানকেই লেখক তুলে ধরেছেন। ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতেই ছিল। এই সময়ে নানারকম বিপ্লবী কার্যকলাপ ও গণ-আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে ইংরেজরা বুঝেছিলেন আর বেশিদিন ভারতবর্ষে থাকা যাবে না। তাই দাঙ্গা সৃষ্টি করে দেশবাসীর ঐক্য ভাঙতে চেয়েছিলেন তাঁরা। গল্পের নায়ক 'সে' দাঙ্গার সময় বিপন্ন হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এক বন্ধুর ঘরে আশ্রয় নেয়। আক্রমণকারীরা তাকে না পেয়ে ফিরে যায়। এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন হিন্দু এবং একজন মুসলিম, তারা একই কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। পরদিন তাদের বস্তিতে আগুন লাগে। সে পথে বেরিয়ে দেখে দাঙ্গার শিকার মানুষগুলির মৃতদেহ, দাঙ্গার আগুনে হিন্দু-মুসলমানের অসংখ্য বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অথচ রাস্তার উল্টো দিকে সাহেব পাড়ায় রয়েছে মনোরম শান্তি ও গানবাজনার শব্দ। কয়েকদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা হয় কারখানায়, সেখানে চল্লিশজন শ্রমিককে কোনো কারণ ছাড়ায় ছাটাই করা হয়েছে,

তালিকায় তাদের নামও আছে। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগেই ১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের। এই গল্পে কেবল দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্দশার ছবি নয়, শ্রমিক শ্রেণির মানুষের শ্রেণিসচেতনতা ও সাম্যবাদে উজ্জীবিত চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা হয়। তাই পুলিশের গাড়িতে উঠতে উঠতে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলে—

> লরি চলতে আরম্ভ করলে হাত বাড়িয়ে সে বন্ধুর ছেড়া শার্টের কলার চেপে ধরে। থু-থু করে রাস্তায় ফেলে দেয় মুখের বিড়িটা।
> আজ শালা তোকে খুন করব।
> বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দেয়। — কর।
> বল শালা তোর কোনো জাত নেই, আমার কোনো জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব। আমরা গরিবের জাত।[৯]

ছাটাই রহস্য

যুদ্ধের অস্থির সময়ে বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের প্রতি যেসব অত্যাচার হয়েছিল তার বাস্তব ছবি এগল্পে আমরা দেখতে পাই। *ছাটাই রহস্য* গল্পের রহস্যটি হল যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন কোম্পানি পারমানেন্ট চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে অনেক কম বেতনে প্রচুর লোক নিয়োগ করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের ছাটাই করে দেওয়া হয়। গল্পের নায়ক রণধীর একটি কোম্পানিতে অনেক কম বেতনেও থেকে যায় ভবিষ্যতে পারমানেন্ট হওয়ার আশায়। বেশি বেতনের চাকরি পেয়েও সে যায় না। যুদ্ধের পরে যখন নানা অজুহাতে কর্মচারীদের ছাটাই করা হতে লাগল তখন রণধীর ছাটাই সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তবুও তাকে ছাটাই করা হয়, সে বুঝতে পারে ছাটাই রহস্যের প্রকৃত তাৎপর্য। বরখাস্ত হওয়ার নোটিশ পাওয়ার পর প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে রণধীর দেওয়ালে লুকিয়ে ছবি আঁকে। সেই ছবি গুলির মধ্যে ফুটে ওঠে কোম্পানীর মালিক ও শাসক শ্রেণির চক্রান্তের নির্মমতা। এই সময় মানিক রাজনৈতিক দলের কর্মী হওয়ায় বিভিন্ন মিটিং মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থেকেছেন এবং খুব কাছ থেকে দেখেছেন শ্রমিক আন্দোলনকে। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে গণ-চেতনার জাগরণ ঘটাতেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বাস্তবিক কার্যকলাপে এবং সাহিত্যে এই গণ-জাগরণের ছবি স্পষ্ট।

চক্রান্ত

এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র প্রতিমা, তাকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল ভালো জামাই পাওয়ার আশায়। তার দাদা রাখাল বেকার, যুদ্ধের বাজারে সে চাকরি পায়, সংসারের সমস্ত ভার প্রতিমার উপার্জনের উপর এসে পড়ে। প্রতিমার প্রেমিক মহেশ অনেক কম বেতনের একটি চাকরি পায়, এবং কিছুদিন পরে

সে চাকরি থেকে ছাটাই হয়। পরিবারের চাপ এবং নানারকম সমস্যায় জর্জরিত মহেশ ও প্রতিমা বিয়ের ভাবনা ভুলে যায়। প্রতিমা অফিস কামাই করে একটি গোটা দিন মহেশের সঙ্গে কাটাতে চায়, কিন্তু কথা তাদের অল্প সময়ের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব ও বেকারত্বের যন্ত্রণায় অস্থির মহেশ আবার দেখা হওয়ার আশ্বাস দিয়ে চলে যায়। দেরি করে অফিস যাবে ভেবেও প্রতিমা অফিসে না গিয়ে দেখা করতে যায় দুই বন্ধুর বাড়ি। গিয়ে দেখে একজন বান্ধবীর বাড়িতে যুদ্ধকালীন ছাটাইয়ের প্রভাবে দারিদ্র্য ও হাহাকার আর এক বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে দেখে দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে সবাই গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। প্রতিমা অনুভব করে সংকট চারিদিকে, প্রত্যেকেই অসহায় এবং পীড়িত। অনেক দেরি করে সেদিন সে অফিসে যায়। বাড়ি ফিরে এসে সে দেখে তাদের বাসন মাজা ঠিকে ঝি-টি তার জ্বরে বেহুশ শিশুপুত্রকে দাওয়ায় শুইয়ে রেখে কাজ করছে কাজ কামাই করলে মাইনে কাটা যাওয়ার ভয়ে। প্রতিমা ভাবে —

> পেটের দায়ে মানুষ কি করতে পারে আর, মানুষকে কি করতে হয়, ভাবতে গেলেই গত মহা দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতি শুধু এই শহরের বুকে যতটা প্রকট হয়েছিল চোখের সামনে তার ছবি নাড়া খায় — আজও তাজা হয়ে আছে মনের মধ্যে। পেটের দায়ে বাস্তব চেহারা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নিজেরও অভিজ্ঞতায়। চাকরির রোমান্স নিঃশেষে উবে গিয়েছে। এ খুশির চাকরি নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার। নিজের আর আপনজনেদের পেটের দায়ে তার চাকরি — নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে।[১০]

গুন্ডামি

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পথে-ঘাটে মেয়েদের চলাফেরার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা যায়, সেই দিকে আলোকপাত করেছে গল্পটি। মেয়েরা যে মেয়েদের সম্মান নিজেরাই রক্ষা করতে পারে সেই বার্তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আছে এই গল্পে। শান্তা অফিসে চাকরি করে, বাসে ট্রামে কিছু বিকৃত মানসিকতার পুরুষদের কাছে মেয়েদের বিপন্ন হওয়ার, লাঞ্ছিত হওয়ার গল্প সে শোনে। মনে মনে সে এই রকম একটি সুযোগের প্রতিক্ষা করে, যাতে এই বিকৃত মানসিকতার পুরুষদের উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। একদিন সেরকম সুযোগ জুটে যায়, সে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে কিন্তু আসল ব্যক্তিটিকে চিনতে পারেনি, তাই পার্শ্ববর্তী এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করে সে মার খাওয়ায়। শেষে ট্রাম ফাঁকা হয়ে গেল শান্তা দেখে ব্যক্তিটির যে হাতটি পকেটে ঢোকানো সেটি আসলে ব্যান্ডেজ বাঁধা, আর একটি হাতে ছিল ঔষুধ। শান্তা নিজের ভুল বুঝতে পারে কিন্তু তখন কিছু করার ছিল না। ছেলেটি রোজ শান্তাকে অনুসরণ করে এবং সবাইকে বলে বেড়ায় শান্তার কথা। এইভাবে শান্তা ছেলেটির কাছে মানসিকভাবে পীড়িত হয়। গল্পটিতে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদার কথা শান্তা উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তার নিজের ব্যবহারও সঠিক ছিল না এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে যে মেয়েদের প্রকৃত উন্নতি হবে না তাই মানিক বোঝাতে চেয়েছেন।

কানাই তাঁতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪৩ এর মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষের প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন শুধু নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক গুলিও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষগুলির ন্যূনতম চাহিদা ছিল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একমুঠো খাদ্য। কিন্তু সে টুকুও মানুষ জোগাড় করতে পারেনি। কানাই তাঁতি তার পছন্দের পাত্রী মাতিকে বিয়ে করবে বলে টাকা জমায়, তাদের সম্প্রদায়ে বিয়ের জন্য কন্যাপণের প্রচলন ছিল। তিনকুড়ি টাকা প্রয়োজন, জমেছে দু কুড়ি তিনটাকা। প্রাণপণ চেষ্টা করে কানাই টাকা জমাতে থাকে। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁতের সুতোর দামও আকাশ ছোঁয়া হয়ে ওঠে। কানাই সুতো কিনতে পারেনা, উপবাসে দিন যায়, কানাই তাঁত বাঁধা রাখে, তাঁত বেচে দেবার কথাও ভাবে, কিন্তু জমানো টাকাগুলি সে খরচ করেনা। তার বুড়ি মা দিনরাত্রি তাকে গালাগাল দেয়, এমনকি তার কাঙ্ক্ষিত মেয়েটি মাতি টাকা ধার চাইতে এলে সে টাকা দিতে অস্বীকার করে। বিয়ে করার জন্য যে টাকা সে জমিয়েছিল, সেই টাকা সে রেখে দেয় ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ কেটে গেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মাতির প্রতি তার যে প্রেম ছিল তাও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে অভাবের কাছে। মানিক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব মানুষের সম্পর্ককেও কিভাবে নষ্ট করে দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় আপনজনেরা এমন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মানুষের থেকে তার উদাহরণ এই গল্পটি। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার নিখুঁত বর্ণনা আছে এই গল্পে—

> এত দুঃখের জীবনেও স্বপ্ন ছিল কানাইয়ের, পেট খিদেয় মোচড় দিতে থাকলে পান্ডার মধুর গন্ধে জাগা স্বপ্ন, হৃদয় টনটন করতে থাকলে সঞ্চিত টাকার স্পর্শে জাগা আগামী কোনো একদিন মাতিকে ঘরে আনার স্বপ্ন। সব স্বপ্ন গুঁড়ো হয়ে গেল কাঁচের মতো মহাকালের বুট পরা পায়ের চাপে, মৃত্যু ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষের রূপে চাষি, তাঁতি, কামার, কুমোর, তেলী, জেলের ঘরে। সব বেচে দিল অসহায় মানুষ বাঁচবার চেষ্টায়, ঘটি-বাটি, হাল-বলদ, ভিটে-মাটি, হাঁপর-হাতুড়ি, তাঁত-মেয়ে-বৌ পর্যন্ত। তবু ঠেকানো গেল না মৃত্যুকে। গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ মরল দলে দলে, বাঁচবার চেষ্টায় দলে দলে দিশেহারা মানুষ পালিয়ে গেল গাঁ ছেড়ে।[১১]

চোরাই

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির গৃহিনী দেখতে পায় রান্না ঘরে চুরি হয়ে গেছে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠে রান্নার ঠাকুর বিশ্বম্ভর, চুরির ব্যাপারে সে কিছুই জানেনা। দুপুরে বস্তিবাসী ঘুটে ওয়ালী মেয়েটি লুকিয়ে দেখা করতে আসে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে। তাদের মধ্যে গোপন প্রণয় সম্পর্ক আবিষ্কার করে বাড়ীর গৃহিণী পুলকিত হয় রাত্রিবেলায় গৃহিণী বিশ্বম্ভরের ঘরে উঁকি মারে এবং আড়ি পেতে তাদের প্রণয়দৃশ্য দেখে। বিশ্বম্ভরের দেওয়া নতুন শাড়ি পরে মেয়েটি মহা খুশী, বিশ্বম্ভর জানায় সে আর চুরি করতে পারবেনা, কেননা গিন্নীমা টের পেয়েছেন। এর উত্তরে মেয়েটি প্রৌঢ় যৌবনা গৃহিনীর কটু নিন্দা করলে,

গৃহিনীটি চিৎকার করে লোক জড়ো করে এবং তাদের উচিৎ শিক্ষা দেয়। এই পর্বের অন্যান্য গল্পগুলির থেকে বিষয়বস্তুতে ভিন্নস্বাদের গল্প এটি।

চালক

গল্পটি চার ভাইকে নিয়ে। বড়োভাই অজিত একতলা বাসের ড্রাইভার, ছোটো ভাই এম. এ. পড়ছে। আর দুটি ভাই চাকুরিরত। অজিতের চাকরি যেহেতু ভদ্রলোকের নয় তাই বাড়ির সবাই তাকে নিয়ে অস্বস্তিতে থাকে। তবে চাকুরে ভাইদের থেকে সে-ই বেশি সংসারে খরচ দেয়। সুজিত নামের ভাইটি যতদিন বেকার ছিল, ততদিন অজিতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলত, কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর সে দাদার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দেয়। অজিত প্রমোশান পেয়ে দোতলা বাসের ড্রাইভার হয় এবং তার মাইনে বেড়ে যায়। অজিতের বাবা বুঝতে পারে তার অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় এই ছোটোলোক শ্রেণির ড্রাইভার ছেলেটিই বেশি নির্ভরযোগ্য এবং সংসারে বেশি টাকা দেয়। আর অন্য ছেলেগুলির মধ্যবিত্ত সুলভ ভন্ডামি এবং কপটতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চাননা। শেষপর্যন্ত তিনি অজিতকে সংসার থেকে আলাদা করে দেন এবং নিজে অজিতের কাছে থেকে যেতে চান। এ গল্পে মানিক খুব সুন্দরভাবে শ্রমিক শ্রেণির মানবিকতাবোধ এবং তথাকথিত ভদ্র লোকেদের সুবিধাবাদী চরিত্রটিকে তুলে ধরেছেন।

টিচার

এই গল্পে মানিক শিক্ষক মহাশয়দের জীবনের দুঃখ দুর্দশা ও করুণ কাহিনি তুলে ধরেছেন। রায়বাহাদুর তার স্কুলের শিক্ষকদের বেশ কড়া ভাষায় উপদেশ দেন — দেশ গড়ার কাজ যারা করেন দারিদ্র্য তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তি। তারা কেন মজুর শ্রমিকদের মতো ধর্মঘট করবে। স্কুলের দরিদ্র শিক্ষক মহাশয়রা সব চুপচাপ শুনে যান, কেউ কোনো প্রতিবাদ করেন না। রায়বাহাদুর সুবিধাবাদী এবং প্রবঞ্চক শ্রেণির লোক। শিক্ষকদের ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করে আসলে সে শিক্ষকদের প্রাপ্য অর্থ ফাঁকি দেয়। কিন্তু শিক্ষকদের ঘর সংসার রয়েছে, জীবনের আনন্দ ও উদ্দীপনা রয়েছে, তাই শিক্ষকদেরও অর্থের প্রয়োজন হয়। হেডমাস্টারমশাই শঙ্কর বাবুর জামাই গিরিন এক বিচিত্র উপায়ে রায়বাহাদুরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। রায়বাহাদুরকে সে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিজের ছোটো ছেলের অন্নপ্রাশনের নাম করে। এবং রায়বাহাদুরকে ডেকে এনে তার চোখের সামনে মেলে ধরে একজন দরিদ্র শিক্ষকের সংসারের করুণ অবস্থা। রায়বাহাদুর এসে দেখেন, গিরিনের বৃদ্ধ পিতা চিকিৎসার অভাবে রোগজর্জরিত হয়ে প্রায় মৃত্যু শয্যায় এক কোণে পড়ে রয়েছে, কেননা তিনি শিক্ষকের পিতা। যে শিশুটির অন্নপ্রাশন, চিকিৎসার অভাবে তার জ্বর, জ্বর আসবার আগে বিশ্রিভাবে কেঁদে চলে, জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। গিরিনের বোনটি অত্যন্ত রোগা, বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, খিদের জ্বালায় রান্নার ডাল ধুতে গিয়ে কিছুটা খেয়ে ফেলে, তার মা মেয়েটিকে টেনে এনে গিরিনের সামনে হাজির করে রায়বাহাদুরের উপস্থিতিতেই। গিরিনের স্ত্রীর কঙ্কালসার রুগ্ন চেহারা, অন্য শিশুগুলি রুগ্ন ও নগ্ন

হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে — সব মিলিয়ে শিক্ষকের দারিদ্র্যের ভয়ঙ্করতম বিজ্ঞাপন রায়বাহাদুরের সামনে মেলে ধরে গিরিন। রায়বাহাদুর গিরিনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। কিন্তু তার কিছুই করার থাকে না, কলে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করেন তিনি। শিক্ষকের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য প্রচার করার উপযুক্ত শিক্ষা গিরিন রায়বাহাদুরকে দেয়। পরদিন স্কুলে গিয়ে গিরিন বরখাস্তের চিঠি পায়। এই গল্পে মানিক দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষকদেরও বাঁচার অধিকার আছে এবং বাঁচার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। দারিদ্র্যতা শিক্ষকের ভূষণ হতে পারেনা। প্রয়োজনে শিক্ষকরাও প্রতিবাদ ধর্মঘট করতে পারে।

ছিনিয়ে খায়নি কেন

দুর্ভিক্ষের মন্বন্তরের বিরুদ্ধে মানিকের কলম বারবার সোচ্চার হয়েছে। এই গল্পেও দুর্ভিক্ষকালীন মানুষের দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে। যখন লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরছিল, এমন নয় যে দেশে খাদ্য ছিল না। মানুষ ছিনিয়ে খায় নি কেন — এই ছিল যোগী ডাকাতের প্রশ্ন। কেউ মনে করে গ্রামের মানুষেরা সহজ সরল তাই ছিনিয়ে খায়নি, কেউ মনে করে এই মানুষেরা অদৃষ্টবাদী। কিন্তু যোগী ডাকাত ভাবে যে মানুষেরা ঘটি-বাটি বেচে একমুঠো অন্ন জোগাড়ের চেষ্টা করেছে, শেষপর্যন্ত তাও জোটেনি। তাহলে তারা গুদামে ভরে থাকা খাদ্য ছিনিয়ে খায়নি কেন ? আসলে খেতে না পেয়ে দুর্বল শরীরের এইসব মানুষেরা ছিনিয়ে খাবার সাহস পায় নি। যোগী ডাকাত খাদ্য লুট করে নিয়ে এসে মানুষের মধ্যে বিতরণ করে। সে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে, প্রত্যেক মানুষের বাঁচবার অধিকার আছে। কিছু মানুষ সে অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তাই মানুষকে ছিনিয়ে খেতে হবে। যোগী লক্ষ্য করেছে এই মানুষগুলি দীর্ঘকাল না খেতে পেয়ে তাদের মেরুদণ্ডটিও বেঁকে গেছে। তাই এভাবে খাদ্য লুট করে মানুষগুলির প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে চেয়েছে যোগী ডাকাত। এই গল্পে দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থা এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন মানিক।

একান্নবর্তী

সভ্যতার অগ্রগতিতে ক্রমশ একান্নবর্তী পরিবার গুলি লুপ্ত হয়ে যায়। বীরেন, ধীরেন, হীরেণ, নীরেন — চার ভাইয়ের ছিল যৌথ একান্নবর্তী পরিবার। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, হীরেণ সাতান্নটাকা মাইনের কেরানি আর নীরেনও ভালো চাকরি করে। বীরেন আলাদা হয়ে গেলে তার স্ত্রী নিজের ঐশ্বর্যময় উজ্জ্বল সংসার সাজিয়ে তোলে। নীরেন চাকরি পেয়ে ধীরেনের সংসারে ভিড়ে যায়। কম মাইনের কেরানি হীরেণের সংসার কোনোরকমে টেনেটুনে চলতে থাকে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় হীরেণের স্ত্রী-লক্ষ্মী ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যায়, কিন্তু হীরেণ ধরে ফেলে। তারপরে হীরেণ, রমেশ, কানাই, ভূপেন চার কেরানি বন্ধু মিলে একটি একান্নবর্তী পরিবার গড়ে তোলে। তদের খরচ কম হয়, চার বৌ পালা করে রান্না করে, ফলে তাদের জীবনে একটু স্বাচ্ছন্দ ও বৈচিত্র্য আসে। প্রয়োজনের

তাগিদে এইভাবে গড়ে উঠে একটি একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে রক্তের বন্ধনের চেয়েও শ্রেণিগত বন্ধন জোরালো হয়ে ওঠে।

১৯৪৬-৪৭ সালে আমাদের দেশে এবং সমাজে যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার ফলে মানুষের মৌলিক নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক মূল্যবোধগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়কার বিপন্ন জীবনের কোলাজ এই গল্পসংকলন। এই সংকলনের গল্পগুলিতে তৎকালীন নানা ঘটনা, ষড়যন্ত্র ও বিভীষিকার চিত্র তুলে ধরেছেন মানিক। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব ও প্রগতিশীল দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে গল্পগুলিতে। "মানিকের সমকাল সচেতন, সমাজ মনস্ক বৈজ্ঞানিক মনটির পরিচয় গ্রন্থটিতে সুমুদ্রিত। চারিপাশের চলমান জীবন তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নিরন্ন মানুষের বাঁচবার জন্য প্রাণপণ লড়াই, প্রতিরোধ — এক কথায় স্পন্দিত, চঞ্চল, সমস্যাকাতর, প্রবহমান জীবন এই গল্পগুলির উপজীব্য।"[১২]

তথ্যসূত্র:

১। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র,* ৫ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৪৬৪।

২। 'চিহ্ন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭।

৬। রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ-শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* অঞ্জলি, ২০১০, পৃ. ৯৫।

৭। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, পৃ. ৪৬১।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪।

৯। 'খতিয়ান', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

১০। 'চক্রান্ত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

১১। 'কানাই তাঁতি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

১২। কৃষ্ণা বসু, *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ,* প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ১২০।

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি:
স্বাধীনতা উত্তর পর্ব (১৯৪৮-১৯৫২)

১৯৪৮

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪০তম বছর। সদ্য স্বাধীন হওয়া এই দেশ তখন আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের স্বপ্নে মশগুল। কিন্তু সে পথে কত বাধা, কত নিগড়, কত প্রতিকূলতা তা একটু একটু টের পেতে আমরা শুরু করেছি। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল দেশীয় রাজ্য দপ্তরটি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ র জানুয়ারি মাসের মধ্যে তিনি হায়দ্রাবাদ জুনাগড় ভিন্ন অন্য দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৪৭ র ২২ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর মদতে হানাদার বাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং কাশ্মীরের এক বিস্তীর্ণ অংশ অধিকার করে ফেলে। আত্মরক্ষার্থে তদানীন্তন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ঐ বছর ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন। প্রত্যুত্তরে পাকিস্তান তার দখলীকৃত অংশে 'আজাদ কাশ্মীর' নামে একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করে। ফলে ১৯৪৮ এ ভারত-পাক যুদ্ধ বাধে। ৩১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে।

জানুয়ারি ৪ এশিয়া মহাদেশের মায়ানমার (১৯৮৯ সালের মে মাস পর্যন্ত বার্মা) স্বাধীনতা লাভ করে। রাজধানী ইয়াংগন।

জানুয়ারি ১৩ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার আহ্বান নিয়ে নিয়ে গান্ধিজি কলকাতায় আসেন এবং আমরণ অনশন শুরু করেন। এই সময় দাঙ্গায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়।

জানুয়ারি ১৪ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ।

জানুয়ারি ২০ বিড়লা হাউসে গান্ধিজির প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

জানুয়ারি ২১ পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রে।

জানুয়ারি ৩০ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে হিন্দু মৌলবাদী নাথুরাম বিনায়ক গডসে দিল্লিতে গুলি করে হত্যা করেন। (পরে এই দিনটিকে জাতীয় শহীদ দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান জানানো হয়।) সারা বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত। গান্ধিজির জন্ম ২-১০-১৮৬৯।

ফেব্রুয়ারি ৪ এশিয়া মহাদেশের 'শ্রীলঙ্কা' স্বাধীনতা লাভ করে। রাজধানী কলম্বো।

ফেব্রুয়ারি ২১ স্বাধীন ভারতের জন্য খসড়া সংবিধান গণপরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৭ চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। এদিন কলকাতায় ডিকসন লেনে গণনাট্যের দুই কর্মী সুশীল মুখার্জী ও ভবমাধব ঘোষকে হত্যা করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৮ শেষ ব্রিটিশ সৈনদল ভারত ত্যাগ করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় শুরু হয়। চলে ৬ই মার্চ পর্যন্ত। ৩১ জনের কেন্দ্রিয় কমিটি গঠিত এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বি. টি. রণদিভে।

মার্চ ২৬	কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির ২য় অধিবেশন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হল। মুজফ্‌ফর আহমেদ, ভবানী সেন, জ্যোতি বসু সহ একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হন।
এপ্রিল ৭	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'WHO' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সাল থেকে এই তারিখটিই 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' হিসাবে পালিত হয়।
মে ১	অভিনেতা শম্ভু মিত্র এবং অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র *বহুরূপী* নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন।
মে ১৪	'ইজরায়েল' রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাজধানী তেলআবিব।
মে ১৬	ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের কর্তৃত্ব ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়।
জুন ৮	ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হয়।
জুন ৯	দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
জুন ২০	লর্ড মাউন্টব্যাটেন স্থায়িভাবে ভারত ত্যাগ করেন।
জুন ২২	ইংল্যাণ্ডের রাজা 'ভারত সম্রাট' উপাধি ত্যাগ করেন।
জুন ২৪	সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম বার্লিন অবরোধ করে।
জুলাই ৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের সুবিধার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত হয়।
আগস্ট	পোল্যাণ্ডে ব্রাসলাভ শহরে ৪৫টি দেশের ৫০০রও বেশি বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক গঠন করলেন 'International Committee of Intellectuals'
জুলাই ৩১	প্রথম কলকাতা পরিবহন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫টি বাস নিয়ে যাত্রী পরিবহন শুরু হয়।
আগস্ট ২০	কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও ভারত সরকারের এক চুক্তির ফলে কোচবিহার ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সেপ্টেম্বর ১৩	ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজাম রাজ্য হায়দ্রাবাদ দখল করে। বামপন্থীদের ওপর তেলেঙ্গানায় পুলিশের উৎপীড়ন শুরু হয়।
অক্টোবর ২১	পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী বিল অনুমোদিত হয়।
অক্টোবর ২৪	কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, আর্ল এ্যাটলে এবং লিয়াকত আলি খানের মধ্যে আলোচনা হয়।
নভেম্বর	কাকদ্বীপে কৃষক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।
নভেম্বর ৬	দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণপিঁড়ি গ্রামে তেভাগা আন্দোলনে শহিদ হন বাতাসি সিংহ সহ ৮ জন এবং উত্তর চন্দনপিঁড়িতে শহিদ হন অহল্যা দাস।
ডিসেম্বর ১০	রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এই দিনটিকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান জানানো হয়।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *একা*। কুমুদরঞ্জন মল্লিক : *স্বর্ণসন্ধ্যা*। জীবনানন্দ দাশ : *সাতটি তারার তিমির*। প্রমথনাথ বিশী : *যুক্তবেণী*। প্রেমেন্দ্র মিত্র : *ফেরারী ফৌজ*। বুদ্ধদেব বসু :

দ্রৌপদীর শাড়ি / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : *তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা* / মণীন্দ্র রায় : *সেতুবন্ধের গান* / যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *ত্রিযামা* / সুধীর করণ : *রক্ত উষা* / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *অগ্নিকোণ*। **নাটক** — শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *বাংলার প্রতাপ* / মনোজ বসু : *বিপর্যয়* / বিজন ভট্টাচার্য : *জীয়ন কন্যা* / শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *এই স্বাধীনতা* / বাণী রায় : *সম্পা*। **উপন্যাস** — বনফুল : *ভীমপলশ্রী, মানদণ্ড, ডানা* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *উত্তর পুরুষ*। **গল্পগ্রন্থ** — লীলা মজুমদার : *দিন দুপুরে* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আচার্য কৃপালিনী কলোনী* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *ছোটোবড়ো, মাটির মাশুল* / মনোজ বসু : *পৃথিবী কাদের, উলু*।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : হুমায়ুন আহমেদ, নবারুণ ভট্টাচার্য, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, নন্দলাল সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, প্রণব মাইতি, রাণা চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, শম্ভু রক্ষিত, শংকর চক্রবর্তী, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু : কান্তিচন্দ্র ঘোষ, কুসুমকুমারী দাশ, বেণীমাধব বড়ুয়া, যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

৩ জানুয়ারি বোম্বাই থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে মানিক রওনা হন। ১৭ জানুয়ারি জে. জে. প্রোডাকশনের সঙ্গে *পুতুল নাচের ইতিকথা* ছায়াচিত্রের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে এক বন্ধুকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় এসময়ে মানিক নানা বিষয়ে বিব্রত আছেন। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তারপর ছোট ছেলেটির পা পুড়ে যাওয়ায় বেশ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় মানিককে, তাছাড়া সাংসারিক নানা সমস্যা ও আর্থিক দুর্ভাবনা তো আছেই। এই সময়ে মানিক পড়ছেন লেনিন ও মার্কসের নানা লেখা এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলি ডায়েরিতে টুকে রাখছেন। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফঃসল শহরে ছোটো বড়ো সাহিত্যসভা ও সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করছেন। গান্ধিজির নিহত হওয়ার খবরে শোক প্রকাশ। মে মাসে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের প্রথম অনুবাদ *Boat-man of the Padma* প্রকাশিত হয়।

এই বছরে প্রকাশিত হয় দুটি গল্পগ্রন্থ: *ছোটবড়ো* এবং *মাটির মাশুল* । ফেব্রুয়ারিতে *পরিচয়* পত্রিকার পাঠক গোষ্ঠীর আলোচনায় প্রগতি সাহিত্য ও মার্কসবাদী সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা প্রকাশিত হয়। *শারদীয় হিন্দুস্থান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *বাঘের বংশ রক্ষা*। গল্প প্রকাশ: 'ব্রিজ', (*অগ্রণী*, এপ্রিল), 'আপদ' (*চলন্তিকা*, আগস্ট), 'নিচু চোখে দু পয়সা' (*চতুরঙ্গ*, সেপ্টেম্বর), 'স্টেশনরোড' (*নতুন সাহিত্য*, বার্ষিক সংখ্যা)। সেপ্টেম্বরে, শারদ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত গল্প 'সখী' (*পশ্চিমবঙ্গ*),

‘প্রাণাধিক’ (*বসুমতি*), ‘মেজাজ’ (*অরণি*), ‘বাগদী পাড়া দিয়ে’ (*চলন্তিকা*), ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ (*সংবাদ*)।

গল্পগ্রন্থ-১ : ছোটোবড়ো

ছোটোবড়ো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ গল্পসংকলন ও ত্রিশ তম মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রকাশ কাল আগষ্ট ১৯৪৮, প্রকাশক পূরবী পাবলির্শাস, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৬ + ১৫৩, মূল্য আড়াই টাকা। এই গল্পসংকলনে গল্পের সংখ্যা চৌদ্দ, গল্পগুলি যথাক্রমে: *ভালোবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলেমানুষী, স্থানে ও স্তানে, স্টেশন রোড, পেরানটা, দীঘি, হারানের নাতজামাই, ধান, সাথী, গায়েন, নব আলপনা, ব্রিজ*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ: [১]

চালক	দেশ	শারদ ১৩৫৩
হারানের নাতজামাই	পূর্বাশা	মাঘ ১৩৫৩
স্থানে ও স্তানে	পূর্বাশা	ভাদ্র ১৩৫৪
তথাকথিত	দেশ	শারদ ১৩৫৪
ছেলেমানুষী	ভারত	শারদ ১৩৫৪
ধান	স্বরাজ	শারদ ১৩৫৪
গায়েন	যুগান্তর	শারদ ১৩৫৪
পেরানটা	পূর্বাশা	পৌষ ১৩৫৪
স্টেশন রোড	অগ্রণী	বৈশাখ ১৩৫৫
ভালোবাসা	নতুন সাহিত্য	বৈশাখ ১৩৫৫
দীঘি	?	?
সাথী	?	?
নব আলপনা	?	?

ভালোবাসা

দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত এই গল্পটি মালতী নামের একটি নববিবাহিত নারীকে কেন্দ্র করে। মালতীর বিয়ে হয়েছে মাত্র একবছর। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা সুগভীর। স্বামী বিপিন বাইরে গেলে মালতী চিন্তায় চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে বিপিনের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। চাকরির পাশাপাশি বিপিন শান্তি সেনার কাজ করে। চারিদিকে তখন দাঙ্গার পরিবেশ। বিপিন দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি সেনার কাজে যায়। আর এই সময়ে মালতীর উদ্বিগ্ন দুপুরগুলি কিছুতেই কাটতে চায়না। একদিন বিপিন আর বাড়ি ফেরে না, দাঙ্গার মধ্যে পড়ে তার প্রাণ যায়। আঘাতে, শোকে, যন্ত্রণায় বিস্মিত বিধ্বস্ত মালতী কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনা যে তার বিপিন আর নেই। সে জেদ ধরে বিপিনকে দেখতে যাওয়ার।

বিপিনের মৃত্যুর খবরে তার চেতনায় নেমে আসে দিগন্ত প্রসারী শূন্যতা, সে ভাবতে থাকে বিপিনের মৃত্যুর সঙ্গে তার জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। পথে বেরিয়ে সে দেখে একটি মিছিল চলেছে — দাঙ্গা বিরোধী এই মিছিল শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইছে। দাঙ্গা মালতীর জীবনের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, তাই দাঙ্গা, মিছিল ইত্যাদির ঘোর বিরোধী মালতী। আজ সেই মিছিলের দিকেই সে এগিয়ে যায় ধীর পায়ে। মিছিলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে যায় সে সহজেই। গল্পটির মধ্যে মালতীর মনোজগতে চিন্তার যে পরিবর্তন দেখানো হয়েছে, তা কিছুটা আতিশয্য দোষে দুষ্ট হলেও সময়ের নিরিখে তাৎপর্যবাহী। মানিক দেখাতে চেয়েছেন ঘরে বসে আত্মস্বার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকলে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা। সময় যেভাবে ভাঙছে, তার হাত থেকে আমাদের কারও রেহাই নেই। তাই পথে নেমে প্রতিবাদ-মিছিলে সামিল হয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারি। ১৯৪৭-৪৮ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ছবি এই গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তথাকথিত

একটি গ্রাম্য সরকারি হাসপাতলের পাশ করা ডাক্তার মতিলালের গল্প। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই গল্পটি রচিত। গ্রাম্য মানুষেরা দরিদ্র, অসহায়, খেতে না পাওয়া, রোগ জর্জরিত। তারা বিনে পয়সায় মতিলাল ডাক্তারের কাছে আসে চিকিৎসা করাতে। মতিলালের ফি সামান্য হলেও তাকে কেউ বাড়িতে ডাকেনা, এই নিয়ে মতিলালের মনে অনেক ক্ষোভ। গ্রামের ধনী পরিবার চাটুজ্জেদের বাড়ি থেকে ডাক আসে মতিলালের। এই পরিবারের এক যুবক কলকাতায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে শরীরে একাধিক রোগ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তার দেহে জীবনী শক্তি আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। মতিলাল যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে ছেলেটির রোগ সারানোর চ্যালেঞ্জ নেয়। কথা হয় ছেলেটি পুরো সেরে উঠলে মতিলাল এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাবে। ছেলেটি আস্তে আস্তে সেরে উঠতে শুরু করে, কিন্তু মতিলালের আদায় হয় মাত্র তিন'শ টাকা। ছেলেটির বাবা কৌশল করে মতিলালের হাসপাতালের বেতন দশ টাকা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু ছেলেকে সুস্থ করার প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক মতিলালকে আর দেয় না। এমন সময় তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। চাষিদের সঙ্গে গ্রামের জমিদার চাটুজ্জেদের বিরোধ বাধে, বিরোধ ক্রমশ মারপিঠ, হাঙ্গামায় পরিণত হয়। চাটুজ্জের ছেলের লাঠির আঘাতে প্রথম আহত হয় মতিলাল ডাক্তারের এক রোগী, গরিব চাষী নুরুল। মতিলাল যায় আহত চাষিদের চিকিৎসা করতে। হাসপাতালে ফিরে সে ডাক পায় চাটুজ্জে বাড়িতে আহতদের চিকিৎসা করতে। মতিলাল ভাবে, যেতে হবে কেননা সাতশ টাকা এখনো বাকি আছে। "কিন্তু না গিয়ে যদি চলত ? যদি মরতে দেওয়া যেত ওদের সবকটাকে বিনা চিকিৎসায় ?"[২] মতিলাল ডাক্তারের ভাবনার এই পরিবর্তনটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। গ্রামের চাষিদের ফসলের ভাগ নিয়ে যারা রক্ত ঝরাচ্ছে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও তিরস্কার এবং দরিদ্র চাষিগুলির জন্য মতিলালের স্নেহ-মমতা গল্পটিতে একটি বিশেষ বার্তা প্রকাশ করেছে।

ছেলেমানুষী

দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত এই গল্পটিতে প্রায় একই বাড়িতে পাশাপাশি থাকে দুটি পরিবার। একটি তারাপদর পরিবার এবং আর একটি নাসিরুদ্দিনের পরিবার। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবেশ সেদিনকার জীবনে কেমন ভয়াবহতা আমদানি করেছিল তার নিদর্শন এই গল্পটি। দুটি পরিবারের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবধান থাকলেও, অন্তরঙ্গতায় কোনো ব্যবধান ছিলনা। দুটি পরিবারের দুটি শিশুর প্রাণ চাঞ্চল্যে ধর্মের বিভেদ উঠে যায়। বাইরে শহরে ঘন ঘন দাঙ্গা লাগে, দুটি বাড়িতেই বিপন্ন আত্মীয়েরা এসে আশ্রয় নেয়। এই পাড়াটিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব রয়েছে, তাই এ পাড়ায় দাঙ্গা নেই। দাঙ্গাকারীরা এপাড়ায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শান্তি রক্ষা বাহিনীর সতর্ক পাহারায় তা সফল হয় না। দুটি পরিবারের শিশু দুটি — গীতা আর হাবিব লুকিয়ে দাঙ্গা দাঙ্গা খেলতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরকে খেলার ছলে আঘাত করে মারামারি করে। দুই পরিবারের লোকেদের মানসিক অবস্থা এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে। এই ঘটনায় তারা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে গীতা আর হাবিবকে খুঁজে পাওয়া যায় , এত দিনকার সুসম্পর্কিত পরিবার দুটি পরস্পরকে ঘোর সন্দেহ করে, তাদের শিশুকে অপর পরিবারটি গুম করেছে ভেবে। দাঙ্গা লাগার উপক্রম হয় দুটি শিশুর ছেলেমানুষীকে কেন্দ্র করে। চিলেকোঠার ছাদ থেকে অবাক হয়ে গীতা আর হাবিব দেখে নীচের দালানে ঘটতে থাকা এসব ঘটনা। শেষপর্যন্ত শিশু দুটিকে খুঁজে পাওয়া যাওয়ায় শান্তি কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের চেষ্টায় দাঙ্গা বাঁধে না। গল্পটিতে মানিক চমৎকার ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই, ইংরেজরা সুচতুর কৌশলে এই বিরোধ ও দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে, আর আমরা ছেলে মানুষের মতোই কোনো কিছু না বুঝে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি।

স্থানে ও স্তানে

ইংরেজদের চক্রান্তে দাঙ্গা ও দেশবিভাগ আমাদের জীবনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। দেশবিভাগের ফলে বহু মানুষকে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা ছেড়ে উদবাস্তু হতে হয়েছিল। এরকমই এক যুবক নরহরি এই গল্পের নায়ক। তার বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্র পূর্ববঙ্গে কিন্তু শ্বশুর বাড়ি পশ্চিম বাঙলার কলকাতায়। দেশভাগের ফলে এরকম বহু মানুষের জীবন দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল। কাঁটাতারের বেড়ায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ক্ষেত্রটি। নরহরি কলকাতায় এসেছে তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তার শ্বশুর মশাই এবং শ্যালকরা তাদের বাড়ির মেয়েকে পূর্ববঙ্গে পাঠাতে রাজি নয়। এমনকি তার স্ত্রী সুমিত্রাও পূর্ববঙ্গে যেতে রাজি হয়না। এই গল্পটিতে মানিক দেখাতে চেয়েছেন দেশ বিভাগের পর দুই বাংলার মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের একটুকরো ছবি। দেশভাগ শুধুমাত্র একটি জায়গার ভাগ-বাটোয়ারা নয়, দেশভাগের ভয়াবহ পরিনাম কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত

জীবনকেও আক্রান্ত করেছিল তার উদাহরণ এই গল্পটি। নরহরির বাড়ি ও আপনজনেরা পূর্ববঙ্গে আর স্ত্রী-পুত্র পশ্চিমবঙ্গে — কি করে সে এদুটিকে মেলাবে, এই প্রশ্নে গল্পটির সমাপ্তি।

স্টেশন রোড

গল্পটিতে নির্দিষ্ট কোনো কাহিনি নেই। তবে দাঙ্গার সময়কালীন কতগুলি ছবি ফুটে উঠেছে। জেলা শহরের স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার দুপাশে গড়ে ওঠা দোকানপাট ও জনজীবনকে কেন্দ্র করে এ গল্প। স্টেশন রোডের একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন বসে সন্ধ্যা আড্ডার আসর। সেখানে টিকিটবাবু, মনোহর, কমপাউন্ডার নিতাই ও আরো অনেকে এসে ভিড় করে। কেউ গল্প বলে, কেউ গান গায়। ভিখারি গায়ক পদ্মলোচন তার ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাঁধা গান গায়। গানের বিষয় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, শোষন-লাঞ্ছনা, ইংরেজ ও জমিদারদের অত্যচারের কাহিনি। ১৪৪ ধারা সান্ধ্য আইন জারি হলে সন্ধ্যার আসর বসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই উৎসাহী মানুষেরা রেললাইনের ওপারে যেখানে ১৪৪ ধারা কার্যকরী নয় সেখানে গিয়ে এই আড্ডার ও গালাগালির আসর বসায়। এই গল্পটিতে তেমন কোনো কাহিনি নেই, কিন্তু দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সময়ের এক টুকরো জীবন চিত্র রয়েছে। যেখানে আমরা দেশভাগ পরবর্তী অস্থির সমাজ জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

পেরানটা

তেভাগা আন্দোলনের পটভুমিতে রচিত এই গল্পটিতে ফসলের ভাগ নিয়ে লড়াই করে জেলে গিয়েছিল সাধু সেখ। জেল থেকে ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্য দুই সঙ্গীকে পুলিশ আবার ধরে নিয়ে যায়, সাধু সেখান থেকে কোনোমতে পালিয়ে আসতে পেরেছে। জেলে থাকার সময় তার সবসময় মনে পড়ত গ্রামের মানুষদের কথা। গ্রামে যাওয়ার পথে তেপান্তরের মাথা ভাঙা ধু ধু মাঠে সে গলা ছেড়ে গান ধরে, "বঁধুর লেগে পেরানটা মোর কাঁদে, পরান বঁধুরে"[৩]। গাঁয়ে ফিরবার পথে সাধু দেখতে পায় রাজবাড়িতে স্বাধীনতা উৎসবের ফানুস বাতি জ্বলছে। কিন্তু সাধুর অনেক বেশি জানা দরকার তার গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলির ঘরে একটা সামান্য প্রদীপ জ্বলছে কিনা। সাধু গ্রামে পৌঁছলে আশ পাশের গ্রাম থেকেও মেয়ে-পুরুষেরা ভিড় করে আসে কেননা সাধু সেখ তাদের নেতা। সবাই মিলে দিঘির পাড়ে জমায়েত হয়, সাধু বলে রাজবাড়ির ফানুস আলোটা ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেওয়ার কথা। এই গল্পে মানিক তুলে ধরেছেন স্বাধীনতার আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। বহুদিনের, বহুসাধনার, বহুসংগ্রামের, বহুপ্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালে লাভ করেছিলাম, তা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ, কিন্তু শূন্য স্বার্থপর নেতা ও অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে স্বাধীন দেশের মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিলনা। তাই স্বাধীনতার মোহভঙ্গ হতে সচেতন মানুষের খুব বেশি সময় লাগেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গল্প *পেরানটা*। যখন মানুষ নতুন আশায় আবার বুক বাঁধছে, কোনো রাজনৈতিক পালাবদলের হাত ধরে হয়তো দেশের মানুষের জীবন অনেকটা সুস্থির ও নিরাপদ হয়ে উঠবে।

দিঘি

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই গল্পটি হাসিতুল্লা নামে এক লেঠেলের। কৃষকেরা চায় ফসলের চার ভাগের তিন ভাগ, কিন্তু জমিদাররা জোর করে ফসলের অর্ধেক ভাগ ছিনিয়ে নিতে চায়, আর এই কাজে জমিদাররা ব্যবহার করে ভয়ঙ্কর লেঠেল বাহিনীকে। হাসিতুল্লা জমিদারপ্রভুর একনিষ্ঠ গোলাম। বিভিন্ন সংঘাতে সে জমিদারের জন্য লাঠি ধরে। জমিদার গুন্ডা, পুলিশ ও লেঠেলদের জড়ো করে কৃষকদের শায়েস্তা করতে চায়। সেরকমই এক সংঘর্ষের পূর্বে হাসিতুল্লার ডাক পড়ে জমিদার বাড়িতে। জমিদার বাড়ি যাওয়ার পথে গ্রামের পুরানো দিঘির পাড়ে সে বিশ্রাম নেয়। রাত্রির অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো কৃষকেরা এসে তাকে অনুরোধ করে এই সংঘর্ষে কৃষকদের বিরুদ্ধে লাঠি না ধরার জন্য। কিন্তু হাসিতুল্লা কৃষকদের কথা শোনেনা, সে জমিদার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে দেখে প্রচুর গুন্ডা, খুনি লেঠেল বাহিনী ও পুলিশের ভীষণ সমাগম, যারা প্রকৃত লেঠেলবাহিনী তারা কেউ আসেনি। এসেছে সেই সব লেঠেলরা যারা পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে খুন করে, অসহায় মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে মেরে ফেলে। এত লোকের ভিড়ে হাসুতুল্লার নিজেকে ভীষণ একা মনে হয়। গল্পটির মধ্যে একজন বীর লেঠেলের বেদনার কাহিনি লুকিয়ে রয়েছে।

হারানের নাতজামাই

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটি রচিত। জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষিজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই তেভাগা আন্দোলনে আমরা দেখেছি। গল্পটির সূচনায় আসে তেভাগা আন্দোলনের ইঙ্গিত:

> কনকনে শীতের রাত, বিরাম, বিশ্রাম ছেটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা, শাঁখ আর উলুধ্বনিতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাবের ... শীতের তেভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের, ... ধান দেবেনা বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।[৪]

তেভাগা আন্দোলন ভাগচাষিদের ন্যায্য আদায়ের সংগ্রাম। দেশের অন্যান্য প্রদেশের মতোই বাংলার কৃষকেরাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার হয়েছিল। সারাবছর জমিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তাদের নিত্য সঙ্গী ছিল অর্ধাহার, অনাহার, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, ব্যাধি। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে বাংলার অত্যাচারিত কৃষকদের জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে তিন ভাগ ফসলের দাবিতে প্রবল আন্দোলন শুরু করে যা বাংলার তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগার তেভাগা নাম হওয়ার কারণ জমির মালিক যদি উৎপাদন ব্যায়ের অর্ধেক খরচ না দেয় তাহলে ফসলের

তিনভাগের দুভাগ কৃষকের প্রাপ্য হবে। তাছাড়া কৃষকদের যে কোনো সময় জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবেনা।

নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সেদিন কৃষক সমাজ কিভাবে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। সালিগঞ্জের ছোটোহাটতলা পাড়ায় মাঝরাতে পুলিশ হানা দেয় কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করার জন্য। সরাসরি হারাণের বাড়িতে চড়াও হয় পুলিশ, কেউ নিশ্চই সেই সংবাদ পুলিশকে পাচার করেছে। হারাণের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি করতে চাইলে গ্রামের মানুষেরা বাধা দেয়। মন্মথ দারোগা গুলি চালাবার হুকুম দিলে ময়নার মা এগিয়ে এসে বলে, তারা কোনো চুরি ডাকাতি করে না, যে বাড়িতে আসামী রাখবে। ময়নার মা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় বাড়িতে জামাই এসেছে এবং মেয়ে জামাই ঘরের মধ্যে রয়েছে। ভুবন মন্ডলকে ময়নার মা আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল। তাই পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে, ভুবন মন্ডলকে জেরা করেও কিছু বুঝতে পারে না। ময়নার মা'র উপস্থিত বুদ্ধির কাছে বোকা বনে গিয়ে পুলিশ ফিরে যায়। পরের দিন মন্মথ দারোগা আরো অধিক পুলিশ বাহিনী নিয়ে হারাণের বাড়িতে চড়াও হয়, সেদিন সত্যি সত্যি ময়নার স্বামী জগমোহন আসে এবং পুলিশ ভুবন মন্ডলকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে হারাণের বাড়ির লোকেদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অন্ধকার পথে প্রবল জনসমুদ্রের মুখোমুখি হতে হয় পুলিশকে —

> দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড়ো হচ্ছে। মথুরের ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক পথ আটকায়। রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ দারোগা। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকেদের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে তো লড়া যায় না।[৫]

সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় *হারাণের নাতজামাই* গল্পটি রচিত। গল্পটি রচনার মূলে রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে কমল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন —

> একদিন দিয়ারা স্টেশনে নেমে বড়ো কমলাপুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে এক লম্বা চওড়া লোক — পা'য়ে বুট জুতো, দেখেই চিনে ফেলি —মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানকার আন্দোলনে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার ধরণ দেখে তিনি লেখেন 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি।[৬]

দরিদ্র মানুষের পীড়িত জীবনের কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নেমে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সমাজ-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসে তাই বার বার উঠে আসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নানান শ্রেণির চরিত্র। এই গল্পে শোষক ও শোষিত, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণির চরিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায়

অঙ্কিত হয়েছে তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে। ৪৬ এর তেভাগা আন্দোলনের একটি জীবন্ত দলিল এই গল্পটি।

ধান

দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত *ধান* গল্পটি। শরৎ হালদারের গোলায় পাঁচশ মন ধান মজুত রয়েছে, অথচ তার গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের মানুষজন দুর্ভিক্ষের দিনে একমুঠো খেতে পাচ্ছে না। টাকা দিয়েও ধান পাওয়া যাচ্ছেনা বাজারে। গ্রামের মানুষজন পরামর্শ করে শরৎ হালদারের গোলার ধান লুঠ করে ন্যায্য মূল্যে বাজারে বেচে দেওয়া হবে। খবর পেয়ে রাতারাতি শরৎ হালদার চোরা কারবারী জগৎ কুণ্ডুকে সব ধান বেচে দেয়। রাতের অন্ধকারে মানুষের খাদ্যের ধান পাচার হয়ে যায় জগৎ কুন্ডুর পলাশডাঙার গুদামে। সেখানে গিয়ে গ্রামের মানুষজন গুদামের কর্মচারী নারায়ণকে ধরে। পুলিশে অভিযোগ করলে, পুলিশ লোক দেখানো পরিদর্শনে আসে। গ্রামের মানুষদের ফাঁকি দিতে সব ধান নিয়ে গিয়ে পুলিশের তত্ত্বাবধানে থানার কাছে একটি চালাঘরে লুকিয়ে রাখা হয়। ইতিমধ্যে এই ধানগুলি পচে দুর্গন্ধ ওঠে। মানুষের ক্ষুধার অন্ন, বাঁচবার পাথেয় ধান নিয়ে চোরাকারবারী, কালোবাজারী ও সরকারী কিছু অফিসারদের ষড়যন্ত্রে দরিদ্র মানুষগুলির অসহায়তা প্রকট হয়েছে এই গল্পে। দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির এবং সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে।

সাথী

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত এই গল্পে দরিদ্র চাষি গগন সারারাত মাঠে ফসল কেটে উপবাসী অবস্থায় ঘরে ফিরে দেখে তার জন্য রাখা সামান্য খাদ্যটুকু তার স্ত্রী ক্ষুধার জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে। ক্ষুধার্ত গগন রেগে গিয়ে স্ত্রীকে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতন করে উচিত শিক্ষা দেয়। গগন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আর সে ভাত চুরি করে খাবে কি না। উত্তরে স্ত্রী সোহাগী জানায় চুরি করে হোক, খুন করে হোক সে খাবেই, দরকার হলে গগনকে কেটে তার মাংস রান্না করে খাবে। স্ত্রীর করুণ অবস্থা দেখে গগন অনুতপ্ত হয়, গগণের অনুনয়ে স্ত্রী সোহাগী উঠে এসে তাকে জল দেয় এবং জানায় যেভাবেই হোক চাল জোগাড় করে সে ভাত রান্না করবে। গগন আবার মাঠে যায় ফসল কাটার জন্যে এবং যাবার আগে স্ত্রীর হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করে আর কখনো সে স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবেনা। এ গল্পটি একটি দরিদ্র চাষি দম্পতির গল্প। ঘরে নিত্য অভাব ও দারিদ্র্য তাদের মানসিকতাকে কখনো কখনো বিকৃত করে কিন্তু তাতেও তাদের প্রাণের সহজ ভালোবাসা কখনো মরে না।

গায়েন

একটি কবিয়ালের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের গল্প *গায়েন*। রাজেন কবিয়াল মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ মহামারীর গান গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করত। তার বেদনাময় গানে শ্রোতাদের চোখ জলে ভরে উঠত।

কিন্তু একসময় তার গানের জনপ্রিয়তা কমে যায় এবং নরহরি গায়েনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। নরহরি শুধু দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের গান গায়না, তার গানে আছে প্রতিবাদ প্রতিরোধের আহ্বান। এক আসরে রাজেন নরহরির গান শুনতে যায় এবং বুঝতে পারে নতুন যুগে তাকে নতুন গান বাঁধতে হবে। যে গান শুধু মানুষের দুঃখের কথা নয়, দুঃখকে অতিক্রম করার সাহস ও শক্তি জোগাবে।

বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ক্রমশই আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। সেই সঙ্গে মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা মানুষের জীবনকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। এই সময়ের শ্রমিক, চাষি, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সমস্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল মূল্যবোধের অবক্ষয়। মানিক তাঁর গল্পের চরিত্র খুঁজেছেন মানুষের এই বাস্তব জীবন থেকেই। কোনোরকম আবেগপ্রবণতা ছাড়াই তার নির্মম লেখনী এই সময়ের মানুষের জীবনকে ক্লান্তিহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছে। অনেকগুলি গল্পে স্বাধীনতালাভ পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং তেভাগা আন্দোলনের ছবি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মানিকের লেখনী বঞ্চিত, পীড়িত, অত্যাচারিত, দরিদ্র, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের জীবনকে ঘন মমতায় স্পর্শ করেছে। চল্লিশের দশকের এমন জীবন্ত গল্পগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

গল্পগ্রন্থ-২ : মাটির মাশুল

এটি মানিকের ত্রয়োদশ গল্পগ্রন্থ এবং একত্রিশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৫, প্রকাশক বিমলারঞ্জন প্রকাশন মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪+১৬৩, মূল্য দু টাকা বারো আনা। প্রথম সংস্করণে মোট গল্পসংখ্যা ছিল পনের, গল্পগুলি যথাক্রমে: *মাটির মাশুল, বক্তা, ঘর ও ঘরামি, পারিবারিক, ট্রামে, ধর্ম, দেবতা, নব আলপনা, ব্রিজ, ভয়ঙ্কর, আপদ, পথান্তর, সিদ্ধপুরুষ, হ্যাংলা, বাগদী পাড়া দিয়ে*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:[৭]

ভয়ঙ্কর (নাটিকা)	রূপমঞ্চ	শারদ ১৩৫১
সিদ্ধপুরুষ	রংমশাল	বৈশাখ ১৩৫৩
বক্তা	?	১৩৫৩
পারিবারিক	দ্বন্দ্ব	শ্রাবণ ১৩৫৪
ব্রিজ	অগ্রণী	বৈশাখ ১৩৫৫
নব আলপনা	?	১৩৫৫
আপদ	চলন্তিকা	ভাদ্র ১৩৫৫
বাগদী পাড়া দিয়ে	চলন্তিকা	শারদ ১৩৫৫
মাটির মাশুল	?	?
ঘর ও ঘরামি	?	?
ট্রামে	?	?

ধর্ম	?	?
দেবতা	?	?
কথান্তর	?	?
হ্যাংলা	?	?

মাটির মাশুল

অত্যাচারী, জোতদার, জমিদাররা কিভাবে দরিদ্র, অসহায় চাষিদের ঠকিয়ে সর্বশান্ত করে তুলত, তার উদাহরণ এই গল্পটি। গ্রামের মানুষেরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়, ফসল তুলতে আর কিছু দিন বাকি, কিন্তু দেড় ভাগ সুদে ধান কর্জ করতে তারা কিছুতেই রাজি নয়। কেননা যে পরিমাণ ধান এখন তারা নেবে তার দেড়গুণ পরিমাণ ধান ফেরত দিতে হলে, তাদের অনেকখানি ক্ষতি হবে। ধরণী তরপদার গ্রামের ধনী জোতদার, সে চাষিদের নানাভাবে ঠকিয়ে সর্বশান্ত করে, নানারকম কৌশলে চাষিদের বোকা বানাতে চায়। তার ফাঁদে পা দিয়ে চাষিরা ধান ধার নেয়না, বরং ফিরে এসে পরামর্শ করে ধরনীর অনেকগুলি গোলার মধ্যে একটি গোলা আছে সাতনাতলায়, সেখানে পাহারার লোকজন কম, তাই সেই গোলাটি লুঠ করে তারা ধান ভাগ করে নেবে। এই গল্পে তৎকালীন বাংলাদেশের চাষিদের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের কাহিনি তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের সঙ্গে মানিক তুলে ধরেছেন।

বক্তা

গল্পটিতে মন্ত্র-তন্ত্র, জ্যোতিষ, তুক-তাক, বশীকরণ ইত্যাদি কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক মানিকের তীব্র শ্লেষ ঝরে পড়েছে। গল্পটির মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের একটি প্রচ্ছন্ন কাহিনিও রয়েছে। দোংড়া নামের একটি পুরুষ অন্যকে বশীকরণের তুকতাক মন্ত্র শিখিয়ে দেয়, কিন্তু তার নিজের স্ত্রী'টিই তার বশীভূত নয়। তার স্ত্রীর নাম কাসা, দোংড়ার উপার্জিত অর্থে কাসার চলেনা, তাই সে নিজেও উপার্জন করে। সুব্বা নামের একটি পুরুষ দোংড়ার কাছে বৌ'কে বশীকরণ করার মন্ত্র শেখার জন্য আসে। কাসার সঙ্গে সুব্বার একটি গোপন প্রণয় সম্পর্ক আছে, কাসা মদের বোতল নিয়ে এসে দোংড়াকে বেশি পরিমাণে খাইয়ে দিলে দোংড়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে কাসা ও সুব্বা আড়ালে ঘনিষ্ট হয়। এই গল্পে মানিক তুক-তাক, বশীকরণের কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে তীব্র বিদ্রূপে তুলে ধরেছেন।

ঘর ও ঘরামি

পরাশর ভালো ঘরামি। তার মতো ভালো ঘর ছাইতে এলাকার আর কেউ পারেনা। তার হাতের কাজ নিখুঁত এবং কাজের মধ্যে সে নিজেকে শিল্পীর তুল্য মনে করে। তার বাড়িতে আত্মীয় আসে, অতিথিদের আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সে আবার বাবুদের ঘর ছাইবার কাজে চলে যায়। সে সারাদিন না খেয়ে

এক মনে ঘর ছায় এবং সন্ধ্যার ঘনায়মান মেঘের দিকে তাকিয়ে এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, বাবুদের কাছারি ঘরটিতে আর একটুও জল পড়বেনা। কাজ করতে করতে সে ভুলে যায় বাড়ির কথা, বাড়িতে আগত আত্মীয়ের কথা এমনকি নিজের অনাহারে থাকার কথাও। গল্পটিতে মানিক একজন দরিদ্র গ্রাম্য মানুষের মধ্যে মাটির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন।

পারিবারিক

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী ও দুর্ভিক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবার গুলিকেও নিঃস্ব করে তুলেছিল। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায় অবস্থার কাহিনি *পারিবারিক*। তুমুল বর্ষার দিনে পরিবারের সব সদস্য মাটির ঘরগুলি ছেড়ে দুটিমাত্র পাকা ঘরে জড়ো হয়। তাদের কথাবার্তার মধ্যে সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি, খবরের কাগজের বানানো সংবাদ; মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি, অভাব ইত্যাদি ধরা পড়ে। বাড়ির বৌ কল্পনার জ্বর এলেও একটি মাত্র ভিজে কাপড় পরেই তাকে থাকতে হয়। বড়ো বৌকে একটি কাপড় দেওয়ার অনুরোধ জানালে সে অসম্মত হয়। এই বাড়ির মেয়ে নন্দিনী নিজের পরণের কাপড়টি ছোটোবৌকে দিয়ে একটি থান নিজে পরে সবার সামনে নিজের মনের জোরের পরিচয় দেয়। নন্দিনীর স্বামী অর্থাৎ এই বাড়ির জামাইয়ের আজ আসবার কথা, কিন্তু অভাবের দিনে রান্না হয়েছে শুধুমাত্র ডাল-ভাত আর চিচিঙ্গা চচ্চড়ি। জামাই এলে কি খাবে এই প্রশ্নের উত্তরে নন্দিনী জানায় সবাই যা খাবে তার স্বামীও তাই খাবে। বৃষ্টি একটু কমে গেলে আদ্যপান্ত ভিজে গিয়ে নন্দিনীর স্বামী নিখিল শ্বশুরবাড়ী আসে হাতে দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের অর্থনৈতিক মন্দা ও তার প্রভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির বিপর্যস্ত অবস্থার ছবি এই গল্পটি।

ট্রামে

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকা মূল্যবোধ, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার অবসান ও নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের মেরুকরণ নিয়ে লেখা এই গল্পটি। গল্পের নায়ক চাকরি ক্ষেত্রে ট্রামে যাওয়া আসা করে, ট্রামে সহযাত্রী বা সহযাত্রিনীদের মধ্যে যে সম্পর্ক বা কথাবার্তা বা মনোভঙ্গি প্রকাশ পায় তাই এই গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। ট্রামে, বাসে পুরুষদের পাশাপাশি সাবলীলভাবে পথ চলছে মেয়েরাও। মেয়েদের নিয়ে পুরানো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের সময় এসে গেছে, কিন্তু লেখক লক্ষ্য করেন মেয়েরাই এখন পুরানো দিনের বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মেয়েরা এখনো পুরুষদের কাছে সহজে পাওয়ার বা সুযোগের প্রত্যাশা করে। লেখকের মতে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রত্যাশা করার মধ্যেই রয়েছে প্রচ্ছন্ন আত্মঅবমাননা, কেননা এই মনোভাবে নিজেদের পুরুষদের থেকে দুর্বল বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। লেখকের এক পরিচিত মহিলা লেখককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান নিজের লেখা গান শোনাবেন বলে, মহিলাটি শিক্ষায়, দীক্ষায়, চিন্তায়, যোগ্যতায় পুরুষের সমান হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, কিন্তু আবার ট্রামে কোনো পুরুষ তাকে বসার সিট ছেড়ে দেয়নি বলে ক্ষোভে

ফেটে পড়ে। একদিন ট্রামে ভিড়ের মধ্যে লেখক অসাবধানে এক বিদেশিনিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেন, বিদেশিনির সহজ ব্যবহার লেখকের ভালো লাগে। লেখক ভাবেন বহির্জীবনে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও চলাফেরা নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন হচ্ছে তা আমাদের গ্রহণ করে নিতে হবে। মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত মানসিকতা দিয়ে আমরা যদি মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে সম্মান না দিই তাহলে সেটা মেয়েদেরই ক্ষতি এবং আমাদের সমাজের ক্ষতি।

ধর্ম

শিক্ষিত বুদ্ধি ও মার্জিত রুচির দম্পতি সৌমেন এবং তমশার মধ্যে প্রায় কলহ বাধে। তারা একে অপরের সমালোচনা করে, সূক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত কথাবার্তায় একে অপরকে আঘাত করে। তাদের সংসারে অভাব না থাকলেও সুখ ও শান্তির বড়োই অভাব। তাদেরই পাশের ঘরের বাসিন্দা নির্মল ও নলিনীর দাম্পত্য জীবনে কলহের অবসান ঘটেছে পূজা ও ধর্মে মনোনিবেশ করায়। তারা সৌমেন তমশাকেও ধর্মে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেয়। সৌমেনরা ঠিক করে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। বেড়াতে যাওয়ার পথে নির্মলদের গ্রাম পড়ে বলে সেখানেও দুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

নির্মলদের গ্রামে যাওয়ার পথে সত্যাগ্রহরত শ্রমিকদের ওপর জমিদারের অত্যাচার দেখে নির্মল ও সৌমেন দুজনেই শ্রমিকদের প্রতি সহমর্মী হয়ে পড়ে। তারা বিকেলে শ্রমিকদের সভায় যায়, শ্রমিকদের সমস্যার কথা শোনে। নতুন যুগের নতুন ধর্ম খুঁজে পায় তারা। জীবনে পুরানো মূল্যবোধগুলি ক্রমশ খসে পড়ছে এবং নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে, যুগের সেই ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারার নামই আধুনিকতা। তাত্ত্বিক দিক থেকে মানিক এই গল্পে সমকালীন শ্রেণি সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন।

দেবতা

ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ভাবাবেগকে মানিক কোনোদিনই প্রশ্রয় দেননি। এই গল্পে ব্রজদুর্লভবাবু এক মফঃসল শহরের হাকিম হয়ে আসেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ধার্মিক হয়ে ওঠেন এবং ভাবাবেগে আকুল হয়ে কীর্তন পরিবেশন করে মানুষকে আপ্লুত করেন। ব্রজদুর্লভবাবুর ভাবব্যাকুল কীর্তন শুনে শ্রোতাদের চোখে জল আসে, তারা আসর ছেড়ে উঠতে চায় না। এক কিশোর এই কীর্তন শুনে ভাব-বিহ্বল হয়ে কাঁদে এবং রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ধর্মোন্মাদনা জেগে ওঠে। নিষিদ্ধ কামনায় ব্রজদুর্লভবাবুর স্ত্রী মাধবীকে নগ্ন দেখে। কিশোরটি স্কুল থেকে পালিয়ে যায় মাধবীর কাছে। মাধবী পুজা সেরে প্রসাদ বাতাসা শশা কিশোরকে দেয় এবং নিজেও খায়। তেতো শশার টুকরো মুখে দিয়েই মাধবী দূরে উঠোনের নোংরার মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। কিশোরটি হতবাক হয়ে ভাবে পূজোর প্রসাদ কি এভাবে কেউ ছুঁড়ে দিতে পারে। মাধবী চলে গেলে কিশোর উঠোনের নোংরা থেকে কুড়িয়ে চেবানো শশার টুকরোটি

মুখে পুরে নেয়। ধর্মোন্মাদনা কতখানি বিকারগ্রস্ত হতে পারে এবং একটি কিশোরের মনকে কতদূর অস্বাভাবিক ও বিকৃত করতে পারে তা দেখিয়েছেন মানিক এই গল্পে।

নব আলপনা

গল্পটিতে বস্তিবাসী নীচু শ্রেণির মানুষের প্রতি উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে। বস্তিবাসী একটি মেয়ে চুনো টুকরি করে কয়লা বিক্রি করে। তার একটি খোঁড়া ভাই ছিল, ভাইটি রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। স্থানিয় জনতা গাড়ির চালক ও সহকারিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। মিলিটারী আসে, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সকাল বেলাতে রাজপথ শ্মশানে পরিণত হয়। একটি বিড়ি দোকানের টিনের ঝোলানো ঝাঁপের ভেতর থেকে চুনো দেখে তার ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে আছে। এই পাড়ারই ধনী পরিবারের সুখী রমণী শ্রীমতি গাড়ি করে যেতে যেতে চুনোর ভাইয়ের মরা দেহটার দিকে তাকিয়ে শুধু সহানুভূতি সূচক শব্দ উচ্চারণ করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সমাজ সচেতন লেখক মানিকের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি ধরা পড়েছে এই গল্পে।

ব্রিজ

এই গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে হাওড়া ব্রিজ। দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত এই গল্পটিতে একটি ট্রেন দশঘণ্টা দেরিতে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছায়। মধ্যভারতের কোনো একটি স্টেশনে গোরা সৈনিকরা মদ্যপানের সঙ্গে দেশি রমণীদের ভোগ করতে চাইলে সেখানকার জনতা প্রতিবাদ করে গন্ডগোল বাঁধায়। গন্ডগোলের মধ্যে ট্রেনটি পড়ে যায় ফলে বহুলোক হতাহত হয়। আবার ট্রেনটি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে জানা যায় কলকাতাতে চারিদিকে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সেই দাঙ্গায় মরছে সাধারণ, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান। আধুনিকতার একটি নমুনা হিসেবে গঙ্গার উপর হাওড়া ব্রিজ তৈরি করেছে ইংরেজরা। কিন্তু সেই আধুনিকতার কোনো সভ্য লক্ষণ ইংরেজদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। দাঙ্গা লাগিয়ে মানুষের সর্বনাশ করছে। এরকম একটি বিদ্রূপ গল্পটিতে মানিক তুলে ধরেছেন।

ভয়ঙ্কর

ভেজাল গল্পগ্রন্থের *ভয়ঙ্কর* গল্পটিরই নাট্যরূপ এটি। দুটি রচনার বক্তব্য একই হওয়ায় আলোচনার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আপদ

বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিকে দেশবাসী যেভাবে সাগ্রহে তাকিয়ে ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই স্বপ্ন অনেকটাই ভেঙে যায়। কণাদ নামের কেরানি স্বাধীনতার লড়াইতে ছিল আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক। যুদ্ধ, বোমাতঙ্ক, দুর্ভিক্ষকে সে ও তার স্ত্রী হাসিমুখে পিছনে ফেলে এসেছে এবং স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীন

ভারতে এই অসহায়তা ও অভাব আর থাকবেনা। কিন্তু মুনাফালোভী চোরাকারবারীদের চক্রান্তে স্বাধীন দেশের মানুষদের অবস্থা আজ শোচনীয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আজকের এই প্রাপ্ত স্বাধীনতার মধ্যে কণাদ কোনো মিল খুঁজে পায় না। তাই তার দৃষ্টিতে এই প্রাপ্ত স্বাধীনতা অনেকটা যেন আপদের মতো।

পথান্তর

ধনী রাঘব চৌধুরীর ছেলে অতুল নিম্নশ্রেণির মানুষের দুঃখে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে এসেছে বন্যাত্রাণে পীড়িত মানুষদের সহায়তা করতে। ধনীর অহংকার ও স্বার্থপরতা তার মধ্যে নেই, আছে প্রগতিশীল মুক্ত চিন্তার ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমতা। তার জমিদার বাবা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করবে বলে বজরা নিয়ে শহরে যায়। বন্যা কবলিত জলমগ্ন এলাকায় অতুল, রাসমণি ও রাখহরি নৌকাগুলিকে নিশান তুলে পথ দেখাচ্ছিল ঘূর্ণাবর্তে না পড়ার জন্য। অতুল নিজের পরিচয় গোপন রেখে পীড়িত মানুষের জন্য কাজ করে যায়। তাদের জমিদারির এক ইজারাদার যোগেন সাহেবের গোলা থেকে ধান লুঠ করে নিয়ে ন্যায্য দামে মানুষের মধ্যে বিক্রি করে দেয়। গল্পটির নাম *পথান্তর*। গল্পটির মধ্যে নতুন পথের প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ রয়েছে। অতুলের পূর্বপুরুষেরা যে পথে চলে এসেছে, অতুল সে পথে যায়নি। সে বেছে নিয়েছে নিপীড়িত, অসহায়, দরিদ্র মানুষদের পথ।

সিদ্ধপুরুষ

এই গল্পে নিখিল নামের এক বড়োলোকের পুত্র পুজোর দিন গুলোতে বন্ধু অজিতের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বায়না করে। কিন্তু বাড়ির লোক তাকে ছাড়তে রাজি হয়নি। অনেক অনুনয় করে সে দশমীর দিন সম্মতি পায় বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার জন্য। তার আগ্রহ ছিল ঢুলির জয়যাত্রা দেখা। বন্ধুর বাড়ি পৌঁছতে তাকে অনভ্যস্ত পায়ে হাঁটতে হয়, পথে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে, না বুঝে কয়েক গ্লাস বুনো দেশি সিদ্ধির সরবত খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে সে। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় সে হারিয়ে যায় এবং অনেক দূরে অন্য জায়গায় চারদিন পরে তার জ্ঞান ফিরে। জ্ঞান ফিরে সে দেখে এক গ্রাম্য গরিব চাষির কুঁড়ে ঘরে সে শুয়ে আছে। মাথার চুল নেড়া করে সেখানে শক্ত ওষুধ বাঁধা রয়েছে। সে জানতে পারে গ্রামের অচেনা পথে পাগলামি করছিল সে, তাকে পথ থেকে দরিদ্র চাষিটি নিয়ে এসে সারিয়ে তুলেছে। দরিদ্র চাষিটির মাধ্যমেই নিখিল শহরের বাড়িতে খবর পাঠায়, বাড়ির লোক নিতে এলে নিখিল অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতাটুকু ভুলে গিয়ে দরিদ্র চাষিটির উপর অত্যাচার ও অমানবিক আচরণ করে। তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ের অমানবিকতা ও হৃদয়হীনতাকে এই গল্পে তুলে ধরেছেন মানিক।

হ্যাংলা

শহুরে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষদের চারিত্রিক অসঙ্গতি এই গল্পের বিষয়। মথুরামোহনের মতো মধ্যবিত্ত মানুষেরা ধনী লোকেদের অনুকম্পা পাওয়ার জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত তোষামোদ করে এবং ধনী মানুষগুলির চোখে হ্যাংলা বলে প্রতিপন্ন হয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপমানবোধ এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে

এই গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প এটি। নিচু জাতের বাগ্‌দী সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে সমাজে অবহেলিত এবং পীড়িত। কিন্তু যুগের ধর্ম অনুসারে একদিন তাদের মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা জেগে ওঠে এবং তারা সামাজিক পীড়নের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। নতুন যুগের ভাবাবেগ এবং পুরানো অচলায়তনের মতো সমাজের বুকে চেপে বসা মূল্যবোধের সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে এই গল্পে। বাগ্‌দী সম্প্রদায়ের প্রধান দুলে বাগ্‌দী তার গোটা জাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারার জন্য জমিদারের কাছে নালিশ করতে যায়। আসলে বাগ্‌দী পাড়ার কয়েকজন তরুণ, যারা শহরে কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল তারা ফিরে আাসে নতুন চিন্তা নতুন বিশ্বাস নিয়ে। তারা মনে করে তারা সজ্জাত অর্থাৎ সৎজাত। কেননা তারা পরিশ্রম করে, শ্রম না করে তারা খায়না, চুরি করেনা। তাদের বাগদী পাড়ার নিচু জায়গায় জল জমে থেকে পচে গিয়ে তীব্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। শিবঠাকুরের মন্দির করার জন্য এভাবে জল বাঁধা হয়ে যায়, আর বেরোতে পথ পায়না। সংস্কারমুক্ত বাগদী পাড়ার উৎসাহী তরুণরা মন্দিরের চাতাল কেটে সেই জল বের করার ব্যবস্থা করে। দুলের ধারণা এতে দেবতার কোপে তাদের পড়তে হবে। তাই সে নায়েবের কাছে নালিশ জানিয়ে ফিরে আসে। এসে দেখে শ খানেক নর-নারী কোদাল-খান্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করছে। সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, পুলিশ জমিদারের ভয় দেখায়। এক বাগদী মেয়ে এগিয়ে এসে খান্তার আঘাতে দুলের মাথা ফাটিয়ে দেয়। তারপর জল নিকাশের সুড়ঙ্গ কাটা হলে জলের স্রোতে সকলে ধরাধরি করে দুলের দেহ সেই জলে ভাসিয়ে দেয়। গল্পের বৈশিষ্ট্য এর সমাজসত্যের উদ্‌ঘাটনে। দীর্ঘদিনের চলে আসা ধারণা ও সংস্কারকে ত্যাগ করে নতুন চেতনাকে গ্রহণ করতে না পারলে তার পরিণতি দুলে বাগদীর মতোই হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত কাম্য প্রত্যাশাগুলি মানুষের পূর্ণ হয়নি। শাসকের স্বৈরাচারী মনোভাব, অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে কালোবাজারী, মজুতদারী ও মূল্যবৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব, বেকারত্বের জ্বালা মানুষের মনে অল্পদিনের মধ্যেই হতাশা, ক্ষোভ তৈরি করেছিল। বিশেষত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সমাজের মধ্যে মানিক খুঁজে নিয়েছেন তাঁর গল্পের চরিত্রদের। মার্কসবাদী চেতনায় শিক্ষিত মানিক নিখুঁত পর্যবেক্ষণে বুঝিয়ে দিলেন সমাজের

শ্রেণিবৈষম্যের স্বরূপ। তাঁর এই পর্বের গল্পগুলির চরিত্ররা সামাজিক শ্রেণি নির্দেশিত বৈষম্য ও পীড়নের শিকার।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, পৃ. ৪৬৭।

২. 'তথাকথিত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৩. 'পেরানটা' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪. 'হারানের নাতজামাই', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।

৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটগল্প, যুগান্তর, ১৭.৪.৯৪।

৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৬ষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।

১৯৪৯

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের একচল্লিশতম বছর। পারিবারিক ঝামেলা, প্রবল অর্থাভাব, অসুস্থতা ইত্যাদির মধ্যেও মানিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশে ঘটে চলেছে নানান ঘটনা। মানিক সচেতন দৃষ্টি রাখছেন চারপাশে এই সব ঘটতে থাকা ঘটনার উপর। সংবিধান খসড়া কমিটির তৈরি সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক ২৬শে নভেম্বর গৃহীত হয়। এই সংবিধান কমিটির সদস্যরা হলেন — বি. আর. আম্বেদকর, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. মুন্সী, ভি. মি. খৈতান ও বি. এল. মিত্র প্রমুখ। এবছরেই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারতে আসেন।

জানুয়ারি	রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত 'সোভিয়েত লেখক সমিতি' গড়ে ওঠে। লেখার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ না থাকলে লেখা বাজেয়াপ্ত হতে থাকে।
জানুয়ারি ১১	উদ্বাস্তু আন্দোলন। উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি।
জানুয়ারি ১৫	ভারতে স্থলবাহিনীর সেনা দিবস হিসাবে এই দিনটিকে প্রথম পালন করা হয়। ভারতের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (সেনাধ্যক্ষ) হন জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পার।
জানুয়ারি ২১	চীনের কমিউনিস্টরা বেজিং অধিকার করে।
ফেব্রুয়ারি ৪	ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের ১৭৬ বছর পর এটিকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল।
ফেব্রুয়ারি ১০	গান্ধিজির হত্যাকাণ্ডের মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করা হয়। নাথুরাম গড্সেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।
মে ১২	সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।
মে ১৭	ভারত কমনওয়েলথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।
জুন ৯	স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট নেতা প্রভাত কুন্ডু ও সুমথ চৌধুরী দমদম জেলে নিহত হন।
জুন ১৯	চন্দননগরের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করেন চন্দননগর ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।
জুন ২৩	পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি মুসলিম লিগ এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর আওয়ামি মুসলিম লিগ থেকে মুসলিম কথাটি বাদ দেওয়া হয়।
জুলাই ১	ত্রাভাঙ্কোর ও কোচিন রাজ্য একত্রিত করে ত্রাভাঙ্কোর কোচিন রাজ্য গঠিত হয়। ১-১১-১৯৫৬ তারিখে ত্রাভাঙ্কোর কোচিন এবং মালাবার এক হয়ে কেরালা রাজ্য গঠিত হয়।
আগস্ট ২৪	'ন্যাটো' প্রতিষ্ঠিত হয়।
সেপ্টেম্বর ২	জাপান চীনের নানকিঙ আক্রমণ করে। একদিনেই ১৭০০ জনের মৃত্যু হয়।
সেপ্টেম্বর ১২	কোচবিহারের ভারতে অন্তর্ভুক্তির চুক্তি করেন রাজা জগদ্বীগেন্দ্র নারায়ণ এবং ভারত সরকার, ১-১-১৯৫০ তারিখে কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় পরিণত হয়।
সেপ্টেম্বর ১৪	ভারতীয় আইনসভা হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়।

সেপ্টেম্বর ১৫ পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের সূচনা হয়।

সেপ্টেম্বর ২১ চিয়াং কাইসেকের জাতীয় সেনা বাহিনীকে পরাস্ত করে চীনে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেপ্টেম্বর ২৩ সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

অক্টোবর ৭ জার্মানিতে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এডগার অ্যালান পো প্রয়াত হন। জন্ম ১৯.০১.১৮৭৯।

অক্টোবর ৯ ভারতে টেরিটোরিয়াল আর্মি গঠিত হয়। এদিনই ত্রিপুরা, মণিপুর ও বারানসী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নভেম্বর ২৬ ভারতের সংবিধান পরিষদে ভারতের সংবিধান অনুমোদন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাক্ষর করেন। সংবিধান তৈরি করতে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন সময় লেগেছিল।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — এনামুল হক : *ডিঙ্গি* / বনফুল : *বনফুলের কবিতা* / বিমলচন্দ্র ঘোষ : *নানকিং* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *প্রেম যুগে যুগে*। **নাটক** — মনোজ বসু : *রাখিবন্ধন* / দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *মোকাবিলা*। **উপন্যাস** — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : *ছায়াপথিক* / বনফুল : *নবদিগন্ত* / বুদ্ধদেব বসু : *তিথিডোর* / সতীনাথ ভাদুড়ী : *ঢোঁড়াই চরিত মানস, চিত্রগুপ্তের ফাইল* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *অক্ষরে অক্ষরে, সঙ্গিনী* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *ট্রফি* / রমাপদ চৌধুরী : *স্বর্ণমারীচ*। **গল্পগ্রন্থ** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *জ্যোতিরিঙ্গন* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *চড়াই উতরাই*। **প্রবন্ধ** — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* / সৈয়দ মুজতবা আলি : *দেশে বিদেশে*।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুস সামাদ, ওয়াজেদ আলি, জহর সেনগুপ্ত, নীরদ রায়, তপোধীর ভট্টাচার্য, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, বিষ্ণু সামন্ত, সন্তোষকুমার মাজী, স্বপনকুমার রায়, সেলিম আল দীন।

মৃত্যু : কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, সরোজিনী নাইডু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

এই বছরটি মানিকের ব্যক্তিগত জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। অবসর গ্রহণের পরে মানিকের পিতা টালিগঞ্জের যে বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন, দীর্ঘ বার বছর বসবাস করার পর মানিকের পিতা বাড়িটি বিক্রি করে দিলেন। একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এবং পুত্রদের স্বার্থপর মনোভাব দেখে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ৪৫ হাজার টাকায় বাড়ি বিক্রি করে ছেলেদের মধ্যে টাকা ভাগ করে দেন। মানিক বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে আট হাজার টাকা পেয়েছিলেন। বরানগর

গোপাল লাল ঠাকুর রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে মানিক উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন তিনি এখানেই ছিলেন। পারিবারিক মালিন্য ও বিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে যেন তিনি কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ভাইদের স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা মানিকের মনকে ক্রমাগত বিষিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি বিক্রির টাকা পুত্রদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিয়ে মানিকের পিতা পুত্রদের কাছে গলগ্রহ হয়ে পড়েছিলেন। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পুত্রদের পরিবারে স্বাচ্ছন্দবোধ না করায় মানিক অসহায় পিতাকে নিয়ে আসেন বরানগরের তাঁর দু-কামরার অপরিসর ভাড়াবাড়িতে। বাইরের ঘরে ক্যানভাসের পার্টিশন দিয়ে সেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই বাড়িতে বসেই পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর পিতৃভক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যু। মানিকের মৃত্যুর দু-বছর পর ৮৭ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।[১]

এবছরে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ছাত্র আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। ২১ জানুয়ারি কলেজ স্কোয়ারে ছাত্র মিছিলে পুলিশি বর্বরতায় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে তার প্রতিবাদে ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বিবৃতি দেন মানিক। *পরিচয়* পত্রিকায় মাঘ ১৩৫০ সংখ্যায় ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে *মানবতার বিচার* শীর্ষক লেখাটি সম্পাদকীয় কলমে মুদ্রিত হয়। মানিক লিখেছেন —

> আমি সাহিত্যিক, ভাষার কারবারী; কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে (১৮ই জানুয়ারী) এই মহানগরীর বুকে যে ভাবে ছাত্রদলনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে তার নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই। ... যে কোন সুস্থ-মস্তিস্ক দেশপ্রেমিকের কাছে এই কথাটাই প্রথম ও প্রধান হয়ে উঠবে যে এক অন্যায় ও অসঙ্গত আইনের টেকনিক্যাল মর্যাদা রক্ষার অজুহাতে পুলিশের গুলিতে এতগুলি তরুণ ছাত্রের জীবনের অবসান হয়েছে, বহু মানুষের রক্তপাত ঘটেছে। শুধু এই মর্মান্তিক সত্য থেকেই বিচার বিবেচনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব। নতুবা মানবতা সভ্যতা সংস্কৃতির মূল নৈতিক ভিত্তিকেই অস্বীকার করতে হয় যে, আইনের জন্য জীবন নয়, তরুণের উষ্ণ রক্ত নয়, জীবনের জন্যই আইন, রক্তের মর্যাদা রাখবার জন্যই আইন।
>
> ... অসহ্য অবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের সঙ্গত প্রতিবাদ একথাই প্রমাণ করে — তাদের সচেতন ন্যায়-অন্যায় বোধ কত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। নিজেদের অন্যায় সম্পর্কে সরকারী ভীরুতাই হিংসায় দিশে হারিয়ে ছাত্র হত্যা করেছে, ছাত্রদমনে শিক্ষাভবনে ও রাজপথে মিলিটারী নামিয়েছে। এমনই আমাদের স্বাধীনতা জুটেছে যে দেশ বিপন্ন হলে যে ছাত্রদের ভরসা করবে, দলে দলে যারা সৈনিক হয়ে প্রাণ দিতে গেলে তবেই দেশ রক্ষা পাবে — আজ সেই ছাত্রদের খালি হাতে দেশেরই সশস্ত্র সৈন্য পুলিশের সাথে লড়াই করে প্রাণ দিতে হয়। স্বাধীনতার স্বাদ ইতিমধ্যেই তিতো হয়ে গিয়েছিল, আজ বিষাক্ত লাগছে। ... "ঘটনাস্থল কাকদ্বীপ নয়, বুধাখালি নয়; ঘটনাস্থল কলকাতার কলেজ স্কোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। দু'শ বৎসরের ইংরেজ রাজত্বে যেখানে যা ঘটেনি, দু'বৎসরের অহিংসার রাজত্বে সেখানেই তার প্রয়োজন হল আজ — ছাত্র হত্যা।

...সাময়িক কালের অন্তরের যে সত্যকে সাধারণ চোখে ঝাপসা দেখে, বোঝে অস্পষ্টভাবে, সাহিত্যিক তার মর্মমূল পর্যন্ত দেখতে পান, আর তাই আবার প্রকাশিত ক'রে দেখান অন্য সকলকে।... এ শুধু বিবৃতি নয়, এ সাহিত্যের স্বাক্ষর এবং ইতিহাসেরও বিচার।"[২]

২৬ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন। সভা অনুষ্ঠানের আগে কোচবিহারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ১৪ এপ্রিল সিটি কলেজের ছাত্রদের আমন্ত্রণে নববর্ষ অনুষ্ঠানে অতিথি হন। ২২ এপ্রিল প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মানিক সভাপতিত্ব করেন। সংঘের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সম্পাদক হিসেবে তিনি সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। নভেম্বরে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে দেশপ্রিয় পার্কে সারা ভারত শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সমাবেশে মানিক সভাপতিত্ব করেন। ডিসেম্বরে বক্সা ক্যাম্পে বন্দিদের মুক্তির দাবীতে *পরিচয়* পত্রিকায় বলিষ্ঠ বিবৃতি দেন। ডায়েরিতে তিনি লিখছেন : "রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য প্রতিদিন হাঙ্গামা চলছে। আন্দোলন আরোও জোরালো হওয়া উচিত ছিল। বিনাবিচারে মানুষকে আটকে রাখা — এই স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করা যায় না।"[৩]

এই সময়ে সারা বাংলাদেশে কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। সেই কারণে বড়া-কমলাপুরেও দেখা দেয় পুলিশী সন্ত্রাস। মানিক নিজে সেখানে গিয়েছিলেন আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজ নিতে। কমিউনিস্টদের উপর সরকারি আক্রমণ তীব্রতা লাভ করে। সেই আক্রমণের ধাক্কা মানিক বাবুর গায়ে এসেও লাগে। কমিউনিস্টদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার অপরাধে বহু প্রকাশকের দরজা মানিকের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি শারদীয় পত্রিকাগুলিতেও তাঁর লেখার চাহিদা কমে যায়। চারিদিকের এই আক্রমণে মানিক ভীত হয়ে পড়েন। অথচ লেখাই মানিকের একমাত্র পেশা, আয় নেই অথচ ব্যয় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। যুদ্ধোত্তর পর্বে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিতে তখন সবারই বেসামাল অবস্থা। ফলে মানিক পড়লেন দারুণ আর্থিক কষ্টে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে এই আর্থিক অসহায়তার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে।

এপ্রিলে *পরিচয়* পত্রিকায় *সাহিত্যিক ও গুন্ডামী* শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৮ জুলাই মুক্তি লাভ করে চলচ্চিত্র *পুতুল নাচের ইতিকথা*। জুলাইয়ে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ — *ছোটবকুলপুরের যাত্রী*। গল্প প্রকাশ: 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' (*দেশ*, শারদ সংখ্যা), 'দু আনা আর দু পয়সা' (*মৌচাক*, জানুয়ারি)।

গল্পগ্রন্থ-১ : ছোটোবকুলপুরের যাত্রী

এটি মানিকের চতুর্দশ গল্পগ্রন্থ এবং বত্রিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৫৬, প্রকাশক ইণ্টারন্যাশন্যল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৬ +৯২, মূল্য দু-টাকা। এই সংস্করণে মোট

গল্পসংখ্যা আট। গল্পগুলির শিরোনাম: *ছোটোবকুলপুরের যাত্রী, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা*। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:[৪]

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী	সংবাদ	শারদ ১৩৫৫
মেজাজ	অরণি	শারদ ১৩৫৫
প্রাণাধিক	বসুমতী	শারদ ১৩৫৫
সখী	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা	শারদ ১৩৫৫
নিচু চোখে দু আনা আর দু পয়সা	চতুরঙ্গ	আশ্বিন ১৩৫৫
ঘর করলাম বাহির	?	?
নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা	?	?

ছোটবকুলপুরের যাত্রী

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি এদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে দুর্বিসহ শোষণ ও নিপীড়ন তীব্রতর করে তুলেছিল; তাতে আসন্ন স্বাধীনতা দেশকে যে অসহায় পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে, তারই আভাস প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত হচ্ছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা দেওয়ালে মানুষের পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছিল। বেঁচে থাকাটাই মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এই অবস্থায় প্রতি আক্রমণের রিফ্লেক্স অ্যাকশন আসতে বাধ্য। তাই সমাজে গড়ে উঠছিল নানা অসন্তোষ, বিদ্রোহ। প্রাকৃতিক কারণেই নানান অত্যাচারের ঘটনা মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে শিখিয়েছিল — তেভাগা আন্দোলন তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ভাগচাষির সমস্যা দিনকে দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক সভার মধ্য দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের পরিকল্পনা গড়ে তোলে। যে সমস্ত জায়গায় পার্টির ভালো সংগঠন ছিল; যেমন রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর — সেখান থেকে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ধীরে ধীরে তা অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল ভাগচাষিরা ফসলের আধাভাগের বদলে তিনভাগের দুইভাগ নেবে এবং বেআইনি কোন আদায় জোতদার মহাজনকে দেওয়া হবে না। আওয়াজ উঠল — জান দিব তবু ধান দিব না। বাংলার কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন প্রগতিশীল মানুষকে সচকিত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। মানিক এই তেভাগা আন্দোলনের পটচিত্র তাঁর একাধিক গল্পে তুলে ধরেছেন।

ছোটবকুলপুরের যাত্রী গল্পটিতে কাহিনি বিশেষ কিছু নেই, যা আছে তা হল তেভাগা আন্দোলনের টানটান উত্তেজনাময় পরিবেশ ও পুলিশী অত্যাচারের বর্বরতার কাহিনি। গ্রামের বাইরে স্টেশন এলাকার এক কারখানায় ধর্মঘটি শ্রমিকদের মধ্যে থেকে তিনজন শ্রমিক নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেওয়ার সময় স্টেশনে ভীষণ হাঙ্গামা হয়। কয়েকশ শ্রমিক এসে তাদের নেতাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল পুলিশের হাত থেকে। শ্রমিকদের বিক্ষোভকে স্তব্ধ করতে পুলিশ গুলি চালায় এবং রক্তপাত ঘটে। গোটা স্টেশন চত্বর এবং কয়েকটি গ্রামকে পুলিশ ঘিরে রেখেছে যাতে কেউ বাইরে থেকে প্রবেশ করতে না পারে বা

বাইরে চলে যেতে না পারে। এরকম থমথমে ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিবাকর, তার স্ত্রী ও শিশুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে ছোটবকুলপুর যাওয়ার জন্য। ছোটোবকুলপুর যাবে শুনে সবাই চমকে ওঠে, জিজ্ঞেস করলে দিবাকর নির্দ্বিধায় উত্তর দেয় "খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয় কুটুম সেথা আছে, খফর নিতে এয়েছি তার বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।"[৫] ছোটবকুলপুর যাওয়ার জন্য গাড়ি প্রয়োজন কিন্তু কেউ যেতে রাজি হয় না। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত গগন ঘোষ কমলতলা অবধি যেতে রাজি হয়। বাকি পথটুকু হাঁটার জন্য রাজি হয় তারা। পথে নানা রকম বাধাবিপত্তি আসে, ছোটবকুলপুরের প্রান্তে পৌঁছালে অনেকগুলি টর্চের আলো গরুর গাড়ির উপর এসে পড়ে। ভারি বুটের শব্দ ও হাঁকডাক শোনা যায়। পুলিশ নানাভাবে দিবাকরকে জেরা করে কিন্তু বিপদজনক কিছুর সন্ধান পায়না। দিবাকরের পকেট থেকে বের হয় সাজাপান, তিনজন পুলিশ পান তিনটি মুখে পুরে নেয়, একজন লণ্ঠনের আলোয় ছাপানো কাগজে চোখ রেখে বিদ্যুৎপৃষ্টের মত ছিটকে আসে লেখা দেখে — ছোটোবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি এবং এতক্ষণ তারা যা সন্ধান করছিল, তার উৎস খুঁজে পেয়ে উত্তেজিত হয় এবং দিবাকরের প্রকৃত পরিচয় জানতে চায়।

গল্পে দিবাকর ও তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা তাদের জিনিসপত্র তল্লাসি করার মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীর অত্যাচারী রূপের প্রকাশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও সংগ্রামের কাছে পুলিশ বাহিনীর ভীত চেহারা ও গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই ছোটোবকুলপুরকে বাইরে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে মানুষের সংগ্রাম আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে পুলিশ বাহিনী। এই গল্পে গণ-আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রেণিসচেতনতা ও প্রতিরোধের ক্ষমতাকে মানিক প্রাধান্য দিয়েছেন। সাম্যবাদী দৃষ্টি দিয়ে মানিক বোঝাতে চেয়েছেন শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা না এলে সমাজ পরিবর্তিত হবে না। শ্রমিক কৃষক শ্রেণির সংঘবদ্ধ প্রয়াসই সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে।

মেজাজ

এটি দরিদ্র ভাগচাষি ভৈরবের জীবনের করুণ গল্প। অসম্ভব রাগী ও জেদী ভৈরবকে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ভয় পায়। গ্রামের ধনী ব্যবসায়ি রাখালবাবু ধান চালের চোরা চালান করে। কিন্তু গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রাখালের এই চোরা চালান বন্ধ করে দেয়। রাখাল রাগে ক্ষোভে গুণ্ডা লাগিয়ে গ্রামের মানুষদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। গ্রামের মানুষেরা সংঘবদ্ধ চেষ্টায় সে অত্যাচার আটকায়। পাড়া থেকে দূরে বাস করত ভৈরব স্ত্রী পুত্র নিয়ে। গুণ্ডারা ভৈরবের বাড়ি চড়াও হয়ে ভৈরব ও তার শিশুপুত্রটিকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তার স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে পালিয়ে যায়। বাঁধনের চাপে ভৈরবের শিশুটি মারা যায়। এই ঘটনায় ভৈরব একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, সে গ্রামরক্ষী দলে নাম লেখায়, পাড়ার মধ্যে গিয়ে বাস করে এবং আবার গুণ্ডার দল এই রকম আক্রমণ করতে এলে ভৈরব

লোকজন সঙ্গে নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই গল্পে মানিক দেখাতে চেয়েছেন যেভাবে সাধারণ মানুষের ওপর নানারকম অত্যাচার নেমে আসছে তাতে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে জীবনে নেমে আসবে নানান দুঃখ-দুর্গতি। তাই ভৈরবের চারিত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানিক সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিতে চেয়েছেন।

প্রাণাধিক

এই গল্পে জীবনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে আদর্শ ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দরিদ্র কেরাণি অবনীর এককালের বন্ধু জ্যোতির্ময় নানারকম অবৈধ ব্যবসা করে বড়লোকে পরিণত হয়েছে। জ্যোতির্ময় একটি চোরাকারবারি এজেন্সি খুলিয়ে অবনীকেও একাজ করাতে চায়। সারাজীবনের বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের পর বৃদ্ধ বয়সে এমন অবৈধ সংসর্গ এবং বেআইনি অর্থাগমের সম্ভাবনায় উত্তেজিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমের মধ্যেই অবনীর পিতা মারা যান। অবনী জ্যোতির্ময়ের চোরা কারবারের প্রস্তাবে রাজি হয় না। জীবনে দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও সে পিতার মতোই আদর্শ ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকে।

ঘর করলাম বাহির

শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পটিতে ধর্মঘট পালন করা নিয়ে কেরাণিদের মধ্যেও নানারকম সমস্যা দেখা দিল। অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সমস্ত মানুষেরাই ধর্মঘটে সামিল হয়। পশুপতি অফিসের কেরাণি হলেও উঁচু পদে থাকার জন্য তার মাইনে অনেকটাই বেশি। সেও ধর্মঘটে সামিল হয় কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে। তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন ধর্মঘটে যোগ না দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করে, এমনকি পশুপতি ধর্মঘটে যোগ দিলে বাড়িতে সবাই পশুপতির বিরুদ্ধে অরন্ধন পালন করে। পশুপতি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার সস্তা হোটেলে ভাত খায়। শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যরা পশুপতির ভাবনাকে সম্মান জানায় এবং তাদের মনোভাবের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। শ্রমিক আন্দোলন এবং একজন শ্রমিকের মানসিক দৃঢ়তা তুলে ধরে মানিক সমকালের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি নিজের সমর্থন জানিয়েছেন এই গল্পে।

সখি

যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির দৈনন্দিন দিনযাপনও খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের তথাকথিত ভদ্রতা বজায় রাখতে গিয়ে তাদের অবস্থা আরো করুণ হয়ে উঠত। বিভা আর রাণি একসময়ের ঘনিষ্ট বান্ধবী, এখন দুই দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী। তাদের রোজকার জীবনের সমস্যা, অভাব ও শ্রীহীনতা। রাণি বেড়াতে আসে বিভার বাড়িতে এবং বিভার সংসারের একই অবস্থা দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়। তারা বুঝতে পারে মধ্যবিত্ত সুলভ ভদ্রতাবোধ, দ্বিধা, সংকোচ রেখে কোন লাভ নেই। বরং অনেক কুলি,

মজুর, দরিদ্র মানুষেরা এর থেকেও খারাপ অবস্থায় বেঁচে আছে। তাদেরকেও দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে সংগ্রামী হয়ে উঠতে হবে।

নীচু চোখে দু আনা দুপয়সা

গল্পটি বস্তিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা। বস্তির হতদরিদ্র মানুষগুলিকে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সুবিধাবাদী লোকেরা নানা ভাবে শোষণ করে। মহাজন সুখলাল বস্তির দরিদ্র মানুষগুলিকে দেড়গুন সুদে টাকা ধার দেয়, মানুষ বিপন্ন হয়ে বাধ্য হয় তার কাছে টাকা ধার নিতে। এই নিয়েই সাধারণ বস্তিবাসীদের সাথে তার ঝামেলা বাঁধে, গল্পটিতে বিশেষ কোন কাহিনি নেই। বস্তিজীবনের শোষণের একটি ছবি শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নীচু চোখে একটি মেয়েলী সমস্যা

গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প এটি। বস্তিবাসী দরিদ্র নোটন মিস্ত্রির মেয়ে দুর্গা যৌবনে পা রাখলে প্রকৃতির নিয়মে লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে। বস্তির অনেকের নজর পড়ে তার উপর। নোটন মেয়েকে চোখে চোখে রাখে। বিনোদ মিস্ত্রির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা পাকা করে। কিন্তু কারখানায় এক দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে নোটন দীর্ঘদিন বিছানাশয্যা হয়ে যায়। সংসারে দেখা দেয় চরম অভাব, নোটনের স্ত্রী বাড়ি বাড়ি ঝি এর কাজ করেও কিছুতেই সামাল দিতে পারে না। যে নোটন মেয়েকে সব সময় আগলে রাখত, সে মনের জোর হারিয়ে ফেলে এবং মেয়েকে কাজ করতে পাঠায় মিত্রর বাড়িতে। কেননা মিত্র বাবুর লোভ আছে দুর্গার উপর। মেয়ের কুমারীত্বের বিনিময়ে কিছু উপার্জন করে আগে প্রাণে বেঁচে থাকাটাই তখন নোটনের চিন্তায় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। গল্পটিতে সমকালীন দরিদ্র পরিবারের অভাব এবং অভাবের তাড়নায় ভেঙে পড়া মূল্যবোধগুলির পরাজয় দেখানো হয়েছে।

এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে সমাজের শোষিত নিপীড়িত নীচু শ্রেণির মানুষের জীবনের নানাকাহিনি, মধ্যবিত্তের মেকী ভদ্রতা ও আত্মসংকট ইত্যাদি তুলে ধরেছেন মানিক। গল্পগুলির বেশিরভাগ চরিত্ররাই সমাজের নিম্নশ্রেণির, দেশের শোষিত পীড়িত শ্রমিক ও কৃষকদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি এই গল্পগ্রন্থে মানিক সর্বহারা মানুষের শ্রেণিচেতনার জাগরণও প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষক ও শ্রমিকের মিলিত সংগ্রামে সমাজে পরিবর্তন আনবে বলে মানিক আস্থাশীল ছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৯৫।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, 'মানবতার বিচার' দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ১৫১।

৩. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ১১৪।

৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, ৬ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, পৃ. ৪৮৫।

৫. 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।

১৯৫০

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪২তম বছর। ২৬ শে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য জহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি ১৯৫০ খ্রী: এপ্রিলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। নেহরুর মতের বিরুদ্ধে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলে নেহরু প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তবে শেষ পর্যন্ত নাসিকে অনুষ্ঠিত ১৯৫০ এর জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কংগ্রেস নেহরুর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

জানুয়ারি ১ কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়।

জানুয়ারি ২৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে সংবিধান সভায় অনুমোদিত হয়। গণপরিষদ অধিবেশন শেষ হয়। সদস্যবৃন্দ ভারতের সংবিধানে তাঁদের স্বাক্ষর দেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

জানুয়ারি ২৬ দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ভারতের ৩৪ তম ও সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। শপথ নেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। ইনি ১২-০৫-১৯৬২ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এই দিন জাতীয় প্রতীক হিসেবে 'অশোক চক্র' গৃহীত হয়।

জানুয়ারি ২৮ স্বাধীন ভারতে সুপ্রিমকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হন হীরালাল জে বমনিয়া।

ফেব্রুয়ারি ১৪ চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুমোদিত হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৭ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে কলকাতা হাইকোর্ট আইনসম্মত ঘোষণা করে।

মার্চ ২১ সুকুমার সেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি উক্ত পদে ১৯-১২-১৯৫৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

এপ্রিল ১ ভারতে সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

মে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার ঘোষিত: প্রাপক সতীনাথ ভাদুড়ী।

জুন ২৫ কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ।

আগস্ট ১৫ ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্পে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু।

নভেম্বর ৪ মানবাধিকারের প্রশ্নে ইউরোপীয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস স্বাক্ষরিত হয়।

ডিসেম্বর ১ ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজে নাগরিক অধিকার কাউন্সিলের সম্মেলনে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের ঐতিহাসিক ভাষণ। স্বাধীন ভারতের বন্দিহত্যা ও বিনাবিচারে জেলে বন্দিদের পচিয়ে মারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনমত গড়ে উঠল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর সরকারী আক্রমণ। পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদার আইন পাশ।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য —অন্নদাশঙ্কর রায় : *রাঙা ধানের খৈ* / অসীম রায় : *ফুটপাথে ফুলের গন্ধ* / আলোক সরকার : *উতল নির্জন* / কামাখ্যাসুন্দর গুহ : *রূপের তুলি* / কালিদাস রায় : *আহরণ* / বিষ্ণু দে : *অন্বিষ্ট* / রাম বসু : *তোমাকে* / শুদ্ধসত্ত্ব বসু : *আজন্ম* / সুকান্ত ভট্টাচার্য : *ঘুম নেই, পূর্বাভাষ* / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *চিরকুট*। **নাটক** — কিরণ মৈত্র : *বারো ঘন্টা* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *রামমোহন*। **উপন্যাস** — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *ইছামতি* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *পদচিহ্ন, উত্তরায়ণ* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *জীয়ন্ত* / সুবোধ ঘোষ : *ত্রিযামা* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *দেহমন, চেনামহল* / সন্তোষকুমার ঘোষ : *কিনুগোয়ালার গলি* / গোপাল হালদার : *উজান গঙ্গা*। **গল্পগ্রন্থ** — রাজশেখর বসু : *গল্পকল্প* / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *কুশল পাহাড়ী* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *মাটি* / শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : *ঠিকঠিকানা* / মনোজ বসু : *খদ্যোত* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *সামনে চড়াই* / অন্নদাশঙ্কর রায় : *যৌবন জ্বালা* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *পটরানি*।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অরবিন্দ পাল, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, কামরুদ্দীন আহমেদ, জহর সেনগুপ্ত, দীপক হালদার, দেবু গোস্বামী, প্রশান্ত রায়, প্রভাত মিশ্র, পরিমল মুখোপাধ্যায়, ব্রতী মুখোপাধ্যায়, রণজিৎদাশ, সৈয়দ কায়সর জামাল।

মৃত্যু : অদ্বৈত মল্লবর্মন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শ্রী অরবিন্দ, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

আনবিক অস্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়ে প্রতিবাদ লিপি করেন। স্বাক্ষরকারী গণের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু প্রমুখ বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী সাহিত্যিকরা ছিলেন। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চরিতার্থতার কারণে দেশ বিভক্ত হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুরোপুরি প্রশমিত হয় নি। এ বছরের প্রথম দিক থেকেই নানা জায়গায় ছোটোখাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। পূর্ব বাংলায় অত্যাচারের বীভৎস গুজব ছড়াচ্ছিল। কলকাতায় থমথমে ভাব। মানিক চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। বরানগরে সাম্প্রদায়িক খুন-জখম-লুটপাট চলছে। ১৩ অক্টোবর শতাধিক প্রতিনিধি সহ বরানগরে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মানিক। সমাজ জীবনে সাহিত্যে শিল্পে যে প্রবল আক্রমণ নেমে আসছিল তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান তিনি সমস্ত মানুষের কাছে।[১] ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মানিক ক্লান্ত ও বিপদ তাড়িত। বড়

মেয়ের টায়ফয়েড। নিজের স্বাস্থ্যও ভালো নয়। আরও বেশি অসুস্থ স্ত্রী, তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু মৃত সন্তান প্রসব করার জন্য মানিকের স্ত্রী দুঃখিত হননি। ডায়েরিতে মানিক লিখছেন —

> বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছি। বললো যে বাঁচা গেছি বাবা, আমি হিসেব করেছি বাড়ি ফিরে মাস খানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।...
>
> মানুষ সন্তানকে ভয় করছে। দশ মাস গর্ভধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে, বাঁচা গেল ? অভিশপ্ত সমাজ এমনই অস্বাভাবিক করেছে জীবন। মানুষের বাঁচাই দায় — সন্তানের হাঙ্গামা কে চায়।[২]

পারিবারিক নানা সমস্যায় ক্লান্ত মানিক জানাচ্ছেন: "জীবনটা সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।" মাত্র দুখানা ঘর, অসুস্থ স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতা। নিজেরও দুর্বল শরীর। এর মধ্যেও তিনি লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছেন। নানা সভা সমিতিতে যোগদান তো আছেই। দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। চরম আর্থিক সংকট। তার মধ্যেও বাগবাজার সাধারণ সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মণ্ডপের উদ্বোধন সভায় সভাপতি হয়ে গেলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ। তিনি বললেন দুর্দিনেও আনন্দ করার কথা। পূজায় আনন্দ সবাইয়ের সাথে ভাগ করে নেওয়ার কথা। কেননা মানুষ সামাজিক উৎসব করে — জয়ের জন্য, বাঁচার জন্য।

জুলাইয়ে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *জীয়ন্ত* । এবছর জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প*। বসুমতি সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয় *মানিক গ্রন্থাবলী* প্রথম ভাগ। জানুয়ারি নবপর্যায় *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা* প্রবন্ধটি।

প্রকাশিত গল্প: 'ডুবুরি' (*ইস্পাত*, আষাঢ়), 'বন্ধ' (*অশনি*, আগস্ট), 'অন্ন' (*নীলদেশ*, সেপ্টেম্বর), 'ভীরু' (*মৌচাক*, সেপ্টেম্বর), 'শারদীয়া' (*বসুমতি*, শারদীয়), 'উপায়' (*শারদীয় পরিচয়*), 'দুই যাত্রী' (*বর্ষবাণী*, শারদীয়া)।

উপন্যাস-১ : জীয়ন্ত

এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তদশ উপন্যাস এবং তেত্রিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৫৭, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ২ + ২৫৬, মূল্য চার টাকা। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি *পরিচয়* পত্রিকায় ১৩৫৩ - ১৩৫৫ সালের মধ্যে মোট ২২ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।[৩] উপন্যাসটির প্রথমে নাম ছিল *কলম পেষার ইতিকথা*। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নাম বদলে রাখা হয় *জীয়ন্ত*।

> দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজে বিভিন্ন বিভ্রান্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যুবক মনেও তা সংক্রমিত হয়। অনেক যুবকের মধ্যেও নানা উচ্ছৃঙ্খলতা, যৌনতা দেখা দেয়। কিন্তু তারাও সমাজের নীচু তলার মানুষের সংস্পর্শে এসে নতুন জীবনবোধ লাভ করে। সেই সব যুবকের মধ্যে কিভাবে সংগ্রামী চেতনা গড়ে ওঠে তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *জীয়ন্ত* উপন্যাসে দেখিয়েছেন।[৪]

উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯২৬-২৮ সাল। স্থান মেদিনীপুর শহর ও তার আশেপাশের গ্রাম। উপন্যাসের নায়ক প্রকাশ অর্থাৎ পাকা উপন্যাসের শুরুতে নবম শ্রেণির ছাত্র। মাতৃহারা পাকা মাতুলালয়ে থেকে লেখাপড়া করেছে, অত্যন্ত দুরন্ত, বিড়ি-সিগারেট হুকা টানে, সেক্সের বই পড়ে, অস্পৃশ্য বাগ্‌দী পল্লীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, নিষিদ্ধ পল্লীতেও কৌতূহলবশে গমন করে। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কিংবা নাটক দেখে বা কীর্তন শুনে মাঝরাতে বাড়ি ফেরে। আবার সে মানুষের বিপদে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। অল্প বয়সেই তার মধ্যে গড়ে উঠে কঠোর ব্যক্তিত্ব। গোপন সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও কৌতুহলবশত তাদের কার্যকলাপ পাকা প্রত্যক্ষ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের জীবনের কিশোর বয়সের কার্যকলাপের সঙ্গে পাকা চরিত্রটির অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। মানিকও অল্পবয়সে মা কে হারিয়েছিলেন এবং কিশোর বয়সে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তার স্বভাব চরিত্রে উক্ত লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল। মালিনী ভট্টাচার্যের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে —

> ১৯২৫ সালে মানিক ছিলেন জীয়ন্তর পাকার মতোই সদ্য মা হারা কিশোর, তারা তখন সপরিবারে মেদিনীপুরেই থাকতেন। এখান থেকেই ১৯২৬ সালে মানিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুড়ি বছর বাদে *পরিচয়ের* জন্য *জীয়ন্ত* লিখতে বসে কিছুটা নিজের স্মৃতি থেকেও তিনি নিশ্চয় সমকালীন গণ আন্দোলনগুলির আদি ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই *জীয়ন্তে*র মধ্যে আত্মজীবনের ইষৎ রেশ হয়তো আছে। পাকা বড় হয়ে তারই মত লেখক হবে, এটা একেবারে গোড়ায় তাঁর পরিকল্পনা ছিল বলেই কি প্রথমে উপন্যাসের নাম রাখেন *কলম পেশার ইতিকথা*।[৫]

প্রথমে মানিকের এরূপ পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীকালে তা পাল্টে যায়। পাকাকে নিয়ে কাহিনি শুরু হলেও কিছটা এগিয়ে কালিনাথদের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং অহিংস জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বনাম সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক বিতর্ক উপন্যাসে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে —

> তখন কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানা ধাচের একটা বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের শাসনের অবসান চাইছিল। সরাসরি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছিল। মানিক তার উপযোগী একটি প্লট তৈরি করলেন। তিনি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করলেন বিপ্লবের বীজ। ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে দেশব্যাপী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যখন হতাশা ও সুবিধাবাদ হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন আবার চতুর্দিকে আত্মত্যাগী যুব শ্রেণির মধ্যে যে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়েছিল তাকে আশ্রয় করে তিনি

কাহিনি বয়ন করলেন। ... ১৯২৬ সালের কাহিনি বললেন ১৯৫০ সালে। শুধু পুরনো দিনের আদর্শে নতুন বৈপ্লবিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয় নব্য বিপ্লবী বোধের আয়নায় পুরনো বিপ্লব-আন্দোলনকে কষে দেখা — কষ্টিপাথরে সোনা কতটা খাঁটি তার যেমন বিচার হয়।[৬]

উপন্যাসে মুখ্য স্থান দখল আছে সন্ত্রাসবাদী সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী। এছাড়াও জমিদারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, জমিদার ও পুলিশের মিলিত ষড়যন্ত্র, বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দমনে পুলিশের ব্যাপক নির্যাতন, সুবিধাবাদী রাজনীতি, জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে ভিন্ন প্রতিযোগিতা, ব্রিটিশ শাসকদের নানা কার্যকলাপ, ধনী-শিল্পপতিদের শোষণে স্বার্থ রক্ষায় রাজনীতিকে ব্যবহার, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য চরিতার্থতা প্রভৃতি। এর ফলে সারা দেশের যুবমানসে প্রবল ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার ঘটে। জনতার একাংশ গান্ধিজির রাজনৈতিক বোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। কিছু মানুষ যখন গান্ধিকে মহামানবরূপে তুলে ধরতে চান তখন কেউ কেউ আবার তাঁকে মাটির কাছে নামিয়ে আনে —

অমন একটা মানুষের নামে যা-তা রটাতে ভালো লাগে না। ভারতের যুগ-যুগান্তরের জ্ঞানকর্মের সাধনা তার মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকে, তাঁকে শতশত প্রণাম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে রাজনীতি করতে আসেন কেন ? চল্লিশ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতি, সেটা শুধু একটা সাইড লাইন হিসাবে গ্রহণ করেছেন একথা বললে যে তাঁর মতো মহাপুরুষকে অপমান করা হয়...। মানুষটা দেশের জন্য এত করেছেন এভাবে তাকে অপমান করা কি উচিত ? তার চেয়ে তিনি যখন রাজনীতি করেন তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা বলে ধরে নিলেই গোল থাকেনা। আমরা তাহলে নিশ্চিত হয়ে তার নীতি বিচার করতে পারি। তার পথ ঠিক না ভুল তাই নিয়ে ঝগড়া করতে পারি।[৭]

আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া হল কেন, জনগণের অসংযম না নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা নাকি আন্দোলনটাই ভুল, জনগণ কি রাজনীতি এতটুকুও বোঝেনা, কেবল নেতারাই রাজনীতি বোঝেন — এসব বিতর্ক উপন্যাসে উঠে এসেছে। গান্ধিকে যারা দেবতার আসনে বসান তারা জনতার রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। আবার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে অনেকেই শ্রদ্ধাশীল অভিমত পোষণ করে —

স্বাধীনতা চাই, এটুকু তো বোঝে ? ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করা চায়, এটুকুতো বোঝে ? মুখ বুঝে মার খেলে স্বাধীনতা আসে, এ রাজনীতি তারা বুঝতে পারেনা, তা ঠিক। কোনদিন বুঝতে পারবেও না। যে মারে তাকে মারতে হয়, এই সোজা সত্যটা তারা বোঝে। চিরকাল তাই বুঝবে।[৮]

অমিতাভের এই বক্তব্যে গান্ধির অহিংসা নীতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ এবং সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসে আমরা সন্ত্রাসবাদী দুটি গ্রুপের অস্তিত্ব এবং কার্যকলাপ লক্ষ্য

করি। কালিনাথের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ইঙ্গিত রেখে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়। কালিনাথের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের কার্যকলাপের প্রতি পাকার যে সহানুভূতি তা লেখক মানিকের মর্মজাত বলে অনুমান করা যায়। মানিক যখন এই উপন্যাস লিখছেন তখন তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত। এদেশের মার্কসবাদীরা সন্ত্রাসবাদকে ভ্রান্ত পথ বলেই অনেক আগে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে মানিকের মনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতি এহেন সহানুভূতির কারণ কি ? মানিক ব্যক্তিগত জীবনে এহেন কার্যকলাপের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও আন্তরিক সমর্থন তাঁর ছিল। মানিকের সব রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির ঘটনা সমসাময়িক, কেবলমাত্র *জীয়ন্ত* উপন্যাসটির ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা পুরনো কাহিনি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতিমেদুরতা অধিক সক্রিয় ছিল বলে আমাদের মনে হয়। যে সময়ে উপন্যাসটি রচিত হতে শুরু হয় তখন কমিউনিস্টদের ওপর সরকারের প্রবল অত্যাচার নিপীড়ন চলছে, ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ — আড়াই বছর ধরে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে, ফলে এই দীর্ঘ সময়ে মানিকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। তাই হয়তো তিনি একেবারে সমসাময়িক জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে গ্রহণ না করে একটু পুরোনো ঘটনাবলীকে বেছে নিয়েছেন। সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রকাশ এবং জাতীয়তাবাদী দল কংগ্রেসের সরাসরি সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচারণ করলে কোন সমস্যায় পড়তে হতে পারে এমন ভাবনাও মানিকের মধ্যে সক্রিয় থাকতে পারে। তবে তিনি জনবিচ্ছিন্ন গোপন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে বিপ্লবের একমাত্র পথ বলে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তা নয়। জনসাধারণকে নিয়ে আন্দোলন সংঘটিত করার গুরুত্বের কথাও তিনি বলেছেন। তাই জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সংবদ্ধ আন্দোলন বা রুশবিপ্লবের কথা উন্যাসে এসেছে। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে চরম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং আন্দোলন থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের অত্যাচার, নির্যাতন এই উপন্যাসের পাতায় প্রধানভাবে চিত্রিত। তবে আন্দোলন শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, সেই আন্দোলন সমাজের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সমস্ত শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে — একথাই মানিকের মূল প্রতিপাদ্য উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র:

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ১৯৯৯, পৃ. ১০৫।

২. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ১৪১।

৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৬ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, পৃ. ৪৯৩।

৪. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অঞ্জলি, ২০১০, পৃ. ১১৮।

৫. মালিনী ভট্টাচার্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮, পৃ. ৭৬।

৬. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, ৫ম খণ্ড, গ্রন্থালয়, ২০০৫, পৃ. ১১৬

৭.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯, পৃ. ৩৯৭।

৮.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৯।

১৯৫১

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪৩তম বছর। প্রবল আর্থিক অনটনের ফলে সংসারে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। তার মধ্যেই মানিক বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। নেহেরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ড থেকে ইস্তফা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্যান্ডন কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে গেলে নেহেরু পুনরায় সভাপতি হন। স্বাধীন ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয় ও শিক্ষিতের হার ছিল ১৬.৬ শতাংশ। ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৫১ তে জনশংসদল প্রতিষ্টা করে। স্বাধীন ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার সময় কাল- ১৯৫১-১৯৫৬। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল — ১. কেলডাস জনিত অর্থনৈতিক সংকট দূর করা। ২. কৃষি, সেচ, পরিবহন ও পুর্নবাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া। ৩. জাতীয় আয় ও জনগণের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা। সংবিধান সংশোধন করে জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন স্বীকৃত হয়।

জানুয়ারি ৪ উত্তর কোরিয়া ও চীন ‘সিওল’ অধিকার করে।

ফেব্রুয়ারি ৯ ভারতে প্রথম লোকগণনা শুরু হয়।

এপ্রিল ৬ পূর্ববঙ্গ জুড়ে ‘জাতীয় ভাষা দিবস’ উদ্‌যাপন; দাবি — বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করার।

এপ্রিল ২১ কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শহিদ দিবস পালন করা হয়। ভুখামিছিলের ওপর পুলিশের গুলিতে ৫ জনের মৃত্যু।

তেলেঙ্গানা সশস্ত্র আন্দোলনের অন্তিম অধ্যায়। শহিদ ৪০০০ কমিউনিস্ট।

মে ২৭ চীন সরকার তিব্বতে ধর্মের স্বাধীনতা দেয়।

জুলাই ৯ ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সেপ্টেম্বর ২২ বিশ্বভারতী ভারতীয় পার্লামেন্টের আদেশানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

অক্টোবর ৫ ৫ থেকে ৯ অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পঞ্চম সম্মেলন মুসলিম ইনস্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে সম্পাদক নির্বাচিত হন মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ।

অক্টোবর ২৫ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ নভেম্বর তিনি শপথ নেন। ১-১১-১৯৫১ থেকে ৭-৮-১৯৫৬ পর্যন্ত রাজ্যপাল ছিলেন।

ডিসেম্বর ১০ ভারতে প্রথম লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়। ৭৩ দিন ধরে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হয়।

ডিসেম্বর ২০ ওমান স্বাধীন হয়। রাজধানী মাসকেট।

ডিসেম্বর ২৪ রাষ্ট্রসংঘের সহায়তায় ‘লিবিয়া’ স্বাধীনতা লাভ করে। রাজধানী ত্রিপোলি।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অজিত দত্ত : *ছায়ার আলপনা* / জসীমউদ্দিন : *মাটির কান্না* / গোলাম কুদ্দুস : *বিদীর্ণ* / দিনেশ দাস : *দিনেশ দাসের কবিতা* / নরেশ গুহ : *দুরন্ত দুপুর* / পূর্ণেন্দু পত্রী : *একমুঠো রোদ* / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: *রাণুর জন্য* / মণীন্দ্র রায় : *অন্যপথ* / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : *মেঘ বৃষ্টি ঝড়* / সুকান্ত ভট্টাচার্য : *মিঠে কড়া*। **নাটক** — বিজন ভট্টাচার্য : *জতুগৃহ* / তুলসী লাহিড়ী : *পথিক*। **উপন্যাস** — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *পেশা, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামি, ছন্দপতন* / বনফুল : *স্থাবর, কষ্টিপাথর* / বুদ্ধদেব বসু : *নির্জন সাক্ষর* / সতীনাথ ভাদুড়ী : *সত্যি ভ্রমণ কাহিনি* / জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : *সূর্যমুখী* / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *লালমাটি, কৃষ্ণপক্ষ* / সমরেশ বসু : *উত্তরবঙ্গ* / গোপাল হালদার : *আর একদিন* / দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আগামী*। **গল্পগ্রন্থ** — মনোজ বসু : *দিল্লী অনেক দূর*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বিশ্বভারতী*।

পত্রিকা প্রকাশ — *শতভিষা* : আলোক সরকার, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, তরুণ মিত্র।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অঞ্জন সেন, অরণি বসু, অলোক সোম, আবুল বাশার, বীতশোক ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মনোতোষ চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি দাস, সন্দীপ দত্ত, সুবিমল জানা।

মৃত্যু : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এস ওয়াজেদ আলী, কায়কোবাদ, নিরুপমা দেবী।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

বছরের শুরু থেকেই আর্থিক অস্বচ্ছলতা আরো বেশি প্রকট হতে শুরু করে। বারবার তিনি অসুস্থ হতে থাকেন। ১লা জানুয়ারি *পরিচয়* পত্রিকার পক্ষ থেকে বিনাবিচারে আটক সদ্যমুক্ত সাহিত্যিক, শিল্পী ও রাজবন্দিদের মুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় গোপাল হালদার, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে মানিক বক্তৃতা দেন। এবছরের শেষ দিকে বিভিন্ন প্রকাশক এবং সাময়িকপত্রের দরজা মানিকের জন্য আবার খুলে যায়। হিসেবের খাতা থেকে তাঁর চরম অর্থাভাবের কথা জানা যায়। তিনি পুজো পার্বনের জন্য United Bank-এর ম্যানেজারের সাহায্যে টাকায় মাসে ২ পয়সা সুদে ইয়ার রিং বাঁধা রেখে তিরিশ টাকা ধার করে এনেছেন।

এ বছরে মানিকের চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় — *পেশা, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামি* (প্রথম খণ্ড), *ছন্দপতন*। মে মাসে *পূর্ব্বাশা* পত্রিকায় *উপন্যাসের কথা* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

উপনাস-১ : পেশা

পেশা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টাদশতম উপন্যাস এবং চৌত্রিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৩৫৮, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ২০০, মূল্য তিন টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি *নতুন জীবন* নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কার্তিক ১৩৫২ থেকে প্রকাশিত হয়। তখন উপন্যাসটির নাম ছিল *ডাক্তারবাবু*।[১] এই উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ জীবনের নানাধরনের অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিফলিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির মধ্যে প্রাপ্ত স্বাধীনতা এবং সামাজিক ভাঙন এই উপন্যাসের কাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে। মানিকের অনন্যতা এইখানে যে তিনি শুধুমাত্র ভাঙনের চিত্র আঁকেননি, ভাঙনের বিপরীতে ঘুরে দাঁড়াবার যে প্রয়াস বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং মানুষের চেতনার জাগরণ মানিক সচেতন লেখনীতে উঠে এসেছে —

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর জনিত বিপর্যয়মূলক দেশীয় পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসা পেশাটিকে অবলম্বন করে মানিক রচনা করলেন তাঁর *পেশা* উপন্যাস সেই সময় এক শ্রেণির চিকিৎসক চিকিৎসা পেশাটিকে নিছক পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই সব চিকিৎসকদের কাছে মানবিকতা, ন্যায়, নীতি প্রাধান্য না পেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল অর্থ এবং পসার। অথচ চিকিৎসা পেশাটি মূলত জনকল্যাণমূলক। মানিক *পেশা* উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চিকিৎসা পেশার কালো দিকটিকে দেখালেও তাকে মুখ্য করেননি। আধুনিক প্রজন্মের সদ্য পাশ করা এক ডাক্তারের মধ্যে উন্নততর গণ-চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে চিকিৎসকদের আদর্শবোধকে উপন্যাসে মুখ্য করেছেন।[২]

চিকিৎসা ক্ষেত্রের এবং চিকিৎসকদের নানাবিধ চারিত্রিক অসংগতি ও বিকারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রিয় চরিত্র কেদার, ডা: পালের সাহায্যে সে ভালোভাবে পাশ করে এবং ডা: পালের মেয়ে গীতার ভালোবাসার স্বপ্নে সে বিভোর। ডা: পালের মতোই একজন বিখ্যাত চিকিৎসক হবার সুযোগ সে পায়। পাশের রেজাল্ট বেরোনোর পর কেদার বাড়িতে মায়ের কাছে না গিয়ে যায় গীতার কাছে। গীতার সঙ্গে কেদারের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। এদিকে বাড়িতে ছেলের খবর শোনার জন্য উদ্বিগ্ন মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ছেলের পাশের খবর শোনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান। এই ঘটনা কেদারকে ভেতর থেকে তীব্রভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। ডাক্তারি পাশ করার মুহূর্ত থেকেই সে মায়ের মৃত্যুর জন্য গভীর নেতিবাচক চিন্তার মুখোমুখি হয়। তার জীবনে ঘটতে থাকে নানান ঘটনা। তার জীবনে আসে মায়া, গীতা, অঞ্জলি, জ্যোতি, ছায়া বিভিন্ন সমস্যার প্রতীক হয়ে। চিকিৎসকদের অমানবিকতা, অনাহারে দুর্বল দরিদ্র রোগীদের অসহায়তা, ওযুধের ভেজাল কারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে

কেদারের মন সচেতন হয়ে ওঠে। সংগ্রামী গণ-চেতনা তার ভাবনার জগৎকে আলোড়িত করে। সমস্ত উপন্যাস জুড়েই আছে চিকিৎসা ও চিকিৎসাব্যবস্থা সংক্রান্ত নানা অনৈতিক কার্যকলাপ।

এই উপন্যাসে মানিক সচেতনভাবেই প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত শিক্ষার প্রসঙ্গ এনে আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। মানিক দেখিয়েছেন আমাদের দেশের গরিব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা শিক্ষার সুযোগ থেকে, চিকিৎসার পরিবেশ থেকে ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ সেসব পাওয়ার অধিকার তাদের আছে। সেজন্যই মানিক প্রকৃত স্বাধীনতার তাৎপর্যের কথা বলেছেন। কেননা স্বাধীনতা পারে গরিব মানুষগুলির অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদাগুলি দূর করতে।

উপন্যাস-২ : স্বাধীনতার স্বাদ

এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিংশতিতম উপন্যাস এবং ছত্রিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫১, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃষ্ঠা - ৬ + ২৬১, মূল্য চার টাকা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থেই কেবল একটি উৎসর্গ পত্র আছে। তাতে লেখা — "সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম, জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।" উপন্যাসটি ১৩৫৬ থেকে মাসিক বসুমতিতে প্রকাশিত হয়।[৩]

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশ জুড়ে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়, দাঙ্গাবিধ্বস্ত সেই নাগরিক জীবনের টুকরো কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাসের সূত্রপাত। নাগরিক জীবন প্রায় অচল, কার্ফু চলছে শহরের নানা প্রান্তে, এই পরিস্থিতিতে উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র মণির দেওয়র প্রণব মামা বাইরে থেকে আসে। দাঙ্গার শিকার হয় দুজনেই। বাড়ির কাছে পৌঁছেও মণির সঙ্গে দেখা হল না মামার, তিনি নিহত হলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতার বাস্তব চিত্র। জীবন থেকে মানুষ যখন হারিয়ে ফেলেছে নিরাপত্তা শব্দটা, শান্তি তখন বহুদূরের নক্ষত্র, অশান্তি, অবিশ্বাস, সন্দেহ সংকুল জীবনের মধ্যে মানুষের জীবনের গতি — গতিবদল স্বপ্ন-স্বপ্নহীনতা, বন্ধুত্ব-বন্ধুত্বের অপমৃত্যু, সন্দেহের জটিল আবর্তে আপোসহীন মানুষ, এসবই উঠে এসেছে উপন্যাসে। কিন্তু সন্দেহের জটিল আবর্তের মধ্যে মানুষের হৃদয়াবেগ হারায় নি, অন্যের দুঃখের পাশে দাড়ানোর মত মহানুভবতাও তখন দুর্লভ হয়ে ওঠেনি, কবির কলম থামেনি। এই উপন্যাসে সমাজের উঁচু তলার ছবি এসেছে, এসেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে মানুষের শত্রু করে তোলার নিপুণ চক্রান্ত। কালোবাজারের কারবারি যতীন যেমন এসেছে, তেমনি উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে থেকেছে শ্রমজীবী মানুষ, তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ছবি, তাদের অসহায় অবস্থান — পাশাপাশি দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাদের একজোট হয়ে প্রতিবাদ ও উত্তরণের বার্তা। প্রাক্ স্বাধীনতাকালীন কিছুদিন এবং সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের কয়েকটা দিন নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পিত।

এই উপন্যাসেও অনেকটা *চিহ্ন* উপন্যাসের টেকনিক ব্যবহৃত হয়েছে। কোন একটি বা দুটি পরিবার বা ব্যক্তির কাহিনি হয়ে ওঠেনি এই উপন্যাস। এখানে অনেকগুলো পরিবার ও অনেক অনেক মানুষের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়ে বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বৃদ্ধ অনুকুলের পুত্র প্রণব তরুণ প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী। তারই উদার সামাজিক মনোভাবের ফল হিসেবে তাদের বাড়িতে জড়ো হয়েছে দাঙ্গা বিধ্বস্ত আত্মীয়-অনাত্মীয় পাঁচ-ছটি পরিবার। এসব পরিবারের পুরুষ সদস্যরা কাজের জন্য প্রতিদিন শহরে বেরিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই নিয়ে এই গৃহের রাতের আসরটি বেশ জমজমাট হয়। সেখানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির গতিধারা মূর্ত হয়ে ওঠে। এই বাড়িতে আশ্রিত পরিবারগুলির বাইরেও কয়েকটি পরিবার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রা, রেশন দোকান, সুঁড়িখানা, চোরাকারবারের গুদাম, পত্রিকা অফিস প্রভৃতির আনুসাঙ্গিক বর্ণনা দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা বাস্তবতা লাভ করে।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় ? দুর্লভ সে স্বাধীনতা হয়তো শুধু দেশেই নয়, ছোট ছোট সংসারের বুকে ছড়ানো স্বাধীনতার স্বপ্ন, সবই ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। একান্নবর্তী পরিবারের বাইরে দাঁড়িয়ে খোলা আকাশকে অনুভব করতে চেয়েছিল মণি। সমান্য অজুহাতে মণি তার স্বামী প্রণবকে নিয়ে পুরানো বাড়ি ও লোকজনকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল নতুন ঠিকানায়। যে মণি নিভৃতে একটা সংসার চেয়েছিল — সময় ও পরিবেশ তাকে এতটাই বদলে দিল এতজন মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে গৃহে বাস করতে এবং যে এতজনের রান্নাবান্না করতে তার কিছু মাত্র দ্বিধা এল না। চালের অভাবে ভাত হবেনা জেনে লুকিয়ে রাখা সুগন্ধী চাল বের করে দিতে সে কৃপণতা করেনি। দাঙ্গায় আতঙ্কিত মানুষ জনের কাছে তখন বেঁচে থাকাটাই প্রধান সমস্যার।

এই উপন্যাসে মানিকের স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই সম্প্রদায়গত দাঙ্গার মূলে যে প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসক শক্তির পরাজয়ের জ্বালা সক্রিয় — নানাভাবে সে বিষয়টি পরিস্কার করে তোলা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত সৌহার্দ্য মূলক সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে অকস্মাত এই সংঘর্ষের কারণ তাই রাজনৈতিক ও চক্রান্তমূলক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিকল্পনা থেকেই শাসক শক্তির উসকানিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির এই কুৎসিত আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংবাদিক গিরিণের মন্তব্য —

> স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছু কালের জন্য ঘুচে গেল, যে পথে এতদূর এগোলাম সেই পথ প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিলাম।— এটাই আমার সবচেয়ে বড় জ্বালা! নইলে হিন্দু-মুসলমান অনেক শ বছর ধরে এদেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান হয়ে যেতাম — তাতে আমার এত কষ্ট হতনা।

> রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াইয়ে দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড় খারাপ। শেষ পর্যন্ত কি হবে আমি জানিনা। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মিমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দুটো সমস্যার মিমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।[৪]

মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল ব্রিটিশের এই ষড়যন্ত্র মূলক কার্যকলাপকে ব্যর্থ করতে কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কেন সচেতন নয় ? কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সতর্ক থাকলে এরূপ ষড়যন্ত্র কার্যকর করা সম্ভবপর ছিলনা। ব্রিটিশ শাসক শক্তি যদি উভয়দলের সাধারণ শত্রু হয়, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে দুদলের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা, কিন্তু সেটা হয়নি। ক্ষমতার লোভে তারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধি ও জিন্নার আপোস ফর্মুলা বেয়ে জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত নেই, সে বিষয়টি বামপন্থি কর্মী প্রণবের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ জাতীয়তাবাদী দুটি দল ব্রিটিশের করুণা আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। ফলে তাদের পক্ষে ব্রিটিশদের করুনা সৃষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ ছাড়া কোনো উপায় ছিলনা—

> আমার মনে হয়, আমরা ভুল করছি। গান্ধি-জিন্না আপোস চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছি। ঐ স্তরে আপোস হবেওনা, সে আপোসে সাধারণ মানুষের লাভ নেই। গরিব খাটুয়ের মধ্যে খাঁটি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি আছে, ওটাই মিলনের আসল ভিত্তি করা উচিত, কংগ্রেস-লীগ মিলন নয়। কংগ্রেস-লীগ-ব্রিটিশ এই তিনপক্ষে আপোস হতে পারে, কংগ্রেস-লীগ আপস হবে না। ব্রিটিশের আপোসে আদরে কংগ্রেস-লীগ দু'ভাই লায়েক হয়েছে, সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেরা লাঠালাঠি করতে পারে, ব্রিটিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশকে বাতিল করতে তো পারেনা।[৫]

কংগ্রেস ও লীগের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করে স্বাধীনতার নামে ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করে। ব্রিটিশ শক্তি এই কাজে দুর্দান্ত ভাবে সফল হয়। দেশের স্বার্থপর ধান্দাবাজ কিছু নেতা, ব্যবসায়ী গুন্ডা বদমাস প্রকৃতির লোকেরা একাজে সহায়ক হয়। ১৯৪৭-এর জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি রূপে ভারতে আসেন। এই বছরেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয়, এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান ও ১৫ই আগষ্ট ভারত এই দুটি দেশ জন্ম লাভ করে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভে সাধারণ মানুষ কতটা খুশি হয়েছিল সেদিন ? এই স্বাধীনতাকে বলা হয়েছে 'লোক ঠকানো একটা কিছু' বা 'আংশিক অপোসিক স্বাধীনতা, রক্ত মাংস বাদ দিয়ে ছাড়ানো চামড়ায় খড় কুটো জঞ্জাল পোরা মেকী স্বাধীনতা'। তাই এই মেকী স্বাধীনতা লাভে খুশির হাওয়া তেমন করে বইতে দেখা যায় না। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব তাই অন্যান্য কোন উৎসবের মতোই একটা চলনসই

আয়োজনেই থেমে থাকে। এই স্বাধীনতা মানুষকে আনন্দ দেয় নি। বাস্তুহারা মানুষ — দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষ-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এই স্বাধীনতার স্বাদ কি তেমন করে পেয়েছে ?

স্বপ্ন আর শ্রমে গড়ে তোলা ভিটেমাটি ফেলে যাদের চলে আসতে হয় এপারে, আর যারা সর্বস্ব ফেলে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে গেল ওপারে, তাদের একটাই পরিচয় হল — উদবাস্তু । দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামি, আত্মবলিদান ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর যে স্বাধীনতা এল তার স্বাদ মানুষের অভিজ্ঞতায় সুখকর, মনোময়, আনন্দময় হলনা কেন ? কবি শামসুর রহমানের কলমে তাই আর্তনাদ ধ্বনিত হয় —

তুমি আসবে বলে' ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে' বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তু ভিটার
ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামগুড়ি দিলো পিতা-মাতার লাশের উপর।[৬]

উপন্যাস-৩ : সোনার চেয়ে দামি

এটি মানিকের উনিশতম উপন্যাস এবং পঁয়ত্রিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড *বেকার* নামে এবং দ্বিতীয় খণ্ড *আপোষ* নামে চিহ্নিত। প্রথম খণ্ডের প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃষ্ঠা ২ + ১২৮, মূল্য দুই টাকা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩৫৮, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ. ৪ + ২২৭, মূল্য সাড়ে তিন টাকা। আষাঢ় ১৩৮৪ সালে সিগনেট বুক শপের পরিবেশনায় অরুণা প্রকাশনী থেকে *সোনার চেয়ে দামী* উপন্যাসটির অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৭]

সমালোচক এই উপন্যাসটি রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন —

> ১৯৪৬ এর বীভৎস দাঙ্গার পর ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হল। হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানে বিভক্ত করা হল দেশকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত বহু মানুষ দলে দলে পূর্বপাকিস্তান থেকে এদেশে এল। বাস্তুহারা মানুষেরা ব্যাপকহারে কোলকাতা ও শহরতলীতে আশ্রয় নিল। ভিটে মাটি ছেড়ে আসা অধিকাংশ মানুষের আশ্রয় জুটল পথে, ঘাটে। গড়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন কলোনি। উদ্‌বাস্তু মানুষের জীবনে আরম্ভ হল সংগ্রাম। উদ্বাস্তু মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন জোরদার হতে লাগল এর সঙ্গে ছাঁটাই, বেকারীত্বের ফলে মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। সেই কঠিন বাস্তব পরিস্থিতি অবলম্বনে রচিত মানিকের *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাস।[৮]

'দেশভাগ' মানে এক সামাজিকতার মৃত্যু, পরিভাষায় — The death of the Social। সে মৃত্যু ঘটে গেছে। পিতৃপুরুষের শেকড়পোতা বাস্তু ভিটা ছেড়ে আর এক দেশে এসে পানার মতো ভেসে বেড়ানো অথবা খুঁটি গেড়ে নতুন ভিটা খাড়া করার মতো ঘটনাও কম ঘটেনি। মধ্যবিত্তের মেট্রোপলিটন বিকাশ ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করেছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষায় পুঁজির গগনবিদারী চিৎকারে দিশেহারা মানুষ ছুটছে দিকবিদিকে। চারিদিকে ছেলেমানুষী সব ফাঁকির খেলা। যান্ত্রিক সমাজটা চোখের সামনে দিন দিন কেমন অমানবিক রূপ লাভ করছে। আর এতো কিছু প্রতিকূলতার মধ্যে ছিন্নমূল অনিকেত সত্তা হয়ে ভাসমান বা অ-ভাসমান উদ্বাস্তু জীবনগুলি—

> ১৯৫১-৫২ তে লেখা উপন্যাসটির মধ্যে স্বাধীনতা তথা দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন নিয়ে যে বিরাট সমস্যা দেখা দেয়, তাকে কেন্দ্র করে প্রধানত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন সূচিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলার ইতিহাসে তার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। মানিক প্রথম যে উপন্যাসে এই আন্দোলনকে অবলম্বন করলেন তা হল 'সোনার চেয়ে দামি'।[৮]

সময়, সমাজের সুচিন্তিত সুস্পষ্ট সমগ্রতা যে কোন লেখকের রচনায় স্বচ্ছ না হলে উপন্যাস লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ সময় ও পরিসরের বিন্যাসক্রম খুবই জরুরি উপন্যাসে। সার্থক উপন্যাসের মূল উপজীব্য সময়, সময়ের হাত ধরে প্রতিটি বিষয়ই শাণিত হয় উপন্যাসে। *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাসের আখ্যানে উদ্বাস্তু ও নিম্নবর্গীয় সমাজ পরিবারের প্রতিফলনে এক ভাঙাগোড়া সময়ের ছবিকেই দেখতে পাচ্ছি। যার মধ্যে আছে ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত এবং তারই হাত ধরে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক মন্দার চিত্র। চল্লিশের অন্তিমে আমাদের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে বিপুল রক্তপাতের মধ্য দিয়ে, এবং তারই মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-পরিবার ও নগর জীবনে এল সংশয়। স্বাধীন দেশ নতুন করে গড়ে উঠবার কোন স্বপ্ন দেখছিল না। আর সেই স্তিমিত আলো-ছায়ায় রচিত হয়েছে *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাসটি। অর্থনৈতিক মন্দার হাত ধরে সমকালীন তরুণ সমাজ যে বিকার ও সমস্যায় জর্জরিত তারই রূপ প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিকে। উপন্যাসের সবকটি চরিত্র এবং ঘটনার মধ্যে ছায়া ফেলেছে এই ভয়াবহতা। দাম্পত্য জীবন এর বাইরে নয়। তারও ভাস্য রচিত হয়েছে রাখাল - সাধনার জীবনচর্যার দুর্বিপাকে। এই সময় প্রবাহে ভালোমন্দের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যক্তি সত্তা হয়ে যায় নিরাশ্রয়, পুরনো মূল্যবোধ বিশ্বাসহীন অসাড় হয়ে পড়ে। কোনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টাই যখন প্রধান হয়ে যায়, তখন জীবনের সকল অর্জনই ছন্দ হারিয়ে ফেলে। এরই প্রেক্ষিতে সোনার মত মূল্যবান ধাতু ক্রমশই বহুমাত্রিকতা নিয়ে আসে।

সম্পর্কের প্রতিনিয়ত টানাপোড়েন এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অভাবের মধ্য দিয়ে যে সংকটের আবর্ত তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে জয়ী হয়ে যায় জীবন। জীবন যে কত মহৎ, এর ব্যাপকতা যে কত গভীর, জীবন প্রবাহের এই ধারণ ক্ষমতাকে সোনার মতো মূল্যবান ধাতুর নিরিখে পরিমাপ করা যায় না। লেখক

হিসেবে মানিক তা একাত্ম হয়ে উপলব্ধি করেছেন। উপন্যাসে রাখাল টিউশন বৃত্তির দ্বারা উপার্জন করে দারিদ্র্যের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে জীবনে টিকে থাকতে চেয়েছে। তার স্ত্রী সাধনা সোনার প্রতি এক গভীর আকর্ষণ ও দুর্বলতা কোনভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারছেনা। আর এরই সূত্র ধরে সংসারে অশান্তির আগুন ধেয়ে আসে। সাধনার একটি পুরানো সোনার হারকে কেন্দ্র করে তাদের সম্পর্কের ছেদ দেখা দেয়। সোনার প্রতি মেয়েদের আকর্ষণকে মানিক পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে সোনার হরিণের প্রতি সীতার তীব্র আকর্ষণ ও মোহের সঙ্গে তুলনা করেছেন —

> সোনার হারটি একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। এখানে ওখানে ছিড়ে যেতে আরম্ভ করার পরেও টিপেটুপে নিয়ে আর সুতো দিয়ে বেঁধে গলায় কিছুকাল লটকানো গিয়েছিল। তা ওভাবে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করাও অসম্ভব হয়ে যাওয়ায় এখন বাধ্য হয়ে বাক্সে তুলে রাখতে হয়েছে। ও হার আর গলায় ঝোলানোর মানে হয় না। ... দিনরাত্রি কাটছে একেবারে শূণ্য গলায়। ঐ যে কথায় বলে গলায় দড়িও জোটেনা, সেই রকম যেন অবস্থা।[১০]

একটি পারিবারিক জীবনের দুঃখ কলহের চিত্রকে অঙ্কিত করতে গিয়ে মানিক তুলে ধরেছেন সামগ্রিক জীবনাচরণকে। সাধনা আর রাখালের পরিবারের কাহিনি তাই সমকালীন জীবনচিত্রের ইঙ্গিতকেও ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। 'রাখাল অনেক দিন বেকার' এবং 'সাধনার গলাটা একদম খালি' — এই দুটি তথ্য একটি সহজ সত্যের দিকে পাঠককে পৌঁছে দেয় — তা হল দারিদ্র্য। কিন্তু, "গুণহীন অপদার্থ মানুষতো রাখাল নয়। নিজের খেয়াল খুশিতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ধরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথাসর্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনেনি।"[১১]

বাস্তব থেকে যখন কাহিনি নির্মিত হয় তখন জীবনের অনেক কিছুই আড়াল হয়ে যায়। *সোনার চেয়ে দামি* তে ঔপন্যাসিক বাস্তবের কুহক থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে প্রকৃত বাস্তবকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। আর এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে উপন্যাসে রূপান্তরিত সময়েরই অভিঘাত প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ের হাত ধরে সমাজ কথা বলে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও অনেক নিরুচ্চার ব্যাবধান যথার্থই অমোঘ সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আর তারই সূত্র ধরে এক এক করে উন্মোচিত হতে থাকে জীবনের আরো কিছু বিচিত্র ও জটিল সত্য। সংসারে যখন স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে তখন সাধনার স্বভাবে দেখা যায় আরো বেশি রূপান্তর। খারাপ সময়টাতে দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তেও তার যে প্রাণ শক্তি, ছোট সংসারটি নিয়ে মেতে থাকার যে আবেগ উদ্দীপনা বজায় ছিল, একটু স্বচ্ছলতার ফিরে আসাতেই তা হয়ে যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনাতেই মানিক নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন, 'সোনা ওজনে খুব ভারি'[১২] সোনা নামক ধাতুর এই বিশেষ গুণের কথা রাখাল কলেজে পড়বার সময়েই জেনেছিল। সোনার চেয়েও দামি ধাতু মানুষ আবিষ্কার করেছে কিন্তু তবু সোনার চেয়ে দামি হতে পারেনি সেই ধাতু। সোনা-ই মানুষের সবচেয়ে

চেনা জানা আপন পদার্থ, সোনাকেই মানুষ আরো বেশি আপন করতে চায়। সোনার রংয়েই সবচেয়ে বেশি রঙিন হয় জীবন। লেখকের এই কথাগুলো তাৎপর্য বহন করে উপন্যাসের কাহিনিতে। এই উপন্যাসে মানিক ব্যক্তিগত বাসনাকে জয়ী করে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সংগ্রামী হতে হয় কিভাবে — সেদিকেও ইঙ্গিত রেখেছেন। আর এভাবেই মানিক নির্দেশিত পথে এগিয়ে গিয়ে সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ, যে কোন দিন শিক্ষার আলো পায়নি, সেও বুঝতে পারে পৃথিবীতে সোনার চেয়ে বড় দামি আরো কিছু রয়েছে — তা হল জীবন। আর এভাবেই মানিকের কলমে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষগুলি শ্রেণি চেতনায় উন্নিত হয়েছে। আসলে মানিক জীবনের ছোট বড়ো নীড়গুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জীবনের গভীরতর তাৎপর্য নিজের মতো করে সন্ধান করতে চেয়েছেন —

> জানা জীবন ভেঙে পড়ছে, গতি নিয়েছে অজানা অনিবার্য পরিণতির দিকে। তা জীবনতো আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংস হচ্ছে অবস্থাটা। ধ্বংসের পরে কোন নতুন অবস্থায় জীবন আবার কোন নতুন রূপ নিতে চলেছে, জানবার বুঝবার জন্যে কৌতূহলের সীমা নেই সাধনার।[১৩]

পাঠক হিসেবে এই কৌতূহল আমাদেরও। আমারাও তো ক্ষয়ে-ভাঙনে, নির্মাণে পুনর্নির্মাণে জীবনের নতুন রং মেশানো বাস্তবকে বুঝে নিতে চাই। উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো প্রতীক মাত্র। জীবন সম্পর্কে একটি সৎ দৃষ্টিভঙ্গি মানিক লালন করতেন। তাঁর আত্মকথন এবং উপন্যাস ও গল্পের অভীষ্ট থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি। উপন্যাসে সময় ও সমাজের সূত্র ধরে পারিবারিক অবক্ষয় ও যৌথজীবন ভেঙে যাওয়ার চেহারা আছে, স্বপ্নের অকালে ঝরে যাওয়া আছে, সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত থেকে জন্ম নেওয়া বিপর্যয় আছে। মধ্যবিত্ত সমাজ বর্গের ভাঙন ঠিক কোন পথে আসে, সে পথের সন্ধান বলে দেওয়া কঠিন। কোন কোন মোহ সামাজিক বিপদের আগাম ইঙ্গিতকে ধরিয়ে দেয় অতি সাধারণ ঘরের মেয়ের সোনার হারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং পরবর্তীকালে পারিবারিক বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে যে অসহনীয় যন্ত্রণার ছবি রাখাল সাধনার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে — তার মূলে আছে অপ্রাপণীয়াকে পাওয়ার সুতীব্র মোহ। জীবনে যা কোনোদিন ভাবতে পারেনি রাখাল আজ তা তার ভাগ্যে অমোঘ হয়ে পড়েছে। জীবন নামক প্রবাহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল প্রশ্নমালা এক এক করে তার মনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। নিত্য নতুন জিজ্ঞাসায় সে আজ উদ্বেল হয়ে উঠলেও মীমাংসার কোন পথ খুঁজে পায় না, যা আছে কেবলই প্রশ্ন থেকে জিজ্ঞাসার বৃত্তে বার বার পরিভ্রমণ। সোনার হরিণতুল্য হারের প্রতি এক সুতীব্র আকর্ষণ সাধনাকে যেমন সংযমহীন আচরণে বাধ্য করেছে। ঠিক তারই অনুসঙ্গ হিসেবে একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে সঙ্গহীন ভাবে সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, রামায়ণে সীতার সোনার হরিণের প্রতি মোহ এবং আকর্ষণকে কেন্দ্র করে যে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে উঠেছিল এবং তার পরিণতিতে লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ তরান্বিত হয়েছিল; তার কত কিছুই না সত্য মিথ্যার রূপে আজ রাখালের কাছে ধরা দিচ্ছে। যা থেকে সে জীবনের সহজ পাঠটিকে চিনে নিতে চেয়েছে —

> বনবাসিনী স্বামী সোহাগিনী সীতা ধনুকধারী সন্ন্যাসী রামের অঙ্গলগ্না হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অদূরে সোনার হরিণ কে। ছবির দিকে তাকানো মাত্র দেখা যায়, বোঝা যায়, সীতার কি আবদার — জগৎ সংসার চুলোয় যাক, সোনার হরিণ তার চাই! রাজার মেয়ে তো রাজার ছেলে ও রাজা ভবিষ্যৎ তার বৌ। কত সোনার কত গয়নাই না জানি সীতার ছিল। সব গয়না ফেলে, গায়ের গয়না গুলি পর্যন্ত খুলে রেখে বনে যেতে মায়া হয়নি সীতার। কিন্তু বনের মধ্যে সোনার হরিণ দেখেই মেয়েদের চিরন্তন সোনার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে; তার অবুঝ আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছে রামের।[১৪]

কিন্তু সব শেষ হয়ে গেলেও কিছু বাকি থাকে। শেষের পরেও আবার নতুন কিছুর শুরু হয়। জীবনের সৌন্দর্য সেখানেই, জীবন এভাবেই আমাদেরকে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতায় পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।আলো ছায়া, সত্য-মিথ্যা, সুখ-দুঃখের দ্বিরালাপেই জীবনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। জীবন নামক সংগ্রামের তাৎপর্যকে খুঁজতে হয় আলো ছায়ার মধ্য দিয়ে। সোনার রঙে রঙিন হতে চেয়ে জীবন কখনো কখনো বিবর্ণতাও লাভ করে। কিন্তু জীবন থামে না। জীবন বেঁচে থাকে আলোতে - অন্ধকারে। তাই উপন্যাসের চূড়ান্ত সমাপ্তি সূচক বাক্যে সাধনা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতকে বাঁচিয়ে রাখে — কথা আমাদের সারা জীবনে ফুরোবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চল।[১৫]

উপন্যাস-৪ : ছন্দপতন

ছন্দপতন মানিকের একবিংশতম উপন্যাস এবং সপ্তত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৫৮, প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স; পৃষ্ঠা ৪ + ১৬৬, মূল্য দু'টাকা আট আনা।[১৬] উপন্যাসটির প্রথমে নাম ছিল *কবির জীবনবন্দি*। বক্তব্য ও আঙ্গিক বিচার করলে দেখা যায়, মানিক এই উপন্যাসে যে তাঁর নিজের সাহিত্য জীবনের স্বরূপটিকে প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক কবি নবনাথ রায় যেন স্বয়ং লেখক। তার আত্মকথনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসে উত্তরণই এই উপন্যাসের উপজীব্য। মানিকের আগেকার উপন্যাসগুলির মধ্যে কাহিনির অথবা উপকাহিনির প্রাধান্য থাকলেও এই উপন্যাসে গল্পাংশ প্রায় নেই বললেই চলে। নবনাথ রায় কবি, সে জনপ্রিয় কবি হতে চায় না; জনতার কবি হতে চায়। যেহেতু সে বস্তুবাদী কবি, শব্দমদ চোলাই করা তার পেশা নয়। তাই সে আকাশ চষে কাব্যফুলের চাষ না করে মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাতে চেয়েছে। বস্তুবাদী জীবনের সঙ্গে সংযোগ না রেখে কবিরা যে একটা স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করে, এটা তার কাছে উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হয়। তার ধারনায় এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পুত্র উৎপাদন। একজন কবির ব্যক্তিমানুষ ও কবিমানুষের অন্তর্জগতের সমস্যা সংকট ও বিকাশের কথা, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসে মানিক তুলে ধরেছেন।

দেহজাত পিপাসা ছাড়াও মানুষের হৃদয় জুড়ে যে পিপাসা বিরাজ করে, তা মিটিয়ে থাকে সাহিত্য ও ললিতকলা। সাহিত্যের মধ্যে আবার সুসাহিত্যই শুধুমাত্র ঔষধি-উদ্ভিদের মতো মানুষের প্রয়োজন মেটায়, বনস্পতির মতো প্রকাশিত হয়ে আমাদের বোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে। সাহিত্য হোক বা কোন সৃষ্টিশীল কর্মই হোক, তার বুনিয়াদ ভাববাদ হোক বা বস্তুবাদ — তাকে হতেই হবে সাধনালব্ধ। এমনকি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চেতনার ভিত্তিতে গঠিত হলেও, তাতে যদি কৃত্রিমতা থাকে তবে তার ঐন্দ্রজালিক প্লাবন ভাসিয়ে দেবেই দেবে ভবিষ্যত সৃজনের ফসল ভরা মাঠ। যদি সাধনায় কৃত্রিমতা অথবা ফাঁকি পড়ে, তবে ধস নামবে তার সৃজনী বিকাশে; কীটদংশনে নষ্ট হবে কারুবাসনা। এই মূল সুরটাই যেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মানিক তাঁর *ছন্দপতন* উপন্যাসে শুনিয়েছেন।

Monologue অর্থাৎ আত্মকথনে, প্রথম পুরুষে লিখিত এই উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র বা নায়ক কবি নবনাথ রায় একজন প্রকৃত বস্তুবাদী এবং প্রচলিত, প্রথাবিরুদ্ধ, সচেতন অথচ ভিন্ন জীবনদর্শনধর্মী আধুনিক কবি। দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজের সর্বস্তরে দেখা দেয় ভাঙন। পুরানো মূল্যবোধ বাতিল হয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে এই ভাঙন আরো তীব্র হয়। সেই ভাঙনের ছবি প্রচণ্ডভাবে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যেও। লেখকদের মধ্যে ভাববিরোধও চৈতন্যের দূরত্ব প্রকট হতে থাকে। *ছন্দপতন* উপন্যাসে একজন লেখক বা কবির সেই দ্বন্দ্বপূর্ণ মানসিকতা স্পষ্ট।

কবিতা লিখতে গিয়ে নবনাথের উপলব্ধি —

১. সে বোঝে কবি হওয়া সহজ নয়। সস্তার কবি হওয়া যায়না।
২. অশেষ পরিশ্রম ও কবিতা লেখা বড় কষ্টের কথা।
৩. কবিতা আনে এক প্রকার তন্ময়তা, যা অধ্যাত্ম আবেশের সগোত্র। কেউ বলবেন কবিরা এক ধরনের পাগল।
৪. এই রোমাঞ্চকর প্রস্তুতি, এই কষ্টকর প্রক্রিয়া, যে কবি হয়নি সে বুঝবে না।
৫. ভালো কবিতার জন্য দরকার মগ্নতা।
৬. একটা কবিতা লিখতে কবির মধ্যে কি তোলপাড় হয়, কি ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে কবি সয়ে যায় ছিঁড়ে পড়ার মতো টনটনে আত্মানুভূতি। আর কঠিন তীব্র আনন্দময় তপস্যায় নিজেকে উঠিয়ে নিয়ে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার শেষ সীমানার ঊর্দ্ধে।
৭. কবি আনন্দ আর সুন্দরের উপাসক।
৮. যোগ সাধনার মত কাব্যসাধনারও নিয়ম নীতি আছে।
৯. ভাবোন্মাদনার গুরুতর যে প্রক্রিয়া তার মধ্য দিয়েই প্রকাশরূপ পায় কবিতা।
১০. অনুভূতির এক রহস্যময় জগৎ থেকে পাক দিয়ে কবি ফিরে আসেন মাটির পৃথিবীর বাস্তবতায়।

১১. কবিরা না থাকলে মানুষ ভুলে বসে থাকত যে ভালোবাসাটা আছে মানুষের জীবনে, স্বার্থের হিসাব আর পয়সার লেনদেনটাই সব নয়।

একজন কবির সঙ্গে পূর্বতন কবিদের সম্পর্ক কি হবে সে প্রসঙ্গে নবনাথ বলেন —

১. নতুন কবিকে জগতের তাবত কবিদের কাছ থেকে শিখতে হয় কবিতা লেখার কৌশল। এভাবেই দেশ-বিদেশের সকল রকম পুরোনো কবির সঙ্গে নতুন কবির যোগ সাধিত হয়।

আধুনিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কতটুকু গ্রহণীয়, কতটুকু বর্জনীয় এনিয়ে মানিকের অভিমত —

১. আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড় উৎস রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পায় নি — একথা বলা যেকোন কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি।
২. রবীন্দ্রনাথের কাব্য রস সব গাছের কোষে।
৩. রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চোরা কারবার চলছে।

উপন্যাসের নায়ক নব তার কবিতা লেখার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন —

১. মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই তার কবি হওয়ার সাধ।
২. শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মানুষের আপন হয়ে উঠতে হবে, তবেই জানা যাবে সেই প্রাণের ভাষা।— যে ভাষা ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।
৩. কবিতা বলে মনুষ্যত্বের মর্যাদার কথা।
৪. মধ্যবিত্তের জীবনে সর্বস্তরে যে দ্বিধা একদিন সে দ্বিধা সংক্রামিত হয় মধ্যবিত্তের কবিতাতে।

কবি নবনাথ দেখেছে সংসারের প্রচলিত ধরাবাঁধা নিয়ম আজ অচল। মধ্যবিত্ত সমাজ সংসার একটা বিরাট ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে। জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি অসহায় অবস্থা, মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কত নীচেই না নামতে হচ্ছে। কেউ ফেরিওয়ালা অথবা কোনো কিশোরী নিজের কুমারীত্বের বিনিময়ে দু-মুঠো খাবার জোগাড় করছে। সমাজ বাস্তবতার এরকম নানা খবর নবনাথের কবিতার বিষয়। নবনাথ কবিতা লেখে, মানুষের ভাত-কাপড়ের দাবিতে সভায় যায়, আবার সবার পিছনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজেই সে মিশে যেতে পারে। নবনাথ চায় বস্তুবাদী কবিতা লিখতে, অযথা শব্দের নেশায় মানুষকে উন্মাদ করে তোলা তার পছন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করে তার কবিতায় মেহনতি মানুষের কথা আছে, মানুষের জন্য বেদনা আছে, ব্যাকুলতাও আছে, তবুও কোথাও যেন একটা আন্তরিকতার অভাব। এতদিন সে মন্ত্রের মতো সংগ্রামী মানুষদের জন্য কবিতা লিখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার উপলব্ধি —

> ভালোবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই — শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা — যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।[১৭]

নবনাথের এই আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানিক বোঝাতে চেয়েছেন সংগ্রামীমানুষের জীবন সংগ্রামকে শ্রেণিচেতনা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলে তা প্রকৃত তাৎপর্য লাভ করে না। মানুষের মাঝে গিয়ে মানুষকে ভালোবাসতে না পারলে, মানুষের প্রতি একাত্মতা ও শ্রদ্ধাবোধ না জন্মালে সংগ্রাম এবং কবিতা দুই ব্যর্থ হয়।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৭ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০, পৃ. ৪৫৯।

২. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* অঞ্জলি, ২০০০, পৃ. ১২১।

৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৭ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪।

৪. 'স্বাধীনতার স্বাদ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২।

৬. শামসুর রহমান, 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা', *বন্দিশিবির থেকে,* শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, ১৯৮৮, পৃ. ৮৭।

৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৭ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২।

৮. রিঙ্কি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস,* গ্রন্থালয়, কলকাতা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭।

১০. 'সোনার চেয়ে দামি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৭ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮।

১৬. 'ছন্দপতন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৭ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৭।

১৯৫২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪৪তম বছর। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার শতকরা ৭৫ ভাগ আসনে কংগ্রেস জয়ী হয়। রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ৬৮.৫ ভাগ আসনে কংগ্রেস জেতে। লোকসভায় ২৩টি আসন লাভ করে কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টির মর্যাদা পায়। এই বছরে প্রথম সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। এর অধীনে ছিল ৫৫টি ব্লক এবং প্রতিটি ব্লকের অধীনে ছিল ১০০টি করে গ্রাম।

জানুয়ারি ৪ যুদ্ধক্ষেত্রে বা বাইরে কোথাও দেশবাসীকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হওয়া বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'অশোকচক্র' পদকে ভূষিত হবার পুরস্কারটি দেওয়া শুরু হয়।

জানুয়ারি ২৪ বোম্বাইয়ে ভারতের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

ফেব্রুয়ারি ২১ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) বাংলাভাষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন ও ৯ ছাত্র শহিদ। আয়ুবশাহী সমগ্র পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বিক্ষোভ। মাতৃভাষা বাংলাভাষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন।

ফেব্রুয়ারি ২১ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) বাংলা ভাষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন ও ৯ ছাত্র শহিদ। আয়ুবশাহী সমগ্র পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বিক্ষোভ। মাতৃভাষা বাংলার জন্য ব্যাপক আন্দোলন।

ফেব্রুয়ারি ২১ পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে শহিদ হন বরকত, জব্বার, সালাম, রফিক প্রমুখ। বাংলাদেশে এই দিনটি শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হয়। উল্লেখ্য, আবুল বরকত (৩০) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র; আবদুল সালাম (২৯) ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মী, রফিকউদ্দিন আহমেদ (২৭) ছিলেন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র; সফিউর রহমান ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের অর্থ দপ্তরের কর্মী; আবদুল জব্বার (৩০) ও মহাম্মদ সালাউদ্দিন (২৬) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র।

ফেব্রুয়ারি ২২ পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে মিছিল হয়, তাতে পুলিশ গুলি চালালে শফিকুল রহমান শহিদ হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৪ ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ঢাকায় প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়। কয়েকদিন পরই পুলিশ সেটি ধ্বংস করে দেয়।

এপ্রিল ৫ ভারতের রাষ্ট্রদূত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ মস্কোতে যোসেফ স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এপ্রিল ১৭ ভারতে প্রথম লোকসভা গঠিত হয়।

এপ্রিল ২৪ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ নির্বাচিত হন।

এপ্রিল ২৮ এশিয়া মহাদেশের জাপান সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়, রাজধানী টোকিও।

মে ১৩	স্বাধীন ভারতের লোকসভার প্রথম অধিবেশন বসে। ভারতের রাষ্ট্রপতি হন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।
মে ৩১	৩১-১ জুন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার একাদশ রাজ্য সম্মেলন ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর কুমারশায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে মহঃ আবদুল্লাহ রসুল ও ভূপাল পন্ডা।
জুন ১২	স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের পর প্রথম বিধানসভার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।
জুন ১৩	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। ৩০ জনের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ফণীভূষণ চক্রবর্তী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।
জুন ১৯	শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।
আগস্ট ১৬	১৬-১৯ আগস্ট জার্মানির বার্লিনে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ডেমোক্র্যাটিক ইউথ-এর ৪র্থ সম্মেলন হয়। ১০৪টি দেশের ২৬০০০ প্রতিনিধি অংশ নেয়।
অক্টোবর ১১	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন শুরু হয় কলকাতায়।
ডিসেম্বর ২২	'গণশক্তি' প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়।
ডিসেম্বর ২৪	ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়ক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অরুণকুমার সরকার : *দূরের আকাশ* / সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : *হসন্তিকা* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *অপ্রেম ও প্রেম*। **নাটক** — মন্মথ রায় : *জীবনটাই নাটক, পথে বিপথে, মহাভারতী*। **উপন্যাস** — আশাপূর্ণা দেবী : *বলয়গ্রাস, অগ্নিপরীক্ষা* / প্রতিভা বসু : *মনের ময়ূর* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *তামস তপস্যা, নাগিনী কন্যার কাহিনী* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *সোনার চেয়ে দামি, ইতিকথার পরের কথা, পাশাপাশি, সার্বজনীন* / সুবোধ ঘোষ : *সীমান্ত সরণি* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *দূরভাষিনী* / সন্তোষকুমার ঘোষ : *নানা রঙের দিনগুলি* / সমরেশ বসু : *নয়নপুরের মাটি, জি.টি. রোডের ধারে*। **গল্পগ্রন্থ** — রাজশেখর বসু : *ধুস্তরী মায়া* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *শিলাসন* / মনোজ বসু : *কুমকুম*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — প্রমথ চৌধুরী : *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (১ম খণ্ড) / সৈয়দ মুজতবা আলি : *চাচা কাহিনি, ময়ূরকণ্ঠী*।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অজিত ভট্টাচার্য, অলকেশ ভট্টাচার্য, অশোক আচার্য, একরাম আলি, কাজল সেন, মিলনেন্দু জানা, সমীরণ মজুমদার।

মৃত্যু : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

প্রবল আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিন মাসে অন্তত ৫০০ টাকা সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে ব্যয় সংকোচ এবং পাশাপাশি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ লাভের আশায় সংযম সাধনের ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তা বাস্তবে কার্যকর হয়ে ওঠেনি। তাঁর ডায়েরি থেকে জানা যায় রাজনৈতিক ভীতি এবং উপরের চাপের ফলে প্রকাশকেরা তাঁর বই প্রকাশ করতে উৎসাহী ছিলেন না। ফলে মানিক প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়েন। আর্থিক অনটনে অসুস্থ মানিক তবুও লিখে চলেছেন। অক্টোবরে তিনি অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে তাঁকে ঘরের মধ্যে আটকা থাকতে হয়। অক্টেবরেই *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের সুইডিশ অনুবাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিছুদিন সুরা পান বন্ধ রাখলেও অসুস্থ বিচলিত মানিক এই সময়ে আবার সুরা পানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় — *সোনার চেয়ে দামী* (দ্বিতীয় খণ্ড), *ইতিকথার পরের কথা*, *পাশাপাশি* এবং *সার্বজনীন*। অক্টোবরে বসুমতি সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয় *মানিক গ্রন্থাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশিত গল্প: 'মীমাংসা' (*দেশ*, শারদসংখ্যা), 'ভোতাহৃদয়' (*বসুমতি*, মার্চ) 'গেঁয়ো' (*মুখপত্র*, এপ্রিল), 'পুরস্কার' (*আগামী*, মে), 'বিপদ ও বন্ধু' (*পরশমণি*, পূজাবার্ষিকী), 'রূপান্তর' (*গল্পভারতী*, পূজাবার্ষিকী), 'বিয়ে' (*অনন্য*, শারদীয়া), 'শিল্পী' (*শারদীয় পরিচয়*), 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' (*মৌচাক*, ডিসেম্বর), 'মায়া নয় দায়' (*গল্পভারতী*, ডিসেম্বর)।

উপন্যাস-১ : ইতিকথার পরের কথা

এটি মানিকের বাইশতম উপন্যাস এবং উনচল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৫৯, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা - ৪ + ২৬২ , মূল্য চার টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে অনিল কুমার সিংহ সম্পাদিত *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় মাঘ ১৩৫৭ থেকে চৈত্র ১৩৫৮ পর্যন্ত মোট তেরো কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১]

স্বাধীনতা পরবর্তী শ্রেণিচিত্র, বিকশিত গ্রামীণ পরিবেশ এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস এই উপন্যাসে দেখা যায়। গ্রামীণ জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে বলা যায় উপন্যাসটি তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। পাশাপাশি শিক্ষিত যুবক শুভময়ের বংশগত সংস্কার ও ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার থেকে উত্তরণের বিষয়টিও উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময় এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র হলেও বহুমুখী চরিত্র ও সম্পর্কের দ্বারা এই উপন্যাসের কাহিনি নিয়ন্ত্রিত। উচ্চশিক্ষায় বিলাত ফেরত শুভময় ওরফে শুভ দেশের উন্নয়ণের লক্ষ্যে শিল্পকারখানা করতে চায়। তার বিশ্বাস সদ্য স্বাধীন দেশের উন্নয়ণের অর্থ দেশকে নতুন ও টেকসই শিল্পকারখানায় সমৃদ্ধ করে তোলা। কারখানা গড়ে তোলা ছাড়া ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই। কিন্তু কারখানার ধরণ কি হবে শুভ তা জানে না। দেশি মিশেল ছাড়া বিলাতি

বিদ্যা কাজে আসে না। তাই চিন্তা ও কর্মসহায়ক হিসেবে সে গ্রামের ডাক্তার নন্দ কর্মকারকে বেছে নেয়। আর আসে কৈলাস। শুভ, নন্দ ও কৈলাস এই ত্রিবেণী সঙ্গমে এই উপন্যাসের কাহিনি ঘনীভূত হয়। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় লক্ষ্মী, গাঁদা ও মায়ার মত আধুনিক মনস্কা নারী।

এই উপন্যাসের প্রধান দ্বন্দ্ব — সামন্ততান্ত্রিক রক্তের উত্তরাধিকারী হওয়া সত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে শুভময়ের আস্থা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। অত্যাচারী জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময় কি করে অত্যাচারিত গরীব দুঃখীর কথা ভাবতে পারে — এটি গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করতে চায়না। আর শুভর পিতাই বা কেন বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত জমিদারির অহংকার ছেড়ে শুভর খামখেয়ালী মেনে নেবে ? এছাড়া নারী পুরুষের যৌনতা বাহিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তারে গতি এনেছে। শেষ পর্যন্ত শুভময়ের পিতার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে যে Attitude নিয়ে মানিক শিল্পীজীবন বেছে নিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে তিনি তাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। একটি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে তিনি এই উপন্যাসের কাহিনি বয়ন করেছেন। যদিও এই সময় মানিকের জীবনে চরম দুরাবস্থা চলছিল, আর্থিক অনটনতো ছিলই, শরীর আগের মতো ভারবহ ছিল না, তার সঙ্গে অসুস্থতা এবং মদের নেশা তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। আর জীবনের এত সমস্যার দুর্বিপাকেও তাঁর প্রতিভা খুব একটা বাধাগ্রস্ত হয়নি। দেশ ভাগের চার বছর পরে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত। মার্কসবাদী অভিজ্ঞতা থেকে মানিক খণ্ডিত দেশ ভাগের পক্ষে ছিলেন না। তাই বলে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপুষ্টতাও তিনি চাননি। চিন্তার স্বাধীনতা ও শ্রমবান্ধব একটি দেশ গড়ে উঠুক — মানিকের স্বপ্নে তা ছিল ষোলো আনা। কিন্তু এর কোন প্রস্তুতি না থাকায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে পুরনো বিপ্লবী জীবন বাবুকে দিয়ে। যৌবনে হয়ত এইসব বিপ্লবী স্বাধীনতার জন্য কিছুটা Sacrifice করেছিলেন কিন্তু জীবন সায়হ্নে এসে ত্যাগ ও প্রাপ্তিকে তাঁরা মেলাতে পারেন নি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তাই তাদের অনেকেরই হয়েছে অধঃপতন। বেঁচে থাকার দায় মেটাতে তাদের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হতে হয়েছে। জীবনবাবুর নাটকীয় ঘটনার রাতে পুলিশের দারোগা বন্দুক ঠেকিয়ে লক্ষ্মীকে ধর্ষণ করে। লক্ষ্মী এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং শুভময়ের কর্মসহায়ক হিসেবে সে উপন্যাসের কাহিনিকে গতিশীলতা দান করেছে। নারী চরিত্র নির্মাণে মানিকের শৈল্পীক চূড়া স্পর্শ করেছে লক্ষ্মী চরিত্র। মনের দোলাচল, দ্বিচারিণীক বৈশিষ্ট্য ছাড়াই সে শুভ ও কৈলাশের কর্ম অনুপ্রেরণার সঙ্গী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ সে কুমারী নয়, বিধবাও নয় — তার স্বামী বহুদিন ধরে পলাতক। নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের অবচেতন বিষয়গুলো এখানে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন মানিক। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধরণ, মিলিত হবার উপায় যে সব সমাজে সবকালে একমাত্রায় প্রবাহিত নয় — লক্ষ্মী ও কৈলাশের সম্পর্কের সূত্র ধরে লেখক তা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বহুদিন আগে সাপের কামড়ে কৈলাশের স্ত্রী বিগত হয়েছে, বহুবছর ধরে লক্ষ্মীর স্বামীর কোন পাত্তা

নেই, কিন্তু কৈলাশ এবং লক্ষ্মীর মিলিত হবার সুযোগ সমাজ রাখেনি। এই উপন্যাস রচনার শতবর্ষ আগে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ চালু হলেও সমাজ তা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। অথচ ঘরে, রাস্তায়, ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বিধবা ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য কৈলাস ধর্মান্তরিত হওয়ার কথাও ভেবেছিল কিন্তু ধর্মও তাদের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে সামাজিক অনুশাসনের কাছে ব্যক্তিজীবন উপেক্ষিত থেকে যায় তার খবর কেউ রাখেনা।

এই উপন্যাসে মানিক বারতলা গ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র অঙ্কণ করতে চেয়েছিলেন। ছোটবড়ো মিশে প্রায় অর্ধশত চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। গ্রামের ডাক্তার নন্দ কর্মকার, জমিদার জগদীশ, সুদখোর মহাজন ধরণী, পুলিশের দারোগা ভুবনমোহন, মন্দিরের পূজারি ত্রিভুবন, শুভর হবু শ্বশুর ভূদেব, শুভর মা সাবিত্রী, বাগদত্তা মায়া, কৃষক ভূষণ, ঘটনরাম, বিপিন, ফজলু, নবমন্দির কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী, জমিদারের নায়েব, লেঠেল — বহুমুখী চরিত্রের সমাহার ঘটেছে এখানে। ব্রিটিশ পরবর্তী এদেশের একটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক চিত্র আমরা এই উপন্যাসে পাই। বিলাত ফেরত শুভময় স্বাধীন দেশের জন্য কিছু একটা করতে চায়। সামন্ততান্ত্রিক রক্তের উত্তরাধিকারের টান অতিক্রম করে সে। কিন্তু সে জানেনা কিভাবে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটবে। কারখানা শুরু করতে গিয়ে টের পায়, কাজটি এত সহজ নয়। বড়বড় শিল্প কারখানাযে দেশের কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করে দেবে সেটিও সে অনুভব করে। ক্রমশ শুভময় স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করে সে তাদের পর নয়। তার বাবা অন্যায় করে থাকলে তার জন্য সে দায়ী হতে পারে না। এইভাবে সে জমিদার পিতার সঙ্গেও বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। স্বাধীন দেশের সচেতন নাগরিক শুভ তার নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে ফেলে। তার শিক্ষা ও শ্রম দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে চায় সে। এই উপন্যাসে শুভময়ের সংস্কারকে বড় করে দেখাননি মানিক। শুভময়ের চারিত্রিক নমনীয়তার মধ্য দিয়ে মানিক এটাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, সংগ্রামী মানুষের জীবনে পরিবর্তন আবেগ দিয়ে সম্ভব নয়। তারজন্য প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষা, পরিকল্পনা এবং অবশ্যই মেহনতি জনগণের সঙ্গে একাত্মতা। তা না হলে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই আমরা মানিকের মধ্যে ইতিকথাধর্মী রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করি। তার কারণ মানিক কল্পনা নির্ভর কাহিনির চেয়ে সমকালীন সমাজের ইতিহাস রচনা করার দিকে অধিক আগ্রহী ছিলেন। যার মধ্যে শোনা যাবে সব মানুষের — বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষের হৃদস্পন্দন — যাদের ইতিহাস মূলত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না– তাদের সংগ্রাম, তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, তাদের জীবনের আলো-অন্ধকার, তাদের সবকিছুই। সমকাল নির্মাণে মানিকের লেখনী নিরন্তর চালিত থেকেছে উপন্যাসের পর উপন্যাসের পাতায়।

উপন্যাস-২ : পাশাপাশি

পাশাপাশি মানিকের তেইশতম উপন্যাস এবং চল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল মহালয়া ১৩৫৯, প্রকাশক সাহিত্য জগৎ কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪ + ৭২, মূল্য তিন টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটির পত্রিকায় প্রকাশের কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।[২]

এই উপন্যাসে একটি চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে নানা ধরনের গল্প তৈরির চেষ্টা করেছেন লেখক। উপন্যাসের নায়ক সুনীলকে আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়হীন মনে হয়। তার কোন নেশা নেই, নারীতে সে আসক্ত নয়। মদ খায় না, জুয়া খেলে না, সিনেমা দেখে না। সে সংসার বিরাগী নয়, ত্যাগ ব্রতে তার কোন উৎসাহ নেই, সাংসারিক প্রয়োজনে তার পরিশ্রমের অন্ত নেই। স্নেহ, মায়া, প্রেম — কোনটাই তার কাছে আবশ্যিক নয়, তার হৃদয় চালিত হয় না অনুভূতিতে। ঠিক যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুর বাইরে খরচ করতে নারাজ বলে বাড়ির লোকে তাকে ভাবে হৃদয়হীন। দুর্মূল্যের বাজারে যখন ঘরে ঘরে বেকার, তখন সুনীল তিনশ টাকা মাইনের চাকরি করে। সংসারে প্রয়োজন আর আবদারের মধ্যে প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেয় সে। এমনকি ভাই বোনেদের মধ্যে সস্তা লঘু ভাবপ্রবণতাকে প্রাধান্য না দিয়ে তাদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলতে সুনীল বদ্ধপরিকর। চাকরি ছাড়াও সুনীল পার্ট-টাইম কাজ করে, টিউশনি করে। নন্দাকে সে ইংরেজি সাহিত্য পড়াবার দায়িত্ব নেয়। এবং সেই সূত্রে নন্দার মৃত স্বামী প্রমোদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *The People Voice* খবরের কাগজটির সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে। উৎসাহনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, বুদ্ধি এবং লেখকতার সুবাদে নন্দার আগ্রহে সুনীল কাগজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে ওঠে। শুরু হয় অমানুষিক পরিশ্রম এবং কাগজটিকে কেন্দ্র করে তার জীবনে এক নতুন উদ্দীপনাময় পরিস্থিতি। এই সংবাদপত্রটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নন্দা সুনীলকে জানায় —

> দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা আসবার সময় প্রমোদের খবরের কাগজ বার করার ঝোঁক চাপে। এইতো উপযুক্ত সময়, যে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে চারিদিকে, ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা যেন কোন দলের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থে ব্যাহত না হয়, ক্ষুণ্ণ না হয়। আজকের দিনেই সবচেয়ে বড় দরকার একটি নির্ভিক নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের, দেশের মানুষের স্বার্থ ছাড়া, যে কাগজ আর কিছুই বড়ো করে দেখবে না।
>
> যে কাগজ সহজ এবং স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় দেশের লোকের কাছে খুলে ধরবে সমস্ত দল আর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির স্বরূপ। তাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের আসল উদ্দেশ্য, চিনিয়ে দেবে কে দেশের শত্রু, কে মিত্র, তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতে মুখোশ খুলে দেবে মতলববাজ সুবিধাবাদী মানুষদের।[৩]

সর্বস্ব পণ করে প্রমোদ সেই সংবাদপত্র প্রকাশ করলেও সংবাদপত্রের চাহিদা আশানুরূপ হয়নি। হৈ চৈ করে প্রকাশিত হলেও সংবাদপত্রটিকে মানুষ বিশেষ গ্রহণ করেনি। এর কারণ সম্পর্কে সুনীলের বক্তব্য—

অদলীয় মানুষ হয়না, অদলীয় কাগজও হয়না। মানুষ হোক, কাগজ হোক একটা পক্ষ নিতেই হবে...

রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনীতি বাদ দিয়ে আপনার চলতেই পারে না। আপনার জীবনে রাজনীতি এঁটে থাকবেই। আপনি একটা কাগজের মালিক কিন্তু ধরে নেওয়া যাক আপনি কাগজ পর্যন্ত পড়েন না। কিন্তু শোনেন তো চালের দর কোথায় উঠেছে ? লোকে না খেয়ে মরছে ? উদ্বাস্তুরা কিরকম কষ্ট পাচ্ছে ? কত মানুষ বেকার বসে আছে ? সব কিছু কালোবাজারের গ্রাসে গেছে ? দেশের লোকের সভায়, গুলি চলছে ? শুনে নিশ্চই গাজ্বালা করে আপনার। তার মানেই পক্ষ নিলেন...

পক্ষ যে মানুষকে নিতেই হবে তার আসল মানে আপনি ধরে রেখেছেন আন্দোলন করা, সোজাসুজি আন্দোলনে যোগ দেওয়া। কোন দল সাধারণ লোকের জন্য ন্যহ্য দাবী তুললে ঘরের কোণে বসে মনে মনে সায় দিলেও আপনি পক্ষ নিলেন।...

পক্ষ যে মানুষকে নিতেই হবে তার আসল মানে হল এই যে, সমস্ত মানুষ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে, — শোষক আর শোষিত। এর একটা ভাগে মানুষকে পড়তেই হবে। রাজনৈতিক দলও আসলে আছে দুটোই — শোষক আর শোষিতের দল। দুটো দল ছাড়া বাকি সব উপদল, সুবিধাবাদী দল।[৪]

জনসাধারণের মধ্যে গণচেতনাকে প্রসারিত করার কাজে দেশীয় সংবাদপত্রের গুরুত্ব কতখানি তা এই উপন্যাসে মানিক তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে সৃজ্জমান দেশের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা কেমন ছিল, তাও এখান থেকে আমরা জানতে পারি। কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনা দেওয়া সংবাদপত্রের যথার্থ দায়িত্ব নয়। জনসাধারণের চেতনার মাননোন্নয়ন ঘটানো এবং সমাজ পরিবর্তনের শরিক হওয়া প্রয়োজন সংবাদপত্রের। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা বৃদ্ধি করার দায়িত্বও সংবাদপত্রের থাকা জরুরি। এই সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনার আবর্ত এবং চরিত্রগুলির মানসিক টানাপোড়েন সূক্ষ্মরেখায় তুলে ধরেছেন মানিক। সবকিছুর উর্ধ্বে মানিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, দেশভাগ পরবর্তী দেশের বেহাল সামাজিক দশা এবং প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তার থেকে উত্তোরণ এর চেষ্টায় রেখাচিত্রটিকে তুলে ধরা। সেই কাজে সংবাদ পত্রগুলির ভূমিকা কেমন ছিল অথবা একটি সংবাদপত্রের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সামাজিক ও মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে মানিক সাফল্যের সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রের দর্শন-কর্ম-ভূমিকা নিয়ে মানিকের এই চিন্তাভাবনাগুলি বর্তমান সময়েও কি প্রাসঙ্গিক নয় ? বর্তমানকালে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ রাখতে গিয়ে আমরা কি কাগজগুলির গোষ্ঠী এবং রঙ নিয়ে আলোড়িত হই না। সেসব প্রশ্নের উত্তর মানিকের এই উপন্যাসে হয়ত খানিকটা আমাদের মিলতে পারে।

উপন্যাস-৩ : সার্বজনীন

এটি মানিকের চব্বিশতম প্রকাশিত উপন্যাস এবং একচল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৯, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ২ + ২৫২, মূল্য চার টাকা। উপন্যাসাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।[৫]

১৯৪৬ ও ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ফলে বঙ্গভাষী অঞ্চলের দু-অংশের হিন্দু-মুসলমান জনগণের বাস্তুভিটা ত্যাগের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম যে ঘটনাটি ঘটে, বিশেষত বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়ে বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গে আগমনের ফলে যে উদ্বাস্তু সংকট মারাত্মক হয়ে ওঠে — তারই পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। তবে উপন্যাসে এই সংকটের বাহ্যিক রূপ চিত্রণকে মানিক প্রাধান্য দেননি। জলের দামে সবকিছু বিক্রি করে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের পূর্বপুরুষের ভিটাত্যাগের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতাগামি ট্রেনে উদ্বাস্তুদের প্রচণ্ড ভিড়। অভিভাবকহীন অবস্থায় কলকাতা বিপদ ভেবে এক বালিকার বালক সেজে তার পরিবারের অভিনব অভিভাবকত্ব গ্রহণ, শিয়ালদা স্টেশনে শত শত উদ্বাস্তু পরিবারের থাকার ব্যবস্থা, কলকাতার উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ উপন্যাসে আছে। তবু এইসব ঘটনাই মুখ্য হয়ে ওঠেনি, উদ্বাস্তু সংকট। তার চিত্র অঙ্কনেই মানিক অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন —

> পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত *সার্বজনীন* উপন্যাস। উপন্যাসে চরিত্র আছে অনেক। সেই সব চরিত্রের জীবন সংগ্রাম ও সংগ্রামী চেতনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমণের ফলে বসবাসের জায়গর অভাবের জন্য গড়ে ওঠে অজস্র কলোনি। ... বেঁচে থাকার তাগিদে, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বহু মধ্যবিত্ত মানুষ ফেরি করে, গান গেয়ে, ভিক্ষাবৃত্তি করে উপার্জন করেছে। এই সমস্ত কাজকে তারা হীন বলে মনে করেনি। আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অনেকে পিছিয়ে পড়ে হতাশ হয়েছে। কেউ আবার তঞ্চকতা করে উপার্জন করেছে। সমগ্র সমাজ তখন ভগ্নগ্রস্ত ... সেই বিরাট ভাঙনের মধ্যেও মানিক আশাবাদ কে প্রতিষ্ঠা করেছেন *সার্বজনীন* উপন্যাসে।[৬]

সার্বজনীন একটি উদ্বাস্তু জীবনের আখ্যান। নামমাত্র মূল্যে সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে পূর্বপুরুষের ভিটাত্যাগের বেদনা নিয়ে মহেশ্বর পরিবার কলকাতায় গিয়ে ওঠে। দেশে তাদের বেশ আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। এত বিপদের পরেও কলকাতায় একটি ছোট বাড়ি কিনে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে অসুবিধে হয় নি। জমানো টাকায় বেশিদিন সংসারের ব্যয় চালানো সম্ভব নয় — মহেশ্বর জানতেন। কিন্তু তাইবলে সাত পুরুষের পূজা-উৎসব বাদ দেবে — এমন কথা সে ভাবতেও পারেনি। ফলে পূর্বের মতোই বেশ

জাঁক জমকের সঙ্গে দুবছর পূজা অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু মহেশ্বরের পক্ষে আর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এবং এই পূজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া কতখানি গভীর ও তীব্র অভিঘাত তৈরি করেছিল মহেশ্বরের মনে, তা বাইরে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। মহেশ্বরের বাড়িতে পূজা হবে না জেনে পাড়ার যুবকেরা যখন একটি সার্বজনীন পূজা উৎসবের কথা ভাবল এবং সেই পূজা কমিটির সভাপতি হিসেবে মহেশ্বরের নাম প্রস্তাব করল, তখনই তার তীব্র হৃদয় যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটল: "বাপ ঠাকুরদার পূজো বন্ধ করলাম, তাঁরা আমায় স্বর্গ থেকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এমন কুলাঙ্গার আমি, কোন মুখে তোমাদের পূজোয় প্রেসিডেণ্ট হব ? না বাবা, আমায় রেহাই দাও। আমার জ্বালা বাড়িও না।"[৭]

চিরাচরিত নিয়ম ও ধর্মীয় অনুশাসনে বাঁধা একটি মন ঐতিহ্যের আশ্রয় হারিয়ে, জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত হয়ে, স্বাভাবিক জীবন থেকে ভেসে গিয়ে ভেঙে পড়েছে ব্যর্থতায়। মহেশ্বরের এই মানসিক যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করেছে পঙ্কজ —

> সব গেছে মহেশ্বরের কিন্তু তবু সে ভাবেনি সব শেষ হয়েছে। বছরকার পূজোর পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর কাছে বেঁচে থাকার মানেটাই শুধু হয়ে যায়নি, জীবনটা হয়ে গেছে ব্যর্থ, অভিশপ্ত। ... নিজের জীবন যেমন মহেশ্বরের কাছে আমার জীবন, বাড়ীর পূজোও তার কাছে তেমনি আমার জীবন, বাড়ীর পূজো ও তার কাছে তেমনি আমার পূজো। ঠাকুরদাদা তার বাপকে জন্ম দিয়েছিল আর দিয়েছিল এই পূজোর দায়িত্ব। শিশুকাল থেকে বাপের কাছে এই জন্মগত দায়িত্বের মানে শিখেছে মর্মে মর্মে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত নিজে পালন করে এসেছে দায়িত্ব।
>
> নিজের বাড়ির নিজের এই পূজো ছাড়া আর সব পূজো তার কাছে মিছে। মুখের কথায় বুঝিয়ে কি আজ তার চেতনা জন্মানো যায় যে তার এই হতাশা কাতরতার পিছনে আছে তারই হৃদয় মনের ক্ষুদ্র সংস্কার আর সংকীর্ণতা।[৮]

এই সংকীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্নতার পঙ্কে নিমজ্জিত জীবন থেকে মহেশ্বরের উত্তোরণের চিত্রও মানিক দেখিয়েছেন। কিভাবে সে আত্মকেন্দ্রিক হতাশাগ্রস্থ নিরানন্দ জীবন থেকে গোষ্ঠী জীবনের ব্যাপকতার আনন্দে স্থির হল — তারই কাহিনি মানিক দেখিয়েছেন। এর পেছনে সক্রিয় থেকেছে মানিকের শ্রেণিসচেতন মানসিকতা। মহেশ্বরের মনে আত্মসুখ সর্বস্ব সামন্ত মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল, সার্বজনীন পূজো-উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। সে সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে সম্মত হল। অতঃপর দুর্গোৎসবের শুরুতে সে হয়ে গেল একেবারে ভিন্ন মানুষ —

> পূজো মণ্ডপে পাড়ার প্রথম বার্ষিকী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনের দিন মহেশ্বরকে দেখে টেরও পাওয়া যায় না এটা তার নিজের বাড়ির সাতপুরুষের পূজো নয় — বাড়ির কর্তা হিসেবে করার বদলে পূজো কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে সে সব দেখাশোনা করছে, সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।[৯]

এই পরিবর্তন শুধু মহেশ্বরের মধ্যেই সঞ্চারিত হল তাই নয়, অগ্রজ পরমেশ্বরের মধ্যেও দেখা দিল। পরমেশ্বর দায়িত্বমুক্ত একক জীবনের আনন্দেই ছিল আত্মহারা। উদ্বাস্তু জীবনের সংকট তার আনন্দপূর্ণ জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। সর্বহারা মানুষদের সঙ্গে সে ধীরে ধীরে মিশে যেতে লাগল সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে। নিজ আনন্দের নেশায় সে চিরকাল বিভোর ছিল, তারও ভুল ভাঙে: 'একলা আমার আনন্দে থাকার কোন মানে ছিলনা।' পরমেশ্বরের এই রূপান্তরের পেছনে আছে উদ্বাস্তুদের লড়াই। ছিন্নমূল মানুষ ভিন্নতর জীবনে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে হারতে হারতেও মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর তাদের একজন হতে পেরে পরমেশ্বর ভাবে, "দশটা মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়াইয়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।"[১০] বস্তি আর কলোনির উদ্বাস্তুরা নতুন করে বাঁচতে শেখায় সকলকে —

> কারা আমায় এই হতাশা জয় করতে শিখিয়েছে জানো ? — উদ্বাস্তুরা। ... ওরা আমায় শিখিয়েছে কখনো কোনো অবস্থাতেই মানুষের হতাশ হতে নেই। সবসময়েই আশা নিয়ে থাকতে হয়। অনেকদিন পথে পথে ঘুরেছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ের ফন্দি ফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে স্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। ওদের দেখি আর অবাক হয়ে যাই। যথা সর্বস্ব গেছে, ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করবে কোথায় যাবে কিছুই ঠিক নেই, কারোও হয়তো একবেলা খেলে আর একবেলা খাওয়া কোথা থেকে জুটবে জানা নেই — কিন্তু কি মনের জোর হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন আবার সব হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ যদি সাহায্য করে ভালো, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। যার যত বেশি দুর্গতি তারই যেন তত বেশি আশা, তত বেশি মনের জোর।[১১]

জীবনের দুর্বিপাকে তলিয়ে যাওয়া সমীরের এই উপলব্ধি স্পষ্ট করে দেয় সে দিনের উদবাস্তু জীবনের মর্মবেদনাটিকে। এই উপন্যাসে মানিক উদ্বাস্তু সমস্যার বাহ্যিক আলোড়নকে বেশি আঁকেননি। বরং এই ঘটনা আর্থসামাজিক জীবনে কী গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, বিশেষত মনোজগতে তার প্রভাব হল কত গভীর ও ব্যাপক তা দেখাতেই মানিক সচেষ্ট থেকেছেন। তাই পরমেশ্বর, মহেশ্বর, সাধন, সবিতা, সমীর ইত্যাদি চরিত্রের ব্যক্তিগত সংগ্রাম বর্ণনা মানিকের উদ্দেশ্য নয়। এই চরিত্রগুলি সমগ্র উদ্বাস্তু মানুষদের প্রতিনিধি —

> দেশছাড়া, গৃহছাড়া মানুষদের বিপর্যয়ের চিত্রের বাস্তব রূপ দানের সঙ্গে সেইসব বাস্তুহারা মানুষদের নতুন উদ্যমে জীবন গড়ে তোলার প্রচণ্ড উৎসাহ এবং উদ্দীপনা উপন্যাসে অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। মানিক ছিলেন সাম্যবাদী চেতনা ঋদ্ধ মানুষ। সাম্যবাদে ব্যক্তির চেয়ে সমগ্রের প্রাধান্য বেশি। সাম্যবাদী আদর্শের দ্বারাই মানিক তাঁর *সার্বজনীন* উপন্যাসে উদ্বাস্তু মানুষদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মুখ্য করেছেন। যে সংগ্রাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সার্বজনীন।[১২]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ের অভিঘাত বাংলাদেশে সমাজে এবং জীবনে নানা দিক থেকে এসেছিল। দেশবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই মানিকের এই পর্বের উপন্যাসে ও গল্পে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দীর্ঘ বাসনা লালায়িত হয়েছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের এই কয়েক বছরেই সমস্ত সে আশা নিভে এসেছিল। পরাধীনতার যন্ত্রণার থেকেও আরো অনেক বেশি দগদগে ক্ষত সমাজের সারা শরীরে দিন দিন চিহ্নায়িত হয়ে উঠেছিল। উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল তেমনই একটি ক্ষতচিহ্ন। সময়ের সেই প্রজ্জ্বলন *সার্বজনীন* উপন্যাসে মানিক দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৮ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ. ৫২৩।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩১।

৩. ‘পাশাপাশি’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৮ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৮ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৪।

৬. রিঙ্কি চক্রবর্তী, বিশশতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি, ২০১০, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

৭. ‘সার্বজনীন’, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,*, ৮ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮।

১২. রিঙ্কি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

পঞ্চম অধ্যায়

মানিক জীবনের অন্তিম অধ্যায়
(১৯৫৩ - ১৯৫৬)

১৯৫৩

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪৫তম বছর। বরাবরের সংগ্রামী মানিক আজ পরাজিত সৈনিকের মতোই ম্লান, দুর্বল, অসহায়, কাতর। ভাষার ভিত্তিতে প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ মহাজনের হাত থেকে মুক্তি লাভে কৃষকদের সংগ্রাম।

জানুয়ারি ১৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের ৫৮তম বার্ষিক অধিবেশন হায়দ্রাবাদে শুরু হয়। সভাপতি জওহরলাল নেহরু।

জানুয়ারি ২৮ ভারতে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির উদ্বোধন হয়।

জানুয়ারি ২৯ ভারতীয় নাটক, নৃত্য ও সংগীতের উন্নয়নকল্পে সংগীত নাটক আকাদেমি স্থাপন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ১ কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন।

মার্চ ১৩ কলকাতায় বেকারি ও ছাঁটাই বিরোধী বিশাল মিছিল।

এপ্রিল ২ ২ সারা ভারত কৃষক সভার একাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন মালাবারের কান্নানোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে ইন্দুলাল ইয়াগ্নিক এবং এল প্রসাদ রাও।

মে ২৯ তেনজিং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারির পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট বিজয়।
স্যার এডমন্ড হিলারি (নিউজিল্যান্ড) এবং তেনজিং নোরগে বেলা ১১.৩০ মিনিটে প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন। দলে ছিলেন ১৩ জন অভিযাত্রী, ৩৬২ জন ভারবাহক ও ২০ জন শেরপা। কাঠমান্ডু থেকে ১০ মার্চ রওনা হন। উল্লেখ্য স্যার জর্জ এভারেস্ট-এর নামানুসারে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হয় 'এভারেস্ট'। জর্জ এভারেস্ট ভারতের জরিপ অধিকর্তা (সার্ভেয়ার জেনারেল) ছিলেন ১৮৩০ থেকে ১৮৪৩ পর্যন্ত।

জুন ২ ব্রিটিশ রাজ ষষ্ঠ জর্জের উত্তরসূরী হিসেবে ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ আলেকজান্দ্রা মেরি সিংহাসনে বসেন।

জুলাই ১ ট্রামের ভাড়া ১ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১ জুলাই থেকে ১৭ দিন ধরে বামপন্থী দলের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন।

জুলাই ৭ কলকাতায় ট্রামে ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১ দিনের সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

জুলাই ২৬ ড. ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবায় স্বৈরাচারী বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়।

আগস্ট ১ ভারতের বিমান ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়।

আগস্ট ১৯ কলকাতায় ২০ হাজার কৃষকের সমাবেশ।

সেপ্টেম্বর ১৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়।

অক্টোবর ১ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়। ভারতে প্রথম ভাষা ভিত্তিতে এই রাজ্য গঠিত হয়। রাজধানী হায়দ্রাবাদ।

অক্টোবর ১৪ ‘এস্টেট ডিউটি’ আইন চালু হয়। জর্ডনের কিবিয়া গ্রামে ইজরায়েলি সেনাদের হাতে ৬৬ জন আরব পুরুষ, নারী এবং শিশুর মৃত্যু হয়।

অক্টোবর ১৫ উত্তরাধিকার কর আইন প্রচলন।

নভেম্বর ২ পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়।

নভেম্বর ২২ বার্ণপুর-কলকাতা শ্রমিক অভিযান।

ডিসেম্বর ১৭ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতি বসু।

ডিসেম্বর ২৬ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ১৩তম কংগ্রেস ত্রিবান্দ্রমে শুরু হয়।

ডিসেম্বর ২৭ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ৪.১.১৯৫৪ পর্যন্ত চলে। ৩৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অজয় ঘোষ।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অমিয় চক্রবর্তী : *পারাপার* / অরুণ ভট্টাচার্য : *ময়ূরাক্ষী* / আনন্দ বাগচী : *স্বগত সন্ধ্যা* / করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : *ত্রয়ী* / গোলাম কুদ্দুস : *ইলা মিত্র* / জসীমউদ্দিন : *ধানক্ষেত* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা* / বুদ্ধদেব বসু : *শ্রেষ্ঠ কবিতা* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *পত্রাবলী* / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *সংবর্ত*। **নাটক** — মন্মথ রায় : *ধর্মঘট, চাষির প্রেম* / সলিল সেন : *নতুন ইহুদি* / তুলসী লাহিড়ী : *ছেঁড়াতার*। **উপন্যাস** — লীলা মজুমদার : *পদিপিসীর বর্মী বাক্স* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *বিচিত্রা, আরোগ্য নিকেতন* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *নাগপাশ, আরোগ্য, চালচলন, তেইশ বছর আগে পরে* / জ্যেতিরিন্দ্র নন্দী : *মীরার দুপুর* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *গোধূলী* / রমাপদ চৌধুরী : *দরবারী* / সমরেশ বসু : *শ্রীমতী কাফে* / বিমল মিত্র : *সাহেব বিবি গোলাম*। **গল্পগ্রন্থ** — রাজশেখর বসু : *কৃষ্ণকলি* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *কামধেনু* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *ফেরিওয়ালা, লাজুকলতা* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *সপ্তপদী*।

পত্রিকা প্রকাশ — *কৃত্তিবাস*: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অচিন্ত নন্দী, অজয় সেন, অরূপরতন পট্টনায়ক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, নির্মল হালদার, প্রমোদ বসু, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, মলয় দাশগুপ্ত, লিয়াকত আলি, স্বপন পাঁজা, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যু : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, শাহাদাৎ হোসেন।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

রোগের আক্রমণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবাঞ্ছিত মদ্যপান ও আর্থিক সংকটে মানিক জর্জরিত। কোনো কোনো দিন ঘরে অচল অবস্থা। পকেটে টাকা না থাকার জন্য এমন দিন গিয়েছে তিনি দু-মাইল হেঁটে কোথাও গিয়েছেন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে কিন্তু বিশ্রাম নিলে চলবে না, অনেক কাজ তাঁর। অতিরিক্ত লেখালেখি, গ্রন্থপ্রকাশ ও রাজনৈতিক কর্মসূচী সভাসমিতি তো আছেই। শরীর যত ভেঙে পড়ছে তত তিনি সুরা পানের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তীব্র অর্থাভাব মোকাবিলার জন্য বাড়ির জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে চড়া সুদে টাকা জোগাড় করছেন।

বছরের প্রথম দিকে *চিহ্ন* উপন্যাসের চেক অনুবাদের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সময়েই *পদ্মানদীর মাঝি*র সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এ বছরেই *পুতুল নাচের ইতিকথা* উপন্যাসের গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ৪ এপ্রিল জোসেফ স্তালিনের মৃত্যুতে প্রগতি লেখক সংঘ আয়োজিত শোকসভায় (৫ই মার্চ) মানিক সভাপতি। ১১-১৫ এপ্রিল রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম ও শেষ বার্ষিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। অল ইণ্ডিয়া পিস কাউন্সিল এর পক্ষ থেকে *প্রেস রেডিও* নামে প্রকাশিত মাসিক পত্রে বোর্ড অফ কনসাল্টিং এডিটরস্ এ যোগ দেওয়ার জন্য মানিককে অনুরোধ জানানো হয়। মে মাসে কাছিপুরে গণনাট্য সংঘের সভায় মানিক সভাপতিত্ব করেন। ২৩ জুলাই *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পের মঞ্চায়ন দেখতে যান। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় খাদ্য আন্দোলন ও ভুখা মিছিলের সঙ্গে একাত্ম হন। বছরের কোনো এক সময়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণে বহু লেখক ও শিল্পীর সঙ্গে মানিকও রাইটার্স বিল্ডিং এ সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। এ বছর *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের ওয়ার্ল্ড সিনেমা রাইট কেনার অপশন হিসেবে মাসিক ৫০০ টাকা পান তিনি। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করে মদ্যপানের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এপ্রিলে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *নাগপাশ*। মে মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *আরোগ্য* এবং গল্পগ্রন্থ *লাজুকলতা*। মার্চে *পরিচয়* পত্রিকার বিশেষ স্তালিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ মহামানব। জুনে *চতুষ্কোণ* পত্রিকায় ছাপা হয় *সাহিত্যিকের জীবিকা* প্রবন্ধটি। আগস্টে *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বরে *শারদীয় বসুমতি*তে প্রকাশিত হয় নিবন্ধ *সাহিত্যের কানমোলা*।

গল্প প্রকাশ: 'স্টুডিও' (*পূর্ব্বাশা*, এপ্রিল), 'ম্যাজিক' (*মৌচাক*, জুলাই), 'বিচিত্র' (*মঞ্জুরী*, জুলাই), 'ছোট একটি গল্প' (*শারদী*), 'বিষ' (*মধ্যবিত্ত*), 'ঠাকুরমার গোসা' (*শারদীয়*, আগামী)।

উপন্যাস-১ : নাগপাশ

এটি মানিকের পঁচিশতম উপন্যাস এবং বিয়াল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল নববর্ষ ১৩৬০, প্রকাশক সাহিত্য জগৎ, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ২ + ১৯৬, মূল্য তিন টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[১]

ঔপনিবেশিক শাসক শক্তির বিদায়ের পর আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার প্রাপ্তি আমাদের মনে যে আনন্দ প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল, অচিরেই সে প্রবাহ দুঃখ, হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের সাগরে বইতে লাগল। অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অগ্রগতি না হওয়ার ফলে দেশে মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্ব সমস্যা বড়ো আকারে দেখা দিল। এই সময়ে শিক্ষিত যুবকদের জীবনে অর্থনৈতিক মন্দা যে জটিল আকার ধারণ করে, সেই বিষয় নিয়েই মানিক রচনা করেন *নাগপাশ* উপন্যাসটি। নরেন নামের একটি চরিত্রের বেকারত্বের যন্ত্রণাকে উপন্যাসের কাহিনিতে স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্যা আসলে সেকালের সার্বিক জীবনের সমস্যা। এই সংকটপূর্ণ জটিল জীবনকে মানিক নাগপাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এই উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলন না থাকলেও রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মানিক। বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক লড়াই তাঁর কথায় পূর্ণ পার্টির কর্মসূচীতে ও রণনীতিতে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা উপন্যাসে পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্তের বিবর্ণ নিস্তরঙ্গ জীবন, বেকারের ভাবনার জগৎ — এদের সম্বন্ধে অন্যদের ভাবনা, নানা শ্রেণির বেকারের ভাবনার পার্থক্য — তাদের ভিন্ন শ্রেণি সম্বন্ধে আলাদা আলাদা মনোভাব, বেকারের বাবা-মা, বেকারের প্রেমিকা, বেকারের মনস্তত্ত্ব ও ভাষার ব্যবহার। মানিকের এই উপন্যাসে বেকার সমস্যা নামক একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যায় এইসব মানবিক দিকগুলোকে আবিষ্কার করেছেন। বেকারত্বকে লেখক একটা বাইরের ঘটনা মাত্র করে রাখেননি, শুধু আর্থিক অনটনের অভিশাপ নয়, বেকারত্ব কিভাবে মানুষের ভাবাবেগকেও পালটে দেয়, কাহিনির মধ্যে এই দিকটিকে মানিক তুলে ধরেছেন। এই বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ নানারকম অস্বাভাবিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অনুভূতিতে, কাজে ও কথায় স্বাভাবিক প্রাণময় মানুষগুলোর মধ্যে নানারকম বিকার পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে সামাজিক অব্যবস্থার কারণে। সমাজ মনস্তত্ত্বের ভিন্নতর ব্যাখ্যা আমরা পাই *নাগপাশ* উপন্যাসে।

মানিক এই উপন্যাসে নরেন, নন্দন, মাধব, গোবিন্দ এবং মন্টুর চরিত্র অঙ্কন করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের গভীরে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা, এগিয়ে চলার প্রতিবন্ধকতা নিজে যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষগুলির কাছে নিজের লব্ধ দর্শন পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। বি. এ. পাশ করা যুবক নরেন চাকরি হারিয়ে, একবেলা না খেয়ে, কখনো বা মুড়ি খেয়ে জীবন যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতা, কেবল পাশ-ফেল ও চাকরিমুখী সংকীর্ণ শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে মানিক প্রশ্ন

তুলেছেন এই উপন্যাসের বেকার যুবকগুলির মধ্য দিয়ে। পরীক্ষায় পাশ করা মানে জীবনে বেকারত্ব থাকবে না। মানিকের মনে হয়েছে যে প্রথাগত বিদ্যাচর্চার স্থানগুলো কি শুধু অর্থ উপার্জনের ছাড়পত্রের প্রতিষ্ঠান মাত্র ? যেখানে বিদ্যালাভ করে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকার কথা ? জ্ঞানীরা বিকলাঙ্গ সমাজটাকে সুস্থ করে তুলবে, সমাজে সকলে সুস্থভাবে বাঁচার রসদ কিভাবে তা পায় তার পথ দেখাবে। শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই সমাজে মানবিকতাবোধ কিভাবে হারিয়ে যায়, তার প্রতিকার ও প্রতিবাদ শিক্ষিত ও বিদ্বান মানুষদের পক্ষ থেকেই হওয়া উচিত। সদ্য স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসার যেমন হয়নি, তেমনি যেটুকু হয়েছিল তার কার্যকারিতা নিয়ে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এই উপন্যাসে মানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সেই ত্রুটির দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু জবা, দিনু, হানিফেরা যারা আশিভাগ জনসাধারণ স্বাধীন ভারতের নাগরিক, তারা কি প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা পেয়েছে ? পঞ্চাশের দশকে আলোড়িত এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন মানিক *নাগপাশ* উপন্যাসে। সেজন্য তিনি সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃত অর্থে শ্রেণিসংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের নেতা বংশীর মাধ্যমে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন যে যতদিন গ্রামের লোকেরা সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মানসিক প্রস্তুতি না নেয়, ততদিন বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। জমিদার শিবরামের বিরুদ্ধে যখন গ্রামের কিছু লোক একজোট হয় — পরিকল্পনার অভাবে হাঙ্গামা বাঁধে — সুযোগ বুঝে শিবরাম পুলিশ ডেকে আনে ও কিছুলোক গ্রেপ্তার হয়। মানিক বোঝাতে চেয়েছেন বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ নয়, সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে।

মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ বলেই হয়তো মানিক মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির স্বার্থপরতা ও প্রকৃত চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার সুবাদে সাহিত্যের দর্পণে ফুটিয়ে তুলেছেন। *নাগপাশ* উপন্যাসটির কাহিনিতে পাই — যুদ্ধোত্তর যুগে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে একদিকে যেমন হতাশা সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে শোষণের নতুন কৌশল প্রয়োগ এই সব শ্রেণিগুলিকে একজোট করেছে শ্রেণি স্বার্থে। এই নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা কি চিরকাল অসহায় অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকবে ? এই প্রজন্মের যুব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সুচিন্তিত এবং সুস্থ সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। না হলে বিশ্বায়নও দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে তৃতীয় বিশ্বের যুবসমাজকে নাগবেষ্টনির বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে হবে। মানিক মনে করেন একমাত্র মার্কসিয় দর্শনই একটা পরিবারকে, একটা সমাজকে, একটা জাতিকে তথা বিশ্বকে নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। পঞ্চাশের দশকের বিচ্ছিন্নতা ও হতাশাকেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে উত্তরণের পথ দেশের যুব সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন মানিক এই উপন্যাসে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের স্বর-শিক্ষা ব্যবস্থা-বেকারত্ব ও যুব সমাজের হতাশার মতো বিষয় এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে।

উপন্যাস-২ : আরোগ্য

আরোগ্য মানিকের চুয়াল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ছাব্বিশতম উপন্যাস। প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাব। পৃষ্ঠা ৪ + ১৮৪, মূল্য তিন টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কি না, এসম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[২]

উপন্যাসটির কাহিনি কেশব চরিত্রকে অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছে। আধাগ্রাম আধাশহরতলী — এরকম একটি পরিবেশে কেশব থাকে এবং কর্মসূত্রে রোজ শহরে যায়। চোরাকারবারী অনিমেশের গাড়ির ড্রাইভার সে। অনিমেষ সমাজের যে শ্রেণির লোক, তাদের প্রতি কেশব তীব্র ঘৃণা পোষণ করে। কিন্তু কাজের জন্য বাধ্য হয়ে এই শ্রেণির লোকেদেরকে তাকে সেবা করতে হয়। কেশব মনে মনে অনিমেষের কন্যা ললনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ললনাকে প্রতিদিন সে কলেজে নিয়ে যায়, ললনার সঙ্গে সহপাঠিনীদের কথাবার্তা শোনে। ললনার কাছ থেকে বই নিয়ে সে পড়ে, ললনার সঙ্গে নানা বিষয়ে কেশব আলোচনা করে। শহরতলী বস্তিতে বাস করা কেশবের গতানুগতিক বর্ণহীন জীবনে ললনার সহচর্য কোথাও একটা ভালোলাগার অবস্থা তৈরি করে। কেশব জানে, সে কোনোদিন ললনাদের শ্রেণিতে উঠতে পারবে না। কেশব তাই প্রতিবেশিনী মায়াকে ভালোবাসে। কিন্তু মায়াকে সে বিয়ে করতে পারেনা, কেননা মায়ার আচরণ উদ্দেশ্যমূলক ও স্বার্থকেন্দ্রিক। এই দুই নারীর দ্বন্দ্বে কেশব অসুস্থ হয় এবং তার মধ্যে দেখা দেয় মানসিক বিকার। আর সেই মানসিক অসুস্থতা থেকে দেখা দেয় তার মধ্যে হিস্টিরিয়া রোগ। ডাক্তার দত্ত কেশবের এই মানসিক অসুখটিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন —

> যা আছে, যা পাওয়া সম্ভব, তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও। প্রায় বিপরীত দুরকম জীবন তুমি একসঙ্গে চাও — তার মানেই দাঁড়ায়, দু-দিকে তোমার যেমন টান তেমনই আবার বিতৃষ্ণা। তুমি দুরকম জীবন চাও কিন্তু পুরোপুরি চাওনা।... দুটো জীবনকেই ভোগ করতে চাইলে। অসম্ভবকে চাইলে, স্বপ্নকে বাস্তব করার সাধটা আঁকড়ে ধরলে। ফল দাঁড়ালো হিস্টিরিয়া।[৩]

চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি, তাই কেশব বাড়ি বন্ধক দেয়। তবু রোগ ভালো হয়না। অনিমেশের উপার্জন কমে যাওয়ায় তার পক্ষে ড্রাইভার রাখা সম্ভব হয়না। কেশবকে অনিমেষ অন্যত্র কাজের সন্ধান দেয়। কেশব উপলব্ধি করে যে সংকট তার কেবল একার নয়, সমগ্র সমাজ সংকটের মুখোমুখী। কেশব বুঝতে পারে তার এই সংকটের জন্য দায়ী প্রকৃতপক্ষে সমাজ এবং সমাজের মূলে শেকড় হয়ে বসে থাকার শ্রেণিবৈষম্য। তাই সে বুঝতে পারে নিছক শারীরিক অসুখের চিকিৎসা করলে রোগ সারবে না। শেকড়ের গভীরে গিয়ে প্রকৃত রোগটার চিকিৎসা দরকার। সে স্থির করে সমাজের শ্রেণিবৈষম্য মুছে ফেলতে সমাজটাকেই পালটে দেওয়া দরকার। আর সমাজের প্রকৃত সমস্যার গভীরে পৌঁছে প্রতিবাদী পজেটিভ চিন্তায় চালিত হতেই তার রোগ অর্ধেক সেরে যায়। তখন কেশব ভাবে সমাজে লড়াই করার কথা ভাবতে গিয়েই যদি অর্ধেক সুস্থ হওয়া যায়, তাহলে লড়াই করলে সে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ

করবে। কেশবের এই আরোগ্য লাভের মধ্য দিয়ে মানিক সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও আরোগ্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মার্কসিয় দর্শনে বিশ্বাসী মানিক বোঝাতে চেয়েছেন সমাজ যদি শ্রেণিবৈষম্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে সামাজিক মুক্তি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তন না হলে কেবলমাত্র চিকিৎসার দ্বারা অসুখ সারবে না। বরং সমাজের নানা অসঙ্গতি ব্যক্তির চৈতন্যে তৈরি করবে আরো নানান অসুখ। শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের জন্যে ও সমাজের আরোগ্য লাভের কাহিনিই *আরোগ্য* উপন্যাস।

উপন্যাস-৩ : চালচলন

এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাতাশতম উপন্যাস এবং পঁয়তাল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৬০, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, পৃষ্ঠা- ৪ + ১১৩, মূল্য দু টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটির পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

চালচলন আকারে ছোটো উপন্যাস এবং বৈশিষ্ট্যে একমুখী ও ঘনসংবদ্ধ। নায়ক সুনীলের বৈচিত্র্যহীন ও শাখাহীন জীবনকথা নিয়ে এই উপন্যাস। সে চাকরি করে। মূলত তার চাকরির উপরেই পরিবার নির্ভরশীল। সুনীল অবিবাহিত, তার বিবাহ সম্পর্কে বিতৃষ্ণার মনোভাব। সুনীল ভালো বাঁশী বাজায়। দিনের শেষে যখন মার্কিনী গান-বাজনার শব্দে মানুষের কান বিদ্রোহ করে ওঠে, তখন সুনীলের বাঁশীর শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়, মানুষের কান শব্দদূষণ থেকে মুক্তি পায়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে রেণু শিক্ষিকা এবং বাস্তববাদী। সুনীলের বন্ধু মনোজ কারখানার শ্রমিক, সে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়াও আছে ধনী ব্যবসায়ী অবিনাশের মেয়ে মিলনী, উচ্চশিক্ষিত যুবক অনাদি। উপন্যাসে সুনীলের জীবনকাহিনি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলি গৌণ।

উপন্যাসের ঘটনা খুবই সামান্য। ভাইয়ের দোকান থেকে বাকিতে সিগারেট কেনা, মিলনীর হবুবরের বিয়ের আগে পণের টাকা আদায় করা, বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না যে রেণুর, তার হঠাৎ বিয়ের চিঠি নিয়ে আসা, ভুল করে একদিন ভোর ভেবে রাত্রিবেলায় সুনীলের মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়া ইত্যাদি। এ বইতে নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা তেমন নেই। মানিকের গল্প-উপন্যাসের এই চরিত্ররা যেমন হয় তেমনি কোনো চরিত্র এখানে নেই। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের শান্ত-সরল ছবির মতো এই উপন্যাস। এই সমস্ত চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে মানিক মধ্যবিত্তকে সংস্কারমুক্ত এবং সহজ সরল হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মধ্যবিত্তের জীবনের জটিল ও বক্র চালচলনের পরিবর্তে সরল-সাধারণ জীবন কাহিনিকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উপন্যাস হিসেবে তেমন স্বার্থকতা লাভ না করলেও এখানে সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে যুগ পরিবর্তনের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

উপন্যাস-৪ : তেইশ বছর আগে পরে

এটি মানিকের আঠাশতম উপন্যাস এবং ছেচল্লিশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল মহালয়া ১৩৬০, প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা- ৮ + ২২৫, মূল্য সাড়ে তিন টাকা। ১৯২৯ সালে (ভাদ্র ১৩৩৬) *বিচিত্রা* পত্রিকায় তাঁর একটি *ব্যথারপূজা* নামে ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। উক্ত ঘটনার তেইশ বছর পরে উপন্যাসের কাহিনির নতুন এক সূত্রপাতের ফলে উপন্যাসটির এরকম নামকরণ।[৫]

ব্যথারপূজা গল্পটিই এই উপন্যাসের উৎস। এ প্রসঙ্গে সূচনায় মানিক জানিয়েছেন —

> তেইশ বছর আগে ছাত্রজীবনে একটি করুণ কাহিনি রচনা করেছিলাম। 'অতসী মামী' নিয়ে গল্প লেখা শুরু করার পর এটি আমার দ্বিতীয় লেখা। কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছে *বিচিত্রায়*। কাহিনিটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দায়িত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কিভাবে ফেনিল ভাবুলতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে 'ব্যথারপূজা'র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি।[৬]

ব্যথারপূজা গল্পটিকে প্রায় অপরিবর্তিত রেখেই *তেইশ বছর আগে পরে* উপন্যাসের সূত্রপাত। তারপর গল্পটির মধ্যে নিহিত সূত্রগুলির সম্প্রসারণে কাহিনির পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। এই অভিনব শৈলীর পরীক্ষাগত কারণে উপন্যাসটির গুরুত্ব রয়েছে। তেইশ বছর আগে রচিত একটি গল্প মানিকের সৃষ্টিশীল সত্তায় কি পরিবর্তন সাধন করেছে তার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ হয়ে আছে এ উপন্যাস। মানিকের ইতিকথা ধর্মী যে উপন্যাসগুলি রয়েছে সেখানে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিমনের আশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রকাশিত। (পুতুল নাচের ইতিকথা এবং সহরবাসের ইতিকথা)। *ইতিকথার পরের কথা* উপন্যাসে মানিক ব্যক্তির সংকটকে ছাপিয়ে মুখ্য করে তুলেছেন সমষ্টির জীবন যন্ত্রণাকে। *তেইশ বছর আগে পরে* নামকরণটি আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একটি ছোটোগল্পের আখ্যানকে উপন্যাসের আখ্যানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে আখ্যানের এই যাত্রাটিও প্রতিকী মূলক।

ব্যথারপূজা গল্পের বিষয় নিয়েই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টি রচিত। এ অংশে কেন্দ্রিয় চরিত্র জগদীশ তার প্রণয়িনীর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে যেমন যন্ত্রণাদগ্ধ ও অনুশোচনাকাতর তেমনি আত্মক্ষয়ী প্রবৃত্তির প্রবল স্বীকার। সন্ন্যাসী হওয়া তার লক্ষ্য নয়, সন্ন্যাসী তাকে বানিয়েছে লোকেরা। একটি অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর নির্মমতা তাকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমান্বয়ী আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে আত্মনিগ্রহের পথে। সব মিলে ব্যক্তির জীবন যন্ত্রণা, ভাবাবেগ তাড়নায় এ গল্পের মুখ্য বিষয়। কিন্তু উপন্যাসে ব্যক্তির মনসংকট ক্রমান্বয়ে সমষ্টির মনজাগতিক সংকটের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। উপন্যাসের এই উত্তরণটি মানিকের শিল্পী সত্ত্বার রূপান্তরের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনি মানিকের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা-সংকট থেকে উত্তোরণ প্রয়াসের আভাসেও এ গল্প তাৎপর্য মণ্ডিত।

সাধক পুরুষ ভেবে যে ভক্তরা জগদীশের কাছে আসে তারা নিজ নিজ জীবনের ব্যর্থতা, যন্ত্রণা ও অশান্তি থেকে মুক্তি কামনা করে। নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির শূন্যতা নিয়ে জগদীশ যতই সততা প্রকাশ করে ততই ভক্তরা একে বিনয় মনে করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভক্তদের সঙ্গে আলোচনায় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা জগদীশ তুলে ধরে। ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ সে নিজের মদ ও মাদক সেবনে এবং দরিদ্রদের কল্যাণার্থে ব্যায় করে। ভক্তদের সমস্যার সমাধানের জন্য জগদীশ হাসপাতাল গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। ভক্ত সান্নিধ্যে সে উপলব্ধি করেছে যন্ত্রণা শুধু তার একার ব্যক্তি মনেই নেই, সমষ্টি মনে রয়েছে তার ব্যাপ্তি। সুতরাং একজন ব্যক্তির সুস্থতায় তার কাম্য নয়, সমষ্টির সুস্থতা তার কাম্য। সমষ্টির সুস্থতার জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি জগদীশ নিজ জীবনের সুস্থতা ফিরে পায়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত মানুষের সেবা বা মানুষের কল্যাণই হয়ে ওঠে জগদীশের অন্বিষ্ট। আর এজন্য জগদীশ তার পৈত্রিক সম্পত্তির পাশাপাশি নিজের জীবন-যৌবন-ধন-মান সবই উৎসর্গ করে। এক নারীর প্রতি ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর পটভূমিতে সমষ্টিগত মানুষকে ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়।

মানিক তার লেখক জীবনের সকল পর্বেই মানুষের মনোবিশ্লেষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারাই তিনি ব্যক্তির সমাজের সারসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেন। এরূপ মনোবিশ্লেষণের ধারাতেই জগদীশ নিজের মানসিক অসুখের কারণ এবং আরোগ্য খুঁজে পায়। যা তাকে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। এই সময়ে মানিকের ব্যক্তিজীবনের মদ্যাসক্তি ও জগদীশের মদ্যাসক্তির মধ্যে তুলনা করলে আর একটি সত্য বেরিয়ে আসে। মানিক মৃগী রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও সৃষ্টিকর্মে সজীব থাকার লক্ষ্যে স্বকীয় পদ্ধতিতে নিয়মিত অ্যালকোহল গ্রহণ শুরুরে করে। ক্রমশ তাতে আসক্ত হয়ে পড়েন। জগদীশ ও সমযন্ত্রণা লাঘব হেতু অ্যালকোহলে আসক্ত হয়। তারপর একসময় সে বুঝতে পারে এই বস্তুটির অসারতা। মানিকও নিজের জীবনে অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ার পরিণতি সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সময়ের লেখালেখির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্বও পালন করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে এভাবে আমরা মানিকের জীবন ও শিল্পবোধের রূপান্তরটি লক্ষ্য করি। 'ব্যথারপূজা' গল্পে এবং জীবনের প্রথম পর্বে মানিকের ব্যক্তিক সংকট ছিল মুখ্য বিষয়। এই সংকট থেকে উত্তোরণের যথার্থ পথটি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল না। কিন্তু মানিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন, যেমনটা করেছে জগদীশ, সমষ্টির সংকট নিরসনের জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার সংকটেরই সমাধান সম্ভব।

গল্পগ্রন্থ-১ : ফেরিওয়ালা

এটি মানিকের পনেরতম গল্পসংকলন এবং তেতাল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৬০, প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা - ৬ + ১৪৩, মূল্য আড়াই টাকা। এই গল্পসংকলনে মোট তেরটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলি যথাক্রমে: *ফেরিওয়ালা, সখী, সংঘাত, সতী, লেভেল ক্রশিং, ধাত, ঠাঁই*

নাই ঠাঁই চাই, চুরি চামারি, দায়িক, মহাকর্কট বটীকা, আর না কান্না, মোরব না সস্তায়, এক বাড়িতে। গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:[৭]

সখী	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা	শারদ ১৩৫৫
ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই	দেশ	শারদ ১৩৫৭
এক বাড়িতে	যুগান্তর	শারদ ১৩৫৭
সংঘাত	চতুষ্কোণ	১৩৫৭
আর না কান্না	পরিচয়	জৈষ্ঠ ১৩৫৮
ফেরিওয়ালা	যুগান্তর	শারদ ১৩৫৮
সতী	পরিচয়	শারদ ১৩৫৮
মহাকর্কট বটীকা	তরুণের স্বপ্ন	শারদ ১৩৫৮
লেভেল ক্রশিং	যুগান্তর	শারদ ১৩৫৯
চুরি চামারি	সূচীপত্র	শারদ ১৩৫৯
মোরবনা সস্তায়	মধ্যবিত্ত	শারদ ১৩৫৯
ধাত	গল্পভারতী	মাঘ ১৩৫৯
দায়িক	?	?

এই গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় মানিক লিখেছেন —

> গত দু-তিন বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূল সূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি সেইভাবেই গল্পগুলি বাছাই করেছি।[৮]

মানিকের সমস্ত গল্পই তাঁর সমসাময়িক পরিবেশ থেকে সংগৃহিত। গল্পের উপাদান বা চরিত্র খুঁজতে তাকে কখনো দূরবর্তী অতীতে বা কল্পনার জগতে পাড়ি দিতে হয়নি। মানিক সমাজ মনস্ক শিল্পী। তাই তাঁর সামাজিক সমসাময়িক ঘটনা তাকে গল্পের উপাদান জুগিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায়, সেইসঙ্গে দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু সমস্যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য যেভাবে লড়াই করতে হয়েছিল; বৈষম্য, অন্যায়, প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হয়েছিল — মানিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে সেই সময়ের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ফেরিওয়ালা

তিনটি ফেরিওয়ালা এবং তাদের আর্থিক দুরাবস্থার চিত্র এ গল্পে আমরা পাই। সে সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা, কালোবাজারী, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন ও বেদনাময়

করে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা চালাতে না পেরে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। এই গল্পের ফেরিওয়ালা জীবন লেখাপড়া শিখেও কোনো কাজ না পেয়ে শাড়ি, গামছা ফেরি করে। তার স্ত্রী অন্যের বাড়ির ঠিকাঝি'র কাজ করে। তাদের প্রতিবেশী অঘোর চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে, কোনো কাজ না পেয়ে মধ্যবিত্তের শূন্য আত্ম অহংকার ছেড়ে ছিটকাপড়, সায়া-ব্লাউজের ফেরিওয়ালা হয়। জীবনের কাছ থেকে কাপড় ধার নেয় যে বউটি, তার স্বামীও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন বিক্রেতা ফেরিওয়ালা। গল্পটিতে নির্দিষ্ট কোন কাহিনি নেই, কিন্তু সমাজ জীবনের ভেঙে পড়া অর্থনীতি এবং বিপন্ন মানুষের বাঁচার জন্য লড়াই ফুটে উঠেছে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের সমাজের অবস্থা ও সময়টিকে চিনিয়ে দেয়।

সংঘাত

গ্রামে কোনোভাবেই দিন চালাতে না পেরে শহরে কাজের সন্ধানে এসেছে এক চাষি দম্পতি। শৈল ঠিকা ঝি'র কাজ পেলেও মাখন সহজে কোনো কাজ পায়না। এক মহিলা তাদের দুটাকা মাসিক ভাড়ায় বাড়ির বারান্দাতে থাকতে দেয়। উপার্জনহীন মাখন হীনমন্যতায় ভোগে এবং স্ত্রীকে অহেতুক সন্দেহ করে। বাড়িওয়ালা মহিলাটি শৈলের মন ভাঙিয়ে তাকে দেহ ব্যবসায় লাগাতে চায়। পরে মাখনও প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। প্রথমে মাখন ভুল বুঝলেও পরে বাড়িওয়ালীর চক্রান্ত বুঝতে পারে। তখন সে স্ত্রী শৈলকে নিয়ে অন্যত্র উঠে যায় এবং কারখানায় একটি কাজ জুটিয়ে নেয়। তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং অহেতুক সন্দেহ করার জন্য সে অনুশোচনা বোধ করে।

সতী

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত এই গল্পটি ভীষণ মর্মান্তিক। গ্রামের উপবাসী একটি মানুষ শহরের পথে ঘুরতে ঘুরতে মারা যায় এবং পথের ধারে তার মৃতদেহ পড়ে থাকে। তার বউ রুগ্ন দুর্বল অন্নহীন শিশুটিকে কোলে করে খুঁজতে খুঁজতে তার মৃতদেহটিকে আবিষ্কার করে। স্বামীর মৃত্যুর ধাক্কায় বউটি প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়, শিশুটিকে রাস্তার উপরে আছড়ে মেরে ফেলে। নিজে চলন্ত বাসের তলায় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে। প্রাচীনকালে মৃতস্বামীর চিতায় সহমরণে যাওয়ার প্রথা ছিল। গল্পের নারীটি নিজের উপবাসী স্বামীর করুণ মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে যেভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিল,তাতে তাকে কি সতী বলা যাবে ? হৃদয়হীন সমাজের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছেন মানিক। যে সমাজের কর্তব্য ছিল দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ করার, সেই সমাজের স্বার্থপরতা সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনে কি দুর্বিষহ যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিল তার একটি উদাহরণ হতে পারে গল্পটি।

লেভেল ক্রশিং

লেভেল ক্রশিংয়ের দুই পারে দুই জীবন। একদিকে শহরের উজ্জ্বলতা ও মোহ আর অন্যদিকে শহরতলীর দরিদ্র নিস্তরঙ্গ পরিবেশ। কেশব পেশায় বড়লোকের বাড়ির ড্রাইভার। মালিকের বিলাসবহুল বাড়ির একটি ঘরে থাকবার ও পুষ্টিকর আহারের আকর্ষণ ত্যাগ করে সে রাত্রে যেভাবেই হোক বাড়ি ফিরে যায়। তার বাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে শহরতলীর দরিদ্র পাড়ায়। সেখানে মায়া নামের একটি মেয়ে তাকে ভালোবাসে। অন্যদিকে ধনী মালিকের কন্যা ললনার আকর্ষণও তাকে টানে। দুই জীবনের মধ্যে টানাপোড়েন কেশবকে অস্থির করে তোলে। মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এবং প্রচলিত মূল্যবোধগুলির অবক্ষয় ব্যক্তির চৈতন্যে তৈরি করেছিল সংশয় ও দ্বিধা। কেশবের মতো যুবকেরা সেই সংশয়বোধে আক্রান্ত সময়ের এও এক প্রতিবেদন।

ধাত

অর্থনৈতিক অহংকারবোধ অনেকসময় হৃদয় হীনতার জন্ম দেয়। চরিত্রকে করে তোলে যান্ত্রিক ও অমানবিক। ধনী ব্যবসায়ী বিনোদের কাছে আর্থিক মুনাফায় সবচেয়ে বড়ো। সম্পর্ক, প্রেম, আবেগ, কোনোকিছুই অর্থের চেয়ে বড়ো নয় তার কাছে। প্রেমিকাকে উপহার দেওয়ার জন্য সে একটি বাড়ি তৈরি করে, বাড়ী তৈরি করা তার ব্যবসা। কিন্তু বেশি দাম পেয়ে অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনায় সে বাড়িটি বিক্রি করে দেয়। এই গল্পে অন্তঃসারশূন্য প্রণয় সম্পর্ক এবং অর্থের প্রতি লালসা — এই দুটি বিষয়কে মানিক জীবন বাস্তবতায় সংলগ্ন করেছেন।

ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই

এই গল্পে আমরা এক বলিষ্ঠ চরিত্রের বিধবা নারীকে পায়, যে শত প্রতিকূলতা এবং বিরুদ্ধতার মধ্যেও জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে চেয়েছে। তার ভাই চক্রান্ত করে সম্পত্তি দখল করে নিতে চাইলে সে উপযুক্ত প্রতিবাদ করে গ্রামের লোকেদের ডেকে এনে সেই ভাইকে বিতাড়িত করেছে। কলকাতায় তার স্বামীর একটি বাড়ি ছিল, সেই বাড়িটিও এক ভাসুর দখল করে রাখে এবং পরে অন্যকে বিক্রি করে দেয়। অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে বিধবা নারীটি কন্যাকে নিয়ে বস্তিতে প্রবল অনটনের মধ্যে দিন কাটায়। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস সে হারায় না। এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ঠাঁই সে করে নেবে। জীবনের সবরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও লড়াই করে বেঁচে থাকার গল্প *ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই* ।

চুরি চামারি

একটি বেসরকারী অফিসের কেরানি লোকেশ অত্যন্ত দরিদ্র। যেদিন সে অফিসের বেতন পায়, সেদিন রাত্রেই তার বাড়িতে চুরি হয়ে যায়। আর অফিসের অনৈতিক কাজ কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায়

মালিক আটক আইনে তাকে জেলে পাঠায়। এককথায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষের উপরে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের অত্যাচার ও অবজ্ঞার চিত্রটি এই গল্পে মানিক তুলে ধরেছেন।

দায়িক

শীতকালে হঠাৎ বৃষ্টি এবং গ্রামীণ পরিবেশে একটি অস্বাস্থ্যকর আঁতুড় ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে দু-দিনের শিশু ও তার সদ্য প্রসূতি মা। গ্রামীণ সংস্কার বশে মূল বাড়ি থেকে আঁতুড় ঘরকে দূরে রাখতে হয়। শীতের প্রচন্ড কনকনে ঠান্ডায় এই শিশু ও মা মৃতপ্রায়,কিন্তু গোবিন্দ স্নান করে স্পর্শ বাঁচিয়ে মূল বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকে। গ্রামীণ সংস্কারের কারণে তার কিছু করার থাকে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে মা এবং শিশুটিকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসে এবং উত্তাপে ও যত্নে তারা সুস্থ হয়। গল্পটির মধ্যে কুসংস্কারকে জয় করে জীবনের সহজ দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার বার্তা দিতে চেয়েছেন মানিক।

মহাকর্কট বটীকা

হারাণের যক্ষ্মারোগ হয়, ভয় পেয়ে সে জীবনের হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার স্ত্রী লতা ভেঙে পড়েনা, সে সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করে যায় স্বামীকে সুস্থ করে তোলার জন্য। সন্তান দুটিকে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে স্বামীর চিকিৎসা চালায় লতা। সে দেখেছে বাড়িওয়ালার ছেলেরও যক্ষ্মা হয়েছিল এবং উপযুক্ত চিকিৎসাতে সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তাই লতাও হাল ছাড়ে না। জমানো সমস্ত টাকা ফুরিয়ে গেলে লতা শহরের রাজপথে বসে যক্ষ্মানিবারণী মহাকর্কটবটীকা নামে এক ঔষধ তৈরি করে বিক্রি করে। এই ভাবে হার না মেনে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায় লতার মধ্যে। লতা এখানে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন প্রতিনিধি। তার মতে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এই শ্রেণির সব মানুষই।

আর না কান্না

দেশ স্বাধীন হলেও সাধারণ দরিদ্র মানুষের ঘরে খিদে মিটানোর জন্য অন্ন ছিল না। দারিদ্রতা এবং পেটভরে খেতে না পাওয়ার জন্য জীবনের করুণার *গল্প আর না কান্না* । এই গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত একটি পরিবারে বাবা-মা সন্তানকে পেট ভরে খেতে দিতে পারে না। ছোটো ছোটো শিশুগুলি খিদের জ্বালায় মা'র সাথে ঝগড়া করে আর মায়ের হাতে মার খেয়ে কাঁদে অথবা চুপ করে থাকে। যতীন সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে কিন্তু তবুও সবার মুখে পেট ভরে আহার তুলে দিতে পারেনা। তার বড়ো মেয়েটি দশ বছরের, রোগা ও দুর্বল তাই তার পেটের খিদেও খুব কম। কিন্তু মেজো মেয়েটি বয়সে ছোটো হলেও শরীর বাড়ন্ত, তাই তার খিদেও একটু বেশি। রাত্রিবেলা খিদের জ্বালায় সে রান্না ঘরে গিয়ে আটা চুরি করে জলে গুলে খায়। তার মা উঠে এসে পেতলের হাতা দিয়ে তাকে মারতে থাকে। গল্পটির মধ্যে

একটি অসহনীয় বাস্তবের ছবি আমরা দেখতে পাই। ছোট্ট অল্পবয়সী সরলমনের শিশুগুলি যেভাবে খিদের জ্বালায় মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে; তাতে স্বাধীন দেশের লজ্জা ভীষণ প্রকট হয়ে ওঠে। যে দেশ শিশুর মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে না, শিশুর স্বাস্থ্যের, শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনা, সে দেশের স্বাধীন হওয়া না হওয়ার কোনো তাৎপর্য নেই। নজরুল ইসলাম *আমার কৈফিয়ৎ* কবিতায় সমাজের এই বাস্তব ছবিটি প্রত্যক্ষ করে লিখেছিলেন — "ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চাই দুটো ভাত একটু নুন।"[৯]

মরবনা সস্তায়

এই গল্পটিও একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। ছেলে-মেয়েগুলি পড়াশুনা করে, তাদের মা সারাদিন পরিশ্রম করে করে দুর্বল হয়ে গেছে। একদিন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, ডাক্তার এসে ঔষধ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে বলে। যদিও সেই ব্যবস্থা করা পরিবারটির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এই একই অবস্থা আরো হাজার হাজার পরিবারের। জীবনের দুর্বিপাকে এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির চাপে মানুষগুলি কোনোভাবে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় উপার্জনের যে কোনো পথ বেছে নিয়েছে। একদা শিক্ষিকা এক রমণী অনন্যপায় হয়ে একটি ধনী গৃহে রাঁধুনীর কাজ নেয়। সহজে মরবেনা তারা কিছুতেই। জীবনে যত কষ্টই আসুক লড়াই করে বেঁচে থাকার গল্প এটি।

এক বাড়িতে

দুই চিরবন্ধু বিলাসময় এবং সুধীর। বিলাসময় একটি বাড়ির মালিক। সুধীরের বাড়ির অভাব হলে বিলাসময় তাকে নিজের বাড়ীর কিছুটা অংশ ভাড়া দেয়। তবে প্রচলিত ভাড়ার দ্বিগুন ভাড়া ধার্য করে এবং আগাম মোটা টাকার বিনিময়ে তবেই বিলাসময় বাড়িটি ভাড়া দেয়। যে বন্ধুত্ব সহজ এবং আনন্দপূর্ণ ছিল, কিছু অর্থের লোভে তা বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের সম্পর্কে পরিণত হয়। সুধীর ধীরে ধীরে বুঝতে পারে বিলাসময় তার বন্ধু নয়। সুধীর রেণ্ট কণ্ট্রোলারের কাছে সঠিক ভাড়া নির্ণয়ের জন্য আবেদন জানায়, তাতে বর্তমান ভাড়ার অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশটাকা ভাড়া ধার্য হয়। সব জানতে পেরে বিলাসময় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় সুধীরকে। এবং কুৎসিত ভাষায় অপমান করে। সুধীরের বড়ো ছেলে বিষ্ণু অপমান সহ্য করতে না পেরে একটি কয়লার চাঁই তুলে বিলাসময়ের মাথায় ঠুঁকে দেয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের গল্প এটি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের বেহাল অর্থনীতি ও নানারকম সামাজিক সমস্যায় পীড়িত দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের গল্পসংকলন *ফেরিওয়ালা*। প্রথম গল্প থেকে শেষ গল্প, প্রত্যেকটিতেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অসহায়তা ও জীবন সংগ্রামের নানান মুহূর্তের ছবি ফ্রেমবন্দি করেছেন মানিক এই গল্পগ্রন্থে। শ্রমিক মানুষ, কৃষক মানুষ, বাস্তুহারা মানুষ, দরিদ্র মানুষ

এককথায় সর্বহারা শ্রেণির জীবনের চিত্রায়ণ, নিজের মতো করে সংগ্রামী চেতনা এই সংকলনের গল্পগুলিতে আমরা দেখতে পাই।

গল্পগ্রন্থ-২ : লাজুকলতা

এটি মানিকের সাতচল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ষোড়শতম ও সর্বশেষ গল্পসংকলন। প্রকাশকাল কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৬০, প্রকাশক রিডার্স কর্ণার, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ১৬০, মূল্য আড়াই টাকা। এই গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ।[১০]

অসহযোগী	সপ্তডিঙা	১৯৪৬
উপদলীয়	ইস্পাত	১৩৫৭
পাশ-ফেল	আজকের ছোটোগল্প	শারদ ১৩৫৮
পাষণ্ড	শারদশ্রী	শারদ ১৩৫৮
কলহান্তরিত	চতুষ্কোণ	১৩৫৮
বাহিরে ঘরে	গল্পভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯
লাজুকলতা	হিমাদ্রি	শারদ ১৩৫৯
এদিক ওদিক	সত্যযুগ	শারদ ১৩৫৯
চিকিৎসা	সচিত্র ভারত	শারদ ১৩৫৯
মীমাংসা	দেশ	শারদ ১৩৫৯
সুবালা	চতুষ্কোণ	শারদ ১৩৫৯
এপিঠ ওপিঠ	মঞ্জরী	১৩৫৯
নিরুদ্দেশ	মঞ্জরী	১৩৫৯
গুন্ডা	?	?
আপদ	?	?
স্বাধীনতা	?	?

এই গল্পসংকলনের ভূমিকায় মানিক জানিয়েছেন —

> এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প গত তিন-চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি গল্পসংকলনের মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ জীবনের কোন একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোটো ছোটো কাহিনির মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে গল্পচয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।[১১]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী বছরগুলিতে আমাদের দেশের ও সমাজের যে নানারকম সংকট ও দূরাবস্থা তৈরি হয়েছিল, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশেষ সময়ের বিশেষ পটভূমিকায় বিশেষ সমস্যাগুলি স্থান পেয়েছে এইসব গল্পে। যুগগত পরিবর্তনের ফলে যেসব

সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল — অর্থনৈতিক সংকট, বিপন্ন নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবন, বেকারত্ব, ছাটাই, শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি সমস্যাগুলি ডানা বেঁধেছে জীবন কাহিনি মূলক এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে। এটি মানিকের শেষ গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনেকগুলি গল্পের কাহিনি মানিক তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করেছেন। মূলত দারিদ্র্যতা ও অসুস্থতার কারণে এই সময়ে মানিকের লেখনী শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে এসেছে। পত্রিকার চাহিদা মেটাতে এবং অর্থোপার্জনের জন্য এই সময়ের বেশিরভাগ গল্পগুলি লেখা। অনেকক্ষেত্রেই তিনি পূর্বের কোনো গল্প বা উপন্যাসের প্লট ভেঙে কাহিনি ও প্রসঙ্গ চয়ন করেছেন। অনেকগুলি গল্পই শিল্পগুন সম্পন্ন ও সুলিখিত নয়। তবে গল্পগুলিতে মানিকের সদাজাগ্রত সময় সচেতন মনের পরিচয় সুমুদ্রিত।

লাজুকলতা

এই গল্পের বিষয়বস্তু একটু ভিন্ন ধরনের। প্রকৃতিতে অত্যন্ত লাজুক এক বধূর গল্প। আসলে সে লাজুক নয় ততখানি। লজ্জা তার আত্মরক্ষার হাতিয়ার। তার স্বামী যতীন বেকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হীনতায় যতীনের মানসিক ভারসাম্য বিচলিত। যতীন তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী তমালকে ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করে একটি চাকরি জোগাড় করতে চায়। তমাল বোঝে এই আত্ম অবমাননাকর কাজে রাজি হলে তার পরিণতি কি হতে পারে। নিজেকে রক্ষার জন্য তাই সে এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করে — চূড়ান্ত লজ্জাশীলা হওয়ার কৌশল। অনেক চেষ্টা করেও যতীন কোনো কাজ পায়না, একটি দোকানের ক্যাশ ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যায়। তমাল সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়লেও এই অবস্থায় ভেঙে পড়ে না, বস্তির একটি সস্তা বাড়িতে উঠে যায়। পাড়ার লোক দেখে যে মাথায় ঘোমটা টেনে লজ্জাশীলা হয়ে থাকত, সেই তমাল কোমরে কাপড় জড়িয়ে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গল্পটির নাম *লাজুকলতা* হলেও, গল্পটি মোটেও লাজুকলতার গল্প নয়; বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও সংগ্রামী চেতনার গল্প।

উপদলীয়

সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত মানিক সবসময় বিশ্বাস করতেন বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে না পারলে, একাত্ম হতে না পারলে প্রকৃত রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজচেতনা লাভ করা সম্ভব নয়। গল্পের নায়ক প্রশান্ত মফঃস্বল শহরে একটি সাংস্কৃতিক সভায় প্রধান অতিথি হয়ে পৌরহিত্য করতে চান। সভায় সমবেত মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প, তাই প্রশান্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। ফেরবার পথে সেই শহরে স্টেশনের পাশে একটি মাঠে বিপুল জনসভায় তার চোখ পড়ে। সেই সভার আলোচনার বিষয় দুর্ভিক্ষ, চোরাকারবার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও এইরকম নানা সমসাময়িক সমস্যা এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার উপায়। মাঠ ছাপিয়ে সভার জনতা রাস্তায় উপচে পড়ছে। প্রশান্ত ফেরবার ট্রেন ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে বক্তৃতা শোনে এবং বৃহৎ জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এই গল্পে প্রশান্ত চরিত্রের আড়ালে আমরা স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেখতে পাই। যিনি নিজে কোনো

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চাইতে সাধারণ মানুষের আলোচিত মিটিং-মিছিলে বেশি যোগ দিতেন। এই গল্পে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সময় যখন দুর্বিষহ, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চাইতে বাস্তবিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা অনেক বেশি জরুরি।

এদিক ওদিক

গল্পটিতে আমরা দুই বন্ধুকে পাই। একজন মাধব মোটর গাড়ির মেকানিক, আর একজন শরৎ ছাটাই হওয়া অল্প বেতনের কেরানি। মাধবের চরিত্রে রয়েছে শ্রমজীবি মানুষের বলিষ্ঠতা এবং স্পষ্টতা, আর শরতের চরিত্রে রয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্রলোক সুলভ দ্বিধা সংকোচ লজ্জা। ছাঁটাই হওয়ার পর শরৎ জমানো টাকা দিয়ে একটি মনোহারি দোকান খোলে। মফঃস্বলে আর্থিক সংগতি সম্পন্ন লোকজন কম, তাই তাকে ধারে জিনিস দিতে হয়। একসময় প্রচুর টাকা ধার পড়ে যায়, তার দোকান উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়। শরৎ লজ্জা সংকোচের কারণে কড়া কথায় টাকা চাইতে পারেনা। ধনী ব্যক্তি যাদবও প্রচুর পরিমাণ টাকা ধার রেখে ইচ্ছা করে শোধ দেয়না। বন্ধু মাধব তথাকথিত ভদ্রতার ধার ধারেনা, মিথ্যা মূল্যবোধের কানাকড়ি মূল্য তার কাছে নেই। তাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ যাদবের বাড়ি যায় এবং টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়। তারপর আরো অন্যান্য ক্রেতাদের বাড়িতে মাধবকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ যায়। এ গল্পে মানিক দেখাতে চেয়েছেন পেশাগত বিভিন্নতা কিভাবে মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলে এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের দুর্বলতা ত্যাগ করে বলিষ্ঠ সংগ্রামী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

এপিঠ ওপিঠ

এই গল্পে একটি চাকরি হারানো দরিদ্র অসহায় পরিবারকে পাই। এই পরিবারের পুরুষটি শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না পেয়ে বড়ো ভাইয়ের আশ্রয়ে উঠে যেতে চায়। যদিও পূর্বের অপমান লাঞ্ছনা তার মনে আছে, কিন্তু সেগুলো সহ্য করেই থাকতে হবে। তাছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিলনা। বড়ো ভাইয়ের কাছে যাওয়ার যখন সবকিছু ঠিকঠাক তখন চাকরি হারানো বিপন্ন বড়ো ভাই গোটা পরিবার নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। গল্পটির মধ্যে ভয়ঙ্কর আর্থ-সামাজিক বিপন্নতার ছবি আছে। সেই সময়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কর্মী ছাটাই ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলির শোচনীয় দূরাবস্থা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে জীবন্ত ছায়াচিত্রের মতো।

পাশফেল

এই সময়ের অর্থনৈতিক সংকট, দারিদ্র্যতা ও বিপন্নতা কিভাবে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তার ছবি 'পাশফেল' গল্পে ধরা পড়েছে। পরীক্ষায় বেশির ভাগ জন যখন ফেল করেছে তখন পাশের বাড়ির নীরেন খুব ভালো ভাবেই পাশ করে। সাফল্যের সঙ্গে পাশ করেও নীরেনের মনে আনন্দ নেই, কেননা তার সব বন্ধুরাই কমবেশি ফেল করেছে। তাছাড়া তার বাবা তাকে আর পড়াতে

পারবেনা জানিয়ে দিয়েছে। ভালোভাবে পাশ করেও উচ্চশিক্ষার আর কোনো সম্ভাবনা না দেখে নীরেন আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এক মেধাবী তরুণ ছাত্রের অর্থনৈতিক সংকট দারিদ্রতার কারণে করুণ পরিণতি এই গল্পটিতে সমকালীন বাস্তব জীবনের ছবিকে প্রতিফলিত করেছে। খবরের কাগজে আত্মহত্যার চেষ্টার খবর প্রকাশিত হয়, কিন্তু কেন পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করা ছেলেটি আত্মহত্যার চেষ্টা করল সেখবর সংবাদপত্রে লেখা হয়না। সংবাদপত্রগুলির অর্ধসত্য খবর প্রকাশের বিষয়টিকেও মানিক এই গল্পে গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন।

কলহান্তরিত

ট্রেড ইউনিয়ানের লড়াই ও সংগ্রাম করার গল্প এটি। দুই ইউনিয়নের নেতা গোকুল ও হরেন একই বাড়িতে ভাড়ায় থাকে। তাদরে উভয়ের স্ত্রী'র মধ্যে কলহ বাঁধে এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া ও দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু দুই ইউনিয়ানের মিলিত সভায় গোকুল ও হরেন পাশাপাশি বসেছে, তাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো বিরোধ নেই। গোকুল ও হরেনের পারিবারিক বিরোধ তাদের শ্রমিক আন্দোলনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনা। ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ মানিক এই গল্পে ট্রেড ইউনিয়ানের কার্যকলাপের একটি ছবি তুলে ধরেছেন। সচেতন ও অভিজ্ঞ মানিক এই গল্পে ট্রেড ইউনিয়ানের কার্যকলাপের একটি ছবি তুলে ধরেছেন।

গুন্ডা

এই গল্পে আমরা সুশীল নামের এক গুন্ডা সর্দারকে পাই। তার অসঙ্গত বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তার বৈঠকখানা ঘরের নানা আসবাব ও ছবি দেখে। মৃণালিনী নামের একটি মেয়েকে দেহ ব্যবসায় চালান করে দেওয়ার জন্য সে এনেছিল, পরে নিজের কাছেই রেখে দেয়। সুশীল অর্থোপার্জনের জন্য অসহায় মেয়েদের ধরে এনে বিক্রি করে, মেয়েদের উপর অত্যাচার করে। সুশীলের চরিত্রে আমরা সমাজের নিম্নস্তরের জীবনচিত্র ও অসহায় মেয়েদের জীবনের করুণ পরিণতির উপলব্ধি করতে পারি।

বাহিরে ঘরে

গল্পের প্রধান চরিত্র সদানন্দের জীবন ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ এবং যন্ত্রণাময়। কিন্তু সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে সে হাসি-আনন্দের সঙ্গে মেলামেশা করে। রেশনের লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলি যখন তাদের জীবন যাপনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তখন সদানন্দ তাদের হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে। সদানন্দ চরিত্রের মধ্যে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। জীবনের ব্যর্থতা ও দুঃখের দিকটিকে ঢেকে রাখার তার আপ্রাণ চেষ্টা আসলে তার অসহনীয় বেদনাকে আরো ঘনীভূত করে তোলে।

চিকিৎসা

এক ধনী পরিবারের ড্রাইভারের গল্প এটি। ধনি পরিবারটির মানসিক বিকার, চারিত্রিক অসঙ্গতি ড্রাইভারটিকে পীড়িত করে। সে নিজের রোজগরের জন্য বাধ্য হয়ে ধনি পরিবারটির আশ্রয়ে কাজ করে। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পরিবারের বড়ো মেয়ে বিধবা মোহিনি তার সঙ্গে গোপন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চায়। বাধ্য হয়ে সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে। তার মনে হয় এত দিন সে যেন মানসিক রুগি হয়ে পড়েছিল, এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই সে সুস্থ বোধ করে ও মুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

মীমাংসা

এই গল্পের নায়ক পঙ্কজ একটি আদর্শবান কাগজ প্রকাশ করে। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে কাগজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পঙ্কজের এক ছাত্রী বীভা ধনির কন্যা। কিন্তু সে খোঁড়া এবং অসুন্দর। বীভার পিতা টাকা দিয়ে পাত্র কিনে তার বিয়ে দিতে চান। কিন্তু যে পাত্র শুধু টাকার লোভে বীভাকে বিয়ে করবে তাদের বীভা ঘৃণা করে। বীভা পঙ্কজের কাছে এসে সমাধান চায়। পঙ্কজ পত্রিকাটিকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হিসেবে বীভাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বীভার চোখে পঙ্কজ ঘৃণার পাত্র নয়, কেননা পঙ্কজ টাকার জন্য নয় তার নিজের আদর্শকে বাঁচাবার জন্য বীভাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছে।

সুবালা

এই গল্পে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা একটি দরিদ্র পরিবারের বধূকে পাই, যে রাস্তায় শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা করে। বৌটির স্বামী তার খোঁজ-খবর করেনা। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন উদ্বাস্তু হয়ে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রাম করেছে। অসহনীয় দুঃখ দুর্দশায় তাদের জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। উদ্বাস্তু সমস্যার একটি করুণ পরিণতি এই গল্পে আমরা দেখতে পাই।

অসহযোগী

দুর্ভিক্ষের সময়কার সাধারণ মানুষের বিপন্নতার ছবি এবং আড়তদার ও চোরাকারবারীদের স্বরূপ এই গল্পে মানিক তুলে ধরেছেন। ধনেশগঞ্জের ধনি আড়তদার হর্ষনাথ তার ছেলেকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং প্রকৃত অর্থের মানুষ করে তোলার জন্য ছেলে রমেনকে পাঠালো স্বদেশী করা শিক্ষক সূর্যপদর কাছে। সূর্যপদর সহচর্যে এবং শিক্ষায় রমেন যথার্থ আদর্শবান ও বিবেকবান মানুষ হয়ে উঠল। পিতার কাছে ফিরে এসে রমেন পিতার চোরাকারবার ও অবৈধ ব্যবসার প্রতিবাদ করে হর্ষনাথের

অনুপস্থিতির সুযোগে আড়তের সব চাল দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। হর্ষনাথ ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে, এবং ভাবে এর চেয়ে তার ছেলে যদি গুন্ডা বদমাশ হতো তবুও ভালো ছিল। দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে আড়তদার, মজুতদার ও চোরাকারবারীরা যে কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করেছিল তার বাস্তব বর্ণনা এবং কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত রমেনের সংগ্রামী চেতনা মানিক এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কি ? ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা বলতে ঠিক কি বোঝায় সে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে এই গল্পে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। একটি দরিদ্র পরিবারের লেখাপড়া শেখা চাকরি করা মেয়ের জীবনে স্বাধীনতার সীমারেখা কতটা হওয়া উচিত তার ব্যাখ্যা মানিক দিয়েছেন এই গল্পে। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুগ্রহে সে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু সে স্বাধীন নয়, বাড়ির লোকের হাজার অভাব অভিযোগের কাছে সে পরাধীন, মাধবের ইচ্ছা অনুগ্রহের কাছেও সে পরাধীন। প্রতিবেশী মানুষেরা তার নামে কুৎসা রটায়, সেখানেও সে পরাধীন, অথচ স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মেয়ে সে। এই গল্পে মানিক দেখাতে চেয়েছেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও, সমাজ যদি অসংগতিতে ভরা থাকে তাহলে একটি মেয়ে কখনই স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারেনা।

নিরুদ্দেশ

একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্যপূর্ণ অসহায়তার ছবি রয়েছে এই গল্পে। বিনয়ের স্ত্রী মঞ্জু টানা তিনবছর বাপের বাড়ি যায় না অভিমানে, অপমানে। একবার তিনটি সন্তান নিয়ে বাপের বাড়িতে একমাস থাকতে গেলে মঞ্জুর বাবা বিনয়ের কাছে কিছু খরচ চেয়েছিল। মঞ্জুর অনুরোধে বিনয় টাকা পাঠিয়ে দেয় এবং মঞ্জুরই নির্দেশে দশদিন পরে স্ত্রী সন্তাদের বিনয় ফিরিয়ে আনে। তারপর মঞ্জু শত অনুরোধেও আর বাপের বাড়ি যায়নি। একসময় বিনয়ের চাকরি যায়। বাড়িতে কিছু না জানিয়ে বিনয় পাঁচ মাস ধরে চাকরির চেষ্টা করে। কিন্তু চাকরি আর জোটেনা। তারপর স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাপের বাড়িতে রেখে আসে এবং চাকরি নেই একথা জানিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পঞ্চাশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, ছাটাই, দারিদ্র্য নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মেরুদন্ডকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিল। একটি সহজ, সুন্দর, সুখী দাম্পত্য জীবন এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কবলে পড়ে কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তার স্বাক্ষর এই গল্পটি।

পাষন্ড

পঞ্চাশের মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি পরিস্থিতি একযুগে সমকালীন সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিজীবনকে এবং জীবনের সকল শুভ মূল্যবোধগুলিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। এই গল্পে সমীর চরিত্রের মধ্যে আমরা সেই বিনষ্টির সমস্ত লক্ষণ খুঁজে পায়। বিপিনের জামাই সমীর অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে সম্পূর্ণ অধঃপতিত হয়েছে, তার চাকরি, স্বাস্থ্য, স্ত্রীর গহনা, সুনাম সবই হারিয়েছে। এখন জোচ্চুরি করে, লোক ঠকিয়ে তার দিন চলে। এমনকি শ্বশুর বিপিনকেও ঠকিয়ে সে টাকা নিয়েছে। তার স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রিত। সমীরের নানা কু-কাজ ও দুর্নীতিমূলক আচরণ দেখে তার স্ত্রী জানায় যে সে বিধবা, কেননা সমীর মারা গেছে। সমীর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেও তার স্ত্রী রাধা কঠিনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। কিছুদিন পরে সমীরের চিঠি আসে, সমীর শিয়ালদহ স্টেশনে মৃত্যু শয্যায় শায়িত, একবার শেষবারের মতো স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দেখতে চায়। ব্যাকুল রাধা এবং বিপিন গিয়ে তাকে তুলে আনে, রাত্রি গভীর হলে রাধাকে চুপি চুপি বিপিন জানায় সে খুব বেশি অসুস্থ নয়। শুধু তাদের একবার দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে অসংখ্য উদ্বাস্তুদের ভিড় এবং তাদের জীবন সংগ্রাম এবং সর্বস্ব হারিয়েও বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ লড়াই দেখে সামীর মনের জোর খুঁজে পায় —

> ঘরে আলোটা জ্বলে ওঠায় রাধা চমকে ওঠে। খাট থেকে নেমে সমীর নিজে আলো জ্বেলেছে! ধড়মড় করে উঠে বসে রাধা। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা যাকে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামিয়ে খাটে শোয়াতে হয়েছিল, নিজে নিজে সে উঠে দাঁড়িয়েছে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো। ... জল খেয়ে একটু তফাতে সমীর বিছানায় বসে ছেলেমেয়ের গায়ে একবার হাত বুলায়, বলে ভেবেছিলাম দু-তিন দিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হব। কিন্তু আর ছলনা ভালো লাগছে না। তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলাম না। ... সকালে আমি নিজেই চলে যাব। টাকাও চাইবনা, কিছু চুরিও করবনা।.... অনেকবার পাঁক থেকে উঠবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। কিসে কাবু হতাম জান ? হতাশায়। নিজেকে যে সুধরে নেব সে তো অল্পে হবে না, দুদিনে হবে না। যা ভেঙেছি আবার তা গড়তে হলে অনেকদিন ধরে অনেক কষ্ট করতে হবে।[১২]

উদ্বাস্তু কলোনীতে ঘুরে ঘুরে সর্বহারা অসহায় মানুষগুলির জীবনের করুণ পরিণতি এবং কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ লড়াই করার চেষ্টা দেখে সমীরের হতাশা কেটে যায়। সে দেখে তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় মানুষ বেঁচে আছে। তাহলে সেই বা পারবেনা কেন। মার্কসিয় চেতনায় অনুপ্রাণিত মানিক তাঁর গল্প উপন্যাসে বারবার জীবনের সংগ্রাম ও উজ্জীবনের মন্ত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। এমন একদিন আসবে, যেদিন সব ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে, জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর। এই গল্পগ্রন্থে পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের সমাজ জীবনের নানান টুকরো টুকরো ছবি আমরা পাই যার মধ্য দিয়ে এই সময়ের স্বরূপটিকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। স্বাধীনতা পরবর্তী

এই পঞ্চাশের দশক জাতীর জীবনে ছিল একটা অগ্নি পরীক্ষার কাল। হতাশা থেকে, মানসিক দৈনতা থেকে, পরাধীন চেতনা থেকে, ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত হওয়ার আত্মগ্লানি থেকে, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-উদ্বাস্তু, অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার অগ্নি পরীক্ষার কাল। নতুন করে সৃজনের কাল। সম্ভাবনার সমস্ত দ্বার খুলে দিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কাল। আমাদের দুর্ভাগ্য এই সময় মানিক আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। চরম দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও আরো নানাবিধ সমস্যা নিয়েও তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। তার সংগ্রামী দৃষ্টি এবং মানবদরদী অনুভব দিয়ে সমকালীন সময়ে পীড়িত মানুষের কথা, সমাজব্যবস্থার কথা জানিয়ে গেছেন। সমকালীন সমাজ ও মানব জীবনের কথা অনেক লেখকের রচনার মধ্যেই আমরা পাই। কিন্তু এমন আপন করে আপন হয়ে কজনই বা বলেছেন সেসব কথা। তিনি দীর্ঘজীবি হলে সমাজ পরিবর্তনের ছবিগুলি আমরা আরো ভালো দেখতে পেতাম, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বেড়ে যেত আরো কয়েকগুণ। মাত্র সাতচল্লিশ বছরের পরমায়ু এবং আঠাশ বছরের সাহিত্য জীবন। এই গল্পগ্রন্থটি তার শেষ গল্পগ্রন্থ। এই সময়ে পত্র-পত্রিকায় আরো কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সে সবের সন্ধান মিলেছে। এই শেষ পর্বের গল্পগুলিতে হয়তো অনেক শিল্পগত দুর্বলতা আছে কিন্তু জীবনের প্রতি মমতা এতটুকু কমেনি। সমকালীন সময়কে সাহিত্যে এমন করে অঙ্গীকার আর ক'জনই বা করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৮ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ. ৫২৮।

২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯।

৩. 'আরোগ্য', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫২।

৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩।

৬. 'তেইশ বছর আগে পরে', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১।

৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭।

৮. 'ফেরিওয়ালা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৯. নজরুল ইসলাম, 'আমার কৈফিয়ত', *সঞ্চিতা,* নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০১৪, পৃ. ৭৭।

১০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬।

১১. 'লাজুকলতা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭।

১২. 'পাষণ্ড', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৮।

১৯৫৪

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪৬তম বছর। মানিক ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। জীবনের প্রতি প্রবল দাবিই হয়তো তাঁর জীবনীশক্তি হ্রাসের অন্যতম কারণ। ভারত ও চীনের মধ্যে প্যান্ডনীল নীতি গৃহীত হয়। নীতি গুলি হল — ১. পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ২. অনাক্রমণ ৩. পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। ৪. সমমর্যাদা ও পারস্পরিক সাহায্য প্রদান। ৫. শক্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

জানুয়ারি ৫ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম.সি. চাগলার সুপারিশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ‘জনগনমন’কে জাতীয় সঙ্গীতের স্বীকৃতি দেয়।

জানুয়ারি ১৪ বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর জীবনাবসান ঘটে। ইনি হালিশহরে ৫.১১.১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

জানুয়ারি ২৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম বার্ষিক অধিবেশন কল্যানীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে শুরু হয়।

জানুয়ারি ২৬ ভারত সরকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, খেলাধূলা, সমাজসেবা সহ বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পদ্ম পুরস্কার দেওয়া শুরু করে।

জানুয়ারি ২৮-২৯ সেনেট হলে কবিতা পাঠের বিরাট সমাবেশ।

ফেব্রুয়ারি ৩ এলাহাবাদের প্রয়োগে মহাকুম্ভ মেলায় স্নান করতে গিয়ে ৮০০ জনের পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু।

ফেব্রুয়ারি ১০ প্রথম শিক্ষক ধর্মঘট, পশ্চিম বঙ্গের ২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষক ধর্মঘটে অংশ নেন।

ফেব্রুয়ারি ১৬ কলকাতায় আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর বর্বর নিপীড়ন অত্যাচার চালায় পুলিশের গুলিও চলে।

ফেব্রুয়ারি ২৪ বঙ্গ বিহারের সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হরতাল আন্দোলন শুরু হয়।

মার্চ ৩ দিল্লিতে ভারতীয় সাহিত্য চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য সাহিত্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্চ ১৭ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে মাধ্যমিক শিক্ষকরা বেতনভাতা বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি এবং ধর্মতলায় অবস্থান শুরু করলে পুলিশ গুলি চালালে সাতজন শিক্ষক মারা যান। বহু শিক্ষক গ্রেপ্তার হন।

এপ্রিল ২৯ তিব্বত নিয়ে চীন-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে বলা হয় পঞ্চশীল চুক্তি।

মে ৭ ‘দিয়েন বিয়েন ফু’র পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতনামে ফরাসি শাসনের অবসান ঘটে। পাক গণপরিষদ ঘোষণা করে উর্দু ও বাংলা দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

মে ৮ চন্দননগর ফরাসি শাসন মুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃত অর্থে আজই চন্দননগরের স্বাধিনতা দিবস।

মে ১৪ কাশ্মীর চুক্তি কার্যে পরিণত করে রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামা। 'উত্তরসূরী' কবিতাপত্রের প্রকাশ, সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য।

মে ১৯ মহারাষ্ট্রে শ্রমিক সংগঠন 'রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সংঘ' স্থাপিত হয়। ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জুন ৪ ৪-৭ জুন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন মালদহের নঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে আবদুর রেজ্জাক খাঁ ও হরেকৃষ্ণ কোঙার।

জুন ২৬ চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারতে আসেন।

জুন ২৮ প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রি চৌ-এন-লাই পঞ্চশীলের ভিত্তিতে চলার কথা জানিয়ে যুক্ত বিবৃত্তি দেন।

জুলাই ফরাসি ঔপনিবেশিকতা থেকে ভিয়েতনামের মুক্তি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ।

সেপ্টেম্বর ৬ ৮ টি দেশের প্রতিনিধিগণ ম্যানিলায় 'সিয়াটো' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সৃষ্টি হয় সাউথ-ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন।

সেপ্টেম্বর ১৫ ১৫-১৯ সেপ্টেম্বর সারা ভারত কৃষক সভার দ্বাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন পাঞ্জাবের মগায় (ফিরোজপুর) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে ইন্দুলাল ইয়াগ্নিককে সভাপতি এবং এন প্রসাদ রাওকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

অক্টোবর ২ আনুষ্ঠানিকভাবে চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়।

অক্টোবর ৮ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় কমিউনিস্টদের দখলে আসে।

অক্টোবর ১৪ বালিগঞ্জের ট্রাম দুর্ঘটনায় কবি জীবনানন্দ দাশ আহত হন।

অক্টোবর ২১ রাত্রি ১১-৩৫এ শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু।

অক্টোবর ২২ কবি জীবনানন্দ দাসের ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। জন্ম ১৭.০২.১৮৯৯।

নভেম্বর ১ পন্ডিচেরী, কারিকোল মাহে ও ইয়ালোনের শাসনভার ফরাসি সরকার ভারতের কাছে স্থানান্তর করে। নতুন রাজ্য পন্ডিচেরির পত্তন শুরু হয়।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অরুণ মিত্র : *উৎসের দিকে* / জীবনানন্দ দাশ : *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* / দিনেশ দাস : *অহল্যা* / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : *নীল নির্জন* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *জোনাকিরা* / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *উলুখড়ের কবিতা* / মণীন্দ্র রায় : *অমিল থেকে মিলে* / শুদ্ধসত্ত্ব বসু : *ঘুমভাঙার গান* / সমর সেন : *সমর সেনের কবিতা*। **নাটক** — দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *মশাল* / আশাপূর্ণা দেবী : *কল্যাণী* / প্রতিভা বসু : *বিবাহিতা স্ত্রী*। **উপন্যাস** — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *চাঁপাডাঙার বউ* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *হরফ, শুভাশুভ* / বনফুল : *লক্ষ্মীর আগমন, পিতামহ* / সতীনাথ ভাদুড়ী : *অচিনরাগিনী* / সুবোধ ঘোষ : *গঙ্গোত্রী* / সন্তোষকুমার ঘোষ : *মোমের পুতুল* / গোপাল হালদার : *জোয়ারের বেলা*।

গল্পগ্রন্থ — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : *কানু কহে রাই* / বনফুল : *অনুগামিনী* / অন্নদাশঙ্কর রায় : *কামিনী কাঞ্চন* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *ধূপকাঠি*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — প্রমথ চৌধুরী : *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (২য় খণ্ড)।

পত্রিকা প্রকাশ — *উত্তরসূরী* : অরুণ ভট্টাচার্য।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অমিত মিত্র, আবদুস শুকুর খান, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, গৌতম হাজরা, বিজয় মাখাল, মলয় দাশগুপ্ত, সমীর ঘোষ, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত।

মৃত্যু : জীবনানন্দ দাশ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

পরিশ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি, আর্থিক সংকট, সুন্দর ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় বার বার ব্যর্থতা। জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের বেদনাবোধ, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ড্রোমাইড যুক্ত ঔষধ ব্যবহারে কর্মশক্তি হ্রাস, দারিদ্র্য, অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন মানিক। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক সংকটের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে যান তিনি। মৃগী রোগ ছাড়াও আমাশয় ও যকৃতের রোগ তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। আত্মরক্ষার নামে আত্মহননের পথে এগিয়ে যান মানিক। যন্ত্রণা ভুলতে মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে যায়। শরীর যত দুর্বল হয়ে পড়ছে ততই তিনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। এই সময়ে তাঁর ডায়েরিতে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ('মা') কাছে শরণাপন্ন হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা মানিকের স্বভাব বিরুদ্ধ। অক্টোবরে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *শুভাশুভ* । মে মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *হরফ*। গল্প প্রকাশ: *রোমাঞ্চকর* (পরিচয়, সেপ্টেম্বর), *ঘাসে কত পুষ্টি* (পরিচয়), *মতিগতি* (গল্পভারতী, সেপ্টেম্বর), *চিন্তাজ্বর* (বসুমতি, সেপ্টেম্বর)।

উপন্যাস-১ : হরফ

এটি মানিকের ঊনত্রিশতম উপন্যাস এবং আটচল্লিশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৬১, প্রকাশক সাহিত্য জগৎ, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ২৪৪, মূল্য চার টাকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটির পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[১]

কালাচাঁদ নামে জনৈক অবহেলিত দরিদ্র কম্পোজিটর কি অসামান্য অধ্যাবসায় ও প্রাণশক্তিতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, তার কাহিনি মানিক আপন রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে বর্ণনা করেছেন। প্রেসের সামান্য কম্পোজিটর কালাচাঁদ, দারিদ্র্য তার নিত্য সঙ্গি, খ্যাত-অখ্যাত সকলের লেখা যান্ত্রিকভাবে কম্পোজ করা তার কাজ। কিন্তু এই লেখাগুলির পেছনে লেখকদের যে মানসিকতা কাজ করে, তা বোঝার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তা কালাচাঁদের

নেই। প্রেসের মালিক ধনদাসের দাসত্ব করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। তার সঙ্গে আলাপ হয় প্রগতিশীল লেখক মানব, কবি খালেফ ও কবি জহর এবং লেখক উমাকান্তের সঙ্গে। সামান্য কয়েকটি টাকার অভাবে উমাকান্তের স্ত্রী পুতুল সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে মারা যায়। প্রেসের মালিক ধনদাস যদি উমাকান্তের অসহায়তার সুযোগ না নিত তাহলে হয়তো উমাকান্ত স্ত্রীকে বাঁচাতে পারতেন। কালাচাঁদ রাগী এবং বেপোরোয়া। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে ধনদাসের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করার প্রস্তুতি নেয়। সহকর্মীদের সমর্থন নিয়ে একদিকে সে পত্রিকার পাতায় ধনদাসের বংশানুক্রমিক কুৎসা কাহিনি ছাপিয়ে দেয় এবং অন্যদিকে *হরফ* নামের আর একটি পত্রিকার জন্ম দেয়।

লেখক জীবনের নানারকম সমস্যা, প্রকাশকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক, প্রকাশকদের অমানবিকতা, ছাপাখানার কর্মীদের প্রতি অবহেলা — এককথায় প্রকাশনার জগতটিকে তার ভালো মন্দ নিয়ে এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন মানিক। এই উপন্যাসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে লেখকেরা। তাদের সাংসারিক জীবনের বাস্তব সমস্যার কথা। ধনদাস ক্ষুব্ধ হয়ে কালাচাঁদকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ধনদাসকে পিছু হটতে হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত কালাচাঁদকে ধনদাসের চক্রান্তে জেলে যেতে হয়। কালাচাঁদকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠানো হলেও শ্রমিক আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়না। সংগ্রামী কালাচাঁদ মিটিং মিছিল হরতালের মধ্য দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেনি। কালাচাঁদ তার শ্রেণি সচেতনতার মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে মাধ্যম করে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি ধনদাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

এই উপন্যাসে মানিক তাঁর সাম্যবাদী জীবনাদর্শ থেকে বোঝাতে চেয়েছেন, সাহিত্যই হতে পারে আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী হাতিয়ার। সাহিত্যের মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে যা জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত সচেতনতার প্রসার ঘটাবে। সমকালীন ক্ষত-বিক্ষত জীবন যন্ত্রণাকে মানিক তুলে ধরার জন্য সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন। *সাহিত্য করার আগে* শীর্ষক নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যেসব কথা জানানো যায় না, সেসব কথা জানানোর জন্যই তাঁর লেখক হয়ে ওঠা। অথবা জীবনে এবং সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে, সেই পরিবর্তনকে সাহিত্যের ভেতরে অঙ্গীকার না করে অন্যকোনো কাজ করার কোনো মানে ছিল না তাঁর কাছে। তাই তিনি পড়াশোনা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে কলম পেষার পেশাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই কলমপেষার কাজও যে সহজ নয়, জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে শুধুই স্বপ্ন নিয়ে যে চলা যায় না — প্রকাশনার জগতকে অবলম্বন করে কয়েকজন লেখকের জীবনসমস্যার কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাসে মানিক তা দেখিয়েছেন।

উপন্যাস-২ : শুভাশুভ

এটি মানিকের ত্রিশতম উপন্যাস এবং ঊনপঞ্চাশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৬১, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ২৬০, মূল্য চার টাকা। উপন্যাসটির সূচনায় *লেখকের কথা* শীর্ষক কলমে মানিক জানিয়েছেন একটি খ্যাতনামা ছোটোরকম মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। কয়েকমাস প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটিও আর প্রকাশিত হয়নি।[২]

এই উপন্যসটি রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন —

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আর একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এর ফলে জনসাধারণের মনেও যুদ্ধের আশঙ্কা রয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববাসীর সেই আশঙ্কাকে দূরীভূত করতে, যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'— এই দাবিতে স্টকহোমে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে যার পরিপ্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন *শুভাশুভ* উপন্যাস।[৩]

যুদ্ধের বাজারে এক শ্রেণির মানুষ নানা উপায়ে প্রচুর টাকাপয়সা কামিয়ে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যখন গোটা পৃথিবীর মানুষ মগ্ন, তখনও এক শ্রেণির মানুষ চাইছে আবার যুদ্ধ বাঁধুক। বনমালীর মতো অনেক মানুষ চাইছে আবার যুদ্ধ-টুদ্ধ বাঁধলে ব্যবসার জগতে হাওয়া ঘুরবে। এককালে মহিম চৌধুরী তিনশটাকা চুরি করে, সেই টাকায় যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা শুরু করেছিল। আজ সে ধনী ব্যবসায়ী ও প্রচুর টাকার মালিক। তার মৃত্যুর পর পুত্র সমরেশের কাঁধে এসে পড়েছে ব্যবসার ভার। বনমালী তাদের ব্যবসার বিশ্বস্ত কর্মচারী। যুদ্ধের বাজারে এই ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বিলাতি কোম্পানিগুলি রাতারাতি ভারতীয় কোম্পানি হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায় লোকসান হতে শুরু করে। ব্যবসার এই শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝতে পারছিল সমরেশ, তাই সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়লে, মামা ভবানীর কাছে সমরেশ অর্থ সাহায্য চাইতে যায়। ভবানী সমরেশকে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় ও তার ব্যবসায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। সমরেশ ভবানীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কোনোরকমে ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই ভবানীর মতো মানুষেরা স্বপ্ন দেখে আর একটা যুদ্ধ বাঁধার। মানিক এই উপন্যাসে ব্যবসায়িদের নেতীবাচক চারিত্রিক মনোভাব এবং অর্থপিপাসাকে তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছেন। অর্থের জন্য এক শ্রেণির মানুষ কিভাবে অমানবিক ও রক্তপিপাসু হয়ে পড়ে, অর্থই তাদের কাছে সবচেয়ে আগে, যুদ্ধ বাঁধলে কত মানুষ মরলো তা তাদের নজরে পড়েনা। যুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক সংকট ও মানুষের দূরাবস্থার কথা এই উপন্যাসে বিধৃত। পঞ্চাশের দশকে দেশ ও সমাজের মানসিকতার কণ্ঠস্বর একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানিক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ৯ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ. ৫৬২।

২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১০ম খণ্ড, ২০০২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৯।

৩. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অঞ্জলি, ২০১০, পৃ. ১৫২।

১৯৫৫

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের ৪৭তম বছর। শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানিক জীবনের প্রতি সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশ। জাতীয় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আইবুল জানিন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান নিকিতা ক্রুশোভ ভারতে আসেন। ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া-আফ্রিকার ২৬টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জওহরলাল নেহরু। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধ, ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করা ছিল এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দু বিবাহ আইন পাস। এই আইনের প্রধান দিক গুলি হল – ১. বহুবিবাহ প্রথা বাতিল ২. পুরুষ ও নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ৩. নারীর বিবাহের বয়সসীমা বৃদ্ধি এবং ৪. পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারে স্বীকৃতি। জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন কার্যকর হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ‘সাহিত্য একাডেমি’ কর্তৃক সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রচলন। প্রথম সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার : জীবনানন্দ দাশ (মরণোত্তর)।

জানুয়ারি ১১ ভারতে ‘নিউজ প্রিন্ট’ উৎপাদন শুরু হয় মধ্যপ্রদেশের নেপা নগরে।

এপ্রিল ১২ পশ্চিমবঙ্গে ‘জমিদারি প্রথা’ লোপ পায়।

এপ্রিল ১৪ পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি অধিগ্রহণ বিল আইন কার্যকর হয়।

এপ্রিল ১৫ পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন তৈরি হয়। বিনোভাভাবে ভূদান আন্দোলন শুরু করেন।

এপ্রিল ২৬ ২৭-৩০ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার ১৪তম রাজ্য সম্মেলন হুগলীর বড়া কমলাপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে মহ: আবদুল্লাহ রশুল এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার।

মে ১০ সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্র কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

মে ১৯ মহারাষ্ট্রের ধানুতে সারা ভারত কৃষক সভার ১৩তম সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে সবাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে নানা পাতিল এবং এন প্রসাদ রাও।

জুন ১ ভারতে অস্পৃশ্যতা নিরোধ আইন চালু হয়।

জুন ৪ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

জুলাই ৬ চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মারা যান।

জুলাই ১৫ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ‘ভারতরত্ন’ উপাধি দেবার কথা ঘোষণা করেন।

জুলাই ২৫ ভারত সরকার দিল্লিতে পর্তুগীজ সরকারের দূতাবাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ২৬ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পায়।

আগস্ট ২৭ স্যার হিউ বীভার 'গিনেজ বুক অব রেকর্ডস' নামক ১৯৮ পাতার একটি প্রথম প্রকাশ করেন।

সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গে 'বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন', 'বর্গাদার আইন' ইত্যাদি উচ্ছেদ করে 'ভূমি সংস্কার বিল' পেশ।

সেপ্টেম্বর ২০ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

নভেম্বর ৩ সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক স্যার অ্যালফ্রেড হিচ্‌কক্‌ কলকাতায় লাইট হাউস সিনেমা হলে তাঁর 'রিয়ার ইউন্ডো' ছবির মুক্তি উপলক্ষে আসেন।

নভেম্বর ১৮ সোভিয়েত দেশের নেতা বুলগানিক ও ক্রুশেভ ভারত সফরে দিল্লি আসেন।

নভেম্বর ৩০ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুশেভ কলকাতায় আসেন। রাজ্য সরকার সবেতন ছুটি ঘোষণা করে। ব্যাপকভাবে সংবর্ধিত হন।

ডিসেম্বর ৩ পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা।

ডিসেম্বর ১ মার্কিন নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং (জু:) যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন।

ডিসেম্বর ৩ সুদানের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয় ব্রিটেন এবং মিশর।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অরুণ মিত্র : *উৎসের দিকে* / অমিয় চক্রবর্তী : *ঘরে ফেরার দিন, পালাবদল* / কৃষ্ণ ধর : *যখন প্রথম ধরেছে কলি* / গোপাল ভৌমিক : *বসন্ত বাহার* / চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *নীলকণ্ঠ* / দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : *নীলাম্বরী* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *নিরিবিলি* / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *মৃত্যুত্তীর্ণ* / বিষ্ণু দে : *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা* / বুদ্ধদেব বসু : *শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর* / মণীন্দ্র রায় : *কৃষ্ণচূড়া* / সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *স্বনির্বাচিত কবিতা* / সুকুমার রায় : *সেই কন্যাকে* / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *প্রতিধ্বনি*। **উপন্যাস** —মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *পরাধীন প্রেম* / বনফুল : *পঞ্চপর্ব, নিরঞ্জনা* / জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : *বারো ঘর এক উঠোন* / সমরেশ বসু : *সওদাগর* / অবধূত : *মরুতীর্থ হিংলাজ* / অমিয়ভূষণ মজুমদার : *নীলা ভূঁইয়া*। **গল্পগ্রন্থ** — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *বিস্ফোরণ* / শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : *স্বনির্বাচিত গল্প, শ্রেষ্ঠগল্প* / বনফুল : *উর্মিমালা*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — রাজশেখর বসু : *বিচিন্তা* / সৈয়দ মুজতবা আলি : *পঞ্চতন্ত্র*।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : অনন্য রায়, অভিরূপ সরকার, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, গৌতম বসু, গৌতম ঘোষ দস্তিদার, নরেশচন্দ্র দাস, ব্রত চক্রবর্তী, মৃণালকান্তি দেব, মানবেন্দ্র রায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, সমীরণ ঘোষ।

মৃত্যু : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

মানিকের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মানিকের জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকদের একটি বৈঠক হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উপস্থিতিতে মানিকের চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। সভাস্থলেই প্রায় ৮০০ টাকা ওঠে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের পরামর্শে ডাক্তার যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে মানিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করানো হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি মানিকের তীব্র অনিচ্ছা ও আপত্তি সত্ত্বেও শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বুঝিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে রাজি করান। চীনমোহন সেহানবীশ, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখরা মানিককে ইসলামীয়া হাসপাতালে ভর্তি করান। এখানে মাসাধিককাল তাঁর চিকিৎসা চলে। আশঙ্কা সত্ত্বেও গোপনে চলে মদ্যপান। চিকিৎসার ও সংসার খরচের জন্য অনুদান নিতে তীব্র আপত্তি ও বেদনাবোধ। ২৭ মার্চ চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে মানিক নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন। দেহে মনে বিপর্যস্ত মানিকের চিকিৎসার জন্য আবারও চেষ্টা হল। ২০ আগস্ট শেষ চেষ্টা হিসেবে ডাক্তার যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে কড়া নিয়মের মধ্যে চিকিৎসা করানোর জন্য লুম্বিনিপার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয় মানিককে। দু'মাস চিকিৎসা চলার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলে ২১ অক্টোবর হাসপাতাল ছেড়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং বিধানচন্দ্র রায়ের সম্মতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানিকের জন্য ১০০ টাকা করে মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেন এবং তাঁকে এককালীন ১২০০ টাকা সরকারি ভাতা দেওয়া হয়।

মে মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *পরাধীন প্রেম*। গল্পপ্রকাশ: 'তারপর' (*বসুমতী*, অক্টোবর), 'বিদ্রোহী' (*অর্চনা*, শারদীয়া)।

উপন্যাস-১ : পরাধীন প্রেম

এটি মানিকের একত্রিশ সংখ্যক উপন্যাস এবং পঞ্চাশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, প্রকাশক রিডার্স কর্ণার, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ১৮৯, মূল্য তিন টাকা। *অনন্যা* পত্রিকায়

ধারাবাহিকভাবে *বাস্তবিক* নামের একটি উপন্যাসের তিনটি কিস্তি প্রকাশিত হয় ১৩৫৮তে। পরবর্তীকালে এই *বাস্তবিক* উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রের কিছু রদবদল ঘটিয়ে *পরাধীন প্রেম* উপন্যাসটি রচিত।[১]

উপন্যাস বিনয়-বকুল, অনিল-কান্তা, সমীর-সুমতি আর অজিত-উমার প্রেমকাহিনি তবে তা অবশ্যই পরিচিত রোমান্টিক স্বপ্ন চরিতার্থতার বিলাস নয়। বরং ঠিক তার বিপরীতে সমাজ বাস্তবতার নিগড়ে বাঁধা প্রেমের পরাধীন রূপ এই উপন্যাসের বিষয়। প্রেমও যে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উর্ধ্বে কোনো অপার্থিব হৃদয়বৃত্তি নয়, চারটি প্রেমকাহিনি সে কথাই বলতে চেয়েছে। অনিলের যুবতি বোন বকুল বিধবা হয়ে বাড়ি ফিরে আসে, তাই দিয়ে উপন্যাসের শুরু। বকুলের সম্বন্ধে বিনয় ও কান্তার কথোপকথন —

> এইটুকু মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, বিষম দায় ঘাড়ে চাপল। শুধু খাওয়ানো পরানোর দায় নয়, বুড়ি হওয়া পর্যন্ত সামলে চলার দায়।
> বুড়ি হওয়া পর্যন্ত ? মরা পর্যন্ত নয় ?
> এ জেলখানায় বুড়ি হওয়া পর্যন্ত বাঁচা মানেই, মরে গিয়ে পেত্নি হয়ে মরার বাড়া জের টানা।[২]

বকুল সম্বন্ধে একথা কে বলেছে ? তার প্রেমিক বিনয়। সূচনাতেই নিষ্ঠুর বাস্তবের উচ্চারণ। মধ্যবিত্ত রোমাণ্টিকতার সমূল উচ্ছেদ ঘটিয়ে এ উপন্যাসে একটার পর একটা ঘটনার ক্রমবিস্তারে আছে অর্থনীতির ইশারায় মানব জীবনের গতিমুখ নির্ধারণের নির্মম সত্য। কেমন সেই সত্য ? বিনয়-বকুলের বাল্যপ্রেম, বকুলের বৈধব্যের পর পরিণতির সম্ভাবনায় উন্নীত হলে হঠাৎই একদিন বকুল খবর পায় তার মৃত স্বামী তার জন্য একটি বাড়ি, তেরো হাজার টাকা ও একটি বৃহৎ সংসার রেখে গেছে। মুহূর্তে প্রেমের তরণি বিষয়ের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। ডাকে আসা পার্সেল থেকে যে দলিল বকুল পেয়েছে তাতে প্রেম না থাকলেও আছে আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বীকৃতি —

> বিনয় বলে, সারাজীবন এই দায় নিয়ে কাটবে ? বকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তাইতো বলছিলাম। একটা পাপ করে চিরকাল নরকে পচবো — শেষ মুহূর্তে কেমন বেঁচে গেলাম দেখ! ছেলেবেলা থেকে এত পূজো করে আসছি — সে কি মিছে হয়! কি নিয়ে জীবন কাটাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, সারা জীবনের অবলম্বন জুটে গেল। মাগো, সব কটাকে সামলে চলতে হবে।[৩]

কোনোরকম ছলচাতুরি নেই, সহজ সরল ভাব। বিধবা হওয়ার পর যে বকুল খুব একটা বেশি কষ্ট পায়নি, কেননা স্বামী অজিতের প্রভাব তার মনে খুব বেশি ছিলনা। তারপর বাল্যপ্রেমিক বিনয়ের প্রেমের জালে সে যখন ধরা দিতে চলেছিল, তখনই আসে মৃত স্বামীর এই চিঠি। তারপর বকুলের এই অভিব্যক্তি। জীবনে প্রেম আর প্রেমহীনতা যে কতখানি অর্থনৈতিক চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রমাণ বকুল চরিত্র।

বকুলের দাদা অনিল। সে ভালোবাসে কান্তাকে। কান্তার বিয়ে হয়েছিল মাত্র আট বছর বয়সে। মাতাল স্বামী অঘোরের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কান্তা একদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে আসে। তারপর লেখাপড়া শিখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে অঘোর মারা যাওয়ার পর সে বিয়েও করতে চেয়েছিল অনিলকে, কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর অনিল জানতে পারে তার যক্ষ্মা হয়েছে। অনিলের কাছে এই খবর মৃত্যুর পরোয়ানা কিন্তু কান্তা তা মানতে রাজি নয়। জীবনের সঙ্গে লড়াই করে কান্তা অনিলকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু অনিল হতাশ, কেননা সংসারের দায় টেনে চিকিৎসা ও পথ্যের সঠিক ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদের জীবন নানা জটিলতার ফাঁদে ঘুরপাক খেতে খেতে কেবলই বাধা বিপত্তির দেওয়ালে কপাল ঠুকে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

এরকম আর একটি চরিত্র উমা — সমাজ ব্যবস্থার চাপে সে হারিয়েছে জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। সে আর বিচলিত হয়ে ওঠেনা, অকারণে তার মনে রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগে না। কেননা সে গরিব ঘরের মেয়ে —

> ঠিক দিদির মতো সেই বয়স থেকে খেলে বেড়াবার সঙ্গে টুকিটাকি ঘরকন্নার কাজ করতে করতে ক্রমে ক্রমে ঘরের কোণে আটক হয়ে শুধু ঘরকন্নার কাজটাই অবলম্বন করত, তারপর যথা নিয়মে একদিন চলে যেত আর এক বাড়িতে আর এক সংসারের ঘরকন্নার কাজ করতে এবং বছর খানেকের মধ্যে নেহাত প্রথমবার বলেই বাপের বাড়ি আসত জন্ম দিতে প্রথম ছেলে অথবা মেয়েটির।[৪]

মধ্যবিত্ত জীবনের সহজ নিস্তরঙ্গ পরিণতির কি নির্মম রূপরেখা! সামান্য কয়েকটি বাক্যে একটা গোটা শ্রেণি ব্যবস্থার সূচনা থেকে পরিণতির এরকম সুচারু বিন্যাস সত্যিই বিরল। এই উমা ভালোবাসে অজিতকে। উমা এই সম্পর্কটির অন্যরকম একটি রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গতানুগতিক লাভ ক্ষতির হিসেবেই পরিণতি খুঁজে পেয়েছে। কেননা তাদের প্রেম পরাধীন। এই উপন্যাসে যে কটি প্রেমকাহিনি আছে, তাদের মধ্যে একমাত্র উমা-অজিতের কাহিনিতেই সরাসরি পরাধীন শব্দটি লেখক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কিসের এই পরাধীনতা ? মানিক বোঝাতে চেয়েছেন এই পরাধীনতা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের সংস্কারে নিহিত। এ পরাধীনতা অর্থের প্রতি আমাদের দাসত্বের মনোভাবে পল্লবিত। এর থেকে পরিত্রাণের পথ মানিকের সমকালে ছিল না, আজও নেই — তাই অজিত উমাকে বিয়ে করতে পারেনি। তবে পড়াশোনা করা ও চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে উমাকে সাহায্য করেছে অজিত। উমাও আত্মমর্যাদাবোধকে দাবিয়ে রেখে অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করে গ্রহণ করেছে অজিতের দান। কেননা সেও পরাধীন। তারপর অজিত অন্য মেয়েকে বিয়ে করলে উমাও অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বিয়ে করলে চাকরি চলে যাবে, তাই আর তার বিয়ে করা হয়ে ওঠেনা। বাবা, মা, গোটা পরিবার তার চাকরির ভরসাতেই বেঁচে আছে। উমার দিদি সমাজের একটি

ব্যবস্থার শিকার, আর উমা অন্য একটি ব্যবস্থার চাপে হারিয়ে ফেলেছে জীবনের নিজস্ব মানে। আজীবন দাসত্বের বোঝা বয়ে বয়ে উমা সত্যি সত্যিই পরাধীন।

এই উপন্যাসে একমাত্র সমীর ও সুমতির প্রেমই বিবাহে পরিণতি পায়। উমা, অনিল, কান্তার চেষ্টায় তারা সুস্থ জীবনের পথে পা রেখেছে। সমাজ-অর্থনীতির চাপে মানুষকে পরাধীন হতে হয়। সেই মানুষই পরাধীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় লড়াই করে চলে। সংস্কার, পরিবেশ, অর্থ — যত কিছুর কাছেই প্রেম পরাধীন হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দাসত্বের অন্ধকার থেকে তিমির বিনাশের পথে মানুষের সংগ্রামী হৃদয় এগিয়ে যাবে — এ উপন্যাসের সবকটি চরিত্র সে কথাই উচ্চারণ করেছে। এই চারটি প্রেম কাহিনির মূলগত ভাব কিন্তু একটিই — আর্থ-সামাজিক পরিবেশ কিভাবে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে, তাকে পরিস্থিতির অধীন একটি যন্ত্রণাগ্রস্ত, অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত করে; যে ব্যবস্থায় প্রেমের মতো হৃদয় বৃত্তিও টাকার প্রয়োজনে নির্ধারিত হয়। অর্থের শৃঙ্খলে প্রেম হয়ে ওঠে পরাধীন। বকুল, বিনয়, অনিল, কান্তা, উমা কেউই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিব্যবস্থার উর্ধ্বে উঠে জীবনের মহত্তর ঐশ্বর্য — প্রেমকে স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। *পরাধীন প্রেম* মূলত প্রেমের উপন্যাস হলেও সে প্রেম গতানুগতিক যৌনতা সর্বস্ব নয়, আবার হৃদয়উৎসারি ঐশ্বর্যময় প্রেমও নয়। বাস্তবের এই গল্প প্রতিদিনের অনিবার্য সত্য। আর্থ-সামাজিক সংকট এবং বহু প্রথাগত সংস্কারের জালে অনেক সময় প্রেমের যে করুণ পরিণতি হয়, তাকে অবলম্বন করে রচিত এই উপন্যাস। *পরাধীন প্রেম* এই শ্লেষাত্মক নামকরণের মধ্য দিয়ে মানিক সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ. ৬২০।

২. ‘পরাধীন প্রেম’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

১৯৫৬

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

মানিকের জীবনের শেষ বছর। অসুস্থ, পীড়িত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানিক আর পারলেন না মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে। তিনিই বাংলা সাহিত্যের দরিদ্রতম সবচেয়ে বড়ো লেখক। এ বছর ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সময়সীমা - ১৯৫৬-১৯৬১ এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এই পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ভারীশিল্প স্থাপন এবং কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেওয়া হয়। রাজ্য পুনর্বিন্যাস আইন পাশ করা হয়। ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য পুনর্গঠিত হয়। ২য় সাধারণ নির্বাচন — সংসদে কংগ্রেস সরকার। কলকাতায় ১ম বর্ষ কবিতা মেলা।

জানুয়ারি ১ আফ্রিকা মহাদেশের সুদান স্বাধীন হয়। রাজধানী খাতুন।

জানুয়ারি ৭ ভারত সরকার সুদান প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়।

জানুয়ারি ১৬ ১৬-২১ জানুয়ারি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ৭ম সম্মেলন কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতি বসু।

জানুয়ারি ১৮ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বোম্বাইতে মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয় এবং পুলিশের গুলিতে ৬০ জন নিহত হয়।

জানুয়ারি ২১ পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ঘোর অবিচারের প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলিরর ডাকে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট পালিত হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৯ সাইপ্রাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গ্রিক সাইপ্রটের বোমা আক্রমণ শুরু হয়।

মার্চ ২ আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো স্বাধীন হয়। রাজধানী বরাত।

মার্চ ২৩ পাকিস্তানকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়।

এপ্রিল ১৯ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস কেরালার পালঘাটে শুরু হয়। ২৯ এপ্রিল শেষ হয়। ৩৯ জন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অজয় ঘোষ।

এপ্রিল ২৬ মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রথম নিউজপ্রিন্ট জমিলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মে ৪ বিপ্লবী, বাঘাযতীনের সহকারী পূর্ণচন্দ্র দাস আততায়ীর ছুরিতে নিহত হন।

মে ৮ লোকসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গৃহীত হয়। ১৮ই জুন আইনে পরিণত হয়।

মে ২০ প্রথম মার্কিনি হাইড্রোজেন বোমাটি বিকিনি দ্বীপে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

আগস্ট ৪ ভারতে প্রথম পারমানবিক চুল্লী অপ্সরা চালু হয়।

আগস্ট ১০ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে ১৪টি নতুন রাজ্য গঠন করা হবে বলে লোকসভায় সিদ্ধান্ত হয়।

আগস্ট ৩১ ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বিভিন্ন রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিলে সম্মতি দেন।

সেপ্টেম্বর ২০ সত্যজিৎ রায়ের *পথের পাঁচালী* শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়।

সেপ্টেম্বর ২৮ সারা ভারত কৃষক সভার ১৪ তম সর্বভারতীয় সম্মেলন পাঞ্জাবের অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে এ.কে. গোপালন এবং এন প্রসাদ রাও।

অক্টোবর ১৪ ড. ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকর শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর সঙ্গে প্রায় দু লক্ষ তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষ ও মহিলা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

নভেম্বর ১ ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন হয়। কেরালা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। মহিশূর, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়। ২৩৯ টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলা গঠিত হয়।

নভেম্বর ২৮ চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ভারতে আসেন।

ডিসেম্বর ২ ফিদেল কাস্ত্রো কারাগার থেকে বের হয়ে কিউবার বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ডিসেম্বর ৬ ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম ভীমরাও আম্বেদকারের জীবনাবসান ঘটে। জন্ম ১৪.০৪.১৮৯৩।

ডিসেম্বর ১৬ নতুন দিল্লিতে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স' স্থাপিত হয়।

সাহিত্য সংবাদ

গ্রন্থপ্রকাশ : কাব্য — অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : *যৌবন বাউল* / অমলেন্দু গুহ : *লুইত পাড়ের গাথা* / তরুণ সান্যাল : *মাটির বেহালা* / প্রেমেন্দ্র মিত্র : *সাগর থেকে ফেরা* / ফণিভূষণ আচার্য : *ধুলিমুঠি সোনা* / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *লখিন্দর* / মোহিতলাল মজুমদার : *নির্বাচিত কবিতা* / রাম বসু : *দৃশ্যের দর্পণে* / শঙ্খ ঘোষ : *দিনগুলি রাতগুলি* / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *দশমী*। **নাটক** — মনোজ বসু : *শেষলগ্ন* / বিজন ভট্টাচার্য : *গোত্রান্তর* / শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *সবার উপরে মানুষ সত্য* / সুনীল দত্ত : *জতুগৃহ* / আশাপূর্ণা দেবী : *নির্জন পৃথিবী, শশীবাবুর সংসার*। **উপন্যাস** — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *পঞ্চপুত্তলী* / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *হলুদ নদী সবুজ বন, মাশুল, প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* / বনফুল : *ভুবনসোম* / বুদ্ধদেব বসু : *শেষ পাণ্ডুলিপি* / নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *অনুরাগিনী, সহৃদয়া* / বিমল কর : *দেওয়াল* / মনীশ ঘটক : *পটলডাঙার পাঁচালী* / অদ্বৈত মল্লবর্মন : *তিতাস একটি নদীর নাম*। **গল্পগ্রন্থ** — রাজশেখর বসু : *নীলতারা* / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *কালান্তর*। **গদ্য ও প্রবন্ধ** — সৈয়দ মুজতবা আলী : *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, জলে ডাঙায়*।

প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের জন্ম-মৃত্যু :

জন্ম : মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, অমিত মণ্ডল, অসিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি দত্ত, তরুণ মুখোপাধ্যায়, দিবাকর ভট্টাচার্য, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় রায়, শৌভিক চক্রবর্তী, সুদর্শন বৈতালিক, সোমেন ভট্টাচার্য।

মৃত্যু : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

মানিকের ব্যক্তি জীবনের খবর

মানিকের জীবনের শেষ বছর। হাসপাতালের চিকিৎসায় শরীরের যেটুকু উন্নতি হয়েছিল বাড়িতে এসে সেটুকু শেষ হয়ে শরীর আরও কাহিল হয়ে পড়ে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা, আর্থিক সংকট, অত্যধিক সুরাপান, বারবার রক্ত আমাশয়ের আক্রমণ ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর প্রাণশক্তি ক্রমশ ক্ষীয়মান হতে থাকে। ২৫শে জুন প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হন। ডাক্তারের চেষ্টায় কিছুটা সুস্থ হন। ৩০ নভেম্বর সকালে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং প্রায় চার ঘন্টা এই অবস্থাতেই ছিলেন। ২ ডিসেম্বর রোববার রাত প্রায় দশটার সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই শেষবার হাসপাতালে মানিককে নিয়ে যাওয়ার সময় যে ক'জন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন্দ্রনাথের মরমী স্মৃতিচারণা থেকে আমরা মানিকের অন্তিম দিনটির বেদনাময় পরিণতির কথা জানতে পারি—

> খাট থেকে ধরাধরি করে যখন নামানো হল, তখন দুটি চোখই খোলা। কপালের ওপর আর কানের পাশে কয়েকটা শিরা কুঁচকে উঠেছে। ডান হাতটা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে একবার নাড়লেন। চাউনিতেও তীব্র প্রতিবাদ ছিল। গলায় অস্ফুট শব্দ, যার কোনো ভাষা নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে।
>
> ডাক্তারীশাস্ত্র আমি জানি না, মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী নই। তবু খাট থেকে সেই বিরাট দেহটা যখন বহু যত্ন আর পরিশ্রমে স্ট্রেচারে তোলা হল — তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ, গলা আর হাতের মিলিত অভিব্যক্তিকে আমার শুধু মনে হল — প্রতিবাদ। প্রতিবাদ আর ভাষাহীন যন্ত্রণা!
>
> অথচ শুনেছিলাম বিকেল থেকে তিনি অচৈতন্য। সন্ধ্যার সময় খবর পেয়ে যখন পৌঁছেছি, তখনও তাঁকে সজ্ঞানে দেখিনি। ছোট ঘর, চটের পর্দা দিয়ে কোনোরকমে পার্টিসান করা। ও-পাশে বৃদ্ধ বাবা রোগশয্যায় শুয়ে নীরবে। এ পাশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে নীরবে। ...
>
> পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নেয়ারের খাটটার এক মাথা শক্ত দু'হাতে চেপে ধরে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। লেপের তলায় সমস্ত শরীরটা ঢাকা শুধু ডান হাতের কনুই থেকে কব্‌জি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চওড়া হাড়ের ওপর মাংস নেই, মেদ নেই। শিথিল চামড়া। যেন আকাশের দেবতার ভ্রুকুটিতে সমস্ত সঞ্চয়কে শুষে নিয়েছে। দেখেছিলাম মানিকবাবুর কপালে কি অজস্র রেখার জটিল আঁকিবুঁকি। মুখের এখানে ওখানে দু-একটা কাটা-ফাটার চিহ্ন। মাথায় কদিন তেল পড়ে নি জানি না, শুকনো চুলগুলো বালির মতো ঝুরঝুরে পাক ধরেছে। আর, সেই আশ্চর্য চোখ দুটো বন্ধ।
>
> এই অনুভূতিই আমাকে হতবাক করে দিচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি যাঁকে দেখছি, তিনি আজ চোখ বন্ধ করেছেন। সমস্ত বাংলাদেশ যে দুটো চোখকে ভয় করত, শ্রদ্ধা করত, ভয় আর

শ্রদ্ধা — সেই চোখজোড়ার পাতা এখন নামানো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অথচ তাঁর চোখে দৃষ্টি নেই, হাতে সামর্থ্য নেই এ কী বিস্ময়। ...

অক্সিজেনের সিলিন্ডারটা খাটের তলায় শুইয়ে নড়াচড়ায় যাতে পড়ে না যায় তাই এক টুকরো প্লাস্টার দিয়ে নলটা গলার ওপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ডান হাতটা অস্থিরভাবে নাড়ছেন। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে কাতর শব্দ বেরুচ্ছে যার কোনো ভাষা নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে। আমি ভেঙে পড়িনি। সেই চতুষ্কোণ খাটে শোয়ানো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি দেখছিলাম বাংলাদেশের চিহ্ন।...

আসার পথে কি দেখেছি ? দেশবন্ধুর কোমার্যব্রতী শিষ্য বিধান রায়ের আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বামপন্থীদের বৃহৎ নির্বাচনী সভা, রাস্তার দেয়ালে হাঙ্গেরীর গোলযোগের ওপর উত্তেজিত পোস্টার, কলেজ স্ট্রীটে সারবাঁধা বইয়ের দোকান, সিনেমা হলের সামনে লম্বা লাইন আর পুলিশ। কি শুনেছি ? দক্ষিণেশ্বরগামী কিছু বাসযাত্রীর পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, খাবারের দোকান বা চায়ের স্টল থেকে হঠাৎ ছিটকে আসা দু-এক কলি চটুল বা গম্ভীর গানের সুর।

যা দেখেছি আর শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে, যিনি এখন চোখ বুজে। যা দেখেছি আর যা শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে, যাঁর ডান হাতটা দুর্বলভাবে উঠছে আর নামছে। যা দেখতে আর শুনতে হয়েছে, সেই বিচিত্র পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে যিনি মরে যাচ্ছেন।

বোবার গানের মতো এই একটা কথা বার বার আমার মনে জান্তব আর্তনাদের আঁচড় কাটছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন।

কি চিকিৎসা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাচ্ছি টেবিলে ওষুধের শিশি কটা দেখে। কি পথ্যি তিনি পেয়েছেন, তার প্রমাণ মিলেছে বৌদির মুখের অসতর্ক একটি কথায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানিকবাবুর স্ত্রীকে অভিযোগ করে বলেছিলেন : এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেন নি কেন ? উত্তরে তাঁকে হাসতে হয়েছিল। আর তারপর অস্ফুটে বলে ফেলেছিলেন: তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই। — মৃত্যুকালে বাংলাদেশ তাঁকে কি মর্যাদা দিল, তারও প্রমাণ আমরা বাইরের সাতটি মানুষ। অথচ নাকি লেখক, পাঠক এবং কৃষ্টি-কলার পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় আমরাই ভারতবর্ষে অগ্রণী। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি!

মিউনিসিপ্যালিটির ভাঙা এ্যাম্বুলেন্স এল। যে মানুষটাকে খাট থেকে নামালে হার্ট ফেল করার সম্ভাবনা, তাঁকে এই গাড়িতেই নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাভাবে ভাল গাড়ি আর মুরুব্বির অভাবে বড় হাসপাতালে ব্যবস্থা করা যায়নি। কলকাতার পথে পথে অসহায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নাকি এখনও একটি পরশপাথরের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকসান দিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র আমার জানা নেই। অচৈতন্য মানুষের যন্ত্রণাবোধ আছে কিনা জানিনে। কিন্তু দেখলাম হাতের ওপর স্পিরিটমাখা তুলো ঘষতেই মানিকবাবু অল্প চোখ মেললেন। বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। কথা, না গলার ঘড়ঘড়ানি

তা বুঝলাম না। ইনজেকসান দেবার সময় ব্যথায় তাঁর সমস্ত শরীরটা মুচড়ে উঠল। চোখ দুটো খুললেন। তাতে যেন কিছুটা ভয়, কিছু বেদনা। ভয় আর বেদনা। তারপর ধরাধরি করে যখন তাঁকে স্ট্রেচারে তোলা হল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকিয়েছেন। তাঁর চোখ, গলা আর হাতের মিলিত অভিব্যক্তিতে আমার মনে হল, তিনি প্রতিবাদ করছেন। বাড়ি ছেড়ে যেতে কিংবা শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের সাতটি মানুষের সহায়তা গ্রহণ করতে।

প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মেঝেতে স্ট্রেচারের ওপর তিনি শুয়ে। মাথার কাছে আমি। বুকের ওপর ঝুঁকে ডাক্তারবাবু। তাঁকে সমস্ত পথ পাল্‌স দেখতে হবে। বরানগরের দুটি তরুণ শক্ত করে অক্সিজেনের সিলিন্ডার ধরে। দরজার কাছে বেঞ্চির ওপর বসে আছেন বৌদি এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বৌদির হাতে চীনেমাটির সেই জলের পাত্রটা।...

ড্রাইভারকে আস্তে চালাতে বলা ছিল। আস্তে আর সাবধানে। অথচ গাড়িটা প্রায় বাতিলের পর্যায়ে পড়ে। রাস্তাও খারাপ। থেকে থেকে ঝাঁকুনি লাগছে। সকলে এক-একবার চমকে মানিকবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

মৃত্যুর এতো কাছে এর আগে আমি আসিনি। আমার শরীর মন এবং অনুভূতির ওপর এতো চাপও কখনো পড়েনি। হাঁটু গেড়ে বসে দুটো হাত তাঁর কপাল, গাল, কখনো গলার খাঁজে শক্ত করে ছুঁইয়ে রেখেছিলাম। শুশ্রূষার আবেগে নয়, তিনি বেঁচে আছেন আর শরীরটা এখনো গরম — শুধু একটু উপলব্ধির স্বস্তি পাবার জন্য।

বরানগর থেকে মৌলালি। কী দীর্ঘ সেই যাত্রা আর কী ভয়ংকর! স্পষ্ট বুঝছিলাম আস্তে আস্তে তাঁর জ্বরতপ্ত শরীরের উত্তাপ কমছে। আর আহা, আমি বুঝছিলাম তিনি মরে যাচ্ছেন।...

হাতটা আর নাড়াচ্ছেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত নিশ্চল হয়ে গেছে। শুধু মুখটা মাঝে মাঝে হাঁ করছেন নিশ্বাস নেবার অস্থির চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করছেন। কিছু কি বলছেন ? কান পেতে শুনলাম — নাঃ, নাঃ। কি না, কেন না, আমি জানি না। আমি জানি না। কিন্তু হাসপাতালে পৌছবার আগে আরও কয়েকবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একইভাবে বলেছেন — নাঃ, নাঃ।

গাড়ি ততক্ষণে বি. টি. রোডের মাঝামাঝি এসেছে। কানের পাশের শিরায় নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়, এ আমি দেখছি। কিন্তু পাগলের মতো হাতড়েও মানিকবাবুর সেই শিরাটা খুঁজে পেলাম না। ডাক্তারকে বললাম, গাড়ি থামিয়ে পাল্‌স্‌টা একবার দেখুন।

ডাক্তারবাবু পাল্‌স দেখলেন। তারপর হাতল ঘুরিয়ে সিলিন্ডারে অক্সিজেনের চাপটা বাড়িয়ে দিলেন। বৌদির হাত থেকে জলের পাত্রটা চেয়ে মানিকবাবুর নাকের নল টেনে বার করে তার ভেতর চেপে ধরলেন। কি পরীক্ষা করলেন জানি না, শুধু দেখলাম জলের ভেতর মৃদু শব্দে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। আর ততক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রশ্বাসের আকুলতায় বুদ্বুদ হয়ে উঠেছেন।

আবার গাড়ি ছাড়ল। মাঝে মাঝে বৌদির দিকে তাকাচ্ছিলাম। পাথরের মূর্তির মতো বসে। চোখে মুখে ভাবাবেগের কোন চিহ্ন নেই। এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

এমনকি একটিবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না। আমার কেমন যেন ভয় করছিল। ভয় আর অস্বস্তি।

মাঝে মাঝে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বৌদির সঙ্গে নীচু গলায় হয়তো দুটো কথা বললেন। চোরের মতো একটিবার মানিকবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।...

তারপর শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। অনেক আলো, অনেক ভিড়, অজস্র কোলাহল। আলো আর ভিড় আর কোলাহল। কফি হাউস, কাগজের স্টল, নিয়ন আলোয় কিসের যেন বর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন। হাত দেখিয়ে ট্রাফিক পুলিশ আমাদের সামনের কয়েকটা গাড়ির গতি রুদ্ধ করল। পাঁচ রাস্তার মোড়ের গোল চত্বরটার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময় আমার মনে, এই পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। তার ভেতর এশিয়া একটি মহাদেশ। তার বুকে ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তার কোলে শহর কলকাতা — যার ইতিহাস আছে, ইতিহাস আর ঐতিহ্য; এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পর মানুষের সভ্যতার বয়েস হয়েছে এক হাজার নশো ছাপ্পান্ন বছর। আর আমার অসহায় দুটো হাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে, গালে, গলায় এই মুহূর্তে উত্তাপ খুঁজছে।

আবার বিশ্রী ঝাঁকুনি শুরু হল। এই ঐতিহাসিক নগরীর সার্কুলার রোড রাস্তাটি এত কদর্য, কোনোদিন তা নজর করে দেখার প্রয়োজন হয়নি। এঁকে বেঁকে ট্রাম লাইন গেছে। লাইনের ফাঁকের ইট অসমান। ঝাকুনির প্রকৃতি দেখে আকৃতি আন্দাজ করছিলাম। আমার সমস্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শেষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, আর উপায় নেই। আর থেকে থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই সুরে অস্ফুটে আর্তনাদ করে বলে উঠছিলেন — নাঃ, নাঃ।

গাড়ি যখন হাসপাতালে পৌঁছল, তখন মানিকবাবুর মুখও বন্ধ হয়েছে আর তিনি কথা বলেন নি। শুধু মনে আছে এমার্জেন্সীর টেবিলে পরীক্ষার পর যখন স্ট্রেচারে করে তাঁকে উডবার্নে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ চোখের কোণ থেকে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। মানিকবাবুর কান্না! সমুদ্রের স্বাদ কিনা জানি নে।...

আর মনে আছে তার কিছু পরে উডবার্ণের বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেছিলেন : দু'দিন আগে যদি আনা যেত, তাহলে হয়তো মানুষটা বেঁচেও যেতে পারতেন।

মনে হল বৌদি সব বুঝতে পারছেন। আমার কাছ থেকে চশমাটা চেয়ে নিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাপসুদ্ধ চশমাটা তিনি আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর আশা ছিল হাসপাতালে মানিকবাবু সেরে উঠবেন। তারপর আবার চশমাটা পরে সেই আশ্চর্য চোখ দুটো মেলে তাকাবেন পৃথিবীর দিকে। হয়তো।...

পালঙ্কসুদ্ধ ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হয়, তখন একটা চোখ খোলা, একটা বন্ধ। ঠোঁটের এক পাশ একটু যেন চাপা। একা ঠিক হাসির ভঙ্গী নয়। কিন্তু আমার মনে আছে —

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির কয়েকটা ধরন ছিল। তা ছাড়া আধখোলা ডান চোখটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন ডান দিকের ঠোঁটে একটু চাপা হাসি।

শরীরের উপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপছে পড়ছে দু'পাশে। হু হু করে হাওয়া বইছে আর ধনুচির ধোঁয়া জটিল রেখাচিত্রের মতো পাক খেয়ে চারপাশে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আজকে ঝাঁকুনি লাগলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু লাগবে না। ট্রাকটা বড়, বড় আর পোক্ত। মধ্যিখানে সুদৃশ্য পালঙ্কের ওপর সেই মৃতদেহ। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা, সাহিত্যিক! সামনে, পেছনে, দু'পাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভিড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না, কিছু ছিল না।

বাংলাদেশটাকে আমি বুঝতে পারি না। হাত বাড়িয়ে বার বার ফুল নিচ্ছিলাম আর অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। দেশের জ্ঞানী, গুণী আর সাধারণ মানুষের এই শোক, এই আবেগ যে কতো অকৃত্রিম, তা আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝছি। কাল এমন সময় এ্যাম্বুলেন্সে বসে বাংলাদেশকে আমি ঘৃণা করেছিলাম। আজ তাকে কি বলবো ? কাল কাঁদিনি, এখন আমার চোখে জল এল।

হঠাৎ গোপাল হালদার আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। ফুলের ভারে দামী পালঙ্কের একটি পায়ে ফাটল ধরছে। ভেঙে ভেতরের পেরেকটা অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো খাটটার কথা মনে পড়ল।...

হঠাৎ হাসি পেল। কাল এমনি সময় একটা ভাঙ্গা গাড়ির বুকে বসে একটা জীয়ন্ত শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করছিলাম। আজ একটা পোক্ত গাড়ির বুকে দাঁড়িয়ে একটা ভাঙা পালঙ্কের আয়ু সামলাচ্ছি।

আজ কপালে ঘাম নেই, একটু যেন শীতও করছে। রাত হয়েছে। আজও দীর্ঘ পথের যাত্রা থেমে থেমে। তবে বরানগর থেকে মৌলালির হাসপাতাল নয়। মৌলালি থেকেই নিমতলার শ্মশানঘাট।[১]

৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) সোমবার ভোর সাড়ে চারটেয় তিনি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বহুলোক হাসপাতালে তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে আসেন। বেলা প্রায় দশটার সময় মানিকের নশ্বর দেহ পুষ্পে সজ্জিত করে লোয়ার সার্কুলার রোডে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে বিকেলে হাজার হাজার গুণমুগ্ধ মানুষের বিরাট শোকযাত্রা সহকারে তাঁর দেহ *স্বাধীনতা* পত্রিকার অফিস, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি পরিষদ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, রাজ্য কৃষক সভা অফিস ও ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী সংঘের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দিন বিকেল ৪ টায় বিরাট শোক মিছিল বের হয় এবং নিমতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।[২]

গ্রন্থ প্রকাশ: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *হলুদ নদী সবুজ বন*, জুন মাসে প্রকাশিত হয় গল্পসংকলন *স্বনির্বাচিত গল্প*, অক্টোবরে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *মাশুল*। চেক ভাষায় মানিকের রচনা সংকলন প্রকাশিত হয় — *OPIUM, A JINE POUIDKY.*

উপন্যাস-১ : হলুদ নদী সবুজ বন

এটি মানিকের বত্রিশতম উপন্যাস এবং একান্নতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশকাল মাঘ ১৩৬২, প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ২৬৪, মূল্য চার টাকা।[৩]

মানিকের সাহিত্যে তাঁর আ-জীবনের সংগ্রাম ও সংগ্রামী চেতনা প্রতিফলিত। জীবনের শেষলগ্নে এসে প্রবল দারিদ্র্যতা ও অসুস্থতার ফলে জীবনের সমস্ত আত্মবিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনটা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী যে আর থাকছেনা, সে কথা ডায়েরিতে লিখেছেন। তবুও সেই প্রতিকূলতাকে অনেকখানি অতিক্রম করে তিনি সৃজনকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাসটি মানিক রচনা করেছিলেন সম্পূর্ণ অসুস্থ অবস্থায়। শরীর খারাপ থাকায় উপন্যাসটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাই প্রকাশিত হতে অনেক দেরি হয়েছে। এসব তথ্য আমরা তাঁর ডায়েরি থেকে পাই। অসুস্থ ও দুর্বল শরীর নিয়েও তিনি সাহিত্য রচনার মতো পরিশ্রম করে চলেছেন, কেননা সংসারে অভাব ছিল এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল অনেকবেশি। তাই এই পর্বের সমস্ত রচনার মধ্যেই শৈথিল্য এবং অপরিকল্পিত চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে রয়েছে নদী ও অরণ্যের প্রকৃতি লালিত ক্যানভাসে। হলুদ নদী আর সবুজ বনের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কয়েকটি গ্রাম, গ্রামের কিছু মানুষ, তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসুস্থতা এবং বেঁচে থাকার ও বেঁচে ওঠার তীব্র লড়াই। আর ঠিক তার বিপরীতে ওৎ পেতে আছে আধুনিক সভ্যতার উদগ্র, নির্মম ও চতুর শিকারী মানুষের দল। উপন্যাসের সূচনাংশে রয়েছে এই বৈপরিত্যের আভাস —

> আকাশে অষ্টমীর চাঁদ একপাশে হেলে পড়ে আছে। পৃথিবীতে তাই আবছা আঁধার। এই আঁধার চোখ মেলে দেখা যায়। সব জীবন্ত প্রাণীর চোখে এই মজার ধাঁধা — খাঁটি অন্ধকার দেখার সাধ্য নেই। একটু আলো চাই। আঁধার একটু আবছা হওয়া চাই। নইলে চোখ টের পাবে না। অন্ধকারে একেবারেই অন্ধ হয়ে থাকবে।
>
> এখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গিয়েছে।
>
> রাত্রি কিন্তু নিঝুম হয়নি। রাত্তিরে পাখি ও পশুর আওয়াজ ঘুমন্ত পৃথিবীতে প্রাণের সাড়া তুলছে, বিচিত্র সে আওয়াজ — মধুর ও কর্কশ।
>
> ওদের যেন জগৎ সংসারকে জানিয়ে দেওয়ার দায় যে, প্রাণীরা রাত্রির অবসরে একটু শুধু ঘুমিয়েছে, তারা মরেনি, তারা আবার জাগবে।

> হঠাৎ প্রায় একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে কয়েকটা বন্দুক একসাথে। এমনভাবে মিশে যায় আওয়াজ যে, আন্দাজ করা কঠিন হয় কটা বন্দুক গর্জন করেছে।[৪]

বন্দুকের গর্জন হত্যা করেছে একটি অত্যাচারী বাঘকে। এর কৃতিত্ব গ্রামবাসী ঈশ্বরের। কিন্তু তাকে ভয় দেখিয়ে এবং পয়সা দিয়ে কৃতিত্বের অধিকারী হতে চায় কারখানার মালিক শ্রেণি প্রভাস ও রবার্টসন। হত দরিদ্র ঈশ্বর অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বিক্রিত হতে হয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী সম্প্রদায় ঈশ্বরের মতো দরিদ্র মানুষগুলিকে নিঙড়ে নেয়। ঈশ্বর যখন বন্দুক হাতে নিয়ে প্রভাসের মেহফিল পাহারা দেয়, তখন তার বাড়ির ভাঙা বেড়া দিয়ে শিশু পুত্রকে শেয়ালে টেনে নিয়ে যায়। বাঘ মারার কৃতিত্বের দাবি নিয়ে প্রভাস ও রবার্টসনের ঝামেলার মাঝখানে পড়ে ঈশ্বরের চাকরি যায়। সে মার খায়, তার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে গ্রামের অন্যান্য মানুষেরা। তারা একসঙ্গে প্রতিবাদ করে। এখানে মানিক শ্রেণিশোষণের চিত্র এবং শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টান্ত দেখাতে চেয়েছেন। তবে কাহিনি সুপরিকল্পিত নয়।

এই উপন্যাসে সমকালীন উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মদ্যপান, ক্লাব সংস্কৃতি, প্রেম-সম্পর্ক ও লোভ লালসার ক্ষুধার্ত রূপকে উন্মোচনের প্রয়াস রয়েছে। পাশাপাশি গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলির জীবনযাপনের দৈনন্দিন অভাব অনটনের নগ্ন বাস্তবতাকেও প্রকাশ করতে চেয়েছেন লেখক। এই উভয় শ্রেণির দ্বন্দ্বে এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটে শ্রেণিসংগ্রামের চিত্রটি আরো জোরালো হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা উপন্যাসের কাহিনিতে তেমন করে দানা বাঁধেনি। উপন্যাসে লখার মা চরিত্রটি অত্যন্ত সজীব ও আদর্শায়িত। গ্রাম্য লোকসমাজে জীবনের নানা ঘটনার কথকতা গান গেয়ে বেড়ায় সে। আনন্দের জন্য সে তার সংস্কৃতিতে আধুনিক সমাজের কাছে বিক্রি করতে চায়না অর্থের বিনিময়ে। মানিকের ব্যক্তিগত জীবন ভাবনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

> সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়েই তার আনন্দ। এ যেন মানিকেরই জীবন। তিনি যখন চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন তখন ডা: বিধান রায় তাঁকে বড় চাকুরি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে শিল্পীর স্বাধীনতা নষ্ট হবে বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৫]

ব্যক্তি মানিক চিরকালই তাঁর রচনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতেন। মার্কসীয় দর্শনে প্রত্যয় থেকে তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে একদিন সবকিছু শুভাশুভ হয়ে উঠবে, তেমনই আশ্বাসবাণী শোনা যায় উপন্যাসের শেষ বাক্যে লখার মা'র মুখে: "মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক আর ভূমিকম্প হোক।"[৬]

মিম্নবর্গের জীবন চিত্রায়ণে যে মমতা ও নৈকট্য এখানে প্রকাশিত তা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অতুলনীয়। মার্কসবাদী চিন্তা চেতনার প্রভাব যতই সুস্পষ্ট হোক, মধ্যবিত্ত রোমাণ্টিকতার স্পর্শ এড়িয়ে জীবনের অন্ধকারকে শুধুই অন্ধকার বলে বর্ণনা করার এবং পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতার

মুখোশ খুলে ধরার এই সাহস মানিকের যেকোন সৃষ্টিকে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে উঠে এক অন্য মর্যাদার আসন দেয়। বিশেষত তাঁর সময়ে, যখন সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মূল্যবোধের এক গভীরতর অসুখ, তখন মানুষের দিকে তাঁর এই মমত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, শুধু লেখক নয়, এক প্রকৃত মানুষী চেতনার পরিচয়।

উপন্যাস-২ : মাশুল

এটি মানিকের তেত্রিশতম উপন্যাস এবং বাহান্নতম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৬৩, প্রকাশক সাহিত্যজগৎ, কলকাতা। পৃষ্ঠা ২ + ২১৪, মূল্য সাড়ে তিন টাকা। মানিকের জীবনকালে এটি প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাস প্রকাশের মাত্র দু মাস পরে মানিকের জীবনাবসান ঘটে।[৭]

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকজন যুবক-যুবতীর পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে কতগুলি ভুলের মাশুল কিভাবে দিতে হয়, তা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। জীবনকে তার সামগ্রিকতার মধ্যে স্থাপন করে ভাবতে না পারলে অনেক সময় কোথাও কোথাও মারাত্মক ভুল হয়ে যায় এবং সেই ভুল মানুষের চিন্তায়, চেতনায় নিয়ে আসে বড় রকমের অসহায়তা। তখন সেই ভুলের মাশুল সারাজীবন ধরে আমাদেরকে দিতে হয়। দুটি বন্ধু পরিবারের একটি মেয়ে রাণি এবং একটি ছেলে সাধনকে নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে। সাধন এবং রাণির মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে ভালোবাসা জন্মায়, কিন্তু তাদের বাড়ির লোকেরা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তখন তারা ঠিক করে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করবে দুজনেই। আফিম আনবার কথা ছিল রাণির, রাণি সাধনকে মরতে দিতে চায়না, সেইজন্য সে নিজের জন্য আফিমের বড়ি আনে আর সাধনের জন্য খয়েরের বড়ি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা উলটে যায়। সাধন খায় আফিমের বড়ি এবং তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠলে রাণি লোকজন ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এই ভুলের মাশুল রাণিকে অনেকদিন ধরে দিতে হয়েছিল। সাধন মনে করল রাণি তাকে মেরে ফেলে নিজে বাঁচতে চেয়েছিল, তাই তাদের সম্পর্ক একেবারে ভেঙে গেল। শেষপর্যন্ত মমতা ও রাণির অনেক চেষ্টায় সাধন আসল সত্যটা বুঝতে পারে এবং রাণিকে বিবাহ করতে রাজি হয়। এই উপন্যাসে অনেকগুলি মানুষের ভিড় আছে। অনেকগুলি চরিত্রকে তাদের জীবনে নানারকম ভুলের মাশুল দিতে হয়। এটা সংসারের অতি সাধারণ নিয়ম। এই বার্তা রেখে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে।

উপন্যাস-৩ : প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান

এটি মানিকের চৌত্রিশতম উপন্যাস এবং তিপ্পান্নতম মুদ্রিত গ্রন্থ। লেখকের জীবনাবসানের পর প্রকাশিত এটি প্রথম গ্রন্থ। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠ ৪ + ১৮০, মূল্য দু টাকা।[৮]

এই উপন্যাসটি পৌষ ১৩৬৩ সংখ্যার *উল্টোরথ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণেশ্বর উপন্যাসের পরিবর্তিত রূপ। অসুস্থ শরীরে লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ে উপন্যাসটির রচনা মানিক অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রাণেরশ্বর চরিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে দুটি পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনি এই উপন্যাসের বিষয়। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রী রামনাথ দেব শর্মার একমাত্র পুত্র প্রাণেশ্বর। তার জন্মলগ্নে তার মা সরলা অনেক কষ্ট পেয়েছিল। সরলার পাশের বেডে ছিল, মণিমালা নামের এক নারী। এই মণিমালার স্নেহ-যত্নে সদ্য ভূমিষ্ঠ প্রাণেশ্বর সেদিন বেঁচে উঠেছিল। সেই থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। প্রাণেশ্বর মণিমালাকে ডাকত মণিমা বলে। শিশুকাল থেকেই প্রাণেশ্বর ছিল মেধাবী। পিতার অকাল মৃত্যুতে ডাক্তারী পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রাণেশ্বরকে সংসারের গুরু দায়িত্ব নিতে হয়। মণিমালাদের সংসারেও আসে নানারকম বিপর্যয়। প্রাণেশ্বর যথাসাধ্য মতো মণিমালার সংসারেও সাহায্য করে। দুটি সংসারের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রাণেশ্বর তার আদর্শের সঙ্গে আপোশ করেনা। সে একটি ঔষুধ দোকান খুলতে চায়, যেখানে ভেজাল ওষুধ নিষিদ্ধ। সে জানে সারা দুনিয়াতে ভেজাল চলছে কিন্তু সে এও জানে সবটাই জাল হলে এই দুনিয়াটা চলতনা। সে জানে ফাঁকি দিয়ে জগৎ চলেনা। ঘরোয়া পারিবারিক কাহিনির মধ্যেই উপন্যাসটি হঠাৎ করে সমাপ্ত হয়েছে। চরিত্র এবং কাহিনির সন্নিবেশনে পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। সম্ভবত লেখকের অসুস্থতাই এই জন্য দায়ী। তবুও এই দুর্বল কাহিনিবৃত্তের মধ্য দিয়েই মানিক তার আদর্শবাদী সংগ্রামী চেতনাকে প্রকাশ করেছেন প্রাণেশ্বর চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক এবং একটি দুটি সন্ধ্যা', *মানিক বিচিত্রা,* সম্পা - বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম, পৃপৃ. ১৭২-১৭৮।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য,* গ্রন্থালয়, ২০০৪, পৃ. ১৫০।

৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র,* ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ. ৬৩০।

৪. 'হলুদ নদী সবুজ বন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১০ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১।

৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১০ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩১।

৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র,* ১০ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানিকের মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত রচনা

মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত রচনা

উপন্যাস

১ : মাটি-ঘেঁষা মানুষ

মাটি ঘেঁষা মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুয়ান্নতম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং পঁয়ত্রিশতম উপন্যাস। লেখকের জীবনাবসানের পর প্রকাশিত দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৬। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০ + ১৩৪, মূল্য আড়াই টাকা।[১]

মৃত্যুর কিছু পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় মানিক এই উপন্যাসটি রচনা করেন। অসুস্থতার কারণে উপন্যাসটির রচনাকার্যে বারবার ছেদ পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি উপন্যাসটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। এইসব কারণে সম্ভবত উপন্যাসটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতি থেকেছে। মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় উপন্যাসটি *একটি চাষীর মেয়ে* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রকাশের ক্ষেত্রে বারবার ছেদ পড়ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে উপন্যাসটিতে প্রকাশকের যে নিবেদন যুক্ত হয়েছিল তা এরকম —

> অনিয়মিতভাবে মানিকবাবু *মাটি ঘেঁষা মানুষের* কিস্তি লিখে দিচ্ছিলেন এবং সেই অনুসারে তা ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উপন্যাস তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। অসম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করা চলে না। মুদ্রিত অংশ নষ্ট করাও সম্ভব নয়। তাই *মাটি ঘেঁষা মানুষ* সম্পূর্ণ করে দিলেন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।[২]

একটি চাষীর মেয়ে নামে মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় যে উপন্যাসটি ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল তার উপসংহার অংশটি লেখক *কুলির বৌ* নামে স্বতন্ত্রভাবে লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার পরবর্তী অংশ সুধীরঞ্জনের রচনা। কিন্তু মানিক কোথায় শেষ করেছেন, আর কোথায় সুধীরঞ্জন শুরু করেছেন তা উল্লেখ নেই। অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে রেবতী কিভাবে সংগ্রামী কুলীর বৌ-এ রূপান্তরিত হল — এই উপন্যাসের কাহিনিতে তা দেখানো হয়েছে। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের শ্রেণিচেতনার পরিচয় মানিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বর্তমান আখ্যানে।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কৃষক পরিবারের মেয়ে রেবতী। কারখানার শ্রমিক গোবিন্দকে সাপে কামড়ালে লোকলজ্জা, ভয়, জড়তা ভুলে নিজের জীবন বিপন্ন করে রেবতী অচেনা যুবক গোবিন্দের পায়ে মুখ দিয়ে সাপের বিষ টেনে ফেলে দেয় এবং গোবিন্দ বেঁচে যায়। রেবতীর এই রকম আচরণে তার বাড়ির লোক লজ্জিত এবং আশঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, চারিদিকে মেয়ের নামে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু হয় উলটোটা। নিন্দে হয়তো কেউ কেউ করেছে কিন্তু প্রশংসা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি, চারিদিকে রেবতীর সাহসিকতার খবর ছড়িয়ে পড়ে, সবাই তাকে সাধুবাদ জানায়। সাহসিকতার

জন্য রেবতীকে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা সংবর্ধনা দেয়। এইসব ঘটনায় রেবতী ভীষণ খুশি হয় এবং সামাজিক স্রোতের মধ্যে এসে পড়ে তার মধ্যে কিছু রূপান্তর দেখা যায়। রেবতীকে কেবল আত্মসুখে তৃপ্ত করে না রেখে লেখক তাকে কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনায় দীক্ষিত করেছেন।

গ্রামের লম্পট জমিদারের নজর এসে পড়ে রেবতীর উপর। বাড়ির লোক তাকে রক্ষার জন্য দূরে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে গিয়েও রেবতী সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যে কৃষক আন্দোলনে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। রেবতী গ্রামের মহিলাদের সচেতন করে তোলার কাজে সক্রিয় থাকে। ইতিমধ্যে রেবতীর মামীর মধ্যস্থতায় গোবিন্দ ও রেবতীর মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং বিবাহ হয়। বিবাহের দিনেই কারখানায় গন্ডগোল বাঁধে এবং গোবিন্দ আহত হয়। সেইসঙ্গে গোবিন্দের কাজও চলে যায়। এই অবস্থায় গোবিন্দের জীবন সংগ্রাম আরো কঠিন হয়ে পড়ে। চারিদিকের অবস্থা সম্পর্কে মানিক জানিয়েছেন —

> দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বড়োই এখন অসময়। কাজ নেই বলে গোবিন্দের একার নয় সকলের অবস্থাই কাহিল। নিজেকে এবং অন্য যাদের বাঁচিয়ে রাখার ভার আগে থেকেই ঘাড়ে চাপানোই ছিল, সে দায় পালন করতেই প্রাণান্ত। কোনো মতে মরণ ঠেকিয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা।
>
> নতুন দায়, তাই সাধ করে নেওয়া যায় না এবং রেবতীকে বিয়ে করা মানেই তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়টা গোবিন্দের কাঁধে চাপা। গোবিন্দ পিছিয়ে দিয়েছে বিয়ের দিন— অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পিছিয়ে দিয়েছে। কে জানে, কবে শেষ হবে এই আকাল আর তার বেকারের দুর্ভোগ।— কবে তার বিয়ে করার সামর্থ ফিরে আসবে![৩]

বিয়ে করে রেবতীকে ঘরে আনে গোবিন্দ। রেবতী ছিল চাষীর মেয়ে, হল কুলীর বৌ। শহরের বস্তিতে যেখানে কুলী-মজুর-শ্রমিকরা থাকে সেরকম একটি বস্তিতে এসে পড়ে রেবতী দিশেহারা হয়ে পড়ে। "প্রথমটা রেবতী সত্যই দিশেহারা হয়ে যায়। এমন গাদাগাদি করে এতটুকু ছোটো ছোটো ঘরে এত রকমের মানুষ বাস করে! রান্না-বান্না, শোয়া-বসা, ঘুমানো সবকিছু। রাস্তার কল থেকে মারামারি করে তোলা জল এনে চালানো।"[৪]

বস্তিতে নানা রকমের নানা জাতের নানা জায়গার মানুষ দেখে অবাক হয়ে যায় রেবতী। মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, কর্ণাটক আরো অনেক প্রদেশ থেকে শুরু করে পূর্ব-বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম, আসামের মেয়ে-পুরুষ এই বস্তিতে ঠাঁই নিয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি উপন্যাসটির কাহিনিতে পরিকল্পনার অভাব ছিলই। দারিদ্র্যের তাড়নায় অসুস্থ অবস্থাতেও মানিককে লিখতে হচ্ছিল নানান লেখা। কিন্তু এ লেখাগুলির মধ্যে লেখকের প্রতিভার দীপ্তি অনেকখানি ম্লান। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমরা তা লক্ষ্য করি। তবে পঞ্চাশের দশকের গ্রাম ও শহরের আংশিক ছবি, দেশব্যাপী মন্দা, দারিদ্র্যতা, শহরের বস্তিবাসী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতিকে মানিক মরমী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

২ : শান্তিলতা

এটি মানিকের ছাপান্নতম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং সাঁইত্রিশতম উপন্যাস। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এটি তাঁর চতুর্থ প্রকাশিত গ্রন্থ। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৬৭ তে, প্রকাশক সাহিত্যজগৎ, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৪ + ১৬ + ৮৭, মূল্য আড়াই টাকা। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের কিছু পূর্বে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে শারদীয় *এলোমেলো* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫]

উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গোপাল হালদার রচিত একটি ভূমিকা একই সঙ্গে সংযোজিত হয়, যা *পরিচয়* পত্রিকা মানিক স্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। *শান্তিলতা* উপন্যাসের কাহিনি শান্তিলতা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শান্তিলতা বস্তিতে থাকে, নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হলেও শান্তিলতা লেখাপড়া জানে। সমাজ ও চারপাশের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন। বস্তির আর এক বাসিন্দা বিমল। যে শান্তিলতাকে গল্প উপন্যাসের বই পড়তে দেয়, রাজনীতি ও শ্রেণিচেতনা সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। শান্তিলতার দেহের আকর্ষণে মুগ্ধ হয় তার বাবার বন্ধুর পুত্র সুখেন্দু। সুখেন্দুকে শান্তিলতার প্রথম দিকে পছন্দ না হলেও সুখেন্দুর সঙ্গে শান্তিলতার বিবাহ হয়। বিয়ের পর শান্তিলতাকে সুখেন্দু ভীষণ নির্যাতন করলেও শান্তিলতা কোনো প্রতিবাদ করেনা। সে সব মুখ বুজে সহ্য করে ধৈর্য ধরে থাকে এবং স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে সুখেন্দুর মনে জায়গা করে নেয়। শান্তিলতা সুখেন্দুকে ক্রমশ এক প্রতিবাদী শ্রমিক চরিত্রে পরিবর্তিত করে তোলে। সুখেন্দু তার কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। মালিকের বিরুদ্ধে সকল শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। কারখানার শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য মালিক পক্ষ গুন্ডাবাহিনীর সাহায্য নেয়। শ্রমিকেরা এই অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ায়।

কায়েমী স্বার্থে অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করতে এবং অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বাড়াবাড়ি আমাদের দেশে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় শোষণের ফলে সাধারণ মানুষ সামান্যতম প্রতিবাদও করতে পারে না। মার্কসিয় দর্শনে আস্থাশীল মানিক এইসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে। মিটিংয়ে, মিছিলে, নানা আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। *শান্তিলতা* উপন্যাস রচনাকালে মানসিক, শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত, অসুস্থ, অসামর্থ মানিক তবুও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নেতিবাচক দিক এবং সাধারণ মানুষের দুর্গতির চিত্র আঁকতে ভোলেননি। তিনি জানিয়েছেন বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবন হোক বা ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন, সংগ্রাম চলতেই থাকে। সেখানেই সংগ্রামী জীবনের সার্থকতা। শান্তিলতা যেমন মিটিংয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী সুখেন্দুকেও শ্রেণিসচেতন ও সংগ্রামী করে তুলেছে। নিজস্ব সাম্যবাদী দর্শন থেকে মানিক সমাজের নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার দেখাতে চেয়েছিলেন, তারই ফলস্বরূপ এই উপন্যাস। দেহে মনে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে মানিক হয়তো এই উপন্যাসটিকে আরো পরিণত করে রচনা করতে পারতেন।

৩ : খুনী

এটি একটি অগ্রন্থিত উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত। মানিক রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে উপন্যাসটি সংকলিত হয়েছে। সেই অর্থে এই উপন্যাসটির গ্রন্থে প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৪১৪। সুনীল কুমার ধর সম্পাদিত *নতুনজীবন* পত্রিকায় উপন্যাসটি পৌষ ১৩৫০ থেকে বৈশাখ ১৩৫২ পর্যন্ত মোট বারো কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।[৬]

এই উপন্যাসটি মোটামুটি একটি সম্পূর্ণ কাহিনি। প্রথম চারটি কিস্তি চলিত ভাষায় এবং পরের কিস্তিগুলি সাধু ভাষায় লিখিত। *হরফ* উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসটির অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মুকুন্দ। সে একটি অফিসে কাজ করত কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তার কাজ নেই। একথা মুকুন্দ স্ত্রী'র কাছে গোপন করে এবং কাজে যাওয়ার নামে রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজ খোঁজার চেষ্টা করেছে। দিনের পর দিন বেকারত্বের জ্বালায় তার মধ্যে দেখা দেয় মানসিক বিকার। স্ত্রীর গহনা বিক্রিকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্যের জেরে উত্তেজিত অবস্থায় মুকুন্দ স্ত্রী কামিনীকে হত্যা করে। মুকুন্দের আগের অফিসের মালিক ধনদাস একটি ছাপাখানা কিনে ব্যবসা শুরু করলে মুকুন্দ আবার কাজে যোগ দেয়। কাজ করতে করতে ধনদাসের শঠতা, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, শোষণ দেখে মুকুন্দের মনে ক্ষোভ জন্মাতে থাকে। চারিদিকে সে দেখতে পায় অজস্র উপায়ে নানা হত্যাকাণ্ড। কেউ রোগের কারণে মরে, কেউ চিকিৎসার অভাবে মরে, কেউ ভুল চিকিৎসায় মারা যায়, কেউ খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে মরে, কারো হয় অকাল মৃত্যু, গোটা দেশ জুড়ে চলেছে অনিবার্য গতিতে মানুষ খুন করার অভিযান। চারিদিকে নানা কারণে মানুষের এত মৃত্যু দেখে মুকুন্দের মাথা ঘুরতে থাকে। উপন্যাসটি সুলিখিত নয়, কাহিনিগত পরিকল্পনার অভাব লক্ষণীয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ে মানিক এ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। নানা রকমের ব্যস্ততা ও অমনযোগের কারণে উপন্যাসটির মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। তবুও মানিক এই উপন্যাসে মানব সমাজের একটি নেতিবাচক দিককে তুলে ধরে তাঁর সমাজ ও সময় সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছেন। জীবনে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সমগ্র সাধনা। বেঁচে থাকার জন্যই চারিদিকে সমস্ত আয়োজন। কিন্তু প্রতিদিন অথবা প্রতিনিয়ত আমাদের চারিদিকে ঘটে চলেছে অজস্র মৃত্যুর ঘটনা। যে সমাজ জীবনকে ধারণ করেছে, সেই সমাজই জীবনকে খুন করে চলেছে। সমাজ ও সভ্যতার এই খুনী চরিত্রটিকে মুকুন্দের অনুভবের মধ্য দিয়ে মানিক তুলে ধরতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। সময় সচেতন মানিক সমাজের এই অবিবেচক রূপটিকে আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যা আমরা এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি। খবরের কাগজে বা সংবাদ চ্যানেলে চোখ রাখলেই আমরা দেখতে পাই মৃত্যুর মিছিল তথা খুনের সমারোহ। জানিনা এই সময়ে জীবিত থাকলে মানিকের মতো সংবেদনশীল শিল্পী কিভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন।

অগ্রন্থিত গল্প

লাজুকলতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে শেষ গল্পগ্রন্থ। কিন্তু মানিকের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরে আরো অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যার কোনো কোনোটি *শ্রেষ্ঠগল্প, উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ, সুনির্বাচিত গল্প, গল্প সংগ্রহ* প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আবার অনেক গল্প এখনো সেইভাবে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত না হওয়া প্রায় বিরাশিটি গল্প পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত মানিক রচনাবলির একাদশ খণ্ডে অগ্রন্থিত গল্প হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। এইসব গল্পগুলি নামি-অনামি পত্রিকায় বেরিয়েছিল, অথচ কোনো বইয়ের মলাটে আসেনি। এই গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি গল্প ছাড়া বেশিরভাগ গল্পই তেমনভাবে জমে ওঠেনি। লেখকের অসুস্থতা ও অমনোযোগ এর কারণ হতে পারে। যেহেতু লেখাই তাঁর জীবিকা ছিল, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রচুর পরিমাণে লেখা লিখতে হতো তাঁকে। তাই হয়তো অনেক লেখা যতটা প্রয়োজনের তাগিদে ততটা মনযোগী হয়ে আসেনি —

> মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হওয়ার পরের সমস্ত গল্পগুলিতে তাঁর বক্তব্যের সহজ মনস্কতা, বলিষ্ঠতা এবং বিশেষ একটি সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আস্থা উচ্চারিত হয়েছে। এই পর্যায়ের যে গল্পগুলি তাঁর তেমন মনযোগ পায়নি সেখানেও গল্পের বক্তব্য যথাযথ, বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত মানবিক, লেখক-জীবনের প্রথম থেকেই মানিক কোনো দিন ভাবালু, রোমান্টিক, সুগোল গল্প লিখতেন না। তাঁর প্রথম জীবন, মধ্য জীবন এবং শেষ জীবনের সমস্ত গল্পগুলিতেই একটি অনাবেগী প্রখর বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সমাজমনস্ক শিল্পী ব্যক্তিত্বকে দেখা যায়। একেবারে শেষ পর্যায়ের এই গল্প গুলিতেও তাঁর সেই নিজস্ব ধরনের শিল্পী ব্যক্তিত্বকে পাওয়া যায়, কিন্তু এই সময়ের অনেক গল্পে মানিকের সেই শৈল্পিক অভিনিবেশকে পাইনা।[৭]

সময়ের অভাব, শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা, সাংসারিক ও মানসিক অশান্তি সহ নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁর লেখার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেও মানিক কিছুটা অর্থ উপার্জনের জন্য, কিছুটা স্বভাবগত ভাবে তাঁর সর্বশক্তিকে সঞ্চয় করে লেখালেখি চালিয়ে গিয়েছেন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যে সময় মানুষের স্নেহ, সেবা, শুশ্রুষা, আরাম, বিশ্রাম প্রয়োজন হয়; সে সময়ও তিনি লেখার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় যে দারিদ্র্য তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন তা তাঁর আজীবনের সঙ্গী হয়েছিল। লেখা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিলনা মানিকের জীবিকা নির্বাহের। লেখালেখির দ্বারা উপার্জিত অর্থই যেহেতু তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল তাই তিনি শরীরকে উপেক্ষা করে রাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখালেখি করতেন। দিনের পর দিন শরীরের উপর এই অত্যাচার কিভাবে তাঁর পরমায়ুকে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে তুলছিল তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাই মাত্র আটচল্লিশ বছরে সীমাবদ্ধ থেকেছে তাঁর আয়ু। মানিক জীবন যুদ্ধের সংগ্রামী সৈনিক, দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তিনি হার না মেনে এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নিয়তির লিখন কে পারে খন্ডাতে! মানিকও পারেননি। নিজের শোচনীয়

পরিণতি যত স্পষ্ট হয়েছে তার কাছে, তত তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। যে আত্মবিশ্বাস ছিল মানিকের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই শেষ বয়সে তিনি অলৌকিক শক্তির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, কেননা তাঁর নিজের হাতের শক্তি হয়ে এসেছিল ক্ষীণ। আর্থিক অনটন, অসুস্থতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যত তিনি বাঁচার চেষ্টা করেছেন, মৃত্যু হয়েছে তত তাঁর নিকটবর্তী। জীবনের শেষ গোধূলী বেলায় তখন তিনি অসহায়, দুর্বল, সংকুচিত, ক্লান্ত, পরাজিত এক সৈনিক। মূলত পত্র-পত্রিকার দাবি মিটিয়ে কিছু উপার্জনের আশায় কখনো কোনো উপন্যাসের প্লট ভেঙে বা কখনো স্বতন্ত্র কিছু গল্প তিনি এই সময় লিখেছেন। শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে অসাধারণ না হলেও, অসংখ্য এই সৃষ্টি সম্ভারে মানিক নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিদায়ী সূর্যের শেষ স্বর্ণ গোধূলী কোনো কোনো গল্পে বিকীর্ণ হলেও, বেশির ভাগ গল্পেই মানিক প্রতিভা দ্যুতিহীন। তবে মানিক সমাজসচেতন শিল্পী ছিলেন। তাঁর সমাজ সচেতনতা সমাজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কোনো এলিট সাহিত্য আড্ডায় ভাষণ দেওয়া নয়। তাঁর সমাজ সচেতনতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত। অন্তিম পর্বের এই গল্পগুলিতে আমরা কিছু না হলেও একজন সমাজ সচেতন হৃদয়বান শিল্পীকে পাই। সে শিল্প হয়তো সার্থক সৃষ্টি হয়নি কিন্তু তাতে শিল্পীর আন্তরিকতার কিছু অভাব নেই।

মানিকের রচনাবলির একাদশ খণ্ডে এই অগ্রন্থিত গল্পগুলি মুদ্রিত হয়েছে। গবেষণা পত্রের খসড়ায় আমরা জানিয়েছিলাম লেখকের মৃত্যু পরবর্তীকালে পাওয়া এই গল্পগুলির একটি তালিকা প্রস্তুতির কাজ আমরা করব। গল্পগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব না হলেও আমরা গল্পগুলির প্রাথমিক প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য এখানে তুলে ধরছি।[৮]

ম্যাজিক	গল্পগুচ্ছ	আশ্বিন ১৩৩৫
শেষ মুহূর্তে	গল্পগুচ্ছ	মাঘ ১৩৩৫
ব্যথার পূজা	বিচিত্রা	ভাদ্র ১৩৩৬
চাপা আগুন	প্রবাসী	চৈত্র ১৩৩৬
তাঁতি-বৌ	উত্তরা	কার্তিক ১৩৩৯
আই সি এর-বৌ	উত্তরা	পৌষ ১৩৩৯
তফাৎ (গল্পের টুকরো)	গল্পলহরী	বৈশাখ ১৩৪০
গাঁদা ফুলের বাগান	গল্পলহরী	আষাঢ় ১৩৪০
তফাৎ	গল্পলহরী	বৈশাখ ১৩৪০
পোষ্টাপিসের পিয়ন ও তার মেয়ে	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৪০
দুর্ঘটনা	পূর্বাশা	চৈত্র ১৩৪০
ভাঙা পুতুলের পা	নবারুণ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১
চোখের জলের দাগ	নবারুণ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

কৌতূহল	নবারুণ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১
জীবিকা	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৪১
বাগ্‌দীপাড়ায় একটি রাত	পাঞ্চজন্য (দৈনিক পত্রিকা)	শারদ ১৩৪২
দিনের পর দিন	বঙ্গশ্রী	মাঘ ১৩৪৩
চাষার বৌ	সচিত্র বর্ষবাণী	বার্ষিক সংখ্যা ১৩৪৬
সঞ্চয়াভিলাষীর অভিমান	আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনা	ফাল্গুন ১৩৪৫
কলহের জের	বৈজয়ন্তী	পৌষ ১৩৪৬
মানুষ কাঁদে কেন	চতুরঙ্গ	চৈত্র ১৩৪৬
প্রতিক্রিয়া	চতুরঙ্গ	চৈত্র ১৩৪৬
গৃহিণী	পত্রিকা	কার্তিক ১৩৩৭
অপর্ণার ভুল	নর-নারী	মাঘ ১৩৪৭
ঘটক	পরিচয়	বৈশাখ ১৩৪৮
ধরাবাঁধা জীবন	নর-নারী	আশ্বিন ১৩৪৮
সন্ধ্যা ও তারা	প্রাঙ্গণ (পাক্ষিক)	মার্চ ১৯৪৪
আধুনিক অতিথি	সঞ্চয়ণ	ফাল্গুন ১৩৫০
কে বাঁচায়, কে বাঁচে	মহামন্বন্তর (গল্পসংকলন) (পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত)	মার্চ ১৯৪৪
জোতদার	সম্প্রতি	শারদ ১৩৫১
আগুনের ফুলকি	রূপ-মঞ্চ	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৫১
সাঁওতাল	নতুন জীবন	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২
কষ্টিপাথর	পূর্বাশা	আষাঢ় ১৩৫২
প্রেমিক	ভারত	শারদ ১৩৫৩
সমানুভূতি	গল্পভারতী	শারদ ১৩৫৩
চৈতালী আশা	রবিবাসরীয় স্বাধীনতা	২০ এপ্রিল ১৯৪৭
গলায় দড়ির কেন	মেঘনা (সাহিত্য সংকলন)	বৈশাখ ১৩৫৪
দলপতি	দ্বন্দ্ব	শারদ ১৩৫৪
বাঘের বংশরক্ষা	হিন্দুস্থান	শারদ ১৩৫৪
রফা ও দফার কাহিনী	সোনার তরী	(?) ১৬৫৫/৫৬
ডুবুরী	ইস্পাত	আষাঢ় ১৩৫৬
নেতা	অভিধারা	শারদ ১৩৫৬
বিচার	পরিচয়	ফাল্গুন ১৩৫৬
উপায়	পরিচয়	শারদ
কালোবাজারে প্রেমের দর	ছাড়পত্র	শারদ ১৩৫৭

বন্ধু	সাহিত্য সংকলন	(১৩৫৭) প্রথম পর্যায় ১৯৫০
ভীরু	সত্যযুগ	শারদ ১৩৫৭
দুটি যাত্রী	সচিত্র বর্ষবাণী	(?) ১৩৫৭
শারদীয়া	বসুমতী	শারদ ১৩৫৮
সবার আগে চাই	শান্তির স্বাক্ষর (সংকলন গ্রন্থ)	এপ্রিল ১৯৫২ (১৩৫৯)
ভোঁতা	বসুমতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯
গেঁয়ো	মুখপত্র	আষাঢ় ১৩৫৯
কোন দিকে ?	বসুমতি	শারদ ১৩৫৯
রূপান্তর	গল্প-ভারতী	শারদ ১৩৫৯
শিল্পী	পরিচয়	শারদ ১৩৫৯
মায়া নয়, দায়	গল্প-ভারতী	অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
স্টুডিও	পূর্বাশা	বৈশাখ ১৩৬০
অগ্নিশুদ্ধি	গল্প-ভারতী	শারদ ১৩৬০
রত্নাকর	মুখপত্র	শারদ ১৩৬০
রক্ত নোনতা	চতুষ্কোণ	শারদ ১৩৬০
বিষ	মধ্যবিত্ত	শারদ ১৩৬০
সশস্ত্র প্রহরী	স্বাধীনতা	শারদ ১৩৬০
কলমে - হরফে	গল্প-ভারতী	পৌষ ১৩৬০
ঘাসে কত পুষ্টি	পরিচয়	ভাদ্র - আশ্বিন ১৩৬১
চিন্তাজ্বর	বসুমতী	শারদ ১৩৬১
দুর্ঘটনা	ক্রান্তি (নবপর্যায়)	শারদ ১৩৬১
প্রাক্ শারদীয় কাহিনি	স্বাধীনতা	শারদ ১৩৬১
মতিগতি	গল্প-ভারতী	শারদ ১৩৬১
মহাদেও-এর যাত্রা শুরু	বন্দেমাতরম্	শারদ ১৩৬১
মাছের লাজ ও মাংসের ঝাঁজ	মধ্যবিত্ত	শারদ ১৩৬১
হাসপাতালে	যুগান্তর	শারদ ১৩৬১
শান্তিলতার কথা	পরিচয়	আশ্বিন - কার্তিক ১৩৬২
তারপর	বসুমতী	কার্তিক ১৩৬২
খাটাল	স্বাধীনতা	শারদ ১৩৬৩
জল-মাটি-দুধ-ভাত	জন্মভূমি	শারদ ১৩৬৩
নীতিকথা	জাগৃহি	বৈশাখ ১৩৬৪
জীবনের সমারোহ	গল্পভারতী	?
বড়দিন	উত্তরায়ণ	১ম বর্ষ ৫ম বর্ষ
মানুষ হতবাক নয়	?	?

ঢেউ	?	?
একটি বখাটে ছেলের কাহিনি ?		?

এই অগ্রন্থিত গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলি গল্প মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের দারিদ্র্যতা ও ভয়ঙ্কর জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। খেটে খাওয়া গরিব এই মানুষগুলির জীবনের, দুঃখ-দুর্দশার বাস্তবায়ন ঘটেছে গল্পগুলিতে। *তাঁতি-বৌ, জীবিকা, বাগদিপাড়ার একটি রাত, চাষার বৌ, জোতদার, গলায় দড়ি কেন* প্রভৃতি গল্পগুলির বিষয় সমকালীন সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য হেতু মানুষের জীবনের দারিদ্র্যতা ও অসহায়তা। আবার কতগুলি গল্পে দারিদ্র্যের কাছে পরাজয় স্বীকার না করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। যেমন — *আগুনের ফুলকি, কোন দিকে* এই ধরনের গল্প।

চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা ছিল দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর জনিত মানুষের ভয়াবহ দুরবস্থা ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয়। এই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর হতভাগ্য দেশবাসীর জীবনে কি ভয়াবহ অভিশাপ নিয়ে এসেছিল তা আমরা আজ শুধু কল্পনা করতে পারি মাত্র। মানিক তাঁর অনেক গল্পে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর জনিত দুরবস্থার, মানুষের অসহায়তার, পতনের, বেদনার, মৃত্যুর কথা তুলে ধরেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গল্প হলো — *চাপা আগুন, সমানুভূতি, চৈতালী আশা, কে বাঁচায় কে বাঁচে, গেঁয়ো* ইত্যাদি। আবার অনেকগুলি গল্পে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব ও শ্রেণিচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় — *প্রাক শারদীয়া কাহিনি, বড়োদিন, সশস্ত্র প্রহরী, ঢেউ, আধুনিক অতিথি, সমানুভূতি, বিচার, সবার আগে চায়* ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি ক্রমাগত টের পাচ্ছিল, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের মানুষ যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছেন তাতে আর বেশিদিন রাজ্যপাঠ চালানো সম্ভব নয়। তখন বিভেদ নীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের ঐক্যশক্তিকে ভাঙতে চেয়েছিলেন সুচতুর ঔপনিবেশিক শাসকগণ। যার ফল স্বরূপ দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং উদবাস্তু সমস্যা। সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষের কতখানি ক্ষতি করেছে তা আজও আমরা টের পাইনি। অগ্রন্থিত অনেকগুলি গল্পে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ঘটে চলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের ছবি সময়কে অঙ্গীকার করে ফুটে উঠেছে। এরকম কয়েকটি গল্প *আধুনিক অতিথি, সমানুভূতি, রক্তনোনতা, বিচার, বন্ধু, দুইযাত্রী* ইত্যাদি।

শেষপর্বের এই গল্পগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবিত বিধ্বস্ত জনজীবন, যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবন সংগ্রাম, শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রেণিচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকের ভাষায় —

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার মধ্যে কেবলমাত্র সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনায় করেননি বরং পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঠিক পথ নির্দেশ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকের যুবপ্রভাব এবং বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের ফলে তাঁর মধ্যে যে গণমুখী চেতনার বিকাশ ঘটে তাকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন।[৯]

কবিতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন — একথা দীর্ঘকাল অনেকের কাছেই অবিদিত ছিল। কোনো কোনো উপন্যাসে কবিতার টুকরো ঝলক ছাড়া কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল ছিলেন অন্তরালে। মানিকের জামাতা যুগান্তর চক্রবর্তী ১৯৭০ সালের মে মাসে একটি মরণোত্তর গ্রন্থ প্রকাশ করেন — *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*। প্রকাশক গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ১৬ + ৪ +৯৬ = ১১৬। বইটির ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি মানিকের ১৬ থেকে ২১ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত লেখাগুলি একটি খাতার মধ্যে ছিল। এই খাতার কবিতা সংখ্যা প্রায় ১০০ র কাছাকাছি। কিন্তু এই কবিতার খাতার একটি কবিতাও মানিক কোনোদিন কোথাও প্রকাশ করেননি। তাঁর কবিতার আরো দুটি খাতা ছিল, যার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনের শেষ আট-দশ বছরের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি কবিতাগুণে অনেকবেশি পরিণত রচনা। সম্পাদক মহাশয় *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা* গ্রন্থটিতে মানিকের সব কবিতা রাখেননি, নির্বাচিত মাত্র আটান্নটি কবিতা এই বইতে স্থান পেয়েছে।

কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠক সমাজে খুব পরিচিত নন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় একযুগ পরে আমরা তাঁর কবিতা সম্পর্কে জানতে পারি। সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। কারণ যে কল্লোলীয় এবং কালিকলমের যুগে তথাকথিত আধুনিক ও বিদ্রোহী কবিদের অভ্যুদয়, কবি মানিকের অভ্যুদয়ও সেই একই বিস্ফোরণের লগ্নে। তবুও প্রথাসিদ্ধ মামুলিয়ানার বিপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধতার পেটার্ন ও পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব, উদ্ধত এবং আপোশ বিমুখ। আমুল পরিবর্তনের ধাক্কায় তখন সমাজের নোঙর বাঁধা মূল্যবোধগুলির অন্তিম দশা উপস্থিত। কবি সাহিত্যিকদের মনে নানা সংশয় এবং দ্বন্দ্বের আন্দোলন অথচ পরিস্থিতির জটিলতায়, ঘটনার কূটিল আবর্তে নানামুখী সমস্যার সমাধানের পথ প্রায় অবরুদ্ধ। তখন ঔপন্যাসিক মানিকের জয়যাত্রার সমারোহ। কিন্তু সেই সময়ও মানিক লিখেছেন অনেকগুলি কবিতা, যা আমাদের পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল। তাঁর প্রাথমিক কবিতাগুলির মধ্যে *পত্র* নামে একটি দীর্ঘ কবিতায় মানিক জানিয়েছেন —

জানো তো কবিতা লেখা কুঅভ্যাস কিছু ছিল মোর,
এখনও ছাড়িতে তাহা পারি নাই, আমি একেবারে —
সে ভূত কায়েমী হয়ে চাপিয়া রয়েছে মোর ঘাড়ে,

— অর্থাৎ যে নেশা ছিল এখনও কাটেনি তার ঘোর।
একথা ভাবিলে মনে বিস্ময়ের অন্ত নাহি পাই
প্রতিপলে জীবনের সহিয়াছি কঠোর আঘাত,
সুখে-দুখে, পাপ-পুণ্যে রচিয়াছি সলিল স্বখাত —
আকণ্ঠ ডুবেছি তাহে তবু আজও তৃষ্ণা মেটে নাই
....
আপনার প্রাণ দিয়া জগতের সীমাহীন প্রাণ
বুঝিতে প্রয়াস করি, ব্যাকুল খুজিয়া ফিরি মানে
কেন এই জাগরণ! বসে আছি আকুল শ্রবণে
চিরন্তর ধরনীর বুক ভরা চিরন্তন গান।[১০]

সুতরাং সন্দেহ থাকেনা বাংলাদেশের অধিকাংশ লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকের মতো লেখক বৃত্তির প্রথম অগোচর অধ্যায়টি মানিকেরও কবিতায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু মানিক উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মাধ্যম কথাসাহিত্য, কবিতা নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন: "সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি, কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক।"[১১] কারণ — "উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরো ব্যাপক ও প্রসারিত — অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনি ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান, বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করেছে।"[১২] আমাদের সৌভাগ্য যে সাহিত্যিক হিসেবে তিনি নিজের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথমেই প্রত্যয়ী হয়েছিলেন। "নইলে আমরা হয়তো আধখানা মুকুন্দরাম এবং আধখানা সুকান্ত ভট্টাচার্য পেতাম কিন্তু পেতামনা সম্পূর্ণ এবং অদ্বিতীয় এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।"[১৩]

কথাসাহিত্যিক হিসেবেই মানিকের প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর কবিতাগুলি প্রকাশের পর, কবি হিসেবে তাঁর সার্থকতা ও অসার্থকতার দ্বন্দ্ব সমালোচক মহলে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে কবি ও সমালোচক প্রভাত মিশ্রের মন্তব্য—

> সেই পাঁচের দশকের শুরু থেকে সাতের দশক পর্যন্ত এই কবিতার একটি পঙক্তি কবিতা পাগল অনেকের মুখে ফিরত, "কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।" আজও এই শিল্পশ্রীহীন সন্ত্রাস কবলিত অন্ধকার দিনে হয়তো কেউ কেউ মনে মনে উচ্চারণ করেন সহজ অমোঘ পঙক্তিটি, "কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।" চিরকালীন স্মরণ যোগ্য কবিতা পঙক্তি নির্মাণেই কবির প্রকৃত সার্থকতা। একথা বলছি না যে বাংলা সাহিত্যে মানিক একজন বড়ো মাপের কবি ছিলেন। আবার একথাও বলছি না যে মানিক কেবল কথাসহিত্যিকই ছিলেন, কবি ছিলেন না।[১৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কাহিনি যাঁরা জানেন — তাঁরা জানেন কি প্রদীপ্ত পৌরুষের অবজ্ঞায় ও ঘৃণায় প্রচনশীল সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আপোশ না-করে দুর্দশা ও দৈনকে তিনি নিজের জীবনে বরণ করেছিলেন। মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের আপনজন হয়ে তিনি ঠিকমত বাঁচতে চেয়েছিলেন। মানুষের জীবনের অংশীদার হতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণার উৎসটি সেইখানে নিহিত। *ছন্দপতন* উপন্যাসে কবি নবনাথের জবানিতে মানিক তাই জানিয়েছেন —

> আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করিনা। আকাশ চষে আমি কাব্য ফুলের চাষ করিনা, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানবের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু, জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব, চিন্তা, আবেগ- অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।[১৫]

কবিতাতেও তিনি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা —

আমি তো খেয়েছি খুদ, আমিতো করেছি উপবাস
আমি তো ভুগেছি রোগ-চাষি মাঝি মজুরের সাথে!
অকারণে আমিতো মরেছি লক্ষবার,[১৬]

অথবা

পদ্মায় যে ডিঙি চালায়, মেদিনীপুরের শক্ত মাটি চষে,
বোম্বে থেকে কলকাতাতে লাখ লাখ চাকা ঘোরায়,
উদয়াস্ত লাখ কলম পেষে,
বুঝতে যেন পারছি
তাদের ফাঁসে আটক গলার ঐকতান
অনুভব করেছি ব্যাহত জীবন কামনায় উজ্জ্বল তাপ, সূর্যালোকের মতো।
তুলনা পাইনি রাজকীয় কাব্য ইতিহাসে
এমন সহজ সরল বিরাট সুন্দরের।[১৭]

সমাজ বা বাস্তবতার বৃহত্তর পরিধিকে মানিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি কবি হতে চাননি, চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক হতে, গল্পকার হতে। কিন্তু পরিণত বয়সে যখন অনুভব করেছেন কবিতার মধ্যেও তাঁর অনেক কথা বলার আছে। পাশে পেয়েছেন পার্টি কর্মী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। তখন মানিকও সুকান্তের সগোত্র কবি হতে চেয়েছেন। গল্প-উপন্যাসের মতো তাঁর কবিতা জুড়েও আছে শোষিত, বঞ্চিত অত্যাচারিত, শ্রমজীবী মানুষ, শ্রেণিবৈষম্য, সমকালীন সময়ের নানা অভিঘাত ও সমাজ পরিবর্তনের নানা স্তর। রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনে নানা গ্লানি, হতাশা, সংকট থেকে মুক্তির পথ সন্ধানের ইঙ্গিত তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ফাঁক ও ফাঁকির মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের

চিনিয়ে দিয়েছেন মুখোশের আড়ালের প্রকৃত মুখ। ক্ষতে ভরা সমাজের রোগমুক্তি ঘটিয়ে নতুন সমাজ গঠনের প্রত্যয় দেখা যায় তাঁর কবিতাতেও।[১৮]

মানিকের কবি প্রতিভার প্রকাশ প্রথম দেখা যায় *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে, এছাড়াও *ছন্দপতন*, *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসে কবি মানিক ও কবিতা সম্পর্কে মানিকের ধারণা কেমন ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই। মানিকের পরিণত বয়সের কবিতাগুলিতে বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের অসহায়তার কথা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় মানিক দেখেছিলেন শোষণমুক্ত সমাজের এক নতুন প্রতিনিধি, নতুন বিশ্বাস। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ছিল মানিকের কবি সত্ত্বার আশ্বাস ভূমি। তাই এই তরুণ কবির রোগ মুক্তির জন্য তাঁর আন্তরিক আবেদন ঘোষিত হয়েছে একটি কবিতায় —

দুর্যোগের ঘনকালো মেঘ ছিড়ে কেটে
আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয়গান ?"[১৯]

মার্কসবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত কবি মানিক কবি সুকান্তকে পাশে পেতে চেয়েছেন শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামে। শ্রেণিবৈষম্য ও নিম্নবিত্তের অসহায়তার ছবি ফুটে উঠেছে *চা* কবিতায়।—

আমাদের পাহাড়ের গায়ে বাগান,
আমাদের মালি চারা গজায়,
কুঁড়ি পাতা চয়ন করে আমাদের কুলি,
তারা নেংটো, অসভ্য, কালো।
ওরা কয়লার মতো কালো।
....
....
চা কাদের রক্ত
চা কাদের জীবন যৌবন আশা-আনন্দের নির্যাস,
চা কাদের বন্ধ্যা জন্ম কামনা,
কাদের জেল-চাবুকের ব্যথা।[২০]

আমাদের পাহাড়ের চা-শ্রমিকরা শরীরের রক্ত জল করা পরিশ্রম দিয়ে চা উৎপাদন করে। সেই চা বিদেশের বাজারে চলে যায়, মুনাফা লুটে মালিকশ্রেণি। কিন্তু নিম্নবিত্ত চা-শ্রমিকরা শোষিত, বঞ্চিত,

অত্যাচারিত হতে থাকে। শোষক শ্রেণির প্রতি তীব্র ঘৃণা ব্যঙ্গের সুরে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর *নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা*র মধ্যে —

হে সূর্য, উত্তাপে শান্তি পাও ?
আমারও পাঁজরে কোটি বজ্রের সন্তোষ,
আমি ক্ষোভে জ্বলি,
আমারও অত্যুগ্র শান্তি অনন্ত ঘৃণায়—
আমার জনতা ঘৃণা চায়।
....
তবু উর্ধ্বে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত,
ঘর নেই জমি নেই পেটে নেই ভাত,
ঘৃণায় ঘটায় অগ্নুৎপাত,
উষ্ণ রক্তপাত।
তাই আরও ঘৃণা চাই।[২১]

কবির ঘৃণা ঝরে পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের তৎকালীন নেতাদের প্রতি। দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, মাথায় চালা নেই কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিরুদ্বেগ আচরণ কবিকে পীড়া দেয়। কিন্তু কবি জানেন পরিবর্তন আসবে নিশ্চিত। সেই সামাজিক পরিবর্তন আসবে ইতিহাসের নিয়মে, তাই মার্কসবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত কবি সর্বহারার মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে ভোলেন না। তাই সূর্যের কাছে কবির প্রত্যাশা —

আরো দগ্ধ কর,
ঘৃণার কবিতা লিখি আমি,
কবি হই জনতার
সগোত্র আপন।[২২]

গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেস নেতৃত্বের অদূরদর্শিতায় এবং পরিকল্পিত আন্দোলনের অভাবে দেশবাসীর মনে সেকালে চূড়ান্ত হতাশা জন্ম নিয়েছিল। এই দিশাহীন আন্দোলনের প্রতি মানিকের বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে কবিতায় —

পেটে দানা মানুষের নেই, অনর্থক বাঁচার লড়াই,
মাটি শক্ত, অভিযান প্রতিহত স্নায়ু শিকড়ের,
অশ্রুজলে ফলেনা ফসল,
হৃদয়ের বাষ্পোদ্যমে, চলে না ইঞ্জিন।
মুক্তির স্বাদ নেই লবণের মাশুল ভিক্ষার
রক্তহীন গঙ্গাজলই আলুনি সংগ্রামে।[২৩]

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন যে প্রকৃত গণমুক্তির পথে অগ্রসর না হয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েছিল, তা আমরা সমকালীন ইতিহাস থেকে জানতে পারি। তবুও কবি ছিলেন আশাবাদী, আত্মবিশ্বাসী —

মহাসম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব
আমি তারই আত্মীয়তা চাই"[২৪]

সেই মহাবিপ্লবকে সার্থকতা দিতে কবির ঘোষণা —

"আমি তার চোখে দেব কয়লাখনির কালো
মরণ কাজল,
টিপ দেব চাকায় মাখানো গাঢ় জমাট রক্তের।
সর্ব অঙ্গে এঁকে দেব লালিম অঞ্জনা।
বুলেটের তাজা তাজা ক্ষতের চিহ্ন।[২৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে আমাদের দেশে যে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর নেমে এসেছিল, সেই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মানিক। তিনি দেখেছিলেন দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহরে এসে ভিড় করেছিল এবং তারপর শহরের রাস্তায় তাদের মৃত্যু মিছিল। একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এই সময়ের কথা মানিক অনুপুঙ্খ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কোথাও অভাবের তাড়নায় মা বিক্রি করছে কোলের শিশুকে, কোথাও যুবতী বধূ একমুঠো অন্নের জন্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে শরীর। একদল অর্থলোভী পিশাচ মানুষ খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখে কালোবাজারীর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের সময়কে আরো ভয়ানক করে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষের সেই ভয়ঙ্কর ছবি তুলে ধরেছেন মানিক *দুর্ভিক্ষ* কবিতায় —

পাখিরা গায় না
গলা মুচড়ে গেছে বিপাকে।
গানের আওয়াজ নেই তা সুরের ঝংকার!
ঝাটানো মাঠে মিছেই খোঁজে যা নেই,
বোঝাই লরি গেছে বোঝাই গুদামের পানে।[২৬]

তবুও জীবনের প্রতি আশাবাদী মানুষের দুদণ্ড বেঁচে থাকার সংগ্রামকে লক্ষ্য করে কবি বলেন —

শোষণ শুষ্ক মরুতে ঘাস গজাতে চায়,
চাওয়া সম্বল করে অফুরন্ত অঙ্কুর উঁকি মারে।[২৭]

সুন্দর কবিতায় দুর্ভিক্ষের বাস্তব চিত্র করুণ সুরে বেজেছে —

"এত সুন্দর চাল, সই, দেখেছিস ? এত কচি মোটা পুঁই ডগা ?
এমন পচা কাদা-ভাপানো গন্ধের মোটা ভাত,
তেল নুন বিনা এত স্বাদে রাঁধা চচ্চড়ি ?

বেঁচে ছিনু যতকাল, ততকাল চেয়েছিনু
আজ আর চাই না।
বাপটা মরল, ভাইটাও,
বোনটা ভগবান পেয়েছে টাকাওলা গান্ধি-ভাঙানো ব্যবসায়।
ছেলেটা মরেছে, মরেছে!
শুকনো মাই বলে ছেলে বুঝি মরেছে ?
দশমাস গর্ভে ছিল যে,
প্রসবের বেদনায় আমি জ্ঞানহারা-প্রায়,
কঠিন দিন কটা ডালে ভাতে বাঁচতে চাইলাম।
মরলাম।
স্বপ্নে দেখলাম কাঁকরের মতো চাল,
লেলিহান শিখার মতো পুঁইডগা।[২৮]

দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে ক্রমাগত গড়ে ওঠা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি যখন ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল তখন তারা দেশের ঐক্যশক্তি ভাঙতে এবং নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির আমদানি করে। মানিক আপন জীবন অভিজ্ঞতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির দিনগুলি দেখেছেন, আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন এই ভয়ঙ্কর বিপদকে দূর করতে। তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্র থেকে সেসব খবর আমরা পাই। *বাংলা ভাঙার কবিতা*য় কবি মানিক তাই লেখেন —

নেতারা নাকি ভাতের হাঁড়ি ভাগ করতে ইচ্ছুক,
বড়লাটের আজ্ঞায় ?
হাড়ি ফাটলে যে ভাত পুড়ে ছাই হবে উনোনের আগুনে,
শ্রমার্ত ক্ষুধার্ত আমরা খাব কি ?
....
মাইরি বলছি কালীর দিব্যি, ক্ষোদার দোহাই,
আর মরা যায় না কিছুতেই।
তাই ঈশ্বর আল্লা নেতাদের লাটদের বাদ দিয়ে
এবার বাঁচতে চাই,
মানুষ নিয়ে মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।[২৯]

বহু আন্দোলন ও আত্মবলিদানের পর যে স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালে এসেছিল, তা খন্ডিত স্বাধীনতা। ভারতবাসীতো এমন স্বাধীনতা চায়নি অনেক সংবেদনশীল মানুষের মতো, কবি মানিকও দেশের এই পরিণতি দেখে হতাশ হয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা দরিদ্র দেশবাসীকে অন্ন-বস্ত্র অধিকার দেয়নি। তাই বহু

কাঙ্ক্ষিত এই স্বাধীনতাকে মানিক গুড় শূন্য ভাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর বুবুক্ষু দেশবাসীকে তাঁর মনে হয়েছে লোভী পিঁপড়ে—

শূন্য গুড়ের ভাঁড়েই লোভী পিঁপড়ে হল খুশি।
সবার কাছেই সস্তা যেন
ভাঁড় চেটেই জীবনটারে মিষ্টি করার সাধ।[৩০]

১৯৫৩ সালে ১লা জুলাই ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ দারুণ বিক্ষোভ দেখায় কলকাতার রাজপথে। জনগণের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পুলিশের লাঠি নির্বিচারে অত্যাচার চালায়। এর প্রতিবাদে ১৬ই জুলাই গণধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘট ব্যর্থ করতে পুলিশ তার সর্বশক্তি নিয়ে হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের উপর। মানিক *ছড়া* কবিতায় লিখেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা—

আমরা শুনেছি তার
পুলিশি ঝঙ্কার,
মিলিটারি হুঙ্কার,
অনেক অনেক বার—
সাদা রাজা কালো দাস
মিলে যিনি অবতার,
স্বাধীনতা হীনতায়!
বারবার ফোসকায়
কড়া পড়ে সেরে যায়,—
লাঠি ও গুলির ঘায়
জনতার প্রাণটায়
মোটে আর ব্যথা নেই
ভীরুতার ফোস্কায়,
কড়া পড়া একতায়।[৩১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় আবেগ নেই, নেই শব্দ মাধুর্য। কল্লোলীয় যুগের হয়েও তাঁর সৃষ্টি কল্লোলীয় নয়। কবিতার রোমান্টিকতা ও ভাবপ্রবণতা অর্থহীন মানিকের কাছে। তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয় কঠিন বাস্তব। সমকালীন বাস্তব জীবনের সমস্যা-সংগ্রাম, আন্দোলন-বিক্ষোভ সহ সমস্ত কম্পন কোথাও মৃদু, কোথাও উচ্চাঙ্গে অনুভূত হয়। সমালোচক মানিকের কবিতার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেন —

এই পৃথিবীকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার যেমন শোনা যায় সুকান্তের কবিতায়, তেমন গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণমুক্ত আগামী সমাজ গঠনের আগামী বার্তা পাওয়া যায় মানিকের কবিতায়। মানিক প্রত্যক্ষভাবে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগ্রামী কবি মিছিলে হেঁটেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন মিটিং-এ। আর সেইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যেও। আমৃত্যু মার্কসবাদী এই কবি বুঝেছিলেন গণ-আন্দোলনই এনে দিতে পারে গণ-মুক্তি। সেই গণ-আন্দোলন, গণমুক্তির প্রকাশ ঘটেছে যেমন তাঁর গল্প-উপন্যাসে, তেমনি তাঁর কবিতাতেও। গণ-আন্দোলন পূর্ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তার সমকালে যতটা; ততটাই প্রাসঙ্গিক বর্তমান কালে।[৩২]

প্রবন্ধ ও গদ্যরচনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত কথাসাহিত্যকার। কথাসাহিত্য সাধনাকেই তিনি ধ্রুব ব্রত মেনেছিলেন। সেই ব্রত পালনই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অন্যতর কিছু নয়। কথাকার পরিচয়কেই তিনি তাঁর অদ্বিতীয় সারস্বত-আত্মপরিচয় মেনেছিলেন। অথচ এত দিন ধরে যে তিনি কবিতার পঙক্তির সাথে বসবাস করেছেন, তা নিয়ে প্রকাশত খুব কিছু বলেননি। তাঁর নিবন্ধকার আত্মপরিচয় নিয়েও তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অথচ চব্বিশ বছর বয়সেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মননশীল গদ্য। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য রচনা করেছেন। সেগুলি আকার-আয়তনে ও শৈল্পিক মানদণ্ডে সবসময় প্রবন্ধ অভিধায় চিহ্নিত হতে পারে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে মানিকের এই জাতীয় রচনাকে আমরা প্রবন্ধধর্মী গদ্য রচনার মধ্যে রেখে দিতে পারি।

কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণত অনুধাবন করতে হলে এই নিবন্ধগুলির একটি পঙক্তিও পরিহার করা চলে না। তাহলে আটত্রিশটি উপন্যাস ও তিনশত পাঁচটি ছোটগল্পের মালিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য জীবনকে জানায় ফাঁক থেকে যেতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃজন জীবনের পথ মানচিত্র কিভাবে আঁকজোক করছিলেন, কখনও বা বদলে নিচ্ছিলেন গতিপথ, কিভাবে তাঁর সারস্বত সাধনার পূজারী হয়ে ওঠা — সেইসব জানতে হলে এই নিবন্ধগুলির প্রতিটি বাক্য, শব্দবন্ধ, পদ অপরিহার্য। নিজের কথাকার জীবন সম্পর্কে এবং কথাসাহিত্য সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেছেন এই নিবন্ধগুলিতে, যা সময়ের সঙ্গে হয়ে উঠেছে একজন শিল্পীর আত্মদর্পণ।

মানিক যে জীবন যাপন করেছেন, তার থেকে দূরবর্তী ছিল না তাঁর সাহিত্য। দাদাদের মতো স্বচ্ছল ভবিষ্যতের পথে পা না বাড়িয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনাকেই করেছিলেন জীবনের একমাত্র ব্রত। তিনি সদর্পে জানিয়েছেন, যখন সমাজে ও জীবনে এত রূপান্তর ঘটছে তখন সেই রূপান্তরিত জীবনের কথা না বলে অন্যকিছু করা আসলে মুর্খামি। জীবনকে যতখানি তিনি জেনেছিলেন, পাঠককে তার ভাগ দেওয়ার জন্যই তাঁর সাহিত্য-সাধনা। তিনি নিছক সাহিত্য

স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মাটির কবি, মানুষের কথাকার। দারিদ্র্যতা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। লেখালেখির মাধ্যমে যেটুকু উপার্জন করতেন, সে টুকুই ছিল তাঁর সংসারের পুঁজি। তিনি ছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী। তিনি প্রগতী লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য ছিলেন। কেননা তিনি মনে করতেন, কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারেন না। সামাজিক চৈতন্য সৃষ্টির জন্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি মিছিলে হেঁটেছেন, মিটিংয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিমূলক, সভা সমিতিতে যোগদান করতেন। 'পিউপিলস্ রিলিফ কমিটি' বা 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে'র সক্রিয় সদস্য বা সভাপতি মন্ডলীর সদস্য হয়েছেন। মানিক তাঁর সমকালীন লেখকদের তুলনায় সমাজ সচেতনতার প্রশ্নে এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার প্রশ্নে অনেক বেশী প্রাজ্ঞস্বর ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং বিশেষত মার্কসবাদে পাট নেওয়ার ফলে তাঁর যে জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার প্রতিবিম্বন নিবন্ধ রচনা গুলিতে আমরা পাই।

মানিকের মৃত্যুর পরের বছরেই প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ সংকলন *লেখকের কথা* সেটি ছিল তাঁর প্রয়াণ পরবর্তীকালে প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)। পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মননশীল গদ্যসহ কথাসাহিত্য বহির্ভূত গদ্যের আরো বেশ কিছু অংশ আবিষ্কৃত হয় তাঁর পরিবারে রক্ষিত ব্যক্তিগত বা অন্যান্য কাগজপত্র থেকে। কিছু কিছু লেখা সংকলিত ও প্রকাশতি হয় বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। লেখকের জীবিতকালেই বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে কিছু মননশীল গদ্য, সমালোচনা বা প্রতিবেদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। *লেখকের কথা*র গদ্যগুলি সহ মানিকের প্রায় সকল প্রকাশিত অপ্রকাশিত আবিষ্কৃত গদ্যগুলি দীপ প্রকাশন কর্তৃক *মানিক বন্দোপাধ্যায় : সমগ্র প্রবন্ধ এবং* নামে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশকাল মে ২০১৫।[৩৩] পূর্বে কখনো মুদ্রিত না হওয়া মানিকের অনেকগুলি গদ্য বা গদ্যাংশ এই গ্রন্থে সুমুদ্রিত হয়েছে। যা মানিক সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই গদ্য রচনাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করছি।[৩৪]

সাহিত্য ভাবনা মূলক রচনা:

শেষপ্রশ্ন	শরৎ বন্দনা (নিবন্ধ গ্রন্থ)	সেপ্টেম্বর ১৯৩২
প্রগতি সাহিত্য	সাপ্তাহিক অরণি	এপ্রিল ১৯৪৪
প্রতিভা	স্বাধীনতা	শারদ ১৯৪৭
গায়েন ও মুচি বায়েন	পরিচয়	ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮
বাংলা সাহিত্যের আত্মসমালোচনা	পরিচয়	জানুয়ারি ১৯৫০
বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা	পরিচয়	জুলাই ১৯৫০
উপন্যাসের কথা	পূর্বাশা	মে ১৯৫১

শিল্প সাহিত্য 'সৃষ্টি' কেন	অরুণোদয়	ডিসেম্বর ১৯৫২
গল্পলেখার জীবিকা	চতুষ্কোণ	জুন ১৯৫৩
সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ	নতুন সাহিত্য	আগস্ট ১৯৫৩
সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার রূপ	পরিচয়	সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
উপন্যাসের নাম সম্ভবত	পরিচয়	সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
রাখিব-বিষ / জমির মূল্য		
সাহিত্য সৃষ্টি ও সচেতনতা	?	?
সাহিত্য সৃষ্টির স্থায়ি ও অস্থায়ি ভিত্তি	?	?
সাহিত্য	?	?
প্রগতি-সাহিত্য	?	?
কলাকৌশল এক	?	?
কলাকৌশল দুই	?	?
ছোটোদের বড়োদের গল্প	?	?

মনঃসমীক্ষণ মূলক রচনা:

জীবনে শত বসন্ত	নর-নারী	এপ্রিল ১৯৪০
ভুলধারণা	নর-নারী	জুন ১৯৪০ এবং জুলাই ১৯৪০
যৌন-জীবন	নতুন জীবন	আগস্ট ১৯৪৪
চিঠি (সুনীল কুমার ধর সমীপে পত্র)	নতুন জীবন	সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

আত্মসমীক্ষণ মূলক রচনা:

কেন লিখি	কেন লিখি (লেখকদের জবানবন্দী)	জানুয়ারি ১৯৪৪
আমার গল্পলেখা	গল্পলেখার গল্প (সংকলিত গ্রন্থ)	মে ১৯৪৫
সাহিত্য করার আগে	নতুন সাহিত্য	সেপ্টেম্বর ১৯৫১
সাহিত্যের কানমোলা	বসুমতী	সেপ্টেম্বর ১৯৫৩
লেখকের কথা	স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থের ভূমিকা	মে ১৯৫৫
ভূমিকা	মানসী	শারদ ১৯৬৩
এত লিখি	?	?
মৃগীরোগ	?	?

সমাজ ভাবনা মূলক রচনা:

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অভিনন্দন	দৈনিক স্বাধীনতা	১৭ এপ্রিল ১৯৪৭
'স্বাধীনতা' তহবিল	দৈনিক স্বাধীনতা	১৪মে ১৯৪৭
প্রেশ মালিকদের ষড়যন্ত্র	স্বাধীনতা	১ জুন ১৯৪৭
মানবতার বিচার	পরিচয়	জানুয়রি ১৯৪৯
সাহিত্যিক ও গুন্ডামি	পরিচয়	এপ্রিল ১৯৪৯

আতঙ্ক-বিকার	ইস্পাত	অক্টোবর ১৯৪৯
বক্সাক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক	পরিচয়	জুলাই ১৯৫০
ফার্স্ট ক্লাস / রাজধানী / মা গঙ্গার পুল	পরিচয়	সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
কলকাতা	নতুন সাহিত্য	অক্টোবর ১৯৫৭
কলকাতায় স্বাধীনতা দিবস	কালান্তর	শারদ ১৯৬৩
স্ট্যালিন কি	?	?

প্রতিবেদনধর্মী রচনা

ভারতের মর্মবাণী	পরিচয়	মার্চ ১৯৪৫
চট্টগ্রামে মিলিটারী বর্বরতার কাহিনি	জনযুদ্ধ	২০ জানুয়ারি ১৯৪৬
দুর্বার	স্বাধীনতা	২৬ জুলাই ১৯৪৬

পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ সমালোচনাধর্মী রচনা

গ্রন্থ সমালোচনা	বঙ্গশ্রী	জুন ১৯৩৮
আধুনিক সোভিয়েট গল্প: মন্তব্য	অরণী	জুলাই ১৯৪৪
পত্রিকা সমালোচনা	পরিচয়	নভেম্বর ১৯৪৫
মাসিক বসুমতি নবপর্যায়-অভিনন্দন	শনিবারের চিঠি	এপ্রিল ১৯৪৬
গ্রন্থ সমালোচনা	দৈনিক স্বাধীনতা	৪ আগস্ট ১৯৪৬
গ্রন্থ সমালোচনা	দৈনিক স্বাধীনতা	২০ অক্টোবর ১৯৪৬
শুভেচ্ছা / অভিনন্দন	রঙমশাল	মার্চ ১৯৪৭
কথাসাহিত্যিকদের অভিনন্দন	দৈনিক স্বাধীনতা	২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭
ভূমিকা	বাস্তুহারা উপন্যাসের ভূমিকাংশ	জানুয়ারি ১৯৫১
শুভেচ্ছাবার্তা	উত্তরায়ণ	?
ডাকঘর	?	?
সংস্কৃতির সংকট	?	?

প্রয়াণ লেখধর্মী রচনা:

কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ	স্বাধীনতা (সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতিসংখ্যা)	১৮-ই মে ১৯৪৭
মহামানব স্তালিন	পরিচয়	মার্চ ১৯৫৩

অন্যান্য গদ্যরচনা:

বিচিত্র জগৎ	?	?
আশীর্বাণী	আশীর্বাণী	মে ১৯৫৬
সম্পাদকীয় বিবরণী	পরিচয়	মে ১৯৪৯

মানিকের গল্প, উপন্যাস, কবিতার মতো এই প্রবন্ধগুলিতেও সমাজ বাস্তবতা, সমাজ সচেতনতা, যুগপ্রভাব, সমকালীন সময়কে অঙ্গীকার করে প্রতিফলিত হয়েছে। মানিকের বেশিরভাগ প্রবন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের প্রকাশ ঘটেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সময়ের পদচিহ্নকে ধরতে গেলে এই প্রবন্ধগুলি খুবই জরুরি। কলমপেষাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মানিক। তাঁর কলমপেষা জীবনের নানান কথা, অভিজ্ঞতা, আত্মদর্শন মূলক রচনা এই প্রবন্ধগুলি। যা মানিকের ব্যক্তিজীবন, লেখক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন যেভাবে সমকালীন নানা ঘটনাবলিকে অঙ্গীকার করে আবর্তিত হয়েছিল, সেইসব খবর সময়ের নিরীখে আমরা প্রবন্ধধর্মী এই রচনাগুলিতে পাই।

ডায়েরি ও চিঠিপত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রায় দু-দশক পরে ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে দে'জ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র*। লেখকের কনিষ্ঠ জামাতা যুগান্তর চক্রবর্তী ভূমিকা-টীকাভাষ্য সহ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনে তাঁর দিনলিপি ও চিঠিপত্র একান্তই তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের পাদটীকার মতো। তাঁর সুবিশাল রচনা কর্মের গভীরে অবগাহন করতে এগুলি আলোকবর্তিকার কাজ করে। মানিকের মতো একজন আত্মসচেতন কথা সাহিত্যিকের সৃজন কর্ম পাঠে পাঠকের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়। সেইসব প্রশ্নের অনেক উত্তর পাওয়া যায় তাঁর আত্মকথনমূলক রচনায় এবং তাঁর দিনলিপি ও বিভিন্ন চিঠিপত্রে।

সৃজনশীল সাহিত্য অপেক্ষা সাহিত্যিকের দিনলিপিতে সাহিত্যরস এবং শিল্পগুণের সমাগম বেশি ঘটেনা, একথা সত্য। তবে শিল্পীর কলমের স্পর্শে দিনলিপির ঘটনা বিবরণ অনেক সময় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। মানিকের রচনাবলিতে যা নেই, এ যেন তারই পরিপূরক। তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপাদানের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে দিনলিপি বা পত্রলিপির মাধ্যমে তাঁর মনোজগতে প্রবেশ করলে লেখক জীবন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসে। লেখকের জীবনের শেষ বারো বছরের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী অনিয়মিত ভাবে দিনলিপিতে উঠে এসেছে। সেখানে অনেক গল্প বা উপন্যাসের প্রাথমিক খসড়া ও সৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারি। যে কোনো ব্যক্তির জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে শৈশব থেকেই। তারপর সময়ের নানান অভিঘাতে সেই দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন পরিশীলন সাধিত হয়। মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশব থেকেই বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; আক্রান্ত ছিলেন তাঁর বহুচর্চিত 'কেন' নামক রোগে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দিয়ে তিনি সবকিছুকে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন প্রথম থেকেই। দেশের আর্থ-সামাজিক অন্যায়-অনাচার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিনি মুখর হয়েছেন। ৩০ ও ৪০ এর দশকের উত্তাল সময়পর্বে ব্যক্তি মানিক এই যুগপ্রবাহ থেকে দূরে থাকতে পারেননি। তিনি মিটিংয়ে বক্তব্য রেখেছেন, মিছিলে হেঁটেছেন, মানুষকে শ্রেণিচেতনায় সচেতন করেছেন, পীড়িত

মানুষের সংগ্রামে তিনিও আর একজন সৈনিক হিসেবে সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন। তাঁর জীবনই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের চালিকাশক্তি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো আত্মজীবনী গ্রন্থ নেই। তাঁর জীবনাদর্শ বিস্তৃত আছে তাঁর লেখালেখিতে। এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পারি, তা কিছু শৈশব স্মৃতি চারণায়, কিছু আত্মসমীক্ষণ মূলক লেখালেখিতে এবং তাঁর দিনলিপি ও চিঠিপত্রে। ব্যক্তি-মানিকের অজানা জগৎ অনেকখানি উন্মোচিত হয় তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্রে। সেখানে প্রায় শহরের শ্রমজীবী কৃষিজীবী, ভূমিজীবী মানুষের জন্য তাঁর যে চিন্তাভাবনা তা যেন তাঁর আত্ম বিশ্লেষণের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। ১৯৪৫-১৯৫৬ এই সময়কালের মধ্যে লিখিত ডায়েরির পাতায় বাংলার ভূমি জীবনের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক দূরবস্থার কথা সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন মানিক। তিনি নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন 'কলম পেষা মজুর' হিসেবে। লেখালেখির মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের মুখে ভাষা দিয়ে শ্রেণিসচেতন সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে অগ্রনায়ক সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সমকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহিত্যিকের ন্যায় শুধুমাত্র শিল্পের মোড়কে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতা খুঁজে নেননি। যুক্তিবাদী ইতিহাস চর্চা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, মিত্রপক্ষের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধে অন্যায় ভাবে ভারতীয়দের জড়ানোর ফলশ্রুতিতে গ্রাম-শহরের সামাজিক কাঠামো ভেঙে যাওয়া, জাতি দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, খাদ্য-কালোবাজারী, মজুতদারী, জোতদারের কৃষক পীড়ন, তেভাগা আন্দোলনের মতো ঘটনাবলীকে তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। তাঁর দিনলিপিতেও সমকালীন এইসব ঘটনার উল্লেখ ও প্রসঙ্গ, অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মানিকের ডায়েরি বলতে — সংখ্যায় সর্বমোট বারোটি ডায়েরি খাতা। মুদ্রিত সাল অনুযায়ী সময়কাল ১৯৪৫-১৯৫৬। সেই হিসেবে মানিকের ডায়েরির কালগত সীমা তাঁর লেখক জীবনের শেষ বারো বছর। ডায়েরিগুলি ধারাবাহিক ভাবে লেখা নয়, লেখা হয়েছে অনিয়মিত। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সাদা পাতা। তবুও যতগুলি পাতা লেখা হয়েছে তা ডায়েরিতে মুদ্রিত সাল তারিখ মেনে লেখা নয়, যখন যেটা হাতের কাছে পাওয়া তাতেই লেখা। শুধু সাল-তারিখ বা বিন্যাস ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলায় নয়, ডায়েরির পর ডায়েরির, পাতার পর পাতা জুড়ে থেকে থেকে দেখা দেয় এমন নানাবিধ লেখা ও বহুবিচিত্র বিষয় যে, মানিকের ডায়েরিকে ঠিক সাহিত্যিক অর্থে ডায়েরি বলা চলে না। ব্যক্তি মানিকের অন্তর্গত বিপন্নতার মতই তাঁর ডায়েরির সমগ্র অবয়ব ক্রমাগত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য মনে রাখতে হবে প্রকাশের কথা ভেবে তিনি এই ডায়েরির খাতাগুলি লেখেননি। ইংরেজি নতুন বছরের গোড়ায় প্রধানত প্রকাশকদের কাছ থেকে তিনি এইসব ডায়েরি খাতা উপহার হিসেবে পেয়েছেন —

> মুদ্রিত ডায়েরি-বইই শেষপর্যন্ত পর্যবশিত হয় যেকোনো কারণে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার যোগ্য যে কোনো একটি খাতায় এবং যে কোনো খাতার লেখার মতোই তাতে চতুর্দিক থেকে এসে যায় বিভিন্ন মুহূর্তের যেকোন ধরনের লেখা — গল্পের প্লট বা উপন্যাসের উপকরণ; কাহিনির

> সূত্র ও চরিত্রের ভিড় ঠেলে উঁকি দেয় সামাজিক ঠিকানা; দিনযাপনের দৈনিক বিবরণের মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত অসুখ নিয়ে অনুসন্ধান, পাতার পর পাতা দেশি-বিদেশী চিকিৎসাবিধি; মাঝে মাঝে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন, বা কড্‌ওয়েল ও আরো নানা লেখা থেকে উদ্ধৃতি, কখনো বা পর পর কিছু Philosophycal Tarmas — সম্ভবত উদ্ধৃতি; কোনো একটি ডায়ারি বইয়ে Notes on Art — উদ্ধৃতি ও ইংরেজিতে লেখা নিজস্ব কিছু চিন্তা; এরই মধ্যে একটি ডায়েরি-বইয়ে, এলোমেলো ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপি এমন কিছু ইংরেজি লেখা যা অন্তত আমাদের কাছে সম্পূর্ণই 'গ্রীক'— অনুমানে মনে হয়, হয়তো ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত সাংকেতিক অঙ্ক...। কখনো বা কোনো কোনো ডায়েরি-বইয়ে পর পর কয়েক পাতা শুধুই হাতে লেখা তারিখ — লিখিত অংশ কিছু নেই। ... কোথাও পাতার পর পাতা জুড়ে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সংক্রান্ত কাজের 'নোট', প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি পত্রের খসড়া, সম্পাদক বা প্রকাশকের কাছে লেখা দেওয়ার দিন-তারিখ, সম্পাদক ও প্রকাশকের কাছ থেকে লেখাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্র এবং পারিবারিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার খরচার দৈনন্দিন হিসাব...।[৩৫]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি, তার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল রূপ নিয়েই, ব্যক্তি ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ বারো বছর জীবন কালের ভগ্নাংশপ্রায় বিবরণ। এই ডায়েরি থেকে লেখকের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন সহ নানা খবর আমরা বিক্ষিপ্তভাবে পাই। লেখক ও মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক সংকট ও সংকল্প, তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য জীবনের অনেক দ্বন্দ্বময় ইতিহাস, ব্যক্তিগত অসুখ ও আসক্তির পরস্পর ক্রিয়াশীল সংঘাত ও সংঘর্ষ, এরই মধ্যে থেকে যায়; এরই মধ্যে আমাদের মধ্যে থেকে যান দ্বন্দ্বময় দুই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — অতিজীবী ও মরণশীল, অকালমৃত ও ইহকালীন — মৃত্যুর পর এতগুলি বছর পেরিয়েও যিনি আমাদেরই সমসাময়িক।[৩৬] বিশ শতকের কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লেখক, যাঁকে নিয়ে উপকথা রচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন উপকথার নায়ক নন। তিনি আমাদেরই মতো নিয়তি তাড়িত অথচ সংগ্রামী একজন মানুষ। তাঁর রচিত সাহিত্য প্রপীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা। এবং একথা আমরা অনেকেই মনে রাখি না যে তিনিই বাংলা সাহিত্যের দরিদ্রতম বড়ো লেখক। মাত্র আটচল্লিশ বছর পরমায়ুতে ষাটখানি গ্রন্থ ও অসংখ্য অগ্রন্থিত রচনার তিনি সৃষ্টিকর্তা। সেই অর্থে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন একটু বেশি পরিমাণে অতি জীবিত। সমকালের অন্যান্য লেখকদের থেকে স্বভাবধর্মে কিছুটা আলাদা। যিনি লেখকের চেয়েও কিছু বেশি এক লেখক-মানুষ। তাঁর সমগ্র জীবনের রচনাও প্রকৃত পক্ষে এক দ্বন্দ্বময় লেখক-মানুষের আত্মচেতনার ইতিহাস। তাঁর আঠাশ বছরের লেখক জীবনের অর্ধাংশেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ডায়েরি লেখায় প্রথম হাত দেন। যে সময়ে লেখক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা তিনি অনেক বেশি প্রকাশ করেছেন —

> একদিকে ব্যক্তি জীবনের সমস্যা ও সংকট — অসুখ, আসক্তি ও দারিদ্র্য; অন্যদিকে সামাজিক দায় - রাজনীতি ও সাহিত্য আন্দোলন; এবং এরই মধ্যে নিজের যা প্রকৃত কাজ অর্থাৎ সাহিত্য— এর সবকিছুর চাপ ও পীড়ন যতই তীব্র হয়, মানুষের প্রকৃতিগত কারণেই নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার, নিজেকে বুঝে নেবার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ততবেশি দেখা দেয়। অন্যদিকে পার্টি, সাহিত্য ও পারিবারিক জীবন ক্রমান্বয়ে দাবি করে আরো বেশি শৃঙ্খলা ও সময়। নিজেই নিজের কাছে দাবি করেন একই সঙ্গে লেখক ও মানুষ হিসাবে জীবনের সম্পূর্ণতা — দেহে, মনে, সুস্থ সবল-সক্রিয় এক সম্পূর্ণ মানুষ। এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই, দয়াহীন আত্মসমালোচনা, এবং নিজের কাছে নিজেকেই স্পষ্ট করার প্রয়োজনে অকপট স্বীকারোক্তি — দ্বিধা-দুর্বলতা-সংশয় সহ এক অনাবৃত ব্যক্তিত্বকে, তাঁর অতি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শেষ কয়েক বছরের ডায়েরির বিশৃঙ্খল লেখায় ক্রমেই বেশি করে ধরে রাখেন। এরই মধ্যে ধরা থাকে তাঁর অন্তিম দিনগুলি, তাঁর তিন মাস হাসপাতালের প্রতিটি দিনযাপন সমেত তাঁর দ্বন্দ্বময় মানসিক ইতিহাস। নিমজ্জমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উদ্যত হাত এরই মধ্যে থেকে ঝলসে ওঠে।... এমন স্পর্শযোগ্য, জীবন্ত, ভঙ্গুত মানুষী রচনা যা একই সঙ্গে অতি মানুষিক, পৃথিবীর খুব বেশি লেখক লেখেননি। অন্তত বাংলা ভাষার মুদ্রিত হরফে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এখনও পর্যন্ত নেই।[৩৭]

যে কোন লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরি বা চিঠিপত্র জাতীয় রচনা মৌলিক অন্তর বিরোধী, কেননা, ডায়েরি বা চিঠিপত্রগুলি প্রকাশের জন্য লেখা নয়। তবুও লেখকদের এইসব ব্যক্তিগত লেখা শেষ পর্যন্ত সার্বজনীন হয়ে পড়ে, যার কোন পরিমার্জন বা সংশোধনও আর করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়না। আবার তাঁর চিঠিপত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে লেখা। চিঠির একটি আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা থাকে। তবে এ চিঠিপত্রগুলির মধ্য দিয়ে লেখকের মানসিক উত্থান-পতন ও জীবন সংগ্রামের অনেক না জানা কথাও আমরা জানতে পারি। চিঠিপত্রের মধ্যে ধরা পড়ে একজন লেখকের ব্যক্তি ও সামাজিক মনের নানান পরিচয়। বন্ধু ও ভাই, প্রেমিকা বা স্ত্রী, প্রকাশক ও পাওনাদার, সম্পাদক বা রাজনৈতিক কর্মী বা পিতা-মাতার কাছে লেখা চিঠিপত্রে, লেখক আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে দেখা দেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান চিঠিপত্রে আমরা তাকে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে জানতে পারি। তাঁর সংগৃহীত চিঠিগুলির সময়কাল তাঁর লেখক জীবনের প্রায় আদিপর্ব থেকে জীবনের শেষবছর পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। এইসব চিঠিপত্রে এবং ডায়েরির পাতায় আমরা ব্যক্তি মানিক ও তাঁর পরিবার, পারিবারিক সমস্যা ও সম্পর্কের উত্থান-পতন, লেখক মানিক, পার্টিকর্মী মানিক, একজন সমাজ সচেতন সংবেদনশীল মানুষ মানিককে আমরা পাই, তাঁর জীবিত সময়কালের ঘটে চলা নানান ঘটনা ও সময়ের অভিঘাত সহ। সেদিক থেকে মানিককে জানতে এবং তাঁর সাহিত্যের অনুসন্ধান কার্যের স্বার্থে, তাঁর সময়কে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনে তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্রগুলি আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

কিশোর রচনাসম্ভার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতে বসে একথা প্রথমেই মনে রাখা ভালো যে তিনি বড়োদের কথাসাহিত্যের জগৎ জুড়ে যতটা রয়েছেন, কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে ততখানি স্থান দখল করেননি। এক সাহিত্যে তাঁর রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে দ্বিতীয়টি বেমানান। তিনি যে ছোটোদের জন্য নিয়মিত লিখতেন, এ তথ্য অনেকেরই হয়তো অজানা। সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ মিলিয়ে চারখানি উপন্যাস, ২৭টি গল্প তিনি ছোটোদের জন্য রচনা করেছেন। লেখাগুলি মূলত পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিল, বই হয়ে তেমন বেরোয়নি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি সমস্ত রচনাগুলিকে একত্র করে ভূমিকাসহ প্রকাশ করে। বর্তমানে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত মানিক রচনাবলির একাদশ খণ্ডে এইসব রচনাগুলি মুদ্রিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত লেখাতে কখনই শৌখিন মজদুরি করেননি, লেখেননি তরল-সরল মনোরঞ্জক গল্প। তাঁর ছোটোদের লেখার ক্ষেত্রেও আমরা তা দেখতে পাই। মানিকের ছোটোদের লেখায় ছেলেমানুষটির নেকামি নেই, রয়েছে মাটি ও মানুষের কথা, জীবনের উত্তাপ। বোঝা যায়, ছোটোদের সময় ও সমাজ সচেতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। ছোটোদের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল, তা জানা যায় পরিকল্পিত একটি গ্রন্থ ভূমিকায়। ছোটোদের ও বড়োদের গল্প মিশিয়ে একটি অভিনব গল্পসংগ্রহ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। জীবন-সংঘাতের গল্প, যা কিশোর মনে বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগাতে সক্ষম, তেমনই কিছু গল্প একত্রিত করার কথা ভেবেছিলেন। গল্প নির্বাচন ও ভূমিকা লেখার কাজ শেষ হলেও অভিনব গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের জন্য জীবনেরই গল্প লিখেছেন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল স্থির, কখনো আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াননি তিনি। তাঁর কিশোর সাহিত্যও জীবন বোধে উজ্জ্বল, মানবিকতায় ঋদ্ধ। ছোটদের কথা ভেবে চারটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন মানিক, *মাঝির ছেলে* শেষ করেছেন। অন্য তিনটি অসমাপ্ত। *মাটির কাছে কিশোর কবি* ও *মশাল* ধারাবাহিকভাবে ছাপা হত পত্রিকায়, কিন্তু মানিক তা শেষ করে যেতে পারেননি। *রাজীবের লম্বা ছুটি* উপন্যাসটি মানিক লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের মধ্য থেকে পাওয়া গেছে এই অসমাপ্ত উপন্যাসটির কয়েকটি পৃষ্ঠা। ছোটোদের জন্য তিনি লিখেছেন সাতাশটি গল্প ও চারটি ছেলেবেলার স্মৃতিমূলক রচনা। রচনাগুলির একটি তালিকা আমরা তুলে ধরছি —

মাঝির ছেলে মানিকের একমাত্র ছোটোদের জন্য লেখা সম্পূর্ণ উপন্যাস। সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত *মৌচাক* পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৪৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩৫০ সংখ্যায় উপন্যাসটির প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। *মাটির কাছে কিশোর কবি* উপন্যাসটি প্রসূন বসু সম্পাদিত *আগামী*

পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৫৯ থেকে প্রকাশিত হয়। অসমাপ্ত এই উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন পরবর্তীকালে খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পরবর্তী উপন্যাস *মশাল* । কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *রঙমশাল* পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৫১ থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। অনিয়মিতভাবে নয়টি কিস্তি প্রকাশের পর উপন্যাসটি অসমাপ্ত থেকে যায়। *রাজীবের লম্বা ছুটি* উপন্যাসটি মানিক লিখতে শুরু করেছিলেন। এর কয়েকটি পৃষ্ঠা তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থেকে পাওয়া যায়।[৩৮]

কিশোর গল্পগুলির নাম ও প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হল —

চণ্ডীচরণের গান	মৌচাক	শারদ ১৩৪৫
কোথায় গেল	পাঠশালা	কার্তিক ১৩৪৬
জব্দ করার প্রতিযোগিতা	পাঠশালা	কার্তিক ১৩৪৭
তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প	মৌচাক	কার্তিক ১৩৪৭
তৈলচিত্রের ভূত	মৌচাক	ফাল্গুন ১৩৪৭
পাশ-ফেল	হালখাতা	১৩৪৮
ভয় দেখানোর গল্প	মধুমেলা (কিশোর সংকলন গ্রন্থ)	শারদ ১৯৪২
সনাতনী	রূপরেখা	শারদ ১৩৫০
চোর সাধুচরণ	জাগরণ	পৌষ ১৩৫১
টিকিট নেই	মৌচাক	পৌষ ১৩৫১
অসহযোগী	সপ্তডিঙা	ভাদ্র ১৩৫২
সিদ্ধপুরুষ	রঙমশাল	বৈশাখ ১৩৫৩
এলো!	রঙমশাল	শারদ ১৩৫৩
১৫ই আগস্টের কবিতা	রঙমশাল	ভাদ্র ১৩৫৪
পোড়াছায়া	মৌচাক	শ্রাবণ ১৩৫৫
দাঁড়ির গল্প	আবাহন	শারদ ১৩৫৫
দু-আনা আর দু-পয়সা	মৌচাক	মাঘ ১৩৫৫
ভীরু	মৌচাক	শারদ ১৩৫৭
গল্প চুরির গল্প	মৌচাক	বৈশাখ ১৩৫৯
বিপদ আর বন্ধু	পরশমণি	শারদ ১৩৫৯
সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা	মৌচাক	বৈশাখ ১৩৬০
ঠাকুমার গোসা	আগামি	শারদ ১৩৬০
ম্যাজিক	মৌচাক	শারদ ১৩৬০
কাণ্ড কারখানা	মৌচাক	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১
অলৌকিক লৌকিকতা	পাতাবাহার	আশ্বিন ১৩৬২

বাজি	মৌচাক	বৈশাখ ১৩৬৩
হাওয়া বদলের ফলাফল	নবপত্রিকা	শারদ ১৩৬৪

অনুবাদ গল্প:

পিংপং	রঙমশাল	শ্রাবণ ১৩৫৪

ছেলেবেলার গল্প:

শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প	মৌচাক	আষাঢ় ১৩৬৪
আমার কান্না	রঙমশাল	কার্তিক ১৩৫২
পুরস্কার	আগামি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯
বড় হওয়ার দায়	আগামি	ভাদ্র ১৩৫৯

কবিতা:

জীবন মরণ	পাঠশালা	ফাল্গুন ১৩৫৮
শারদীয়া	অরুণোদয়	কার্তিক ১৩৫৯

প্রবন্ধ:

শিল্পসাহিত্য 'সৃষ্টি' কেন	অরুণোদয়	অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
ছোটোদের বড়োদের ছোটগল্প	?	?

মানিকের সমগ্র কিশোর রচনাগুলি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত রচনাবলির একাদশ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। রচনাগুলির তথ্য ঐ একাদশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশ থেকে প্রাপ্ত।[৩৯]

তথ্যসূত্র:

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১০ ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ. ৬৪৬।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৭।

৩. 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪।

৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫০।

৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১১ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৭৭৫।

৭. কৃষ্ণা বসু, *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: শিল্পরূপ ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ১৬৩।

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ১১ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ৭৯৭-৭৯৯।

৯. কৃষ্ণা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।

১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, সম্পা: যুগান্তর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃপৃ. ৬৩-৬৪।

১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপন্যাসের কথা', *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৫৬।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

১৩. নন্দরাণি চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা : অসমাপ্ত অন্বেষণ*, মুখাবয়ব, (মানিক শতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৮, পৃ. ১৯৫।

১৪. প্রভাত মিশ্র, *'বিরহী ধ্বনি'র কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অরূপরতন (মানিক শতবার্ষিকী সংখ্যা), সম্পা: আজাহারুদ্দীন খান, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ২০০৮, পৃ. ৩৫৯।

১৫. ছন্দপতন।

১৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ।

১৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

১৮. রিঙ্কি চক্রবর্তী, *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অঞ্জলি, ২০১০, পৃ. ১৭৫।

১৯. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৩২. রিঙ্কি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৩৩. *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, পূর্বোক্ত, পৃ.

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ২৪১-৩০৬।

৩৫. *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*, সম্পা- যুগান্তর চক্রবর্তী, দে'জ, ১৯৯০, পৃ. ২১।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

৩৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১১ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ৮০২-৮০৫।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ৮০৬-৮১২।

সপ্তম অধ্যায়

কথাসাহিত্যের নূতন শৈলী: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যের নূতন শৈলী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন হল অবিচ্ছিন্ন এক নিরন্তর গতি ও বিবর্তন। জীবনে কোন স্থির সত্য নেই, সাহিত্যেও তেমনি অপরিবর্তনীয় স্থির কিছু নেই। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি ঘটে মানব জীবনের। জীবন থেকে উদ্ভুত সাহিত্যের মধ্যেও স্থির বা ধ্রুব কিছু নেই। বিষয়ে-ভাবনায়-আঙ্গিকে সাহিত্যের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে চলে সময়ের দাবিকে অঙ্গীকার করে। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে এই পরিবর্তন বা নতুনত্বের ঝোঁক বা আধুনিকতা একটি চর্চিত বিষয়। আর আজ অবধি আধুনিকতার মাপকাঠি নিয়ে চর্চা সীমাহীন। আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে মনে রেখেও (আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে) একথা ভুললে চলবেনা যে, আধুনিকতা সময়কে অস্বীকার করে আসেনা, কেননা আধুনিকতার চেতনা একটি সময় আশ্রিত বিবর্তনধর্মী রূপ। বাংলা কথাসাহিত্যে এই আধুনিকতা সময় নির্ভর বিবর্তনের পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই আধুনিকতা স্বরূপত সময় নির্ভর নয়, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপের অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এই কারণে একই সময় পর্বে উপস্থিত বিভিন্ন লেখকের কথাসাহিত্যে আধুনিকতার বিচিত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-জগদীশ গুপ্ত এবং কল্লোল গোষ্ঠীর মধ্যে পল্লবিত আধুনিকতার বৈচিত্র্যধর্মী অভিব্যক্তিকে অনুধাবন করতে পারলে সেই প্রেক্ষাপটে মানিকের কথাসাহিত্যের আধুনিকতা বা নূতনত্বের স্বরূপ-তাৎপর্য আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে —

> মানিকের আধুনিকতা নিতান্ত 'স্বয়ংসিদ্ধ' নয়, তার মধ্যে তাঁর সমকালের বা অব্যবহিত পূর্বকালের লেখকদের আধুনিকতার প্রতিফলন চোখে পড়ে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কেবল 'Belated Kallolean' বা 'কল্লোলের কূলবর্ধন'। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে যে আধুনিকতার ধারা ক্রমপ্রসারিত হয়েছে, মানিক সেই ধারাতেই এক প্রবল স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত তরঙ্গবেগ — কেবল কল্লোল-এর সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতার গূঢ় আত্মীয়তা, একথা সত্য নয়। 'আধুনিক' মানিকের সত্তার গভীরে খুঁজলে তাঁর পূর্বসূরীদের অনেকেরই হয়তো দেখা মিলবে। আবার 'আধুনিকতা'র এই ধারাবাহিক ঐতিহ্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানিক এক উন্নতশীর্ষ অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।[১]

বিশ শতকের কথাসাহিত্যে মানিকের পূর্বে আধুনিকতার একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। বিষয় এবং আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেই ভাবনার জগতে পরিবর্তন যেমন নতুন নতুন বিষয়ের আমদানি করেছিল, বিষয়ের প্রকাশরূপ আঙ্গিকের শৈলীগত পরিবর্তনও ছিল অনিবার্য। এই পরিবর্তনের অন্যতম পথিকৃত রবীন্দ্রনাথ। *চোখের বালি* র মধ্য দিয়ে যে আধুনিকতার সূচনা, *চতুরঙ্গে* তার রূপ আরো পরিস্ফুট। *চতুরঙ্গে* ব্যক্তির সুতীব্র আত্মজিজ্ঞাসা, চেতনা-অবচেতনায় সুকঠিন দ্বন্দ্ব, অনিকেত নিঃসঙ্গ নিঃসমাজ সত্তার অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি আধুকিতার এই সুচিহ্নিত লক্ষণগুলি মানিকের প্রথম পর্যায়ের রচনায় আরো জোরালোভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। লেখকভেদে আধুনিকতার রূপভেদ ঘটেছে বার বার।

শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা তাঁর একান্ত জীবনসংলগ্নতায়; অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মহিমার প্রকাশে। তিনি সামাজিক কুসংস্কারের ও শোষণের গণ্ডি পেরিয়ে এক সুস্থ মানবপ্রীতিময় সমাজ ভাবনার প্রকাশে আধুনিকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মধ্যে জীবন সংলগ্নতার যে আধুনিকতা চোখে পড়ে সেই প্রবণতাকে আরো অনুপুঙ্খতায় সুনির্দিষ্ট করে প্রকাশ করেছেন আঞ্চলিক সাহিত্য স্রষ্টা শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর। মানিকের পূর্বসূরীদের মধ্যে কল্লোল লেখকগোষ্ঠী বিশেষভাবে আধুনিকতার প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল বাংলা সাহিত্যে। সেদিনের তরুণ লেখকগোষ্ঠী কিছুটা হলেও বিষয় এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নূতনত্ব সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথাগত মূল্যচেতনার ভাঙনের ও সংশয়ী সিনিক্যাল দৃষ্টির ইঙ্গিত পরিস্ফুট এঁদের লেখায়। মানিক কল্লোলের আধুনিক জীবনদৃষ্টির দ্বারা অনেকখানি উদ্দীপিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই আবার কল্লোলের অসঙ্গত উল্লাস ও রোমাণ্টিক ন্যকামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন —

> সাহিত্যে ঐ 'আধুনিক' মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচন্ড সোরগোল তুলে, প্রায় একটা বিপ্লব-মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য দিকপালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিল তারুণ্যের এই বল্গাহীন সাহিত্যিক অভিযানে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল...
>
> বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিলনা — সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারেনা। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুপন্থী আদর্শ কল্লোল-কালিকলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।[২]

কথাসাহিত্যে মানিক তাঁর পূর্বসূরীদের চোখের আলোয় আধুনিকতার রূপটিকে নিশ্চই দেখেছেন। তবে তাঁর আত্মীয়তা সবচেয়ে বেশি ছিল জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে। পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব স্বতন্ত্র নির্বিকার মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে প্রথম থেকেই করে তুলেছিল ভিন্নতর। মানিকের সাহিত্য আলোচনাকালে প্রথমেই মনে আসে তাঁর জীবন সম্পর্কে বিশেষ মনোভঙ্গি বা Attitude-এর কথা। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। তিনি কিভাবে জীবনকে দেখেছেন, কি তিনি জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন, কি তিনি বর্জন করেছেন, তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন নৈতিক বোধে বিশিষ্ট্য — এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেই তাঁর শিল্পী সত্তার রহস্যটিকে বুঝে নেওয়া সম্ভব। মানিকের শিল্পী স্বভাবের স্বতন্ত্র লক্ষণগুলি ক্রম উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। মানিকের পাঠক মাত্রই জানেন, মোটামুটিভাবে তাঁর রচনার প্রথম পর্যায়ে ফ্রয়েড অনুসারে অবচেতনাশ্রয়ী জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই পর্বেই আবার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ছবি (*পদ্মানদীর মাঝি* এবং *শহরতলী*) উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর পরবর্তীকালের রচনায় শ্রমজীবীদের উপর শ্রেণিবৈষম্যজাত পীড়ন ও বঞ্চনা এবং প্রতিরোধ ও

শ্রেণিসংগ্রামের মনোভাব মুখ্য উপাদান স্বরূপ গৃহীত হয়েছে। কথাসাহিত্যের উপকরণ হিসেবে এগুলি সবই আধুনিক। তবে বিষয় নির্বাচনের এই গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, মানিকের যথার্থ আধুনিকতা তাঁর জীবনসংক্রান্ত মৌল দৃষ্টিভঙ্গিতে, এবং সেই দৃষ্টির বিন্যাসের উপযোগী আধুনিক শিল্পরীতির প্রয়োগে।[৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লেখক যিনি জীবনকে বাস্তবের ভূমিতে দেখেছেন, বাস্তবের গভীরে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অভ্যন্তরে গোপনললিত যে জীবন প্রবাহ, তার মধ্যে তিনি জীবনের রহস্য সন্ধান করেছেন। তিনি দুঃসাহসী লেখক, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা অন্বেষণে সদাতৎপর। আর সে কারণেই আপাত সিদ্ধিকে পিছনে ফেলে সত্যকে জানার ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলেন, উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি নিয়ে বারবার দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেন।[৪] বিজ্ঞানীর মতো নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি যেমন জীবন ও জগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেমন চিরে চিরে টুকরো করে বিশ্লেষণ করেছেন নর-নারীর জীবনকে, সেইসঙ্গে আবার সবকিছুকে একটি বোধের সূত্রে সমগ্রতায় গেঁথে তোলার প্রবণতা তাঁর উপন্যাসের প্রকরণে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম থেকেই মানিকের উপন্যাসে চোখে পড়ে নিটোল কোন গল্প গড়ে তোলার দিকে তাঁর বিপরীত প্রবণতা। অর্থাৎ কাহিনির মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত কোন সুঠাম শরীর, কোন সুনির্দিষ্ট পরিনাম না থাকা। বেশ কিছুটা ছড়ানো ছিটানো বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গল্পের একটা আলগা বুনুনি, তারই মধ্যে নরনারীর পারস্পরিক বিচিত্র জীবনকে বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিসত্তার গভীরে গূঢ় গোপন চৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস থেকেই আমরা এই প্রকরণ শৈলীটির সন্ধান পাই। উপন্যাসের নাম *দিবারাত্রির কাব্য*। উপন্যাসটির নামের মধ্যেই কবিতার লক্ষণ আভাসিত হয়েছে। তবে *দিবারাত্রির কাব্য* অবশ্যই উপন্যাস, কবিতা নয়। তবে এও ঠিক যে উপন্যাসটিতে প্রচলিত লক্ষণ নেই বললেই চলে। তাই মানিক সূচনায় জানিয়েছেন — এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনি। উপন্যাসের Content-এ জীবনধর্মী কাহিনির বদলে ব্যক্তির জটিল অস্বাভাবিক মনোলোক একান্তভাবে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই চরিত্রগুলিও ঠিক স্বাভাবিক হতে পারেনি। চরিত্রগুলি যেন কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection, মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ। উপন্যাসটির কাহিনি ও চরিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে আছে আধুনিক যুগের মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গ মনের অনিকেত চেতনা। সব মিলিয়ে জীবন সম্পর্কে অর্থহীনতা ও নিস্ফলতার বোধ উপন্যাসের গঠনশৈলীতে কাহিনি অংশের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করেছে ভূমিকা-কবিতাগুলি। চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম অনুসন্ধান কাব্যধর্মী প্রকরণ শৈলীতে অনেক বেশি মানানসই হয়েছে। যেহেতু আধুনিক মানুষের মনোজগৎ গূঢ় রহস্যময় অনির্দেশ্য কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তাই তার প্রকাশ বাস্তবধর্মী উপন্যাসের প্রচলিত রীতিতে না হয়ে ব্যঞ্জণাময় প্রতীকী শিল্পরীতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

মানিকের জনপ্রিয়তম উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথা*। উপন্যাসটির গুরুত্ব শুধুমাত্র আধুনিক বিষয় ভাবনায় নয়, গঠনশৈলীতেও। ইতিকথা অর্থে কোন বৃহৎ প্রসারিত প্রেক্ষাপটে জীবনের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রচনা এখানে নেই। এখানে ইতিকথার তাৎপর্য আলাদা। এখানে বঙ্কিমী ধরনের ঘটনা সংঘাত ও নাটকীয়তা নেই, তার বদলে খণ্ড খণ্ড কয়েকটি উপিসোডের সমাবেশ। আর সবকটি এপিসোড নিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাস। এপিসোড গুলিকে নায়কের জীবনের চলমান অভিজ্ঞতার প্রবাহ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক শশীর কাহিনি কেবল তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গল্প নয়, তার মানস দর্পণে প্রতিফলিত বিভিন্ন নর-নারীর জীবনের বিচিত্র ঘটনার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। সব মিলিয়ে এই যে বিভিন্ন খণ্ড এপিসোড — এর সঙ্গে নায়কের জীবন অভিজ্ঞতার চলমান প্রবাহকে অঙ্গীভূত করে দেখানো — এরই মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে জীবনের ইতিকথার আবহমান এক চলিষ্ণু রূপ। বিশ শতকের সাধারণ উপন্যাসগুলির যে আধুনিক প্রবণতা — ঘটনার বিরলতা ও বর্ণবাহুল্য বর্জন করে ব্যক্তির অন্তর্লোকের অধিকতর রূপায়ণ, তা মানিকের উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। উপন্যাসের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানা দিক থেকে মানিক পুরানো রীতি বর্জন করেছেন।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটির শৈলীগত অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যের পাঠককে চমকে দিয়েছিল। আয়তনে ছোট হলেও উপন্যাসটির পটভূমি অনেকবেশি প্রসারিত। এই উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে কেবল কেতুপুর গ্রামই সংশ্লিষ্ট নয়, বাংলা দেশের এক বিস্তীর্ণ জনজীবন ও জীবনবোধ সংযুক্ত হয়ে আছে পদ্মানদীর আখ্যানে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্দাম উধাও পদ্মানদী এবং সুদূর অন্তহীন সমুদ্র বেষ্টিত ময়নাদ্বীপ। উপন্যাসের আঞ্চলিকতার ধারায় মানিক যুক্ত করলেন নূতন মাত্রা। পদ্মাতীরবর্তী গ্রামজীবনের এক সুনির্দিষ্ট পট, সেখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ মাঝি-জেলেদের জীবিকার কঠিন সংগ্রামের বর্ণনা, প্রকৃতি ও মানুষের সহযোগ ও সংঘাতের চিত্র, আঞ্চলিক ব্যূহবদ্ধ নর-নারীর আচার-আচরণ, পূর্ববঙ্গীয় সমাজের মাটিঘেঁষা বাস্তবতা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার সজীব লক্ষণকে চিহ্নিত করেছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তাল পদ্মার দূরন্ত রূপ এবং জেলে-মাঝিদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারের ছবি, তাদের ভাঙাঘর ও জেলে-মাঝিদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারের ছবি, তাদের ভাঙাঘর ও জলে ডোবা কর্দমাক্ত পথ-ঘাট, এক কথায় সমগ্র ধীবর পল্লী — সব মিলিয়ে পদ্মাতীরের এক সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক পটচিত্র সজীব ডিটেল-ধর্মী ন্যারেটিভ শিল্প-শৈলীতে রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রকরণে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল ভাষা - সংলাপ। পদ্মা ও তার তীরবর্তী অঞ্চলের জল হাওয়া মাটির স্পর্শ যুক্ত ভাষার প্রসাধনমুক্ত রূপ পাঠককে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। বাংলা উপন্যাসে পূর্ববঙ্গীয় সংলাপের এমন সার্থক শিল্পসফল প্রয়োগ ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি।

পরবর্তী সময়ে মানিক রচিত উপন্যাসে জীবন বাস্তবতায় নতুনতর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তা মূলত মার্কসীয় দৃষ্টি প্রভাবিত শ্রেণিসচেতনতা ও সমাজ-অর্থনীতির চেতনাশ্রয়ী উপন্যাস। এই পর্বের

উপন্যাসগুলির শৈলীগত সাধারণ লক্ষণগুলি আলোচনা করলে ঔপন্যাসিক মানিকের প্রকরণ চেতনার ধারণাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

এই পর্বের উপন্যাসের উপাদানবৈচিত্র্য খুব বেশি না হলেও তা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনধারায় বিধৃত এবং পরিণামে শ্রেণি সচেতন সমাজ গঠনের আহ্বান। তিনি প্রায় একই ভঙ্গিতে কাহিনি বিন্যাস করেছেন এই পর্বে। মানিকের সকল পর্যায়ের উপন্যাসেই কাহিনির গুরুত্ব কম। এই বৈশিষ্ট আরো বেশি প্রত্যক্ষ হয় উত্তর কালের উপন্যাসগুলিতে। এই উপন্যাসগুলির কাহিনি অখণ্ড ঘটনা প্রবাহ নয়, বিক্ষিপ্ত কিছু টুকরো আখ্যানের সংযোগ মাত্র। একটি প্রধান চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের খণ্ড আপাত বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনাকে দেখার শিল্পীত অবয়ব অথবা একটি বা দুটি চরিত্রকে মাঝখানে রেখে তার চারপাশে নানা মানুষের নানাধরনের আখ্যানের জাল বোনা। *'দর্পণ', 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'পাশাপাশি', 'সার্বজনীন', 'আরোগ্য', 'শুভাশুভ', 'হরফ'* ইত্যাদি উপন্যাসে এই শৈলীগত বৈশিষ্টটি লক্ষ্যণীয়।

এই পর্বের উপন্যাসের সূচনা বিন্দু অনেকটা ছোটগল্পের মতো। প্রথাবদ্ধ উপন্যাসের কাহিনি আরম্ভের প্রচলিত রীতির বদলে এখানে দেখা যায় কোন একটি ঘটনা বা পরিস্থিতির মাঝখান থেকে শুরু হচ্ছে যেন উপন্যাসটি। তার ফলে একটি খাপছাড়া আকস্মিকতার অনুভব কখনো কখনো পাঠকের মনে জেগে উঠতে পারে। মানিকের উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণগত লক্ষণ হল উপন্যাসের দেহে ছোটগল্পের উপস্থিতি। এই পর্বে লেখক কোন কোন উপন্যাস-শরীর এমনভাবে নির্মাণ করেছিলেন যে, তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে ছিল ছোটগল্পের অবয়বের নিশ্চিত আভাস। তবে এই প্রবণতা নিছক প্রক্ষিপ্ত বা আরোপিত নয়। আর এর ফলেই দেখা দিয়েছে একটি উপন্যাস ভেঙে একাধিক ছোট গল্প *'আরোগ্য' ,'সার্বজনীন','পাশাপাশি', 'হলুদ নদী সবুজ বর্ন'* ইত্যাদি উপন্যাসের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য। অনেকের মনে হতে পারে, জীবনের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ লেখকের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতার অভাব ঘটেছিল, তারফলেই এধরনের অবাঞ্ছিত পরিণতি। কিন্তু ঔপন্যাসিক মানিকের সমগ্র জীবনের আবহমান রূপাটিকে লক্ষ্য করলে এর প্রকৃত কারণ হয়তো ধরা পড়বে। উপন্যাস তাঁর কাছে কোন অখণ্ড কাহিনি ধারা নয়, তথাকথিত নায়ক-নায়িকার জীবনের একটি সুসংবদ্ধ সুগ্রন্থিত বিন্যাসমাত্র নয় — তাঁর উপন্যাস জীবনের এক চলমান শোভাযাত্রা। অজস্র নর-নারীর সমস্যাক্ষুব্ধ গ্রন্থিল জীবনের আপাত খন্ডিত প্রকীর্ণ ছবির সমাহারে রচিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসধৃত ল্যান্ডস্কেপ-ধর্মী ছাড়ানো জীবনের সংবেদন।[৫]

বেশিরভাগ উপন্যাসে মানিক মননের একটি আবহাওয়া তৈরি করেন। মানিকের কথাসাহিত্যের এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানিকের এই মনন বিষয়টি সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ব ঘটিত। দর্শনের বিষয়তো আছেই, ফ্রয়েড ও মার্কসের কথা এসেছে। সেই সঙ্গে পাভলভ ও আলফ্রেড অ্যাডলারের মনোবিশ্লেষণ মূলক চিন্তার প্রভাব আমরা যেমন পাই, তেমনি এঙ্গেলসের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশ্লেষণ

এই মননধর্মীতার অন্যতম লক্ষণ। মানিকের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রে আংশিক, রবীন্দ্রনাথে ও জগদীশ গুপ্তের লেখায় মনস্তত্ব বিশ্লেষণী রীতির নিপুণ ব্যবহার আমরা দেখেছি। উপন্যাসে মনস্তাত্বিকতা ও চেতনাপ্রবাহ রীতির ব্যবহার মানিকের সাহিত্যের অন্যতম স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের ব্যবহারে মানিক সামগ্রিকতা অর্জন করেছেন। যে মানুষ মনের ধার ধারেনা, অর্থাৎ মনটাই যাদের প্রধান নয়, আত্মসমীক্ষা, কূপমুন্ডকতা যাদের স্বভাব সঙ্গত, যারা সহজ বুদ্ধির, কর্মের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে-ডুবে চলেছে, তারাও উপন্যাসে যখন সামনে এসেছে বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্ররাও মনোবিশ্লেষণে আলোকিত হয়ে উঠেছেন। মানুষের মনের মধ্যে ক্রমাগত যেসব টানাপোড়েন ও সংকট ঘনীভূত হয়, যে বক্রতা ও জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয় তা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও তীক্ষ্ণ নির্লিপ্ত ভাষায় মানিক তুলে ধরেন। মানিক নির্দিষ্ট কোন মতবাদের কাছে তাঁর কথাসাহিত্যের পাঠ নেননি। জীবন থেকেই তিনি গল্প-উপন্যাসের উপাদান নিয়েছিলেন। তাই মনোবিশ্লেষণ রীতির ব্যবহার করেও তিনি নাটককে বর্জন করেননি। কারণ জীবনে রয়েছে নাটক প্রবলভাবে। তাই তিনি বিশ্লেষণি সুতোয় উত্তেজক ঘটনা ও নাটকের মালা গেঁথেছেন।

মানিকের অনেক উপন্যাস চরিত্র কেন্দ্রিক। একটি চরিত্রকে ঘিরে বহুল আয়োজন। কখনো তার ব্যক্তিগত সমস্যাবহুল জীবন সমস্যার প্রতিফলন, কখনো বহুল জীবন সমস্যায় নিজের অনুভূতির সঞ্জীবায়ন। মানিক কোন মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনা করেননি, কিন্তু যেভাবে এপিসোডিক রীতিতে বিভিন্ন উপন্যাসের পাতায় পাতায় জীবনচিত্র অঙ্কণ করেছেন তা যেন বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকের বাঙালি জীবনের মহাকাব্য। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের মতো বর্ণনার শৈলী তিনি গ্রহণ করেননি। করলেও তা অল্প। বর্ণনার বিষয়ে তিনি কৃপণ। বর্ণনার দৃশ্য তাঁর হাতে ছিল অনেক — সমুদ্র, মহোনা, নদী, জলপ্রপাত, সুন্দরবন, বাঘ শিকার ও আরো অনেক কিছু। কিন্তু আত্মহারা বর্ণনার লোভ তিনি সংবরণ করেছেন। বরং পরিবেশের মধ্যে চরিত্রকে সন্নিবিশ্ট করে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে জীবন রহস্যের সন্ধানে ও সমাধানে তিনি অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। মানিকের অনেক উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তি চমকিত হওয়ার মতো। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আকস্মিক ও বিস্ফারিত। পড়তে গিয়ে পাঠক একেবারে বিষ্মিত হয়। *পুতুল নাচের ইতিকথা*র সূচনায় বজ্রাহত হয়ে হারু ঘোষের মৃত্যু, পদ্মানদীর সমাপ্তিতে ময়না দ্বীপগামী কুবেরের সঙ্গে হঠাৎ নৌকায় কপিলার চড়ে বসা ইত্যাদি। অনেক সময় মনে হয় সমাধানহীন, পরিনামহীন জীবনের অনির্দেশ্য নিয়তির প্রতি আকর্ষণের ফলে মানিক এধরনের শিল্প প্রকরণ ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসে মানিকের ভাষা প্রয়োগ একেবারে অনন্য। মানিক তাঁর ভাষারীতির জন্যই পাঠককে বেশি টানতে সক্ষম হয়েছেন। বিষয় অনুযায়ী এবং চরিত্র গুলির পরিচয় অনুযায়ী মানিক ভাষাশৈলীকে ব্যবহার করেছেন। একজন সার্থক কবিকে যেমন করে শব্দের প্রতি যত্নশীল হতে হয়, মানিক নিরলস প্রচেষ্টায় সেভাবেই ভাষার চালচিত্র নির্মাণ করেছেন। মানিকের ভাষায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা-বক্রতা

আবেগকে শাসন করেছে, যুক্তির পাকে পাকে ভাবনা জটিল হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনবোধে ভাষাকে তিনি কাব্য সুরভিত করেছেন। আবার নাটকীয়তা প্রকাশের সময়ও দেখা যায় চরিত্রগুলির দ্বান্দ্বিক কলরব। বেশিরভাগ সময়ে মানিকের ভাষা সুমিত ও সংক্ষিপ্ত। উত্তরকালের মানিকের রচনার ভাষা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সময়ে তিনি মার্কসবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত একজন লেখক-মানুষ, যিনি সাহিত্য রচনার থেকেও জীবনের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ।

মানিকের ছোটগল্প গুলিতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, মানব মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান, স্বচ্ছ সমাজচিন্তা ও বিজ্ঞান মনস্ক মুক্ত মনের পরিচয় আমরা পাই। তাঁর প্রথম পর্বের ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনচিন্তা প্রভাবিত গল্পগুলিতে যেমন, উত্তরকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির পীড়িত শ্রেণিচেতনার গল্পেও তেমনভাবে আমরা পাই। মানিকের গল্পের রচনাশৈলীতে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার গঠনের মধ্যে দেখা যায়। মানিকের উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ, সবসময় অখন্ড কাহিনি ধারা উপস্থিত থাকেনা, অনেক সময়ে আপাত খন্ড কতগুলি কাহিনির সমবায়ে উপন্যাস দেহ নির্মিত হয়। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসের নানা অংশকে আলাদা করে কতগুলি ছোটগল্পের রূপ উপভোগ করা যেতে পারে। নিজের উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে এই সচেতনতার জন্যই তিনি একটি উপন্যাসের মৌচাক থেকে একাধিক মধু সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এধরনের সংগ্রহের দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় — *আরোগ্য, সার্বজনীন, পাশাপাশি, হলুদনদী সবুজবন, শান্তিলতা* ইত্যাদি উপন্যাসে।

শুধু উপন্যাস থেকে গল্প নয়, এর বিপরীত পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষা করেছেন মানিক। কোন একটি গল্প লেখার পর তার মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে পরবর্তী সময়ে সেই গল্প অবলম্বন করে বড়ো আকারের উপন্যাস গড়ে তুলেছেন। হয়তো এ গল্পটি না লিখলে উপন্যাসটির ভাবনা তাঁর পরিকল্পনায় কোনোদিন আসত না। তবে উপন্যাস ভেঙে গল্প রচনা করার দৃষ্টান্তই বেশি দেখা যায়। মানিকের এই প্রবণতাকে নিছক সম্পাদকের তাগিদ বা অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য অতিরিক্ত লেখালিখির মধ্যে ছোটগল্পের থিম অন্বেষণের স্থূল প্রচেষ্টা বলে উপেক্ষা করা সংগত হবেনা। এর মধ্যে আসলে মানিকের জীবন ও শিল্পরীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের কাহিনি তাঁর কাছে সুসংবদ্ধ এবং অখণ্ডরূপে বিন্যস্ত নয়, তা নানা খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার দৃঢ় বন্ধনহীন এক গ্রন্থিতে যুক্ত। তাই হয়তো মানিক প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা ছোট আকারের গল্পের দিকে যতটা বেশি, বড় আকারের উপন্যাসের দিকে ততটা নয়।

মানিকের ছোটগল্পের শৈলীতে নিরাবেগ ভাষা ও সংক্ষিপ্ততা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। বাহুল্য বর্জিত ও বলিষ্ঠ এই ভাষা তাঁর গল্পগুলিকে দিয়েছে সংহত দীপ্তি। তাঁর গল্পের গদ্য ভাবাবেগ বর্জিত, অনলঙ্কৃত এবং বিষয়পোযোগি। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ তার গল্পে যে ন্যারেটিভ লক্ষণযুক্ত কথকতাধর্মী ভাষা চোখে পড়ে, তা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানিকের ভাষাভঙ্গি — সংহত, তির্যক ও ইঙ্গিতধর্মী।

মানিকের ভাষা নিরুচ্ছ্বাস, নিরাসক্ত, শুষ্ক ও ঋজু। বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের প্রকাশ গল্পগুলিতে উপযুক্ত ভাষা কাঠামোকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে।

মানিক তাঁর ছোটগল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সমকালীন পরিপার্শ্ব থেকে। তাই যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রমিক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মধ্যবিত্তের নানা চারিত্রিক অসঙ্গতি ইত্যাদি সমকালীন জীবনের বহুবিচ্ছুরিত বর্ণমালা তাঁর ছোটগল্পে যথাযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে। পাঠককে নিছক গল্প শোনাতে মানিক এই গল্পগুলি লেখন নি। সমাজ সচেতন দায়িত্বশীল লেখক-মানুষ হিসেব তিনি সমস্ত শ্রেণির মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন আমাদের জীবনের বাস্তব ছবি। দেখাতে চেয়েছেন আপাত সত্যের আড়ালে প্রকৃত সত্যকে। তার ফলে মনোলোভন, নরম, নিটোল, সুগোল, মিষ্টি গল্প তিনি কোনদিনই লেখেননি। কি গল্পের কাঠামোতে, কি গল্পের সূচনা ও পরিণতিতে, কি সংলাপে ও ভাষায়, কি বর্ণনায় ও উপস্থাপনে তাঁর চরিত্রের মতোই তাঁর ছোটগল্পের শৈলীও স্বতন্ত্র। মানিকের কথা সাহিত্যের শৈলীর স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকের একটি মন্তব্য করে এই অংশের আলোচনা সমাপ্ত করছি —

> মানিকই প্রথম পৌনে এক শতাব্দী আগে বাঙালি উপন্যাস পাঠকদের হকচকিয়ে দেন। উপন্যাস পাঠের উপভোগ, আনন্দ, স্বস্তি আর আরামকে আয়াসপ্রাপ্য করে তোলেন। উপন্যাস পাঠে স্তরান্তর ঘটান; প্রবন্ধ, মননশীল রচনা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতির সঙ্গে কথাসাহিত্যের তফাৎ কমিয়ে আনেন। উপন্যাসের ধারণাটিকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। আমি মনে করি, শুদ্ধ সাহিত্যের ভাবনা মানিক পাঠকের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। একালের ইতিহাস, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, মনঃস্তত্ত্ব সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল, যেন সাহিত্য ঠিক কি বস্তু সেটা আর নির্ধারণ করা যায় না... উপন্যাসে একটা নতুন পথ মানিক যেন জোর করে দেগে দেন। সাহিত্যে কল্পনাবৃত্তি, সৃজনবৃত্তি, উদ্ভাবনী বৃত্তির সঙ্গে মেশে বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের শুকনো নিরস আরো কিছু ভিন্নতর বৃত্তি। ব্যবচ্ছেদে শল্য-চিকিৎসকের হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরির যে কাজ, অনেকটা সেভাবেই বুদ্ধিকে উপন্যাসের উপজীব্য জীবন ও সমাজের তন্ন তন্ন বিচার ব্যবহার করতে চাইলেন মানিক।[৬]

তথ্যসূত্র:

১. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ, ২০০৮, পৃ. ১০।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং,* দীপ প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ১৩২।

৩. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৪. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যয়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ, ২০০৫, পৃ. ৮১।

৫. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৬. হাসান আহিজুল হক, মানিকের কথা - গদ্যবাস্তবের ভিতর পিঠ, উত্তরাধিকার (মানিক শতবার্ষিকী সংখ্যা), সম্পা. সৈয়দ মোহাম্মদ শায়েদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৮৬।

উপসংহার

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: সময় ও সাহিত্য" বিষয়ে এই গবেষণা পত্রে আমরা শিল্পী মানিকের সাহিত্যজীবনকে ও ব্যক্তিজীবনকে সমকালীন সময়ের পটে স্থাপন করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। গবেষণার প্রস্তাবনাপত্রে আমরা জানিয়েছিলাম, সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে মানিকের জীবন ও সাহিত্যকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করে সাহিত্যিকের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন রীতি গড়ে তোলার প্রয়াস থাকবে আমাদের। যেখানে একই পাতায় ফুটে উঠেছে সময়ের এক একটি অধ্যায় তার সমকালীন ইতিবৃত্তকে অঙ্গীকার করে। সময়ের প্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থাপন করে তাঁর জীবন-সংগ্রাম ও সাহিত্য চর্চার একটি সম্পূর্ণ ইতিকথা রচনা করেছি আমরা। মানিকের সাহিত্য জীবনকে তাঁর সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রেখে আলোচনা করার এই প্রয়াস আমাদের কাছে অভিনব মনে হয়েছে।

যেকোন শিল্পী তাঁর সময়ের পরিধিতে লগ্ন হয়েই, 'হয়ে' ওঠেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে নির্মিতি দেয় তাঁর 'সময়'। মানিকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। খুব সচেতনভাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কলমপেষার পেশা। নিজের প্রতিভায় ও পরিশ্রমের ক্ষমতায় সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী পথের বিস্ময়কর প্রতিভা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র আটচল্লিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবন। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মানিকের প্রবল উপস্থিতি ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত। লিখলেন প্রায় ৪০টি উপন্যাস ও ৩০৫টি ছোটগল্প ছাড়াও কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখার রূঢ় বাস্তবতা, যা অনেক সময়ই সহনীয়তার সীমারেখা যেন অতিক্রম করে যায়, দ্ব্যর্থহীন সত্যের তীব্র আলোর নীচে জীবনের বিবর্ণতাকে মেলে ধরার তীক্ষ্ণতা নির্দয় রূপ নেয়, রাখা-ঢাকা দিয়ে মন রেখে কথা বলার আদব কায়দাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই যেন মানিকের কলম তুলে নেওয়া। আবেগপ্রবণ মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একেবারে বিপরীত প্রান্তে যেন তাঁর স্বকীয়তাপূর্ণ অবস্থান। সমাজের সব স্তরের সব ধরনের মানুষের জীবন থেকে তিনি তাঁর সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কখনও হেঁটেছেন মজুরদের মিছিলে, কখনও আবার পা মিলিয়েছেন ছাত্রদের শ্লোগানের সঙ্গে — যে কোনও রাজনৈতিক বা সমসাময়িক ঘটনাকে তুলে নিয়ে শিল্পীর নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের ক্ষতে ভরা মুখখানার সামনে আয়না ধরতে চেয়েছিলেন তিনি — ভেবেছিলেন সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। দুই মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে মানিকের রচনায়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি, বাস্তবতার প্রবল দ্বন্দ্বে-সংশয়ে, বিশ্বাসে, সাহসিকতায়; আবার অসহায় আত্মসমর্পণে আন্দোলিত হয়েছে। এ সময়ের সচেতন শিল্পী-গল্পকার-কবি-ঔপন্যাসিকরা

নিজেদের বীক্ষা অনুযায়ী তাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাড়া দিয়েছেন। একই সময় ও বাস্তব, পৃথক শিল্প স্ট্রাকচারের জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন জনের হাতে। তাই একই সময়বৃত্তে থেকেও বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকের সাহিত্যের বীক্ষাভূমি কতো আলাদা। মানিকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিই তাঁর সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের সূচক। গত শতাব্দীর তিরিশ, চল্লিশের দশকের বড় ঢেউগুলিকে এমনভাবে সাহিত্যে আর কেউ আনেন নি। সমকালীন সময়বৃত্ত এতো মোটাদাগে ফুটে ওঠেনি আর কোনো শিল্পীর হাতে।

যে কোনো বড় লেখকই তাঁর শিল্পী জীবনে ক্রমশ 'হয়ে' ওঠেন — বহিঃর্জগতের অভিঘাত এবং অন্তর্জগতের চৈতন্যের প্রতিক্রিয়ায় সময়ের পাক্‌চক্রে তাঁর নিরন্তর 'হয়ে' ওঠা। এই 'হয়ে ওঠা' যে সর্বদা সার্থক হয় তা নয়, এমনও দেখা যায়, শৈল্পিক মাত্রায় তা তীর্যক হয়ে গেল। এ সত্বেও ঐ সচলতাটি লক্ষ্যণীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লেখক হিসেবে শিল্পী হিসেবে 'হয়ে উঠে'ছিলেন। এই 'হয়ে ওঠা'র পেছনে অবশ্যই সময়ের অভিঘাত ছিল, ছিল বাস্তব সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের শেষ কয়েক বছর নিদারুণ দারিদ্র্য ও চূড়ান্ত রকমের মানসিক অসুস্থতা এবং নিজের রাজনৈতিক সাথীদের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও, সে সমস্ত মানিকের লেখনীকে স্পর্শ করেনি। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর ক্ষত বিক্ষত জীবনের শেষ দিকের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে শিথিলতা বা শ্রীহীনতার অভিযোগ আছে। কিন্তু মানিকের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আদর্শগত মূল্যবোধের কোনো দৈন্য ও দেউলিয়াপনা তাতে লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশ শতকের তিন, চার ও পাঁচের দশকের উত্তাপ ও দ্রুত পরিবর্তমান সময়ের বিশ্বস্ত আলেখ্য হয়ে আছে তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি। আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সময়ের এই বিবর্তনের ধারায় মানিকের ব্যক্তিজীবনের ও তাঁর শিল্পসৃষ্টির রেখাচিত্র নির্মাণ। এই দীর্ঘ গবেষণাপত্রে আমরা মানিকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন সংগ্রামের তথ্য, সমসাময়িক দেশ-কালের খবর ও সাহিত্যকর্মকে পাশাপাশি রেখে বছর অনুযায়ী কালানুক্রমিকভাবে আলোচনা করেছি। এই কাজ উত্তরকালের সাহিত্যিকের জীবনী ও সাহিত্যের বিশ্লেষণে নতুন ধারা রচনায় সহায়ক হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ:

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র (১ম - ১১দশ খণ্ড)*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

- *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

চক্রবর্তী, যুগান্তর - *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

- *সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বন্দ্বের দুই মুখ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

রায়চৌধুরী, গোপীকানাথ - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি শিল্পরীতি ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, কলকাতা।

- *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দেজ, কলকাতা।

মিত্র, সরোজমোহন - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, কলকাতা।

- *শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, মালিনী - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার - *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ - *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দেজ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, জগদীশ - *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, ভারবী, কলকাতা।

সেন, সুকুমার - *ভারত বিভাগ : ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ*, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা।

- *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)*, আনন্দ, কলকাতা।

চৌধুরী, ভূদেব - *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৪র্থ খণ্ড)*, দেজ, কলকাতা।

গুপ্ত, ক্ষেত্র - *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।

- *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)*, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার - *মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে*, দে'জ, কলকাতা।

- *কালের প্রতিমা*, দে'জ, কলকাতা।

- *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ, কলকাতা।

- *বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা*, দে'জ, কলকাতা।

সময়ের খরস্রোত ও বাংলা উপন্যাস, দে'জ, কলকাতা।

দাশ, ধনঞ্জয় - *বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস*, সম্বোধি, কলকাতা।

- *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, করুণা, কলকাতা।

দাস, শিশির কুমার - *বাংলা ছোটগল্প*, দেজ, কলকাতা।

বসু, দেবকুমার - *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*, আই. পি. পি. কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, আশু - *কল্লোল যুগের পরে*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

পাল, রবীন - *কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, শ্রীভূমি, কলকাতা।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার - *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার, কলকাতা।

সিংহ রায়, জীবেন্দ্র - *কল্লোলের কাল*, দেজ, কলকাতা।

চৌধুরী, ভূদেব - *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ, কলকাতা।

বসু, নিতাই - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ফসল প্রকাশনী, কলকাতা।

- *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

দে, বিশ্বনাথ - *মানিক বিচিত্রা*, সাহিত্যম, কলকাতা।

চৌধুরী, নারায়ণ - *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা।

- *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার - *যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা।

চক্রবর্তী, রিঙ্কি - *বিশ শতকের গণ-আন্দোলন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু - *ছোটগল্পে ত্রয়ী : তারাশঙ্কর : মানিক : বিভূতিভূষণ*, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব - *পুড়ে যায় জীবন নশ্বর*, গণশক্তি, কলকাতা।

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা - *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব*, দি জেনারেল বুকস, কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, মানব - *আধুনিক মননে সাহিত্যভাবনা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

দে, আশিস কুমার - *মানিকের ছোটগল্প : শিল্পীর নবজন্ম*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

সেন, কানাই - *মানিক উপন্যাস : জীবনের জটিলতা*, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা।

আহমেদ, কায়েস - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

বসু, কৃষ্ণা - *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরীতি ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ - *মানিক জিজ্ঞাসা*, রমা প্রকাশনী, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, দিলীপন - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, জলার্ক, কলকাতা।

দত্ত, লিলি - *জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, উত্তরণ, কলকাতা।

ঘোষ, শিখা - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

সরকার আবদুল, মান্নান - *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দত্ত, সরোজ - *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, রত্নাবলী, কলকাতা।

হক, সৈয়দ আজিজুল - *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ চেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

খান, আজাহারউদ্দীন (সম্পা.) - *অরূপরতন*, শব্দের মিছিল, মেদিনীপুর।

রায়, ধনঞ্জয় - *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ, কলকাতা।

মাজী, বিপ্লব - তেভাগা : মেদিনীপুরের সংগ্রাম, মনফকিরা, কলকাতা।

ঘোষ, জ্যোতির্ময় - *শততম মানিক ও কথাসাহিত্যের নানামহল*, একুশ শতক, কলকাতা।

চৌধুরী, নাজমা জেসমিন - *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ - *নির্জনা মন*, ভাষা সাহিত্য, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় - *মার্কস ও মার্কসবাদ*, এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা।

চক্রবর্তী, রাধারমন - *ভারতের রাষ্ট্র চিন্তার বিকাশ : রাজনৈতিক আন্দোলন*, এন. বি. এ, কলকাতা।

পাল, প্রশান্ত - *রবি জীবনী*, আনন্দ, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার - *রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি*, দে'জ, কলকাতা।

আহমেদ, মুজফ্‌ফর - *ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ*, এন. বি. এ., কলকাতা।

পাল, সুকান্ত - *ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ*, এন. বি. এ., কলকাতা।

সেন, রণেন - *ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত*, নবপত্র, কলকাতা।

- *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা*, বিংশ শতাব্দী, কলকাতা।

উমর, বদরুদ্দিন - *ভারতের জাতীয় আন্দোলন*, চিরায়ত, ঢাকা।

রায়, সুপ্রকাশ - *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব - *ভারতের মুক্তি সংগ্রাম*, ইউনাইটেড রাইটার্স, কলকাতা।

ত্রিপাঠী, অমলেশ - *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব*, আনন্দ, কলকাতা।

লাহা, প্রবীরকুমার - *ভারতের সংবাদ পত্র ও গণমাধ্যম ইতিহাসের কালপঞ্জি*, নিউবেঙ্গল প্রেস, কলকাতা।

সমাদ্দার, রণজিৎ কুমার - *ভারতের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সমকালীন সমাজ ও বাংলা সাহিত্য*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

মহাপাত্র, রাজর্ষি - *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েকটি অধ্যায়*, পূর্বাদ্রি, কলকাতা।

কুমার, মৃত্যুঞ্জয় - *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : বিশ্বসংকট বনাম বিশ্বচিন্তা*, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, হরিদাস - *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান*,ফার্মা, কলকাতা।

খাতুন, আশরফি - *চল্লিশের দশকের সময় ও সমাজ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

লাহিড়ী, তারাপদ - *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, এন. বি. এ, কলকাতা।

লাহা, প্রবীরকুমার - *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জি*, নিউ বেঙ্গল, কলকাতা।

রনদিভে, বি. টি. - *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা*, এন. বি. এ, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, আনন্দ - *স্বাধীনতা : স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি*, গাংচিল, কলকাতা।

শিকদার, অশ্রুকুমার - *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, কলকাতা।

পাল, উদয়চাঁদ	-	*দেশ ভাগ ও বাংলা উপন্যাস,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ।
ইসলাম, তাজ-উল	-	*ঔপনিবেশিক বাংলা,* প্যাপিরাস, কলকাতা।
মনজুর, নুরুল ইসলাম	-	*বাঙালীর ইতিহাস চর্চার ধারা ১৯০১-১৯৫০,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
নাম্বুদ্রীপাদ, ই. এম. এস.	-	*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* এন. বি. এ, কলকাতা।
সরকার, সুমিত	-	*আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭,* প্রোগ্রেসিভ, কলকাতা।
বাগচী, কে. টি.	-	*ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি,* প্রোগ্রেসিভ, কলকাতা।
দাশ, অসিতাভ	-	*তারিখ অভিধান (১৭৫৬-১৯৪৭),* পত্রলেখা, কলকাতা।
দত্ত, সন্দীপ	-	*বাংলা কবিতার কালপঞ্জি,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা।
নীরদবরণ হাজরা	-	*কলকাতা : ইতিহাসের দিনলিপি,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
সেন, শুচিব্রত ও ঘোষ অমিয়	-	*আধুনিক ভারত : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* প্রোগ্রেসিভ, কলকাতা।
সিংহ, দীনেশচন্দ্র	-	*বঙ্গভঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ,* কথাশিল্পী, কলকাতা।
ইসলাম, আনিমূল	-	*সেই সব ইতিহাস,* পত্রলেখা, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ	-	*দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা,* প্রোগ্রেসিভ, কলকাতা।
উমর, বদরুদ্দীন	-	*সাম্প্রদায়িকতা,* নবপত্র, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ	-	*বিশশতকের জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা।
ঘোষ, সুনীতি কুমার	-	*বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি ও রাজনীতি,* নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়	-	*উদ্বাস্তু,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
ঘোষ, সেমন্তী	-	*দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* গাঙচিল, কলকাতা।

ইংরেজী গ্রন্থ:

Bhalla, Aloke	-	*Pratition Dialogues : Memories of a Lost Home,* Penguin, New Delhi.
Chatterjee, Partha	-	*Present History of West Bengal*, NBT, Kolkata

Das, Veena - *Mirrors of Violence : Communities*, Riots and survivors in South Asia., Rupa, New Delhi.

Bandopadhyay, Srikumar - *Recent Trends in Bengali Literature*, NBT, Kolkata.

পত্র-পত্রিকা:

দাস, প্রভাত - *'অন্বিষ্ট'* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৮, কলকাতা।

ভৌমিক, তাপস - *'কোরক'* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৯, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, দিলীপন - *'জলার্ক'* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), ১৯৯০, কলকাতা।

দেব, দেবব্রত - *'মুখাবয়ব'* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৮, কলকাতা।

মণ্ডল, ধ্রুবজ্যোতি - *'বৈশাখী'* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৮, কলকাতা।

ঘোষ, নিলয় - *পশ্চিমবঙ্গ* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৮, বাংলা একাডেমী।

শাহেদ, ড. সৈয়দ মোহাম্মদ - *উত্তরাধিকার* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ফুয়াদ, আফিক - *দিবারাত্রির কাব্য* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), ২০০৯, কলকাতা।